

ମଧ୍ୟ ରୂପ ଚତୁର୍ଦ୍ରାବିଦୀ

# ଶ୍ରୀକାନ୍ତ



# শ্রীকান্ত

শ্রী শরৎ চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়

# প্রথম পর্ব

## এক

আমার এই ‘ভবঘুরে’ জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!

ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই ত বুড়া হইলাম। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা ‘ছি-ছি’ শুনিয়া শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মন্ত্র ‘ছি-ছি-ছি’ ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ ‘ছি-ছি’র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেই সব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাত সন্দেহ হইতেছে, এই ‘ছি-ছি’টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না। মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিৰ-সৃষ্টিৰ ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন নাই; গাঢ়ি-পাঞ্চী চড়িয়া বহু লোক-লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে ‘কাহিনী’ নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরূচিও দেন না! বুদ্ধি হয়ত তাহাকে কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী-লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এমনি অসঙ্গত, খাপছাড়া—এবং দেখিবার বস্ত ও তুষঁটা স্বভাবতঃই এতই বেয়াড়া হইয়া উঠে যে, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া অঙ্গাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে—সুদীর্ঘ দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

অতএব এ সকলও থাক। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই ত বলা হয় না। ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত-দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না! সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মন্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাপ্টুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক— একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারো মুখটুখ ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু, কি করিয়া ‘ভবঘূরে’ হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা ‘ফুটবল ম্যাচে’। আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না জানি না। কারণ বহুবৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যুষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমন্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবন্ধে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে!

ইঙ্কুলের মাঠে বাঙালী ও মুসলমান ছাত্রদের ‘ফুটবল ম্যাচ’। সন্ধ্যা হয়—হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ—ওরে বাবা—এ কি রে! চটাপট শব্দ এবং মারো শালাকে, ধরো শালাকে! কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া

গেলাম। মিনিট দুই-তিন। ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আস্ত ছাতির বাঁট পটাশ্ করিয়া ভাস্তিল এবং আরো গোটা দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুসলমান-ছেকরা তখন আমার চারিদিকে বৃহৎ রচনা করিয়াছে—পালাইবার এতটুকু পথ নাই।

আরও একটা ছাতির বাঁট—আরও একটা। ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্গতিতে বৃহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ।

ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুউল কপাল, মুখে দুই-চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে কিছু বড়। কহিল, তয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্লভ হইলেও অসাধারণ হয়ত নয়। কিন্তু তাহার হাত দুখানি যে সত্যই অসাধারণ, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু জোরের জন্য বলিতেছি না। সে দুটি দৈর্ঘ্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পড়িত। ইহার পরম সুবিধা এই যে, যে ব্যক্তি জানিত না, তাহার কম্পিনকালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাত হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুষ্ট্যাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি! বাঘের থাবা বলিলেই হয়।

মিনিট-দুয়ের মধ্যে তাহার পিঠ ঘেঁষিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল, পালা।

চুটিতে শুরু করিয়া কহিলাম, তুমি? সে রুক্ষভাবে জবাব দিল, তুই পালা না—গাধা কোথাকার!

গাধাই হই—আর যাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া  
দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—না।

ছেলেবেলা মারপিট কে না করিয়াছে? কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা—  
মাস দুই-তিন পূর্বে লেখাপড়ার জন্য শহরে পিসিমার বাড়ি আসিয়াছি—ইতিপূর্বে  
এভাবে দল বাঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আন্ত দুটা ছাতির বাঁট পিঠের  
উপরও কোনদিন ভাঙে নাই।

তথাপি একা পলাইতে পারিলাম না। ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি  
চাহিয়া কহিল, না—তবে কি? দাঁড়িয়ে মার খাবি নাকি? ঐ, ওই দিক থেকে ওরা  
আসচে—আচ্ছা, তবে খুব ক'ষে দৌড়ো—

এই কাজটা বরাবরই খুব পারি। বড় রাস্তার উপরে আসিয়া যখন পৌঁছান  
গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং  
পথের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের উপর এখানে  
একটা, আর ওই ওখানে একটা জ্বালা হইয়াছে। চোখের জোর থাকিলে, একটার  
কাছে দাঁড়াইয়া আর একটা দেখা যায় না, তা নয়। আততায়ীর শঙ্কা আর নাই।  
ইন্দ্র অতি সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা কহিল। আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল,  
কিন্তু আশ্চর্য, সে এতটুকুও হাঁপায় নাই। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই—মারে  
নাই, মার খায় নাই, ছুটিয়া আসে নাই—না, কিছুই নয়; এমনিভাবে জিজ্ঞাসা  
করিল, তোর নাম কি রে?

শ্রী—কা—ন্ত—

শ্রীকান্ত? আচ্ছা। বলিয়া সে তাহার জামার পকেট হইতে একমুঠা শুকনা  
পাতা বাহির করিয়া কতকটা নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া কতকটা আমার হাতে  
দিয়া বলিল, ব্যাটাদের খুব ঠুকেছি—চিবো।

কি এ?

সিদ্ধি।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সিদ্ধি? এ আমি খাইনে।

সে ততোধিক বিস্মিত হইয়া কহিল, খাস্নে? কোথাকার গাধা রে! বেশ নেশা হবে—চিরো! চিবিয়ে গিলে ফ্যাল্।

নেশা জিনিসটার মাধুর্য তখন ত আর জানি নাই! তাই ঘাড় নাড়িয়া ফিরাইয়া দিলাম। সে তাহাও নিজের মুখে দিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল।

আচ্ছা, তা হ'লে সিগ্রেট খা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা-দুই সিগ্রেট ও দেশলাই বাহির করিয়া, একটি আমার হাতে দিয়া অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। তারপরে তাহার দুই করতল বিচিৰ উপায়ে জড়ো করিয়া সেই সিগ্রেটটাকে কলিকার মত করিয়া টানিতে লাগিল। বাপ রে, সে কি টান! এক টানে সিগ্রেটের আগুন মাথা হইতে তলায় নামিয়া আসিল। চারিদিকে লোক—আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফ্যালে?

ফেললেই বা! সবাই জানে। বলিয়া স্বচ্ছন্দে সে টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া আমার মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

আজ আমার সেই দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না—ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।

তারপরে মাস খানেক গত হইয়াছে। সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম তেমনি অন্ধকার। কোথাও গাছের একটি পাতা পর্যন্ত নড়ে না। ছাদের উপর সবাই শুইয়া ছিলাম। বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই। হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামপ্রসাদী সুর। কত ত শুনিয়াছি, কিন্ত বাঁশিতে যে এমন মুঞ্চ করিয়া দিতে পারে, তাহা জানিতাম না। বাড়ির পূর্ব-

দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁটালের বাগান। ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজখবর লইত না। সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শুধু গরু-বাচুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়া সরু একটা পথ পড়িয়াছিল।

মনে হইল, যেন সেই বনপথেই বাঁশির সুর ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। পিসিমা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার বড়ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হাঁ বে নবীন, বাঁশি বাজায় কে—রায়েদের ইন্দ্র নাকি? বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই ওই বংশধারীকে চেনেন। বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশিই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে?

বলিস্ কি রে? ও কি গোঁসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসচে না কি?

বড়দা বলিলেন, হ্বঁ।

পিসিমা এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ওই অদূরবর্তী গভীর জঙ্গলটা স্মরণ করিয়া মনে মনে বোধ করি শিহরিয়া উঠিলেন। ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ওর মা কি বারণ করে না? গোঁসাইবাগানে কত লোক যে সাপে-কামড়ে মরেচে, তার সংখ্যা নেই—আচ্ছা, ও-জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছোঁড়াটা কেন?

বড়দা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর কেন! ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় আসার এই সোজা পথ। যার ভয় নেই, প্রাণের মায়া নেই, সে কেন বড় রাস্তা ঘূরতে যাবে মা? ওর শিগ্গির আসা নিয়ে দরকার। তা, সে পথে নদী-নালাই থাক আর সাপখোপ বাঘ-ভালুকই থাক।

ধন্যি ছেলে! বলিয়া পিসিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। বাঁশির সুর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল।

এই সেই ইন্দ্রনাথ। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, যদি অতখানি জোর এবং এমনি করিয়া মারামারি করিতে পারিতাম! আর আজ রাত্রে যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি অম্বনি করিয়া বাঁশি বাজাইতে পারিতাম!

কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি! সে যে আমার অনেক উচ্চে। তখন ইঙ্গুলেও সে আর পড়ে না। শুনিয়াছিলাম, হেডমাস্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্মাহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাস্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘৃণাভরে ইঙ্গুলের রেলিং ডিঙাইয়া বাঢ়ি চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই। অনেকদিন পরে তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম, সে অপরাধ অতি অকিঞ্চিৎ। হিন্দুস্থানী পশ্চিতজীর ক্লাশের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইত। এমনি এক সময়ে সে তাহার গ্রন্থিবন্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছেট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ, পশ্চিতজী বাঢ়ি গিয়া তাঁহার নিজের শিখাটি নিজের চাপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন—খোয়া যায় নাই। তথাপি কেন যে পশ্চিতের রাগ পড়ে নাই, এবং হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন—সে কথা আজ পর্যন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে নাই। সেটা পারে নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে, ইঙ্গুল হইতে রেলিং ডিঙাইয়া বাঢ়ি আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না। কিন্তু খোলা ছিল, কি ছিল না, এ দেখিবার শখও তাহার আদৌ ছিল না।

এমন কি, মাথার উপর দশ-বিশজন অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইল না! ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছেট ডিঙি ছিল; জল নাই, বড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—একা তাহারই উপর। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা-শ্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; দশ-পনর দিন আর তাহার কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া গেল না। এমনি একদিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাসিয়া যাওয়ার মুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত-

বাঞ্ছিত মিলনের গ্রান্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাই এত কথা আমার  
বলা।

কিন্তু যাহারা আমাকে জানে, তাহারা বলিবে, তোমার ত এ সাজে নাই  
বাপু! গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখিতে গ্রাম ছাড়িয়া পরের বাড়িতে  
আসিয়াছিলে—তাহার সহিত তুমি মিশিলেই বা কেন, এবং মিশিবার জন্য এত  
ব্যাকুল হইলেই বা কেন? তা না হইলে ত আজ তোমার—

থাক্ থাক্, আর বলিয়া কাজ নাই। সহস্র লোক এ কথা আমাকে লক্ষ  
বার বলিয়াছে; নিজেকে নিজে আমি এ প্রশ্ন কোটিবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে।  
কেন যে—এ জবাব তোমরাও দিতে পারিবে না; এবং না হইলে আজ আমি কি  
হইতে পারিতাম, সে প্রশ্ন সমাধান করিতেও কেহ তোমরা পারিবে না। যিনি সব  
জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই একটা  
হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত মন-প্রাণটা পড়িয়া থাকিত, এবং কেন সেই মন্দের  
সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতি কগাটি পর্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও  
শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং  
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল  
সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্য প্রথামত বাইরে বৈঠকখানার ঢালা-  
বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি।  
বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্পিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার  
সান্ধ্যতন্ত্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃন্দ রামকমল ভট্ট  
চায় আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হঁকায় ধূমপান করিতেছেন।  
দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে  
আমরা তিন ভাই, মেজদা'র কঠোর তত্ত্ববধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি।  
হোড়না, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গন্তীর-প্রকৃতি

মেজদা বার-দুই এন্টাগ ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদা'র ‘পাশের পড়া’র বিষ্ণ না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত ‘বাইরে’, কোনটাতে ‘থুথুফেলা’, কোনটাতে ‘নাক ঝাড়া’, কোনটাতে ‘তেষ্টা পাওয়া’ ইত্যাদি।

যতীনদা একটা ‘নাকঝাড়া’ টিকিট লইয়া মেজদা'র সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—হ্যাঁ—আটটা তেব্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা ‘থুথুফেলা’ টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা ‘না’ লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারি করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া থাকিয়া ‘তেষ্টা পাওয়া’ আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্চুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—হ্যাঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গাঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।

এইরপে মেজদা'র অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা সরম্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে

আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইঙ্গুলে ক্লাশের মধ্যে যে সকল সন্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদা'র দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার। যাক—এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে।

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্ত্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সন্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশ্ব কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাত আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা ‘হ্র’ শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চিৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেললে রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার দুই-পা সন্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে ‘আঁ-আঁ’ করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া

ফেলিতেছেন। এ যেন তিনি বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চিৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো—শালাকো মার ডালো ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুন্দর লোকের মুখ শুকাইয়া গেল! —আরে, এ যে ভট্চায়িমশাই।

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে-মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুটিলেন কেন? ভট্চায়িমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

ছোড়না ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হৃম করে ল্যাজ গুটিয়ে পাপোশের উপর বসেছিল।

মেজদা'র চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, ‘দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার’।

কিন্তু কোথা সে? মেজদা'র ‘দি রয়েল বেঙ্গল’ই হোক আর রামকমলের ‘মস্ত ভালুক’ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা-কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাত পালোয়ান কিশোরী সিং ‘উহ বয়ঠা’ বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই বোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রানী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কর্তৃস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। ‘লাও’ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাশা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিষ্ঠক।

এম্বিনি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চিংকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে খতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লঞ্ছন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রংঘনিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতেই সেই রঞ্জেল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা

জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী। ইন্দ্ৰ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্চায়িমশাই খড়ম হাতে সর্বাঞ্ছে ছুটিয়া আসিলেন—হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?

পিসেমশাই মহাক্রোধে হৃকুম দিলেন, শালাকো কান পাকাড়কে লাও!

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাঞ্ছে দেখিয়াছিল, সুতৰাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্চায়িমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন, এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্চায়িমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভবিয়াছিল একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্য ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির এই খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই।

পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ  
পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল  
কথার যথেষ্ট সদৃতর দিতে পারেন। কিন্তু শ্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই  
পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই আরও গরম হইয়া ভুক্ত দিলেন, উহার  
ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ  
কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া  
বলিলেন, রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

ইন্দ্র আমার দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বুঝি এই বাড়িতে থাকিস্ শ্রীকান্ত?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ। তুমি এত রান্তিরে কোথায় যাচ?

ইন্দ্র হাসিয়া কহিল, রান্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা। আমি যাচ্ছি আমার  
ডিঙিতে—মাছ ধ'রে আনতে। যাবি?

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত অন্ধকারে ডিঙিতে চড়বে?

সে আবার হাসিল। কহিল, ভয় কি রে! সেই ত মজা। তা ছাড়া অন্ধকার  
না হ'লে কি মাছ পাওয়া যায়? সাঁতার জানিস?

খুব জানি।

তবে আয় ভাই! বলিয়া সে আমার একটা হাত ধরিল। কহিল, আমি  
একলা এত স্বোতে উজোন বাইতে পারিনে—একজন কাউকে খুঁজি, যে ভয় পায়  
না।

আমি আর কথা কহিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে রাস্তার উপর  
আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমটা আমার নিজেরই যেন বিশ্বাস হইল না—আমি  
সত্যিই এই রাত্রে নৌকায় চলিয়াছি। কারণ, যে আহ্বানে এই স্তন্ধ-নিবিড় নিশীথে  
এই বাড়ির সমস্ত কর্ঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া দিয়া, একাকী বাহির হইয়া  
আসিয়াছি, সে যে কত বড় আকর্ষণ, তাহা তখন বিচার করিয়া দেখিবার আমার  
সাধ্যই ছিল না। অন্তিকাল পরে গোঁসাইবাগানের সেই ভয়ক্ষর বনপথের সম্মুখে

আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ইন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা  
অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

খাড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বথবৃক্ষ মূর্তিমান  
অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই প্রায় ত্রিশ হাত নীচে  
সূচিভোদ্য আঁধার-তলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্ন্তোত ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া  
উদ্বাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি বাঁধা আছে।  
উপর হইতে মনে হইল, সেই সুতীর্ণ জল ধারার মুখে একখানি ছেট মোচার  
খোলা যেন নিরন্তর কেবলই আছাড় খাইয়া মরিতেছে।

আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। কিন্তু ইন্দ্র যখন উপর হইতে  
নীচে একগাছি রঞ্জু দেখাইয়া কহিল, ডিঙির এই দড়ি ধ'রে পা টিপে টিপে নেমে  
যা, সাবধানে নাবিস্, পিছলে পড়ে গেলে আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না;  
তখন যথার্থই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি  
আমার ত দড়ি অবলম্বন আছে, কিন্তু তুমি?

সে কহিল, তুই নেবে গেলেই আমি দড়ি খুলে দিয়ে নাব্ব। ভয় নেই,  
আমার নেবে ঘাবার অনেক ঘাসের শিকড় ঝুলে আছে।

আর কথা না কহিয়া আমি দড়িতে ভর দিয়া অনেক যত্নে অনেক দুঃখে  
নীচে আসিয়া নৌকায় বসিলাম। তখন দড়ি খুলিয়া দিয়া ইন্দ্র ঝুলিয়া পড়িল। সে  
যে কি অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিল, তাহা আজও আমি জানি না। ভয়ে ঝুকের  
ভিতরটা এমনি টিপটিপ করিতে লাগিল যে, তাহার পানে চাহিতেই পারিলাম না!  
মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মন্ত্রগর্জন ছাড়া কোনও শব্দমাত্র নাই।  
হঠাতে ছেট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইন্দ্র দুই  
হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া ঢিয়া বসিল। ক্ষুদ্র তরী তীর  
একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

## ଦୁଇ

କରେକ ମୁହଁତେଇ ସନାନ୍ତକାରେ ସମ୍ମୁଖ ଏବଂ ପଞ୍ଚାଂ ଲେପିଯା ଏକାକାର ହଇଯା ଗେଲ । ରହିଲ ଶୁଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମେ ସୀମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରସାରିତ ବିପୁଲ ଉଦ୍ଦାମ ଜଳଶ୍ରୋତ ଏବଂ ତାହାରଇ ଉପର ତୀର୍ବଗତିଶୀଳା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଣୀଟି ଏବଂ କିଶୋରବସ୍ତ ଦୁଟି ବାଲକ । ପ୍ରକୃତିଦେବୀର ସେଇ ଅପରିମୟ ଗଭୀର ରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ବସନ୍ତ ତାହାରେ ନହେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମି ଆଜଓ ଭୁଲିତେ ପାରି ନାହିଁ! ବାୟୁଲେଶହୀନ, ନିଙ୍କମ୍ପ, ନିଷ୍ଠକ, ନିଃସଙ୍ଗ ନିଶୀଥିନୀର ସେ ଯେନ ଏକ ବିରାଟ କାଳୀମୂର୍ତ୍ତି । ନିବିଡ଼ କାଳୋ ଚୁଲେ ଦୂଳୋକ ଭୂଲୋକ ଆଚନ୍ମ ହଇଯା ଗେଛେ, ଏବଂ ସେଇ ସୂଚିଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ବିଦୀଗ୍ କରିଯା କରାଳ ଦଂହ୍ରାରେଥାର ନ୍ୟାୟ ଦିଗଭାବିଷ୍ଟତ ଏହି ତୀର ଜଳଧାରା ହଇତେ କି ଏକ ପ୍ରକାରେର ଅପରମ ସ୍ତିମିତ ଦୃତି ନିଷ୍ଠିର ଚାପାହସିର ମତ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହଇତେଛେ । ଆଶେପାଶେ ସମୁଖେ କୋଥାଓ ବା ଉନ୍ନାନ୍ତ ଜଳଶ୍ରୋତ ଗଭୀର ତଳଦେଶେ ଘା ଖାଇଯା ଉପରେ ଉଠିଯା ଫାଟିଯା ପଡ଼ିତେଛେ, କୋଥାଓ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଗତି ପରମ୍ପରେର ସଂଘାତେ ଆବର୍ତ୍ତ ରାଚିଯା ପାକ ଖାଇତେଛେ, କୋଥାଓ ବା ଅପ୍ରତିହତ ଜଳପ୍ରବାହ ପାଗଳ ହଇଯା ଧାଇଯା ଚଲିଯାଛେ ।

ଆମାଦେର ନୌକା କୋଣାକୁଣି ପାଡ଼ି ଦିତେଛେ, ଏଇମାତ୍ର ବୁଝିଯାଛି । କିନ୍ତୁ ପରପାରେ ଏ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରେର କୋନଖାନେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଯା ଇନ୍ଦ୍ର ହାଲ ଧରିଯା ନିଃଶବ୍ଦେ ବସିଯା ଆଛେ ତାହାର କିଛୁଟି ଜାନି ନା । ଏହି ବୟସେଇ ସେ ଯେ କତ ବଡ଼ ପାକା ମାରି, ତଥନ ତାହା ବୁଝି ନାହିଁ । ହଠାଂ ସେ କଥା କହିଲ, କି ରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଭୟ କରେ?

ଆମି ବଲିଲାମ, ନାঃ—

ଇନ୍ଦ୍ର ଖୁଶି ହଇଯା କହିଲ, ଏହି ତ ଚାଇ—ସାଁତାର ଜାନଲେ ଆବାର ଭୟ କିମେର! ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ ଆମି ଏକଟି ଛୋଟ ନିଶାସ ଚାପିଯା ଫେଲିଲାମ—ପାଛେ ସେ ଶୁଣିତେ ପାଯ ।

কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জয় স্নোতের সঙ্গে সাঁতার জানা, এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সেও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এই ভাবে চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এম্নি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই, বিছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না বাড়েও না, থামিতেও চাহে না। মাঝে মাঝে এক-একবার ঝুপঝাপ্প শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্ৰ, ও কিসের আওয়াজ শোনা যায়? সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল, জলের স্নোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বড় পাড়? কেমন স্নোত?

সে ভয়ানক স্নোত। ওঃ, তাইত, কাল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙ্গে পড়লে ডিঙিসুন্দ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব। তুই দাঁড় টানতে পারিস?

পারি।

তবে টান।

আমি টানিতে শুরু করিলাম। ইন্দ্ৰ কহিল, উই—উই যে কালো মত বাঁদিকে দেখা যায় ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব আন্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লাগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।

এ আবার কি কথা! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে! ইন্দ্ৰ বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর ত পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাব কি ক'রে? ফিরে আসতে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।

তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই, বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্ফিস্ করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল—তবে এলি কেন? চল তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরূষ! তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনরয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরূষ? বপাঁৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারী পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মুকাফ্তের ভিতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাব যে শালারা টেরও পাবে না। একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! দ্যাখ শ্রীকান্ত, কিছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেল্লে ব'লে—আর পালাবার জো নেই, তখন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখবার জোটি নাই, তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধার ধরে বাঢ়ি ফিরে গেলেই বাস্ক! কি করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম, কহিলাম, সতুয়ার চড়া ত ঘোরনালার সুমুখে, সে ত অনেক দূর।

ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দূর? ছ-সাত ক্রোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরে গেলে চিত হ'য়ে থাকলেই হ'ল—তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক-চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্তসঙ্কল গভীর তীরে জলপ্রবাহে সাত ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। ইহার মধ্যে আর এ দিকের তীরে উঠিবার জো নাই। দশ-পনর হাত খাড়া উঁচু বালির পাড় মাথায় ভাসিয়া পড়িবে—এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙ্গন ধরিয়া জলস্নোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে!

বন্ধুটা অস্পষ্ট উপলক্ষি করিয়াই আমার বীরহৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ  
হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে?

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ত আমি ঠিক এমনি করেই পালিয়েছিলাম। তার  
পরদিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম, বলিলাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে  
আর কেউ এনেছিল—আমি নয়।

তবে এ-সকল এর কল্পনা নয়—একেবারে হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য!  
ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সন্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলি সারি দিয়া  
খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে—মিট্টমিট করিয়া আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্তী  
এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপর  
পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানটায় জলের বেগে অনেকগুলো মোহনার  
মত হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনো ঝাউগাছে একটা হইতে আর একটাকে  
আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে  
পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলো তখন অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের  
মত দেখাইতেছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গতব্য স্থানে পৌঁছান গেল।

ধীরের প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায়  
পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না তখন  
এধার হইতে ওধার পর্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই  
বহিদিকে জাল টাঙ্গাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্তোতে বড় বড় রঁই-কাঁলা  
ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং  
দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনর, বিশ সের রঁই-কাঁলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিম্নে  
নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র

ডিঙিখানা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল, এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

এত মাছ কি হবে ভাই?

কাজ আছে। আর না, পালাই চল। বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেমনি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্বোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা দমকা মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টা-ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতিপরিবর্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি? কি হ'ল?

ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ! শালারা টের পেয়েছে—চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসচে—ঐ দ্যাখ!

তাই ত বটে! প্রবল জল-তাড়নায় ছপাচপ শব্দ করিয়া চারখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা। পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টা-ক্ষেত্রের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

কি হবে ভাই? বলিতে বলিতেই অদম্য বাঞ্চোচ্ছসে আমার কঢ়নাগী রূপ্ত্ব হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেত্রের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয় দিন ইন্দ্র ‘চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা’ সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপনে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার

চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর। কোথাও জল এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর একহাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

নীচে কেন?

ডিঙি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে?

ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঞ্জে পড়ব।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাত কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানেক্টা পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাকট শব্দে চম্কাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই? সে উত্তর দিল, চাষীরা মাচার উপরে বসে বুনো শুয়ার তাড়চে।

বুনো শুয়ার! কোথায় সে? ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচি যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে। জবাব শুনিয়া স্তুত হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জঙ্গলে যে বুনো শুয়ারের হাতে পড়িব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু এ লোকটি একবুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পা

নড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট-পনর এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার, ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া ‘ছপাং’ করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্খিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাঢ়ী শুয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অঙ্গুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে, টেঁড়া, বোঢ়া, গোখ্রো, করেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই দেখচিস নে?

সে ত দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রাহিল। সে লোকটি কিন্তু ঊক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো-তিনটে ত আমার গা ঘেঁষে পালালো। এক-একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোঢ়া-টোঢ়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি করব। মরতে একদিন ত হবেই ভাই! এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কঢ়ে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পৌঁছিল, কতক পৌঁছিল না। আমি নির্বাক-নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিশাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাং করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্ত যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের

মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিশ্লেষিত করিবার জন্য শক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ?

সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

নীচে কেন?

ডিঙি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে?

ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঞ্জে পড়ব।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাত কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানেক্সা পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাক্ট শব্দে চম্কাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই? সে উত্তর দিল, চাষীরা মাচার উপরে ব'সে বুনো শুয়ার তাড়চে।

বুনো শুয়ার! কোথায় সে? ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে। জবাব শুনিয়া স্তুতি হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জঙ্গলে যে বুনো শুয়ারের হাতে পড়িব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু ঐ লোকটি একবুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পানড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট-পনর এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার, ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া ‘ছপাং’ করিয়া শব্দ হইতেছে।

একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শুয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে, টোড়া, বোড়া, গোখরো, করেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই দেখচিস নে?

সে ত দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু জ্ঞেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো-তিনটে ত আমার গা ঘেঁষে পালালো। এক-একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া-টোড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি করব। মরতে একদিন ত হবেই ভাই! এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কঢ়ে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পোঁছিল, কতক পোঁছিল না। আমি নির্বাক-নিষ্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিশ্চাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাং করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্ত যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদের মত সন্ধুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শক্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ?

সমস্ত বিপদের বার্তা তন্মতন্ম করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে  
অকুণ্ঠিতচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল, একবার  
একটা মুখের অনুরোধও করিল না—'শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা'। সে ত  
জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানাইতে পারিত! এ ত শুধু খেলা  
নয়! জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক  
করিয়াছে! এই যে বিনা আড়ম্বরে সামান্য ভাবে বলিয়াছিল—মর্তে একদিন ত  
হবেই—এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই  
বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার এত বড়  
স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া  
ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির  
হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কত কাল কত  
সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত  
প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের  
মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও  
দেখিতে পাই নাই! কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাত একদিন যেন বুদ্বুদের মত  
শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুক্ষ চোখ জলে ভাসিয়া  
যাইতেছে-কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া  
উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্তা! এই অত্মত অপার্থিব বস্ত কেনই  
বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার  
করিলে! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই  
করিতেছে—ভগবান! টাকাকড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি তের ত তোমার অফুরন্ত  
ভাঙ্গার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত  
তুমই বা কয়টা দিতে পারিলে?

যাক সে কথা। ক্রমশঃ ঘোর-কলকল্লোল নিকটবর্তী হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতেছিলাম, অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ যাহাকে অতিক্রম করিয়া স্টীমার যাইতে পারে না—তাহাই প্রধাবিত হইতেছে। বেশ অনুভব করিতেছিলাম, জলের বেগ বর্ধিত হইতেছে, এবং ধূসর ফেনপুঁজি বিস্তৃত বালুকারাশির অমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে করিয়া সন্মুখবর্তী উদ্বাম স্বোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েচি। মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও ত বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্বোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল! কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূর পর্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, বনবাড় এবং ভুট্টা-জনারের চড়া ডান দিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতেই লাগিল।

## তিনি

বড় ঘুম পেয়েছে ইন্দ্র, বাড়ি ফিরে চল না ভাই!

ইন্দ্র একটুখানি হাসিয়া ঠিক যেন মেয়েমানুষের মত মেহার্দি কোমল স্বরে  
কথা কহিল। বলিল, ঘুম ত পাবার কথাই ভাই! কি করব শ্রীকান্ত, আজ একটু  
দেরি হবেই—অনেক কাজ রয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন? ঐখানে  
একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে না?

আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে হইল না। আমি গুটিশুটি হইয়া সেই  
তঙ্গাখানির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। স্তিমিতচক্ষে চুপ করিয়া  
আকাশের গায়ে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে লাগিলাম। এ ডোবে, এই  
ভাসে, আবার ডোবে, আবার ভাসে! আর কানে আসিতে লাগিল—জলস্নোতের  
সেই একটানা ছুক্কার। আমার একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিন অমন করিয়া  
সব ভুলিয়া মেঘ আর চাঁদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম কি করিয়া? সে ত আমার  
তন্ময় হইয়া চাঁদ দেখিবার বয়স নয়! কিন্তু এই যে বুড়োরা পৃথিবীর অনেক ব্যাপার  
দেখিয়া-শুনিয়া বলে যে, ওই বাহিরের চাঁদটাও কিছু না, মেঘটাও কিছু না, সব  
ফাঁকি—সব ফাঁকি! আসল যা কিছু, তা এই নিজের মনটা। সে যখন যাকে যা  
দেখায়, বিভোর হইয়া সে তখন তাই শুধু দেখে। আমারও সেই দশা। এত  
রকমের ভয়ক্ষেত্র ঘটনার ভিতর দিয়া এমন নিরাপদে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়া  
আমার নিজীব মনটা তখন বোধ করি এমনি-কিছু-একটা শাস্তি ছবির অন্তরেই  
বিশ্রাম করিতে চাহিয়াছিল।

ইতিমধ্যে যে ঘণ্টা-দুই কাটিয়া গেছে, তাহা টেরও পাই নাই। হঠাৎ মনে  
হইল আমার, চাঁদ যেন মেঘের মধ্যে একটা লম্বা ডুবসাঁতার দিয়া একেবারে  
ডানদিক হইতে বাঁদিকে গিয়া মুখ বাহির করিলেন। ঘাড়টা একটু তুলিয়া

দেখিলাম, নৌকা এবার ওপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিয়াছে। প্রশ্ন করিবার বা একটা কথা কহিবার উদ্যমও তখন বোধ করি আমার মধ্যে আর ছিল না; তাই তখনি আবার তেমনি করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। আবার সেই দুচক্ষু ভরিয়া চাঁদের খেলা এবং দু'কান ভরিয়া স্নোতের তর্জন। বোধ করি আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল।

খস—স—বালুর চরে নৌকা বাধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্ত এ কোন্ জায়গা? বাড়ি আমাদের কত দূরে? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুই ত কোথাও দেখি না? প্রশ্ন করিবার পূর্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইন্দ্র কহিল, একটু বোস শ্রীকান্ত; আমি এখনুনি ফিরে আসব—তোর কিছু ভয় নেই। এই পাড়ের ওধারেই জেলেদের বাড়ি।

সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই। এমনিই ত সর্বকালেই মানুষের মানসিক গতিবিধি বড়ই দুর্জ্জ্য; কিন্ত কিশোর-কিশোরীর মনের ভাব বোধ করি একেবারেই অঙ্গেয়। তাই বোধকরি, শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল।

বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া, তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ,—কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল,—আবার কেহ বা কোন কথাই শুনিল না—তর্কাতর্কির সমস্ত গণি মাড়াইয়া ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইল, নাচিয়া, কাঁদিয়া, গান গাহিয়া সব একাকার করিয়া দিয়া সংসারটাকে যেন একটা পাগলাগারদ বানাইয়া ছাড়িল। তখন যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, তাহারাও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্ত

আর কোথাও নাই। যাহাদের রঞ্চির সহিত মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল, এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিল—সেই যে সবদিনের পুরাতন, অথচ চিরন্তন—বৃন্দাবনের বনে বনে দুটি কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র, মুক্তিফল যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতই তুচ্ছ—তাহার কে কবে অন্ত খুঁজিয়া পাইল? পাইল না, পাওয়াও যায় না। তাই বলিতেছিলাম, তেমনি সেও ত আমার সেই কিশোর বয়স! যৌবনের তেজ এবং দৃঢ়তা না আসুক, তাহার দম্ভ ত তখন আসিয়া হাজির হইয়াছে! প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ত হৃদয়ে সজাগ হইয়াছে! তখন সঙ্গীর কাছে ভীরু বলিয়া কে নিজেকে প্রতিপন্থ করিতে চাহে? অতএব তৎক্ষণাত্মে জবাব দিলাম, ভয় করব আবার কিসের? বেশ ত, যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে, মাথার উপর আবার সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহু দূরাগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জন। আর সুমুখে সেই বালির পাড়। এটা কোন জায়গা, তাই ভাবিতেছি, দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিসনে—খবরদার ব'লে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়ে যদি কেউ আসে, তবু দিবিনে—বল্বি, মুখে তোর ছাই দেব—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার হাতে ক'রে দিতে যাস্নে যেন, ঠিক আমি হলেও না,—খবরদার!

কেন ভাই?

ফিরে এসে বল্বি—খবরদার কিন্তু—বলিতে বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনই ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা-উপশিরা দিয়া বরফ-গলা জল বহিয়া চলিতে লাগিল। নিতান্ত শিশুটি নহি যে, তাহার ইঙ্গিতের মর্ম অনুমান করিতে পারি নাই! আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের কাছে গোল্পদের জল। কিন্তু তথাপি, এই নিশা অভিযানের রাতটায় যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বোধ করি ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল, পাড়ের ওদিক হইতে কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। যেমনি আড়চোখে চাই, অম্নি সেও যেন মাথা নিচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ হইল চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিতেছে না।

মনে হইল, যেন মানুষের কঠস্বর শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধাঙ্গে শতপাকে বেষ্টন করিয়া মুখ নিচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

কঠস্বর ক্রমশঃঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুবিলাম, দুই-তিনজন লোক কথাবার্তা বলিতে বলিতে এইদিকেই আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর অপর দুইজন হিন্দুস্থানী! কিন্তু সে যাহাই হউক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না। কারণ, এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলেবেলা হইতেই জানিতাম যে, ইহাদের ছায়া থাকে না।

আঃ—ঐ যে ছায়া! অস্পষ্ট হউক তবুও ছায়া! জগতে আমার মত সেদিন কোন মানুষ কোন বস্ত চোখে দেখিয়া কি এমন তৃষ্ণি পাইয়াছে! পাক আর নাই পাক, ইহাকেই যে বলে দৃষ্টির চরম আনন্দ, একথা আজ আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি! যাক! যাহারা আসিল তাহারা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জালের মত একপ্রকার বন্ধুখণ্ডে বাঁধিয়া

ফেলিল এবং তৎপরিবর্তে ইন্দ্রের হাতে যাহা গুঁজিয়া দিল, তাহার একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদু শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু স্নোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁষিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লগি ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না। কারণ আমার মন তখন তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও কি-একপ্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইমাত্র না তাহাকেই চাঁদের আলোয় ছায়া ফেলিয়া ফিরিতে দেখিয়া অধীর আনন্দে ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম!

হাঁ, তা মানুষের স্বভাবই ত এই! একটুখানি দোষ পাইলে পূর্ব-মুহূর্তের সমস্তই নিঃশেষে ভুলিয়া যাইতে তাহার কতক্ষণ লাগে? ছিঃ! ছিঃ! এমনি করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিল। এতক্ষণ এই মাছচুরি ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট চুরির আকারে বোধ করি স্থান পায় নাই। কেননা ছেলেবেলায় টাকাকড়ি চুরিটাই শুধু যেন বাস্তবিক চুরি; আর সব—অন্যায় বটে—কিন্তু কেমন করিয়া যেন সে সব ঠিক চুরি নয়—এমনিই একটা অদ্ভুত ধারণা প্রায় সকল ছেলেরই থাকে। আমারও তাই ছিল। না হইলে, এই ‘টুং’ শব্দটি কানে যাইবামাত্র এতক্ষণের এত বীরত্ব, এত পৌরুষ, সমস্তই একমুহূর্তে এমন শুক্ষ ত্রণের মত ঝড়িয়া পড়িত না। সে যদি মাছগুলা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিত, কিংবা—আর যাহাই করুক, শুধু টাকাকড়ির সহিত ইহার সংস্রব না ঘটাইত, তাহা হইলে আমাদের এই মৎস্য-সংগ্রহের অভিযানটিকে কেহ চুরি বলিলে ক্রোধে বোধ করি তাহার মাথাটাই ফাটাইয়া দিতাম এবং সে তাহার নায় প্রাপ্য পাইয়াছে বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু ছিঃ, ছিঃ! এ কি! এ কাজ ত জেলখানার কয়েদীরা করে!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাস্নি, না রে শ্রীকান্ত?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, না।

ইন্দ্র কহিল, কিন্তু তুই ছাড়া ওখানে আর কেউ ব'সে থাকতে পারত না,  
তা জানিস? তোকে আমি খুব ভালোবাসি—আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই।  
আমি যখন আস্ব, তোকে শুধু ডেকে আন্ব, কেমন?

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু এই সময়ে তাহার মুখর উপর সদ্য মেঘমুক্ত  
যে চাঁদের আলোটুকু পড়িল তাহাতে মুখখানি কি যে দেখাইল, আমি এতক্ষণের  
সব রাগ অভিমান হঠাৎ ভুলিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি  
কখনো ঐ সব দেখেচো?

কি সব?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

না ভাই দেখিনি—লোকে বলে, তাই শুনেচি।

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পারো?

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না ?

না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আসতে পারে না। একটু থামিয়া কহিল,  
রামনাম কি সোজা রে? তুই যদি রাম নাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চ'লে  
যাস, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে।  
কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা হ'লেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করছে—  
তারা সব অন্তর্যামী কিনা!

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাঁকরের পাড় শুরু হইল। ওপার অপেক্ষা  
এপারে স্নোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল, স্নোত যেন উল্টামুখে  
চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি তুলিয়া বোটে হাতে করিয়া কহিল, ঐ যে সামনে বনের  
মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। এখানে আমি একবার  
নেবে ঘাব। ঘাব আর আস্ব। কেমন?

অনিছা সত্ত্বেও বলিলাম, আচ্ছা। কারণ, ‘না’ বলিবার পথ ত এক প্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আবার ইন্দ্রও আমার নিভীকতা সম্পর্কে বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এখান হইতে ঐ স্থানটা এমনি জঙ্গলের মত অন্ধকার দেখাইতেছিল যে, এই মাত্র রামনামের অসাধারণ মহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও ওই অন্ধকার প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে নৌকার উপর একা বসিয়া এত রাত্রে রামনামের শক্তি-সামর্থ্য ঘাচাই করিয়া লইতে আমার এতটুকু প্রবৃত্তি হইল না এবং তখন হইতেই গা ছম্ছম্ করিতে লাগিল। সত্য বটে, মাছ আর ছিল না, সুতরাং মৎস্যপ্রার্থীর শুভাগমন না হইতে পারে; কিন্তু সকলের লোভ যে মাছেরই উপর, তাই বা কে বলিল? মানুষের ঘাড় মট্কাইয়া ঈষদুষ্ফ রক্তপান এবং মাংসচর্বণের ইতিহাসও ত শোনা গিয়াছে!

অনুকূল স্ন্যাত এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানি ত্রুট্র করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণদিকের আগ্রীবমন্থ বনবাট এবং কসাড়বন মাথা তুলিয়া এই দুটি অসমসাহসী মানবশিশুর পানে বিস্ময়স্তন্ত্রভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরশালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বামদিকেও তাহাদেরই আত্মীয়-পরিজনেরা সু-উচ্চ কাঁকরের পাড় সমাচ্ছম করিয়া তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেমনি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্গে অমান্য করিতাম না। কিন্তু কর্ণধার যিনি তাঁহার কাছে বোধ করি ‘রামনামে’র জোরে ইহাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কোনদিকে ঝঞ্জেপটি করিল না। দক্ষিণদিকের চরের বিস্তৃতিবশতঃ এ জায়গাটা একটি ছোটখাটো হৃদের মত হইয়াছিল—শুধু উত্তরদিকের মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ডিঙি বেঁধে উপরে উঠবার ত ঘাট নেই, তুমি যাবে কি করে?

ইন্দ্র কহিল, ঐ যে বটগাছ, ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধি মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে  
আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন  
হঠাতে একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল  
যে, অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কিছু পচেছে,  
ইন্দ্র!

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা! সবাই ত  
পোড়াতে পারে না—মুখে একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-  
কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোন্থানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই?

ঐ হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত—সবটাই শূশান কিনা। যেখানে হোক ফেলে  
রেখে ঐ বটতলার ঘাটে চান করে বাড়ি চ'লে যায়,—আরে দূর! ভয় কি রে! ও  
শিয়ালে-শিয়ালে লড়াই করচে। আচ্ছা আয়, আয়, আমার কাছে এসে বোস।

আমার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার  
কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার  
স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রান্তিরে একা একা আমি এই  
পথে যাই আসি—তিনবার রামনাম করলে কার সাধ্য কাছে আসে?

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটু সাড়া পাইলাম—অস্ফুটে  
কহিলাম, না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখানে কোথাও নেবো না—সোজা  
বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটিবার  
যেতেই হবে! এই টাকা ক'টি না দিলেই নয়—তারা পথ চেয়ে বসে আছে—আমি  
তিন দিন আস্তে পারিনি!

টাকা কাল দিয়ো না ভাই!

না ভাই, অমন কথাটি বলিস নে। আমার সঙ্গে তুইও চল—কিন্তু কারংকে  
এ কথা বলিস নে যেন।

আমি অস্ফুটে ‘না’ বলিয়া তাহাকে তেমনি স্পর্শ করিয়া পাথরের মত  
বসিয়া রহিলাম। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল  
লইব, কি নড়াচড়ার কোন প্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধ্যই আমার আর ছিল না।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই ঘাটটি চোখে পড়িল।  
যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপর যে গাছপালা নাই, স্থানটি  
মান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে,—দেখিয়া অত দুঃখেও একটু  
আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এইজন্য ইন্দ্র পূর্বাহ্নেই  
প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া  
পড়িয়াই একটা ভয়জড়িত স্বরে ‘ইস্’ করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে  
ছিলাম, সুতরাং উভয়েই প্রায় একসময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম।  
তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকালমৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করণভাবে আমার চোখে  
পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না  
দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না! গভীর নিশ্চীথে চারিদিক নিবিড় স্তুত্যায়  
পরিপূর্ণ—শুধু মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে শুশানচারী শৃগালের ক্ষুধাত  
কলহ-চিৎকার, কখন বা বৃক্ষেপবিষ্ট অর্ধসুষ্ঠ বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়নশব্দ,  
আর বহুদূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হৃ-হৃ-হৃ আর্তনাদ—ইহার মধ্যে  
দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক, নিষ্ঠক হইয়া, এই মহাকরণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া  
রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে  
ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে  
এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া  
অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই।

ঠিক যেন বিসৃষ্টিকার নিরাকৃণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নধর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিলেন। জলে-স্থলে বিন্যস্ত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ বেচারাকে ডিঙিতে তুলে এ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি!

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য; কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অসীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া—সে তের বেশি কঠিন কাজ! তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই না টান ধরে! একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রঞ্জের বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাঁধাবাঁধি, কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘটা! তাহাতে এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়শিত্ব করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে?

কৃষ্ণিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোঁবে? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্যহাত হাঁটুর নীচে দিয়া একটা শুক্ষ তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাবে। আহা! মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েচে রে! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই

উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি  
জাত থাকে রে?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন  
আমাদের ডিঙ্গিটা— এর কি জাত আছে? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরি  
হোক—এখন ডিঙ্গি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আমগাছ, জামগাছ—বুঝালি না?  
এও তেমনি।

দৃষ্টান্তটি যে নেহাঁ ছেলেমানুমের মত, এখন তাহা জানি। কিন্তু অন্তরের  
মধ্যে ইহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না—কোথায় যেন অতি তীক্ষ্ণ সত্য ইহারই  
মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে এমনি খাঁটি কথা সে বলিতে  
পারিত। তাই আমি অনেক সময়ে ভাবিয়াছি, ওই বয়েসে কাহারো কাছে কিছুমাত্র  
শিক্ষা না করিয়া বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া এই সকল  
তত্ত্ব সে পাইত কোথায়? এখন কিন্তু বয়েসের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উত্তরটাও যেন  
পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। কপটতা ইন্দ্রের মধ্যে ছিলই না। উদ্দেশ্যকে গোপন  
রাখিয়া কোন কাজ সে করিতেই জানিত না। সেই জন্যই বোধ করি তাহার সেই  
হন্দয়ের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সত্য কোন অঙ্গাত নিয়মের বশে সেই বিশ্বব্যাপী  
অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্যের দেখা পাইয়া, অনায়াসে অতি সহজেই তাহাকে নিজের  
মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত! তাহার শুন্দি সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের  
উমেদারী না করিয়াই ঠিক ব্যাপারটি টের পাইত। বাস্তবিক, অকপট সহজ-বুদ্ধিই  
ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি। ইহার উপরে ত কেহই নাই। ভাল করিয়া  
দেখিলে, মিথ্যা বলিয়া ত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চোখে পড়ে না।  
মিথ্যা শুধু মানুষের বুঝিবার এবং বুঝাইবার ফলটা। সোনাকে পিতল বলিয়া  
বুঝানও মিথ্যা, বুঝাও মিথ্যা, তাহা জানি।

କିନ୍ତୁ ତାହାତେ ସୋନାରଇ ବା କି, ଆର ପିତଳେରଇ ବା କି ଆସେ ଯାଯା । ତୋମରା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ବୁଝ ନା, ତାହାରା ଯା ତାଇ ତ ଥାକେ । ସୋନା ମନେ କରିଯା ତାହାକେ ସିନ୍ଦୁକେ ବନ୍ଦ କରିଯା ରାଖିଲେଓ ତାହାର ସତ୍ୟକାର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ହୁଯ ନା, ଆର ପିତଳ ବଲିଯା ଟାନ ମାରିଯା ବାହିରେ ଫେଲିଯା ଦିଲେଓ ତାହାର ଦାମ କମେ ନା । ସେଦିନଓ ସେ ପିତଳ, ଆଜଓ ସେ ପିତଳଇ । ତୋମାର ମିଥ୍ୟାର ଜନ୍ୟ ତୁମି ଛାଡ଼ା ଆର କେହ ଦାୟୀଓ ହୁଯ ନା, ଜ୍ଞାନେପାଇଁ କରେ ନା । ଏହି ବିଶ୍ୱବର୍କଷାଣେର ସମସ୍ତଟାଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ । ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ତିତ୍ର ଯଦି କୋଥାଓ ଥାକେ, ତବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟେର ମନ ଛାଡ଼ା ଆର କୋଥାଓ ନା । ସୁତରାଂ ଏହି ଅସତ୍ୟକେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଥନ ତାହାର ଅନ୍ତରେର ମଧ୍ୟେ ଜାନିଯା ହୋକ, ନା ଜାନିଯା ହୋକ, କୋନ ଦିନ ସ୍ଥାନ ଦେଯ ନାହିଁ, ତଥନ ତାହାର ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସତ୍ୟକେଇ ପାଇବେ, ତାହା ତ ବିଚିତ୍ର ନଯ ।

କିନ୍ତୁ ତାହାର ପକ୍ଷେ ବିଚିତ୍ର ନା ହଇଲେଓ କାହାରଓ ପକ୍ଷେଇ ଯେ ବିଚିତ୍ର ନଯ, ଏମନ କଥା ବଲିତେଛି ନା । ଠିକ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମାର ନିଜେର ଜୀବନେଇ ତାହାର ଯେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଛି, ତାହା ବଲିବାର ଲୋଭ ଏଖାନେ ସଂବରଣ କରିତେ ପାରିତେଛି ନା । ଏହି ଘଟନାର ଦଶ-ବାରୋ ବ୍ସର ପରେ, ହଠାତ୍ ଏକଦିନ ଅପରାହ୍ନକାଳେ ସଂବାଦ ପାଓଯା ଗେଲ ଯେ ଏକଟି ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାକ୍ଷଣୀ ଓ-ପାଡ଼ାୟ ସକାଳ ହଇତେ ମରିଯା ପଡ଼ିଯା ଆଛେ— କୋନମତେଇ ତାହାର ସଂକାରେର ଲୋକ ଜୁଟେ ନାହିଁ । ନା ଜୁଟିବାର ହେତୁ ଏହି ଯେ, ତିନି କାଶୀ ହଇତେ ଫିରିବାର ପଥେ ରୋଗଗ୍ରାହୀ ହିଁ ଏହି ଶହରେଇ ରେଲଗାଡ଼ି ହଇତେ ନାମିଯା ପଡ଼େନ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟସୂତ୍ରେ ଯାହାର ବାଟିତେ ଆସିଯା ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ଏହି ଦୁଇରାତ୍ରି ବାସ କରିଯା ଆଜ ସକାଳେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଯାଛେ, ତିନି ‘ବିଲାତ-ଫେରତ’ ଏବଂ ସେ ସମୟେ ‘ଏକଘରେ’ । ଇହାଇ ବୃଦ୍ଧାର ଅପରାଧ ଯେ, ତାହାକେ ନିତାନ୍ତ ନିରନ୍ତରା ଅବସ୍ଥା ଏହି ‘ଏକଘରେ’ର ବାଟିତେ ମରିତେ ହିଁଯାଛେ ।

ଯାହା ହଟକ, ସଂକାର କରିଯା ପରଦିନ ସକାଳେ ଫିରିଯା ଆସିଯା ଦେଖା ଗେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକେରଇ ବାଟିର କବାଟ ବନ୍ଦ ହିଁ ଗିଯାଛେ । ଶୁଣିତେ ପାଓଯା ଗେଲ ଗତରାତ୍ରି ଏଗାରୋଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିକେନ-ଲଗ୍ଠନ ହାତେ ସମାଜପତିରା ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ସୁରିଯା

বেড়াইয়াছেন, এবং স্থির করিয়া দিয়াছেন যে এই অত্যন্ত শান্ত্ববিরুদ্ধ অপকর্ম (দাহ) করার জন্য এই কুলঙ্গারদিগকে কেশচেদ করিতে হইবে, ‘ঘাট’ মানিতে হইবে, এবং এমন একটা বস্তু সর্বসমক্ষে ভোজন করিতে হইবে, যাহা সুপবিত্র হইলেও খাদ্য নয়! তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া প্রতি বাড়িতেই বলিয়া দিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহাদের কোনই হাত নাই; কারণ জীবিত থাকিতে তাঁহারা অশান্তীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই ঘটিতে দিতে পারিবেন না। আমরা অনন্যোপায় হইয়া ডাঙ্কারবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনিই তখন শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং বিনা দক্ষিণায় বাঙালীর বাটীতে চিকিৎসা করিতেন। আমাদের কাহিনী শুনিয়া ডাঙ্কারবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাশ করিলেন, যাঁহারা এইরূপ নির্যাতন করিতেছেন তাঁহাদের বাটীর কেহ চোখের সম্মুখে বিনা চিকিৎসায় মরিয়া গেলেও তিনি সেদিকে আর চাহিয়া দেখিবেন না। কে এই কথা তাঁহাদের গোচর করিল, জানি না। দিবা অবসান না হইতেই শুনিলাম, কেশচেদের আবশ্যকতা নাই, শুধু ‘ঘাট’ মানিয়া সেই সুপবিত্র পদার্থটা ভক্ষণ করিলেই হইবে। আমরা স্বীকার না করায় পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম, ‘ঘাট’ মানিলেই হইবে—ওটা না হয় নাই খাইলাম। ইহাও অস্বীকার করায় শোনা গেল, আমাদের এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তাঁহারা এমনিই মার্জনা করিয়াছেন—প্রায়শিক্ত করিবার আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু ডাঙ্কারবাবু কহিলেন, প্রায়শিক্তের আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে এই দুটা দিন ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছেন সেইজন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ; অর্থাৎ কাহারও বাটীতে যাইবেন না। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডাঙ্কারবাবুর বাটীতে একে একে বৃদ্ধ সমাজপতিদিগের শুভাগমন হইয়াছিল। আশীর্বাদ করিয়া তাঁহারা কি কি বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই; কিন্তু পরদিন ডাঙ্কারবাবুর আর ক্রোধ ছিল না, আমাদিগকে ত প্রায়শিক্ত করিতে হয়ই নাই।

যাক, কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু সে যাই হউক, আমি নিশ্চয় জানি—যাঁহারা জানেন তাঁহারা এই নামধামহীন বিবরণটির মধ্যে সমস্ত সত্যটিই উপলব্ধি করিবেন। আমার বলিবার মূল বিষয়টি এই যে, ইন্দ্র ঐ বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, অত বড় বড় সমাজপতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহার কোন তত্ত্বই পান নাই; এবং ডাঙ্গারবাবু সেদিন অমন করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চিকিৎসা না করিয়া দিলে, কোনদিন এ ব্যাধি তাঁহাদের আরোগ্য হইত কি না তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

চড়ার উপর আসিয়া অর্ধমঘ বনবাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশুদেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা ঝুঁকাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে—অত্যন্ত ম্লান এবং উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, তাহার শুক্ষমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র, এইবার চল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায়?

এই যে বললে, কোথায় যাবে?

থাক—আজ আর না।

আমি খুশি হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাঢ়ি যাই।

প্রত্যুগ্রে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানিনে; তুমি বাঢ়ি চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাঢ়ি রেখে এস।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতাই করিল না। কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না।  
তা ছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। দ্যাখ্, আমি যখন ওকে  
জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুম, তখন সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, ভেইয়া।

আমি কম্পিতকগ্নে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ  
ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। ইন্দ্র কথা কহিল না, অভয় দিল না, ধীরে ধীরে  
বোটে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা  
বাহিতে লাগিল। মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে  
মনে রামনাম কর, সে নৌকা ছেড়ে যায়নি—আমার পেছনেই ব'সে আছে।

তারপর সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমার  
মনে নাই। যখন চোখ চাহিলাম তখন অন্ধকার নাই—নৌকা কিনারায় লাগানো।  
ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল; কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত,  
উঠে বোস।

## চার

পা আর চলে না—এম্বিনি করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া সকালবেলা  
রক্তচক্ষু ও একান্ত শুষ্ক ম্লানমুখে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটা সমারোহ পড়িয়া  
গেল। এই যে! এই যে! করিয়া সবাই সমন্বরে এম্বিনি অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল যে,  
আমার হৎপিণ্ড থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

যতীনদা প্রায় আমার সমবয়সী। অতএব তাহার আনন্দটাই সর্বাপেক্ষা  
প্রচণ্ড। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্নত চিৎকার শব্দে—এসেচে শ্রীকান্ত—  
এই এল, মেজদা! বলিয়া বাড়ি ফাটাইয়া আমার আগমন—বার্তা ঘোষণা করিয়া  
দিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া পরম সমাদরে আমার হাতটি ধরিয়া টানিয়া  
আনিয়া বৈঠকখানার পাপোশের উপর দাঁড় করাইয়া দিল।

সেখানে মেজদা গভীর মনোযোগের সহিত ‘পাশের পড়া’ পড়িতেছিলেন।  
মুখ তুলিয়া একটিবার মাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ পড়ায় মন  
দিলেন। অর্থাৎ বাঘ শিকার হস্তগত করিয়া নিরাপদে বসিয়া যেরূপ অবহেলার  
সহিত অন্যদিকে চাহিয়া থাকে, তাঁহারও সেই ভাব। শান্তি দিবার এত বড়  
মাহেন্দ্রযোগ তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

মিনিটখানেক চুপচাপ। সারারাত্রি বাহিরে কাটাইয়া গেলে কর্ণযুগল ও  
উভয় গণের উপর যে-সকল ঘটনা ঘটিবে তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আর যে  
দাঁড়াইতে পারি না! অথচ কর্মকর্তারও ফুরসৎ নাই। তাঁহারও যে আবার ‘পাশের  
পড়া’!

আমাদের এই মেজদাদাটিকে আপনারা বোধ করি এত শীঘ্ৰ বিস্মৃত হন  
নাই। সেই, যাহার কঠোর তত্ত্বাবধানে কাল সন্ধ্যাকালে আমরা পাঠাভ্যাস  
করিতেছিলাম, এবং ক্ষণেক পরেই যাঁহার সুগন্ধীর ‘আঁ-আঁ’ রবে ও সেজ

উল্টানোর চোটে গত রাত্রির সেই ‘দি রয়েল বেঙ্গল’কেও দিশাহারা হইয়া  
একেবারে ডালিমতলায় ছুটিয়া পালাইতে হইয়াছিল—সেই তিনি।

পাঁজিটা একবার দেখ্ দেখি রে সতীশ, এ বেলা আবার বেগুন খেতে  
আছে না কি; বলিতে বলিতে পাশের দ্বার ঠেলিয়া পিসিমা ঘরে পা দিয়াই আমাকে  
দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন—কখন এলি রে? কোথায় গিয়েছিলি? ধন্যি ছেলে  
বাবা তুমি—সারা রাত্রিটা ঘুমুতে পারিনি—ভেবে মরি, সেই যে ইন্দ্রের সঙ্গে  
চুপিচুপি বেরিয়ে গেল—আর দেখা নেই। না খাওয়া, না দাওয়া; কোথা ছিলি বল্  
ত হতভাগা? মুখ কালিবর্ণ, চোখ রাঙ্গা—চল্ছল করছে, বলি জ্বরটর হয়নি ত?  
কই, কাছে আয় ত, গা দেখি—একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করিয়া পিসিমা নিজেই  
আগাইয়া আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, যা ভেবেচি তাই।  
এই যে বেশ গা গরম হয়েচে। এমন সব ছেলের হাত-পা বেঁধে জলবিছুটি দিলে  
তবে আমার রাগ যায়। তোমাকে বাড়ি থেকে একেবারে বিদেয় ক’রে তবে আমার  
আর কাজ। চল্ ঘরে গিয়ে শুবি, আয় হতভাগা ছোঁড়া। বলিয়া তিনি বার্তাকু-  
ভক্ষণের প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া আমার হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

মেজদা জলদগন্ত্বারকষ্টে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন ও যেতে পারবে না।

কেন, কি করবে ও? না না, এখন আর পড়তে হবে না। আগে যা হোক  
দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমোক। আয় আমার সঙ্গে, বলিয়া পিসিমা আমাকে লইয়া  
চলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু শিকার যে হাতছাড়া হয়। মেজদা স্থান-কাল ভুলিয়া প্রায় চিৎকার  
করিয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন—খবরদার! যাস্নে বলচি শ্রীকান্ত।

পিসিমা পর্যন্ত যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া  
মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন, সতে! পিসিমা অত্যন্ত রাশভারী লোক।  
বাড়িসুন্দ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে

জড়সড় হইয়া উঠিল। আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন। কথাটা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকিত না।

পিসিমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; কখনও, কোন কারণেই, তিনি চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না। হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না। তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ও দাঁড়িয়ে এখানে? দেখ্ সতীশ, যখন-তখন শুনি, তুই ছেলেদের মারধোর করিস্। আজ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস্ আমি জান্তে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব। বেহায়া, নিজে ফি বছর ফেল হচ্ছে—ও আবার যায় পরকে শাসন করতে। কেউ পডুক, না পডুক, কারুকে তুই জিজেসা পর্যন্ত করতে পাবিনে—বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন। মেজদা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। এ আদেশ অবহেলা করিবার সাধ্য বাড়িতে কাহারো নাই—সে কথা মেজদা ভাল করিয়াই জানিত।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পিসিমা তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে আনিয়া কাপড় ছাড়াইয়া দিলেন এবং পেট ভরিয়া গরম গরম জিলাপি আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া—আমি মরিলেই তাঁর হাড় জুড়ায়—এই কথা জানাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিনিট-পাঁচেক পরেই খুট করিয়া সাবধানে শিকল খুলিয়া ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয়ে প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। একটুখানি দম লইয়া ফিস্ফিস্ করিয়া কাহিল, মেজদাকে মা কি ভকুম দিয়েচে জানিস? আমাদের কোন কথায় তার থাকবার জোটি নেই। তুই, আমি, যতে এক ঘরে পড়ব—মেজদা অন্য ঘরে পড়বে। আমাদের পুরানো পড়া বড়দা দেখবেন! ওকে আমরা আর কেয়ার ক্ৰ

ব না। বলিয়া সে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল।

যতীনদাও পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সে তাহার কৃতিত্বের উভেজনায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছেটদাকে এই শুভ সংবাদ দিয়া সে-ই এখানে আনিয়াছিল। প্রথমে সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। হাসি থামিলে নিজের বুকে বারংবার করাঘাত করিয়া কহিল আমি! আমি! আমার জন্যেই হ'ল তা জানো? ওকে আমি মেজদার কাছে না নিয়ে গেলে কি মা হ্রকুম দিত! ছোড়দা, তোমার কলের লাটুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।

আচ্ছা দিলুম। নিগে যা আমার ডেক্ষ থেকে, বলিয়া ছোড়দা তৎক্ষণাত্ হ্রকুম দিয়া ফেলিল। কিন্তু এই লাটুটা বোধ করি সে ঘণ্টাখানেক পূর্বে পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না।

এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য। এমনিই মানুষের ব্যক্তিগত ন্যায় অধিকার লাভ করার আনন্দ। আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্মূল্যতা একবিন্দু কম নয়!

মেজদা তাহার অঞ্জের অধিকারে স্বেচ্ছাচারে ছেটদের যে সমস্ত অধিকার গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, তাহাকেই ফিরিয়া পাইবার সৌভাগ্যে ছোড়দা তাহার প্রাণতুল্য প্রিয়বন্ধিকেও অসঙ্কোচে হাতছাড়া করিয়া ফেলিল। বন্ধুত্বঃ মেজদার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না; রবিবারে দুপুর রোদ্রে এক মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তাঁহার তাস খেলার বন্ধু ডাকিয়া আনিতে হইত। গ্রীষ্মের ছুটির দিনে তাঁহার দিবানিদ্বার সমস্ত সময়টা পাখার বাতাস করিতে হইত। শীতের রাত্রে তিনি লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকাইয়া কচ্ছপের মত বসিয়া বই পড়িতেন, আর আমাদিগকে কাছে বসিয়া তাঁহার বহির পাতা উলটাইয়া দিতে হইত—এম্বিনি সমস্ত অত্যাচার! অথচ ‘না’ বলিবার জো নাই, কাহারও কাছে অভিযোগ করিবার সাধ্য পর্যন্ত নাই। ঘুণাঙ্করে জানিতে পারিলেও তৎক্ষণাত্ হ্রকুম করিয়া বসিতেন,

কেশব, তোমার জিয়োগ্রাফি আনো, পুরানো পড়া দেখি। যতীন যাও, একটা ভাল দেখে ঝাউয়ের ছড়ি ভেঙে আনো। অর্ধাং প্রহার অনিবার্য। অতএব আনন্দের মাত্রাও যে ইহাদের বাড়াবাড়িতে গিয়া পড়িবে, ইহাও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কিন্তু সে যতই হউক, আপাততঃ তাহাকে স্থগিত রাখা আবশ্যিক, কারণ স্কুলের সময় হইতেছে। আমার জ্বর—সুতরাং কোথাও যাইতে হইবে না।

মনে পড়ে সেই রাত্রেই জুরটা প্রবল হইয়াছিল এবং সাত-আট দিন পর্যন্ত শয্যাগত ছিলাম।

তার কতদিন পরে স্কুলে গিয়েছিলাম এবং আরও যে কতদিন পরে ইন্দ্রের সহিত আবার দেখা হইয়াছিল, তাহা মনে নাই। কিন্তু সেটা যে অনেক দিন পরে, একথা মনে আছে। সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি। গঙ্গার তখন জল মরিতে শুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া, ছিপ দিয়া ট্যাঙ্গো মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি। অনেকেই ধরিতেছে। হঠাং চোখ পড়িল কে একজন অদূরে একটা শর-ঝাড়ের আড়ালে বসিয়া টপাটপ মাছ ধরিতেছে। লোকটিকে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু তাহার মাছধরা দেখা যায়। অনেকক্ষণ হইতেই আমার এ জায়গাটা পছন্দ হইতেছিল না। মনে করিলাম, উহারই পাশে গিয়া বসি। ছিপ হাতে করিয়া একটুখানি ঘুরিয়া দাঁড়াইবামাত্র সে কহিল, আমার ডানদিকে বোস। ভাল আছিস ত রে শ্রীকান্ত? বুকের ভিতরটা ধক্ক করিয়া উঠিল। তখনও তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু বুঝিলাম, এ ইন্দ্র। দেহের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহ বহিয়া গেলে যে যেখানে আছে এক মুহূর্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে, ইহার কঠস্বরেও আমার সেই দশা হইল! চক্ষের পলকে সর্বাঙ্গের রক্ত চক্ষল, উদাম হইয়া বুকের উপর আচাঢ় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কোনমতেই মুখ দিয়া একটা জবাব বাহির হইল না। এই কথাগুলি লিখিলাম বটে, কিন্তু জিনিসটা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পরকে বুঝানো শুধুই যে অত্যন্ত কঠিন, তা নয়, বোধ করি বা অসাধ্য। কারণ বলিতে

গেলে, এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্যরাশি—যেমন বুকের রঙ তোলপাড় করা—উদাম চথল হইয়া আছাড় খাওয়া—তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া যাওয়া—এই-সব ছাড়া ত আর পথ নাই! কিন্তু কতটুকু ইহাতে বুঝাইল? যে জানে না, তাহার কাছে আমার মনের কথা কতটুকু প্রকাশ পাইল! আমিই বা কি করিয়া তাহাকে জানাইব, এবং সেই বা কি করিয়া তাহা জানিবে?

যে নিজের জীবনে একটি দিনের তরেও অনুভব করে নাই, যাহাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়াছি, কামনা করিয়াছি, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, অথচ পাছে কোথাও কোনোরূপে দেখা হইয়া পড়ে এই ভয়েও অহরহ কাঁটা হইয়া আছি, সে এমনি অকস্মাৎ, এতই অভাবনীয়রূপে আমার চোখের উপর থাকিয়া আমাকে পার্শ্বে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিল! পাশে গিয়াও বসিলাম। কিন্তু তখনও কথা কহিতে পারিলাম না।

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ফিরে এসে বড় মার খেয়েছিলি—না রে শ্রীকান্ত! আমি তোকে নিয়ে গিয়ে ভাল কাজ করিনি। আমার সেজন্যে রোজ বড় দুঃখ হয়। আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, মার খাই নাই। ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, খাস্নি! দেখ রে শ্রীকান্ত, তুই চলে গেলে আমি মা কালীকে অনেক ডেকেছিলুম—যেন তোকে কেউ না মারে। কালীঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা রে! মন নিয়ে ডাক লে কখনো কেউ মারতে পারে না। মা এসে তাদের এম্বিনি ভুলিয়ে দেন যে, কেউ কিছু করতে পারে না। বলিয়া সে ছিপটা রাখিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বোধ করি তাঁকেই মনে মনে প্রণাম করিল। বঁড়শিতে একটা টোপ দিয়া সেটা জলে ফেলিয়া বলিল, আমি ত ভাবিনি তোর জ্বর হবে; তা হ'লে সেও হ'তে দিতুম না।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলাম, কি করতে তুমি? ইন্দ্র কহিল, কিছুই না। শুধু জবাফুল তুলে এনে মা কালীর পায়ে দিতুম। উনি জবাফুল বড় ভালবাসেন। যে যা ব'লে দেয় তার তাই হয়। এ ত সবাই জানে। তুই জানিস

নে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অসুখ করেনি? ইন্দ্র আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার? আমার কথ্যনো অসুখ করে না। কথনো কিছু হয় না। হঠাৎ উদ্বীপ্ত হইয়া বলিল, দেখ শ্রীকান্ত, আমি তোকে একটা জিনিস শিখিয়ে দেব। যদি তুই দুবেলা খুব মন দিয়ে ঠাকুরদেবতার নাম করিস্—তাঁরা সব সামনে এসে দাঁড়াবেন, তুই স্পষ্ট দেখতে পাবি। তখন আর তোর কোন অসুখ করবে না। কেউ তোর একগাছি চুল পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না—তুই আপনি টের পাবি। আমার মতন যেখানে খুশি যা, যা খুশি কর, কোন ভাবনা নেই। বুঝালি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হ্যাঁ। বঁড়শিতে টোপ দিয়া জলে ফেলিয়া মৃদুকঞ্চে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কাকে নিয়ে সেখানে যাও?

কোথায়?

ওপারে মাছ ধরতে?

ইন্দ্র ছিপটা তুলিয়া লইয়া সাবধানে পাশে রাখিয়া বলিল, আমি আর যাইনে। তাহার কথা শুনিয়া ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, আর একদিনও যাওনি?

না, একদিনও না। আমাকে মাথার দিবি দিয়ে—কথাটা ইন্দ্র শেষ না করিয়াই ঠিক যেন থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

উহার সমন্বে এই কথাই আমাকে অহরহ খোঁচার মত বিঁধিয়াছে। কোন মতেই সেই সেদিনের মাছ-বিক্রিটা ভুলিতে পারি নাই। তাই সে যদি বা চুপ করিয়া গেল, আমি পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে মাথার দিবি দিলে ভাই? তোমার মা?

না, মা নয়। বলিয়া ইন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে ছিপের গায়ে সুতাটা ধীরে ধীরে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, শ্রীকান্ত, আমাদের সে রাত্রির কথা তুই বাড়িতে বলে দিস্নি?

আমি বলিলাম, না। কিন্তু তোমার সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলাম তা সবাই জানে।

ইন্দ্র আর কোন প্রশ্ন করিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, এইবার সে উঠিবে, কিন্তু, তাহাও করিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার মুখে সর্বদাই কেমন একটা হাসির ভাব থাকে, এখন তাহাও নাই, এবং কি-একটা সে যেন আমাকে বলিতে চায়, অথচ তাহাও পারিতেছে না, বলিয়া উঠিতেও পারিতেছে না—বসিয়া থাকিতেও যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে। আপনারা পাঁচজন এখানে হয়ত বলিয়া বসিবেন, এটি বাপু তোমার কিন্তু মিছে কথা। অতখানি মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার বয়সটা ত তা' নয়। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আপনারাও এ কথাটা ভুলিতেছেন যে, আমি ইন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলাম। একজন আর একজনের মন বুঝে সহানুভূতি এবং ভালবাসা দিয়া—বয়স এবং বুদ্ধি দিয়া নয়। সংসারে যে যত ভালবাসিয়াছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যন্ত কঠিন অন্তদৃষ্টি শুধু ভালবাসার জোরেই পাওয়া যায়, আর কিছুতে নয়। তাহার প্রমাণ দিতেছি। ইন্দ্র মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে না পারিয়া সমস্ত মুখ তার অকারণে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা শরের ডাঁটা ছিঁড়িয়া নতমুখে জলের উপর নাড়িতে নাড়িতে কহিল, শ্রীকান্ত!

কি ভাই?

তোর—তোর কাছে টাকা আছে?

ক' টাকা?

ক' টাকা? এই—ধৰ্, পাঁচ টাকা—

আছে। তুমি নেবে? বলিয়া আমি ভাবি খুশি হইয়া তাহার মুখপানে চাহিলাম। এ কয়টি টাকাই আমার ছিল। ইন্দ্রের কাজে লাগিবার অপেক্ষা তাহার সম্ববহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। কিন্তু ইন্দ্র ত কৈ খুশি হইল না। মুখ যেন তাহার অধিকতর লজ্জায় কি একরকম হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত এখন তোকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

আমি আর চাইনে, বলিয়া সগর্বে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

আবার কিছুক্ষণ সে মুখ নীচু করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি নিজে চাইনে। একজনদের দিতে হবে, তাই। তারা বড় দুঃখী রে—খেতেও পায় না। তুই যাবি সেখানে? চক্ষের নিমেষে আমার সে রাত্রির কথা মনে পড়িল। কহিলাম, সেই যাদের তুমি টাকা দিতে নেমে যেতে চেয়েছিলে? ইন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ তারাই। টাকা আমি নিজেই ত কত দিতে পারি, কিন্তু দিদি যে কিছুতে নিতে চায় না। তোকে একটিবার যেতে হবে শ্রীকান্ত, নইলে, এ টাকাও নেবে না; মনে করবে, আমি মায়ের বাক্স থেকে চুরি ক'রে এনেচি! যাবি শ্রীকান্ত?

তারা বুঝি তোমার দিদি হয়?

ইন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, না, দিদি হয় না—দিদি বলি। যাবি ত? আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তখনি কহিল, দিনের বেলা গেলে সেখানে কোন ভয় নেই। কাল রবিবার; তুই খেয়েদেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্ক, আমি নিয়ে যাব; আবার তখ্খুনি ফিরিয়ে আন্ব। যাবি ত ভাই? বলিয়া যেমন করিয়া সে আমার হাতটি ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহাতে আমার ‘না’ বলিবার সাধ্য রহিল না। আমি দ্বিতীয়বার তাহার নৌকায় উঠিবার কথা দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

কথা দিলাম সত্য, কিন্তু সে যে কতবড় দুঃসাহসের কথা সে ত আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। সমস্ত বিকালবেলাটা মন ভারী হইয়া রহিল, এবং রাত্রে ঘুমের ঘোরে প্রগাঢ় অশান্তির ভাব সর্বাঙ্গে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভোরবেলা উঠিয়া সর্বাঙ্গে ইহাই মনে পড়িল আজ যেখানে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রূত হইয়াছি, সেখানে যাইলে কোনমতেই আমার ভাল হইবে না।

কোন সূত্রে কেহ জানিতে পারিলে, ফিরিয়া আসিয়া যে শান্তি ভোগ করিতে হইবে, মেজদার জন্যও ছোড়দা বোধ করি সে শান্তি কামনা করিতে

পারিত না। অবশেষে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে টাকা পাঁচটি লুকাইয়া লইয়া নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন এমন কথাও অনেকবার মনে হইল—কাজ নাই গিয়া। নাই বা কথা রাখিলাম; এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়! যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শরোভাড়ের নীচে সেই ছেট নৌকাটির উপর ইন্দ্র উদ্গীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। চোখাচোখি হইবামাত্র সে এমন করিয়া হাসিয়া আহ্বান করিল যে, না-যাওয়ার কথা মুখে আনিতেও পারিলাম না। সাবধানে ধীরে ধীরে নামিয়া নিঃশব্দে নৌকাটিতে চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আজ মনে ভাবি, আমার বহুজন্মের সুকৃতির ফল যে, সেদিন ভয়ে পিছাইয়া আসি নাই! সেই দিনটিকে উপলক্ষ্য করিয়া যে জিনিসটি দেখিয়া লইয়াছিলাম, সারা জীবনের মধ্যে পৃথিবী ঘূরিয়া বেড়াইয়াও তেমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? আমিই বা তাহার মত আর কোথায় দেখিতে পাইলাম? জীবনে এমন-সব শুভ মুহূর্ত অনেকবার আসে না। একবার যদি আসে, সে সমস্ত চেতনার উপর এমন গভীর একটা ছাপ মারিয়া দিয়া যায় যে, সেই ছাঁচেই সমস্ত পরবর্তী জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমার তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনও আমি ছেট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেন না তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই? নাই যদি তবে পথেঘাটে এত পাপের মূর্তি দেখি কাহাদের? সবাই যদি সেই ইন্দ্র দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ-সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ, যখন খুশি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সতীর আসন্নের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে। বন্ধুরা বলেন, ইহা আমার একটা অতি জঘন্য শোচনীয় ভ্রম মাত্র। আমি তাহারও প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, ইহা আমার যুক্তি নয়—আমার সংস্কার। সংস্কারের মূলে যিনি, জানি না সেই পুণ্যবতী আজও বাঁচিয়া আছেন কি না। থাকিলেও কোথায় কি ভাবে আছেন, তাঁহার নির্দেশমত কখনো কোন সংবাদ

লইবার চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু কত যে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করিয়াছি, তাহা যিনি সব জনিতে পারেন, তিনিই জানেন।

শুশানের সেই সঙ্কীর্ণ ঘাটের পাশে বটবৃক্ষমূলে ডিঙি বাঁধিয়া যখন দুজনে রওনা হইলাম, তখনও অনেক বেলা ছিল। কিছু দূর গিয়া ডানদিকে বনের ভিতর ঠাহর করিয়া দেখায়, একটা পথের মতও দেখা গেল। ইন্দ্র তাহাই ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটা পর্ণকুটীর দেখা গেল। কাছে আসিয়া দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার পথ আগড় দিয়া আবদ্ধ। ইন্দ্র সাবধানে তাহার বাঁধন খুলিয়া ঠেলা দিয়া প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া লইয়া পুনরায় তেমনি করিয়া বাঁধিয়া দিল। আমি তেমনি বাসস্থান কখনো জীবনে দেখি নাই। একে ত চতুর্দিকেই নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ এবং পাকুড় গাছে সমস্ত জায়গাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাড়া পাইয়া একপাল মুরগি এবং ছানাগুলা চিংকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটা দুই ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সুমুখে চাহিয়া দেখি—ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। চক্ষের নিম্নে অস্ফুট চিংকারে মুরগিগুলাকে আরও ত্রুট ভীত করিয়া দিয়া আঁচড়-পিঁচড় করিয়া একেবারে সেই বেড়ার উপর চড়িয়া বসিলাম।

ইন্দ্র খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ও কিছু বলে না রে, বড় ভালমানুষ। ওর নাম রহিম। বলিয়া কাছে গিয়া তাহার পেটটা ধরিয়া টানিয়া উঠানের ওধারে সরাইয়া দিল। তখন নামিয়া আসিয়া ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই পর্ণকুটীরের বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলাগোছের লোক প্রবল কাসির পরে হাঁপাইতেছে। তাহার মাথায় জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছেটবড় মালা। গায়ের জামা এবং পরনের কাপড় অত্যন্ত মলিন এবং এক প্রকার হল্দে রঞ্জে ছোপানো। তাহার লম্বা দাঢ়ি বন্ত্রখণ্ড দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল বলিয়াই প্রথমটা

চিনিতে পারি নাই; কিন্তু কাছে আসিয়াই চিনিলাম সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ-ছয় পূর্বে তাহাকে প্রায় সর্বত্রই দেখিতাম। আমাদের বাটীতেও তাহাকে কয়েকবার সাপ খেলাইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্র তাহাকে শাহজী সম্মোধন করিল এবং সে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম এবং কলিকাটি দেখাইয়া দিল। ইন্দ্র দ্বিরুণ্ডি না করিয়া আদেশ পালন করিতে লাগিয়া গেল এবং প্রস্তুত হইলে শাহজী সেই কাসির উপর ঠিক যেন ‘মরি-বাঁচি’ পণ করিয়া টানিতে লাগিল এবং একবিন্দু ধোঁয়াও পাছে বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নাকেমুখে বাম করতল চাপা দিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানির সহিত কলিকাটি ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, পিয়ো।

ইন্দ্র পান করিল না। ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, না। শাহজী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু উভয়ের জন্য একমুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়াই সেটা নিজেই তুলিয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া নিঃশেষ করিয়া উপুড় করিয়া রাখিল। তার পরে দুজনের মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হইল। তাহার অধিকাংশ শুনিতেও পাইলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, শাহজী হিন্দিতে কথা কহিলেও ইন্দ্র বাঙ্গলা ছাড়া কিছুই ব্যবহার করিল না।

শাহজীর কঠস্বর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা উন্মত্ত চিৎকারে পরিণত হইল। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে যে এরূপ অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা তখন বুঝিলে, ইন্দ্র সহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি করিতাম না। তারপরে লোকটা বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিল এবং অনতিকাল পরেই ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া যেন অস্ত্রির হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, বেলা যায়! তুমি সেখানে যাবে না?

কোথায় শ্রীকান্ত?

তোমার দিদিকে টাকা দিতে যাবে না?

দিদির জন্যই ত ব'সে আছি। এই ত তাঁর বাড়ি।

এই তোমার দিদির বাড়ি! এরা ত সাপুড়ে—মুসলমান! ইন্দ্র কি-একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াই, চাপিয়া গিয়া চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বড় ব্যথায় একেবারে যেন ম্লান হইয়া গেল। একটু পরেই কহিল, একদিন তোকে সব কথা বলব। সাপ খেলাব দেখবি শ্রীকান্ত?

তাহার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তুমি সাপ খেলাবে কি? কামড়ায় যদি? ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশি বাহির করিয়া আনিল; এবং সুমুখে রাখিয়া ডালার বাঁধন আল্গা করিয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম। ডালা খুলো না ভাই, ভেতরে যদি গোখ্রো সাপ থাকে! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও আবশ্যক মনে করিল না, শুধু ইঙিতে জানাইল যে, সে গোখ্রো সাপই খেলাইবে; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বাঁশি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ গোখ্রো একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল; এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্র হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশির লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল, এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়। ভয়ে বিরক্তিতে রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল, বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে? ও বেরিয়ে যদি শাহ্‌জীকে কামড়ায়? ইন্দ্র লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে? আমি বলিলাম, তা হলে বেরিয়েই ওকে কামড়াবে। ইন্দ্র নিরূপায়ভাবে এদিক-ওদিকে চাহিয়া বলিল, কামড়াক্‌ব্যাটাকে! বুনো সাপ ধরে রাখে—গাঁজাখোর শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই। এই যে

দিদি! এসো না, এসো না; ঈখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্র দিদিকে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহি! যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটিবাঁধা কতকগুলো শুক্নো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক-সবজি। পরনে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামাকাপড়—গেরুয়া রঙে ছোপানো, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। হাতে দু'গাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দু-নারীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন। তিনি কাঠের বোঝাটা নামাইয়া রাখিয়া আগড়টা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, কি? ইন্দ্র মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলো না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—মস্ত একটা সাপ ঘরে চুকেছে। তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। তার পরে একটুখানি হাসিয়া পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, তাই ত! সাপুড়ের ঘরে সাপ চুকেছে, এ ত বড় আশ্চর্য! কি বল শ্রীকান্ত? আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রাখিলাম।—কিন্তু কি করে সাপ চুকল ইন্দ্রনাথ? ইন্দ্র বলিল, বাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে বুনো-সাপ।

উনি ঘুমোচেন বুঝি? ইন্দ্র রাগিয়া কহিল, গাঁজা খেয়ে একেবারে অঙ্গান হয়ে ঘুমোচে। চেঁচিয়ে মরে গেলেও উঠবে না। তিনি আবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর সেই সুযোগে তুমি শ্রীকান্তকে সাপ খেলানো দেখাতে গিয়েছিলে, না? আচ্ছা এসো, আমি ধ'রে দিচ্ছি।

তুমি যেয়ো না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে। শাহজীকে তুলে দাও—আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলিয়া ইন্দ্র ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। তাহার এই ব্যাকুল কর্তৃস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল তাহা তিনি টের পাইলেন। মুহূর্তের জন্য চোখ দুটি তাঁহার ছল্ছল করিয়া উঠিল, কিন্তু গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, অত পুণ্য তোর এই দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে—এখন্দুনি ধ'রে দিচ্ছি দ্যাখ। বলিয়া বাঁশের মাচা

হইতে একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্ৰ চিপ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, দিদি, তুমি যদি আমার আপনার দিদি হ'তে! তিনি ডান হাত বাড়াইয়া ইন্দ্ৰের চিবুক স্পর্শ করিলেন, এবং অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া মুখ ফিরাইয়া বোধ করি অলক্ষ্যে একবার নিজের চোখদুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

## পাঁচ

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে ইন্দ্রি দিদি হঠাৎ বার-দুই এমনি  
শিহরিয়া উঠিলেন যে, ইন্দ্রি সেদিকে যদি কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত, সে আশ্চর্য  
হইয়া যাইত। সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি পাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে  
চাহিয়া থাকিয়া সন্নেহে তিরক্ষারের কঢ়ে

কহিলেন, ছি দাদা, এমন কাজ আর কথ্যনো করো না। এ-সব ভয়ানক  
জানোয়ার নিয়ে কি খেলা করতে আছে ভাই? ভাগ্যে তোমার হাতের ডালাটায়  
ছোবল মেরেছিল, না হ'লে আজ কি কাণ্ড হ'ত বলত?

আমি কি তেমনি বোকা দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্ততিত হাসিমুখে ফস্ক করিয়া  
তাহার কোঁচার কাপড়টা টানিয়া ফেলিয়া কোমরে সুতা-বাঁধা কি একটা শুক্না  
শিকড় দেখাইয়া বলিল, এই দ্যাখো দিদি, আট-ঘাট বেঁধে রেখেচি কি না! এ না  
থাকলে কি আর আজ আমাকে না

ছুব্লে ছেড়ে দিত? শাহজীর কাছে এটুকু আদায় করতে কি আমাকে  
কম কষ্ট পেতে হয়েছে? এ সঙ্গে থাকলে কেউ ত কামড়াতে পারেই না; আর  
তাই যদি বা কামড়াত—তাতেই বা কি! শাহজীকে টেনে তুলে তক্ষুনি বিষ-  
পাথরটা ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা দিদি, ঐ বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে  
পারে? আধঘণ্টা? একঘণ্টা? না অতক্ষণ লাগে না, না দিদি?

দিদি কিন্তু তেমনি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দ্র উত্তেজিত হইয়া  
উঠিয়াছিল, বলিল, আজ দাও না দিদি আমাকে একটি। তোমাদের ত দুটো-  
তিনটে রয়েচে—আর আমি কতদিন ধরে চাইচি। বলিয়া সে উত্তরের জন্য  
প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে তৎক্ষণাত্ম বলিয়া উঠিল, আমাকে  
তোমরা যা বল আমি তাই করি—আর তোমরা কেবল পাত্তি দিয়ে আমাকে আজ

নয় কাল, কাল নয় পরশু—যদি নাই দেবে তবে বলে দাও না কেন? আমি আর আসব না—যাও।

ইন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে, তাঁর মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া একটুখানি হাসির ভাব সেই শীর্ণ শুঙ্ক ওষ্ঠাধরে টানিয়া আসিয়া কহিলেন, হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়িতে শুধু সাপের মন্ত্র আর বিষ-পাথরের জন্যেই আসিস্ রে?

ইন্দ্র অসক্ষেত্রে বলিয়া বসিল, তবে না ত কি! নিন্দিত শাহজীকে একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, কিন্তু কেবলই আমাকে ভোগা দিচ্ছে—এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, সেই যে কবে শুধু হাতচালার মন্ত্রটুকু দিয়েছিল আর দিতেই চায় না। কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি, তুমিও কম নয়, তুমিও সব জানো। ওকে আর আমি খোশামোদ করচি নে দিদি, তোমার কাছ থেকেই সমস্ত মন্ত্র আদায় ক'রে নেবো। বলিয়াই আমার প্রতি চাহিয়া, সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, শাহজীকে উদ্দেশ করিয়া গভীর সম্মের সহিত কহিল, শাহজী গাঁজা-টাজা খান বটে, শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসীমড়া আধঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন—এত বড় ওস্তাদ উনি! হাঁ দিদি, তুমিও মড়া বাঁচাতে পারো?

দিদি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সহসা খিল্খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন!

সে কি মধুর হাসি! অমন করিয়া হাসিতে আমি আজ পর্যন্ত কম লোককেই দেখিয়াছি। কিন্তু সে যেন নিবিড় মেঘভরা আকাশের বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত পরক্ষণেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু ইন্দ্র সেদিক দিয়াই গেল না। বরঞ্চ একেবারে পাইয়া বসিল। সেও হাসিয়া কহিল, আমি জানি, তুমি সব জানো। কিন্তু আমাকে একটি একটি করে

তোমাকে সব বিদ্যে দিতে হবে, তা বলে দিচ্ছি! আমি যতদিন বাঁচব, তোমাদের একেবারে গোলাম হয়ে থাকব। তুমি কটা মড়া বাঁচিয়ে দিদি?

দিদি কহিলেন, আমি ত মড়া বাঁচাতে জানিনে ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, তোমাকে এ মন্ত্র শাহজী দেয়নি? দিদি ঘাড় নাড়িয়া ‘না’ বলিলে, ইন্দ্র মিনিটখানেক তাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজেই তখন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, এ বিদ্যে কি কেউ শীগগির দিতে চায় দিদি! আচ্ছা কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না?

দিদি বলিলেন, কাকে কড়ি-চালা বলে, তাইত জানিনে ভাই।

ইন্দ্র বিশ্বাস করিল না। বলিল, ইস্ম! জান না বৈ কি! দেবে না, তাই বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-চালা কখনো দেখেচিস শ্রীকান্ত? দুটি কড়ি মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দিলে তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধ'রে সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির ক'রে দেয়। এম্নি মন্ত্রের জোর! আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধূলো-পড়া এ-সব জান ত? আর যদি নাই জান্বে ত অমন সাপটাকে ধ'রে দিলে কি করে? বলিয়া সে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে দিদির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দিদি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া মনে মনে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন; শেষে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ইন্দ্র, তোর দিদির এ-সব কানাকড়ির বিদ্যেও নেই। কিন্তু কেন নেই, সে যদি তোরা বিশ্বাস করিস ভাই, তা হ'লে আজ তোদের কাছে আমি সমস্ত ভেঙ্গে ব'লে আমার বুকখানা হাঙ্কা ক'রে ফেলি। বল তোরা আমার সব কথা আজ বিশ্বাস করবি? বলিতে বলিতেই তাঁহার শেষের কথাগুলি কেমন একরকম যেন ভারী হইয়া উঠিল।

আমি নিজে এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই কহি নাই। এইবার সর্বাপ্রে জোর করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি! সব—যা বলবে সমস্ত। একটি কথাও অবিশ্বাস করব না।

তিনি আমার প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করবে বৈ কি ভাই! তোমরা যে ভদ্রলোকের ছেলে। যারা ইতর, তারাই শুধু অজানা অচেনা লোকের কথায় সন্দেহে ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আমি ত কখনও মিথ্যে কথা কইনে ভাই! বলিয়া তিনি আর একবার আমার প্রতি চাহিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিলেন।

তখন সন্ধ্যার ঝাপসা কাটিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং তাহারই অঙ্গুট কিরণরেখা গাছের ঘনবিন্যস্ত ডাল ও পাতার ফাঁক দিয়া নীচের গাঢ় অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ, মনে করেছিলুম আজই আমার সমস্ত কথা তোমাদের জানিয়ে দেব! কিন্তু ভেবে দেখছি, এখনও সে সময় আসেনি।

আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস কোরো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহজীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়ো না। আমরা তত্ত্বমন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কি না, জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।

কি জানি কেন আমি এই অত্যন্ত কালের পরিচয়েই তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, যদি পার না, তবে সাপ ধরলে কি ক'রে?

দিদি বলিলেন, ওটা শুধু হাতের কৌশল ইন্দ্র, কোন মন্ত্রের জোরে নয়। সাপের মন্ত্র আমরা জানিনে।

ইন্দ্র বলিল, যদি জান না, তবে তোমরা দুজনে জোচুরি ক'রে ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন?

দিদি তৎক্ষণাত জবাব দিতে পারিলেন না; বোধ করি বা নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় কর্কশকঞ্চে কহিল, ঠগ্ জোচোর সব—আছা আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।

অদূরেই একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বলিতেছিল। আমি তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। সভয়ে সসঙ্ঘোচে বলিলেন, আমরা যে সাপুড়ে—ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা।

ব্যবসা বার ক'রে দিচ্ছি—চল্লে শ্রীকান্ত, জোচোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা। বলিয়া ইন্দ্র সহসা আমার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না, কারণ তাহার অনেক দিনের অনেক বড় আশা একেবারে চোখের পলকে ভূমিসাত হইয়া গেল, কিন্তু আমার দুই চোখ যে দিদির সেই দুটি চোখের পানে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। জোর করিয়া ইন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এনেছিলাম দিদি—এই নাও।

ইন্দ্র ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা! জোচুরি ক'রে এরা আমার কাছে কত টাকা নিয়েচে, তা তুই জানিস শ্রীকান্ত? এরা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক, সেই আমি চাই।

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না ইন্দ্র, দাও—আমি দিদির নাম করে এনেচি—

ওঃ—ভারী দিদি! বলিয়া সে আমাকে টানিয়া বেড়ার কাছে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে গোলমালে শাহজীর নেশার ঘুম ভাসিয়া গেল। সে, কেয়া হয়া,  
কেয়া হয়া? বলিয়া উঠিয়া বসিল।

ইন্দ্র আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকু  
শালা। রাস্তায় তোমাকে দেখ্তে পেলে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব।  
কেয়া হয়া! বদমাস ব্যাটা কিছু জানে না—আর বলে বেড়ায় মন্তব্রের জোরে মড়া  
বাঁচাই! কখনো পথে দেখা হ'লে এবার ভাল ক'রে বাঁচাব তোমাকে! বলিয়া সে  
এমনি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যে শাহজী চমকাইয়া উঠিল।

তাহার একে নেশার ঘোর, তাহাতে অকস্মাত এই অভাবনীয় কাণ্ড! সেই  
যে সাধুভাষায় বলে ‘কিংকর্তব্যবিমৃঢ়’ হইয়া বসিয়া থাকা, ঠিক সেইভাবে ফ্যাল্  
ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দ্র আমাকে লইয়া যখন দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন সে বোধ  
করি কতকটা প্রকৃতিস্ত হইয়া পরিষ্কার বাঙলা করিয়া ডাকিল, শোন ইন্দ্রনাথ, কি  
হয়েচে বল ত? আমি তাহাকে এই প্রথম বাঙলা বলিতে শুনিলাম।

ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কিছু জান না—কেন মিছামিছি আমাকে  
ধোঁকা দিয়ে এত দিন এত টাকা নিয়েচ, তার জবাব দাও।

সে কহিল, জানিনে তোমাকে কে বলল?

ইন্দ্র তৎক্ষণাত ঐ স্তন নতমুখী দিদির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল,  
ওই বললে, তোমার কানাকড়ির বিদ্যে নাই। বিদ্যে আছে শুধু জোচুরি করবার  
আর লোক ঠকাবার। এই তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যাবাদী চোর।

শাহজীর চোখ দুটা ধূক করিয়া জলিয়া উঠিল। সে যে কি ভীষণ প্রকৃতির  
লোক, সে পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতে আমার  
গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। লোকটা তাহার এলোমেলো জটাটা বাঁধিতে বাঁধিতে  
উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, বলেচিস্ম তুই?

দিদি তেমনি নতমুখে নিরস্তরে বসিয়া রাহিলেন। ইন্দ্র আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, রাত্তির হচ্ছে—চল্ না। রাত্রি হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার পায়ে আর নড়ে না। কিন্তু ইন্দ্র সেদিকে অক্ষেপও করিল না, আমাকে প্রায় জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শাহজীর কর্তৃস্বর আবার কানে আসিল—কেন বললি?

প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যন্তের শুনিতে পাইলাম না। আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অকস্মাত চারিদিকের সেই নিবিড় অঙ্ককারের বুক চিরিয়া একটা তীব্র আর্তস্বর পিছনের আঁধার কুটীর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কানে বিধিল এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল। সুমুখেই একটা শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড় ছিল; আমি সবেগে গিয়া তাহারই উপরে পড়িলাম। কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। সে যাক, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেই প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এ কাঁটা ছাড়াই ত সে কাঁটায় কাপড় বাধে; সে কাঁটা ছাড়াই ত আর একটা কাঁটায় কাপড় আটকায়। এমনি করিয়া অনেক কষ্টে, অনেক বিলম্বে যখন কোন মতে শাহজীর বাড়ির প্রাঙ্গণের ধারে গিয়া পড়িলাম, তখন দেখি, সেই প্রাঙ্গণেরই একপ্রান্তে দিদি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে গুরুশিয়ের রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্ণ পড়িয়া আছে।

শাহজী লোকটি অত্যন্ত বলবান। কিন্তু ইন্দ্র যে তাহার অপেক্ষাও কত বেশি শক্তিশালী, এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে বোধ হয় সে এত বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিত না। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র তাহাকে চিত করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। সে এমনি টিপুনি যে, আমি বাধা না দিলে হয়ত সে যাত্রা শাহজীর সাপুড়ে যাত্রাটাই শেষ হইয়া যাইত।

বিস্তর টানা-হেঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক করিলাম, তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্ধকারে প্রথমে নজরে পড়ে নাই যে তাহার সমস্ত কাপড়-জামা রঙে ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, শালা গাঁজাখোর আমাকে সাপ-মারা বর্ণ দিয়ে খোঁচা মেরেচে—এই দ্যাখ। জামার আস্তিন তুলিয়া দেখাইল, বাছতে প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত এবং তাহা দিয়া অজস্র রক্তস্নাব হইতেছে।

ইন্দ্র কহিল, কাঁদিস নে—এই কাপড়টা দিয়ে খুব টেনে বেঁধে দে—এই খবরদার! ঠিক অম্নি ব'সে থাকো। উঠলেই গলায় পা দিয়ে তোমার জিভ টেনে বার কর্ব—হারামজাদা শুয়ার! নে, তুই টেনে বাঁধ—দেরি করিস নে। বলিয়া সে চড়চড় করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। আমি কম্পিতহস্তে ক্ষতটা বাঁধিতে লাগিলাম এবং শাহজী অদূরে বসিয়া মুমৰ্শু বিষাক্ত সর্পের দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্র কহিল, না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন কর্তে পার। আমি তোমার হাত বাঁধব। বলিয়া তাহারই গেরুয়ারঙে ছোপানো পাগড়ি দিয়া টানিয়া টানিয়া তাহার দুই হাত জড় করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না।

যে লাঠিটার আঘাতে দিদি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া ইন্দ্র কহিল, কি নেমকহারাম শয়তান এই ব্যাটা। বাবার কত টাকা যে চুরি ক'রে একে দিয়েছি, আরও কত হয়ত দিতাম, যদি দিদি না আমাকে মাথার দিবিয় দিয়ে নিষেধ করত। আর স্বচ্ছন্দে ও ঐ বল্লমটা আমাকে ছুঁড়ে মেরে বস্ল। শ্রীকান্ত নজর রাখ, যেন না ওঠে—আমি দিদির চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিই।

জলের ঝাপটা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, যেদিন থেকে দিদি বললে, ‘ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হ'লে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের

‘ইহকাল-পরকাল মাটি কৱ্ব না’, সেই দিন থেকে ঐ শয়তান ব্যাটা দিদিকে কত মার মেরেচে, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে খাওয়াচে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে—তবুও কিছুতে ওর হয় না। কিন্তু আমি ওকে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়ব—না হ’লে দিদিকে ও খুন ক’রে ফেলবে, ও খুন করতে পারে।

আমার মনে হইল, লোকটা যেন এই কথায় শিহরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াই তৎক্ষণাত্ মুখখানা নত করিয়া ফেলিল। সে একটি নিমেষমাত্র। কিন্তু অপরাধীর নিবিড় আশঙ্কা তাতে এম্বিনি পরিস্ফুট হইতে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আজিও তাহার তখনকার সেই চেহারাটা স্পষ্ট মনে করিতে পারি।

আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত করিবেই, পরন্তু উদ্ভট কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়ত ইত্তত করিবে না। তথাপি এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য। কারণ সত্যের উপরে না দাঁড়াইতে পারিলে কোনমতেই এই-সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না।

প্রতি পদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতে বাস্তব ঘটনা যে কল্পনাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ৎ নিজের কোন জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি হাতেই টানিয়া টানিয়া ধরিতে থাকে।

যাক সে কথা। দিদি যখন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি বোধ করি দ্বিপ্রহর! তাঁহার বিহ্বল ভাবটা ঘুচাইতে আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তারপরে আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া শাহ্‌জীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, শোও গে।

লোকটা ঘরে চলিয়া গেলে তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া, তাহার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, ইন্দ্র, এই আমার মাথায় হাত

দিয়া শপথ কৱ ভাই, আৱ কখনো এ বাড়িতে আসিস্ব নে। আমাদেৱ যা হবাৱ  
হোক, তুই আৱ আমাদেৱ কোন সংবাদ রাখিস্ব নে।

ইন্দ্ৰ প্ৰথমটা অবাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু পৱন্ধণেই আগুনেৱ মত জলিয়া  
উঠিয়া বলিল, তা বটে! আমাকে খুন কৱতে গিয়েছিল, সেটা কিছু নয়। আৱ  
আমি যে ওকে বেঁধে রেখেছি, তাতেই তোমার এত রাগ! এমন না হ'লে কলিকাল  
বলেচে কেন? কিন্তু কি নেমকহারাম তোমৱা দু'জন!—আয় শ্ৰীকান্ত, আৱ না।

দিদি চুপ কৱিয়া রহিলেন—একটি অভিযোগেৱও প্ৰতিবাদ কৱিলেন না।  
কেন যে কৱিলেন না তাহা পৱে যত বেশিই বুঝিয়া থাকি না কেন তখন বুঝি  
নাই। তথাপি আমি অলঙ্ক্ষ্য নিঃশব্দে সেই টাকা-পাঁচটি খুঁটিৰ কাছে রাখিয়া দিয়া  
ইন্দ্ৰেৰ অনুসৱণ কৱিলাম। ইন্দ্ৰ প্ৰাঙ্গণেৰ বাহিৱে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, হিঁদুৱ  
মেয়ে হয়ে যে মোচলমানেৰ সঙ্গে বেৱিয়ে আসে, তাৱ আবাৱ ধৰ্মকৰ্ম! চুলোয়  
যাও—আৱ আমি খোঁজ কৱব না, খৰেও নেব না—হারামজাদা নচ্ছার! বলিয়া  
দ্রুতপদে বনপথ অতিক্ৰম কৱিয়া চলিয়া গেল।

দু'জনে নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্দ্ৰ নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল, এবং মাৰো  
মাৰো হাত তুলিয়া ঢোখ মুছিতে লাগিল। সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া  
আৱ কোন প্ৰশ্ন কৱিলাম না।

শুশানেৰ সেই পথ দিয়াই ফিৱিয়া আসিলাম এবং সেই পথ দিয়াই  
এখনও চলিয়াছি, কিন্তু কেন জানি না, আজ আমাৱ ভয়েৱ কথাও মনে আসিল  
না। বোধ কৱি, মন আমাৱ এমনি বিশ্বল আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, এত রাত্ৰে কেমন  
কৱিয়া বাড়ি তুকিব এবং তুকিলেও যে কি দশা হইবে, সে চিন্তাও মনে স্থান  
পাইল না।

প্ৰায় শেষৱাত্ৰে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমাকে নামাইয়া দিয়া ইন্দ্ৰ  
কহিল, বাড়ি যা শ্ৰীকান্ত! তুই বড় অপয়া! তোকে সঙ্গে নিলেই একটা-না-একটা  
ফ্যাসাদ বাধে। আজ থেকে তোকে আৱ আমি কোন কাজে ডাকব না—তুইও

আর আমার সামনে আসিস্ নে। যা! বলিয়া সে গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দিয়া  
দেখিতে দেখিতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব  
হইয়া নিজেন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।

## ছয়

নিষ্ঠুর গভীর রাত্রে মা-গঙ্গার উপকূলে ইন্দ্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন কান্না আর সামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে যে ভালবাসিয়াছিলাম, সে তাহার কোন মূল্যই দিল না। পরের বাড়ির যে কঠিন শাসনপাশ উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারও এতটুকু মর্যাদা রাখিল না। উপরন্তু অপয়া অকর্মণ্য বলিয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদ্যায় দিয়া স্বচ্ছদে চলিয়া গেল। তাহার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কত বিধিয়াছিল, তাহা বলিবার চেষ্টা করাও বাহুল্য। তারপরে অনেকদিন সেও আর সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাং পথেঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু আমার এই ‘যেন’টা আমাকেই শুধু সারাদিন তুষের আগুনে দম্ভ করিত, তাহার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত। ছেলেমহলে সে একজন মস্ত লোক। ফুটবল ক্রিকেটের দলে কর্তা, জিম্ন্যাস্টিক আখড়ার মাস্টার। তাহার কত অনুচর, কত ভক্ত! আমি ত তাহার তুলনায় কিছুই নয়। তবে কেনই বা দুদিনের পরিচয়ে আমাকে সে বন্ধু বলিয়া ডাকিল, কেনই বা বিসর্জন দিল! কিন্তু সে যখন দিল, তখন আমিও টানাটানি করিয়া বাঁধিতে গেলাম না। আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের সঙ্গী-সাথীরা যখন ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়া তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ অভূত আশ্চর্য গল্প শুরু করিয়া দিত, আমি চুপ করিয়া শুনিতাম। একটা কথার দ্বারাও কখনও ইহা প্রকাশ করি নাই যে, সে আমাকে চিনে; কিংবা আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানি। সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিলাম, ‘বড়’ ও ‘ছোট’র বন্ধুত্ব সচরাচর এমনিই দাঁড়ায়। বোধ করি ভাগ্যবশে পরবর্তী জীবনে অনেক ‘বড়’ বন্ধুর সংস্পর্শে আসিব বলিয়াই ভগবান

দয়া করিয়া এই সহজ জ্ঞানটা আমাকে দিয়াছিলেন যে, কখনও কোন কারণেই যেন অবস্থাকে ছাড়াইয়া বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য করিতে না যাই। গেলেই যে দেখিতে দেখিতে ‘বন্ধু’ প্রভু হইয়া দাঁড়ান এবং সাধের বন্ধুত্বপাশ দাসত্বের বেড়ি হইয়া ‘ছোট’র পায়ে বাজে, এই দিব্যজ্ঞানটি এত সহজে এমন সত্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম বলিয়া লাঙ্ঘনার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়াছি।

তিন-চারমাস কাটিয়াছে। উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করিয়াছি—তা বেদনা এক পক্ষের যত নিদারণই হোক—কেহ কাহারও খোঁজ করি না।

দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইতেছে। ‘মেঘনাদবধ’ হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশি চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়াও নাই, বিশ্রামও নাই। স্টেজ-বাঁধায় সাহায্য করিতে পারিয়া একবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন।

সুতরাং ভারী আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সঞ্চিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম। রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে!

ରାତ୍ରି ଦଶଟାର ପର ଥିଯେଟାରେର ପଯଳା ‘ବେଲ’ ହଇଯା ଗେଲେ ନିତାନ୍ତ କୁଣ୍ଡମନେ ସମ୍ମତ ବ୍ୟାପାରଟାର ଉପରେଇ ହତଶନ୍ଦ ହଇଯା ସୁମୁଖେ ଆସିଯା ଏକଟା ଜାଯଗା ଦଖଲ କରିଯା ବସିଲାମ ।

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାଳେର ମଧ୍ୟେଇ ସମ୍ମତ ଅଭିମାନ ଭୁଲିଯା ଗେଲାମ । ସେ କି ପ୍ଲେ! ଜୀବନେ ଅନେକ ପ୍ଲେ ଦେଖିଯାଛି ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତେମନଟି ଆର ଦେଖିଲାମ ନା । ମେଘନାଦ ସ୍ଵର୍ଗ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟ କାଣ୍ଡ! ତାଙ୍କର ଛୟ ହାତ ଉଁଚୁ ଦେହ । ପେଟେର ସେରଟା ଚାର ସାଡ଼େ-ଚାର ହାତ । ସବାଇ ବଲିତ, ମରିଲେ ଗର୍ବ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ା ଉପାୟ ନାଇ । ଅନେକ ଦିନେର କଥା । ଆମାର ସମ୍ମ ସଟନା ମନେ ନାଇ । କିନ୍ତୁ ଏଟା ମନେ ଆଛେ, ତିନି ସେଦିନ ଯେ ବିକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଲେନ, ଆମାଦେର ଦେଶେର ହାରାଣ ପଲସାଂହି ଭୀମ ସାଜିଯା ମନ୍ତ ଏକଟା ସଜିନାର ଡାଳ ଘାଡ଼େ କରିଯା ଦାଁତ କିଡ଼ମିଡ଼ କରିଯାଓ ତେମନଟି କରିତେ ପାରିତେନ ନା ।

ଡ୍ରପ୍‌ସିନ ଉଠିଯାଛେ । ବୋଧକରି ବା ତିନି ଲକ୍ଷ୍ମଣଇ ହଇବେନ—ଅନ୍ଧ-ସନ୍ଧ ବୀରତ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରିତେଛେନ । ଏମନି ସମୟେ ସେଇ ମେଘନାଦ କୋଥା ହିତେ ଏକେବାରେ ଲାକ ଦିଯା ସୁମୁଖେ ଆସିଯା ପଡ଼ିଲ । ସମ୍ମ ସ୍ଟେଜଟା ମଡ଼ମଡ଼ କରିଯା କାଂପିଯା ଦୁଲିଯା ଉଠିଲ—ଫୁଟଲାଇଟ୍‌ର ଗୋଟା ପାଁଚ-ଛୟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଉଲ୍ଟାଇଯା ନିବିଯା ଗେଲ, ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ନିଜେର ପେଟ-ବାଁଧା ଜରିର କୋମରବନ୍ଧଟା ପଟାସ୍ କରିଯା ଛିଁଡ଼ିଯା ପଡ଼ିଲ । ଏକଟା ହୈଟେ ପଡ଼ିଯା ଗେଲ! ତାଙ୍କକେ ବସିଯା ପଡ଼ିବାର ଜନ୍ୟ କେହ ବା ସଭ୍ୟ ଚିଂକାରେ ଅନୁନୟ କରିଯା ଉଠିଲ, କେହ ବା ସିନ ଫେଲିଯା ଦିବାର ଜନ୍ୟ ଚେଂଚାଇତେ ଲାଗିଲ—କିନ୍ତୁ ବାହାଦୁର ମେଘନାଦ! କାହାରେ କୋନ କଥାଯ ବିଚଲିତ ହଇଲେନ ନା । ବାଁ ହାତେର ଧନୁକ ଫେଲିଯା ଦିଯା, ପେଟୁଲାନେର ମୁଟ୍ ଚାପିଯା ଧରିଯା ଡାନ ହାତେର ଶୁଦ୍ଧ ତୀର ଦିଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ଧନ୍ୟ ବୀର! ଧନ୍ୟ ବୀରତ୍ସ! ଅନେକେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଯାଛେ ମାନି, କିନ୍ତୁ ଧନୁକ ନାଇ, ବାଁ ହାତେର ଅବସ୍ଥାଓ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଅନୁକୂଳ ନଯ—ଶୁଦ୍ଧ ଡାନ ହାତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ

তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে  
সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

আনন্দের সীমা নাই—মগ্ন হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের  
জন্য মনে মনে তাঁহার শতকোটি প্রশংসা করিতেছি, এমন সময়ে পিঠের উপর  
একটা আঙুলের চাপ পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখি ইন্দ্র। চুপিচুপি কহিল, আয়  
শ্রীকান্ত, দিদি একবার তোকে ডাকচেন। তড়িৎস্পষ্টের মত সোজা খাড়া হইয়া  
উঠিলাম। কোথায় তিনি?

বেরিয়ে আয় না—বলচি। পথে আসিয়া সে শুধু কহিল, আমার সঙ্গে আয়।  
বলিয়া চলিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাহার নৌকা বাঁধা আছে—নিঃশব্দে  
উভয়ে চড়িয়া বসিলাম, ইন্দ্র বাঁধন খুলিয়া দিল।

আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথ বাহিয়া দুজনে শাহজীর কুটীরে  
আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোধ করি, রাত্রি আর বেশি নাই।

একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বালাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার  
ক্রোড়ের উপর শাহজীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখ্রো সাপ  
লম্বা হইয়া আছে।

দিদি মৃদুকণ্ঠে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। আজ দুপুরবেলা কাহার  
বাটীতে সাপ ধরিবার বায়না থাকে। সেখানে ঐ সাপটিকে ধরিয়া যাহা বকশিস  
পায় তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া সন্ধ্যার প্রাঙ্কালে বাড়ি  
ফিরিয়া দিদির পুনঃপুনঃ নিষেধ সন্ত্বেও সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়। খেলাইয়াও  
ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাঙ্গ করিয়া তাহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পুরিবার  
সময় মন্দের ঝোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে,  
সেও আদর করিয়া শাহজীর গলার উপর তীব্র চুম্বন দিয়াছে।

দিদি তাঁহার মলিন অঞ্চল-প্রাণে চোখ মুছিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া  
বলিলেন, শ্রীকান্ত, তখনই কিন্তু তাঁর চৈতন্য হ'ল যে, সময় আর বেশি নেই।  
বলিলেন, আয় দুজনে একসঙ্গেই যাই, বলে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধরে  
দুই হাত দিয়ে তাকে টেনে টেনে ঐ অতবড় ক'রে ফেলে দিলেন। তার পরে  
দুজনেরই খেলা সাঙ্গ হল। বলিয়া তিনি হাত দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহজীর  
মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া গভীর মেঝে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া  
বলিলেন, যাক, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিইনে।

আমরা উভয়েই নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে কঠস্বরে যে কি  
মর্মান্তিক বেদনা, কি প্রার্থনা, কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পাইল, তাহা যে  
শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই যে জীবনে বিস্মৃত হয়। কিন্তু কিসের জন্য এই  
অভিমান? প্রার্থনাই বা কাহার জন্য?

একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ, কিন্তু তোমরা দুটি  
ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই ভাই, তাই এই ভিক্ষে করি, এঁর একটু তোমরা  
উপায় করে দিয়ে যাও। আঙুল দিয়া কুটীরের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলটা নির্দেশ  
করিয়া বলিলেন, ওইখানে একটু জায়গা আছে, ইন্দ্রনাথ, আমি অনেকদিন  
ভেবেচি, যদি আমার মরণ হয়, ওইখানেই যেন শয়ে থাকতে পাই! সকাল হলে  
সেই জায়গাটুকুতে এঁকে শুইয়ে রেখো ভাই, অনেক কষ্টই এ-জীবনে ভোগ ক'রে  
গেছেন—তবু একটু শান্তি পাবেন।

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, শাহজীকে কি কবর দিতে হবে?

দিদি বলিলেন, মুসলমান যখন, তখন দিতে হবে বৈ কি ভাই!

ইন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, দিদি, তুমিও কি মুসলমান?

দিদি বলিলেন, হাঁ, মুসলমান বৈ কি।

উভয়ের শুনিয়া ইন্দ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত কৃষ্ণিত হইয়া পড়িল। বেশ  
দেখিতে পাইলাম এ জবাব সে আশা করে নাই। দিদিকে সে বাস্তবিকই

ভালবাসিয়াছিল। তাই বোধ করি, মনের মধ্যে একটা গোপন আশা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার দিদি তাহাদেরই একজন। আমার কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তাঁহার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনমতেই ভাবিতে পারিলাম না যে, তিনি হিন্দুকন্যা নহেন।

বাকি রাতটুকু কাটিয়া গেলে, ইন্দ্র সেই নির্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়িয়া আসিল এবং তিনজনে আমরা ধরাধরি করিয়া শাহজীর মৃতদেহটা সমাহিত করিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরেই কাঁকরের একটুখানি পাড় ভাঙিয়া ঠিক যেন কাহারও শেষ-শয্যা বিছাইবার জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল। কুড়ি-পঁচিশ হাত নীচেই জাহুবী-মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বন্যলতার আচ্ছাদন। প্রিয়বন্তকে স্যাত্তে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে! বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম—আর একজন আমাদের কোলের কাছে মৃত্যুকাতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল। তখনও সূর্যোদয় হয় নাই—নীচে মন্দস্ত্রোতা ভাগীরথীর কুলকুলু শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল—মাথার উপরে আশেপাশে বনের পাখিরা প্রভাতী গাহিতে লাগিল। কাল যে ছিল, আজ সে নাই। কাল প্রভাতে কে ভাবিয়াছিল, আজ এমনি করিয়া আমাদের নিশাবসান হইবে! কে জানিত, একজনের শেষমূল্হর্ত এত কাছেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল!

হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণকঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা! আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই। তাঁহার এই প্রার্থনা, এই নিবেদন যে কিরূপ মর্মান্তিক সত্য, তাহা তখনও তেমন বুঝিতে পারি নাই, যেমন দুদিন পরে পারিয়াছিলাম। ইন্দ্র একবার আমার মুখের পানে চোখ তুলিল, তার পরে উঠিয়া গিয়া সেই আর্ত নারীর ভূ-লুঁঠিত মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাঁহারই মত আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, দিদি, আমার কাছে তুমি চল—আমার মা এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তোমাকে

ফেলবেন না—কোলে টেনে নেবেন। তাঁর বড় মায়ার শরীর, একবার শুধু তাঁর  
কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চল। তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।

দিদি কথা কহিলেন না। মূর্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনিভাবে পড়িয়া  
থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তার পরে উঠিয়া আসিয়া তিনজনে গঙ্গাস্নান  
করিলাম। দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গালার চুড়ি ভাঙিয়া  
ফেলিলেন। মাটি দিয়া সিঁথির সিন্দূর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য-বিধবার সাজে  
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন যে, শাহজী তাঁহার স্বামী ছিলেন।  
ইন্দ্র কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সন্দিপ্তকষ্টে  
প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি।

দিদি বলিলেন, হাঁ বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া কহিল, জাত দিলেন কেন?

দিদি বলিলেন, সে কথা ঠিক জানিনে ভাই। কিন্তু তিনি যখন দিলেন,  
তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বৈ ত নয়। নইলে আমি  
নিজে হ'তে জাতও দিইনি—কোন দিন কোন অনাচারও করিনি।

ইন্দ্র গাঢ়স্বরে কহিল, সে আমি দেখেছি দিদি—সেই জন্যেই আমার যখন-  
তখন এই কথাই মনে হয়েচে,—আমাকে মাপ কোরো দিদি, তুমি কি ক'রে এর  
মধ্যে আছ,—তোমার কেমন ক'রে এমন দুর্মতি হয়েছিল! কিন্তু এখন আমি আর  
কোন কথা শুনব না, আমাদের বাড়িতে তোমাকে যেতেই হবে। এখনি চল।

দিদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন, পরে মুখ  
তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে ইন্দ্রনাথ।

কেন পার না দিদি?

দিদি বলিলেন, আমি জানি, তিনি কিছু কিছু দেনা রেখে গেছেন। সেগুলি  
শোধ না দেওয়া পর্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।

ইন্দ্র হঠাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—সে আমিও জানি! তাড়ির দোকানে, গাঁজার দোকানে তার দেনা; কিন্তু তোমার তাতে কি? কার সাধ্য তোমার কাছে টাকা চাইতে পারে? তুমি চল আমার সঙ্গে, কে তোমাকে আটকায় দেখি একবার।

অত দুঃখেও দিদি একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক ক'রে রাখবে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম। স্বামীর খণ্ড যে আমার নিজেরই খণ্ড। সে পাওনাদারকে তুমি কি ক'রে বাধা দেবে ভাই! তা হয় না, আজ তোমরা বাড়ি যাও—আমার অল্লস্বল্ল যা কিছু আছে বিক্রি ক'রে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি। কাল-পরশু একদিন এসো।

আমি এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই ছিলাম। এইবার কথা কহিলাম। বলিলাম, দিদি, আমার কাছে বাড়িতে আরও চার-পাঁচটা টাকা আছে—নিয়ে আসব? কথাটা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ছোট ছেলেটির মত একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, আমার কপালের উপর তাঁহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, না দাদা, আর এনে কাজ নেই! তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দয়া আমি মরণ পর্যন্ত মনে রাখব ভাই। আশীর্বাদ ক'রে যাই, তোমার বুকের ভিতর বসে ভগবান চিরদিন যেন অমনি ক'রে দুঃখীর জন্যে চোখের জল ফেলেন। বলিতে বলিতেই তাঁহার দু'চোখ দিয়া ঝরবার করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা আটটা-নয়টার সময় আমরা বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সেদিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিলেন। যাবার সময় ইন্দ্রের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে মনে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার করে নেন।

ইন্দ্রকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র জোর করিয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, দিদি, এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতেই মন সরচে না। আমার কি জানি কেন কেবলি মনে হচ্ছে তোমাকে আর দেখতে পাব না।

দিদি জবাব দিলেন না। সহসা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সেই বনপথ ধরিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন শূন্য কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। কিন্তু একটিবারও আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না—তেমনি মাথা নত করিয়া একভাবে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেলেন। অথচ কেন যে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, তাহা দুজনেই মনে মনে অনুভব করিলাম।

তিনিদিন পরে ক্ষুলের ছুটির পর বাহির হইয়াই দেখি, ইন্দ্র গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুক্ষ, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় ভরা। এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। বড়লোকের ছেলে, বাহিরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি ত দেখিই নাই—বোধ করি আর কেহও দেখে নাই। ইশারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ইন্দ্র বলিল, দিদি নেই—কোথায় চলে গেছেন। আমার মুখের প্রতিও আর সে চাহিয়া দেখিল না। কহিল, কাল থেকে আমি কত জায়গায় যে খুঁজেচি, কিন্তু দেখা পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, এই নে, বলিয়া একখানা ভাঁজ করা হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে আর-একদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বোধ করি, হৃদয় তাহার এতই পীড়িত, এতই শোকাতুর হইয়াছিল যে, কাহারও সঙ্গে বা কাহারও সহিত আলোচনা তাহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানেই আমি ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভাঁজ খুলিয়া কাগজখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলাম। চিঠিতে যাহা লেখা ছিল, এতকাল পরে তাহার

সমস্ত কথা যদিচ মনে নাই, তথাপি অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারি। চিঠিতে লেখা ছিল, শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্বাদ করিতেছি। শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের আশীর্বাদ করিব। কিন্তু আমার জন্য তোমরা দুঃখ করিয়ো না। ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, সে জানি। কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস করিয়ো। আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝিতে পারিবে, তাহা নয়; কিন্তু বড় হইলে একদিন বুঝিবে সেই আশায় এই পত্র লিখিয়া গেলাম। কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই ত তোমাদের কাছে বলিয়া যাইতে পারিতাম! অথচ কেন যে বলি নাই—বলি-বলি করিয়াও কেন চুপ করিয়া গিয়াছি, সেই কথাটাই আজ না বলিতে পারিলে আর বলা হইবে না। আমার কথা—শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আবার তাও ভাল কথা নয়। এ জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু পূর্বজন্মের সংগঠিত পাপের যে আমার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, স্তু হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা-ঘানি করিয়া সে পাপের বোৰা আর ভারাক্রান্ত করিব না। কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গিয়াছেন। আর গিয়াছেন বলিয়াই যে বলিতে আর দোষ নাই, সে মনে করি না।

অথচ কেন জানি না, আমার এই অন্তবিহীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানাইয়াও কোন মতেই বিদায় লইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অনন্দ। স্বামীর নাম কেন গোপন করিয়া গেলাম, তাহার কারণ—এই লেখাটুকুর শেষ পর্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়িতেই ছিলেন—ইহাকে হত্যা

করিয়া স্বামী নিরংদেশ হন। এ দুঃক্রম কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলেমানুষ আজ না বুঝিতে পারিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক বল ত শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড়? এ লজ্জা কি মর্মান্তিক! তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সে জ্বালা আজও তোমার দিদির থামে নাই। যাক সে কথা! তার পরে সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই। শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে, খিড়কির দ্বার খুলিয়া আমার স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই শুনিল, সবাই জানিল, অনন্দা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের বোৰা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন উপায় নাই। কারণ স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই। পিতাকে চিনিতাম, তিনি কোন মতেই তাঁর সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। তা ছাড়া আমি আবার মুসলমানী।

এখনে স্বামীর ঝণ যাহা ছিল, পরিশোধ করিয়াছি। আমার কাছে লুকানো দুটি সোনার মাকড়ি ছিল, তাহাই বেচিয়াছি। তুমি যে পাঁচটি টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই। আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের উপর যে মুদীর দোকান আছে, তাহার কর্তার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—চাহিলেই পাইবে। মনে দুঃখ করিয়ো না ভাই। টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পুরিয়া লইয়া গেলাম। আর এইটি তোমার দিদির আদেশ শ্রীকান্ত, আমার কথা ভাবিয়া তোমরা মন খারাপ করিও না। মনে করিও, তোমার

দিদি, যেখানেই থাকুক, ভালই থাকিবে; কেননা দুঃখ সহিয়া সহিয়া এখন কোন  
দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না। তাকে কিছুতেই আর ব্যথা দিতে পারে না।  
আমার ভাই দুটি, তোমাদের আমি কি বলিয়া যে আশীর্বাদ করিব খুঁজিয়া পাই  
না। তবে শুধু এই বলিয়া যাই—ভগবান পতিরূপার ঘদি মুখ রাখেন, তোমাদের  
বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন।

তোমাদের দিদি অনন্দা

## সাত

আজ একাকী গিয়া মুদীর কাছে দাঁড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া মুদী একটি ছোট ন্যাকড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দুটি সোনার মাকড়ি এবং পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকা কয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, বহু, মাকড়ি-দুইটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রি করিয়া শাহজীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না। এই বলিয়া সে কাহার কত ঋণ, মুখে মুখে একটা হিসাব দিয়া কহিল, যাবার সময় বছর হাতে সাড়ে-পাঁচ আনা পয়সা ছিল। অর্থাৎ বাইশটি মাত্র পয়সা অবলম্বন করিয়া এই নিরূপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন। পাছে তাঁহার সেই মেহাস্পদ বালক-দুটি তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে, উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়, এই ভয়ে নিঃশব্দে অলক্ষ্য বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায়, কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দেন নাই। না দিন, কিন্তু আমার টাকা-পাঁচটি নিলেন না। অথচ নিয়াছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে, গর্বে কতদিন কত আকাশকুসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার শূন্যে মিলাইয়া গেল। অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাহাই এই বুড়ার কাছে লুকাইবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেলাম। বার বার বলিতে লাগিলাম, ইন্দ্রের কাছে তিনি কতই লইয়াছেন, কিন্তু আমার কাছে কিছুই লইলেন না—যাইবার সময় না বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া গেলেন।

কিন্তু এখন আর আমার মনে সে অভিমান নাই। বড় হইয়া বুঝিয়াছি, আমি এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, তাঁহাকে দান করিতে পাইব! সেই জ্বলন্ত শিখায় যাহা আমি দিব, তাহাই বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে বলিয়াই দিদি আমার দান প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র! ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুর প্রস্তুত যে, সে যেখানে দান করিবে, আমি সেখানে হাত বাড়াইব! তা ছাড়া ইহাও

ত বুঝিতে পারি, দিদি কাহার মুখ চাহিয়া সেই ইন্দ্রের কাছেও হাত পাতিয়াছিলেন। যাক সে কথা।

তার পরে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনও তাঁহার দেখা পাই নাই। না পাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসি মুখখানি চিরদিন তেমনিই দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করি, তখন এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্মীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি। তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জগতের সমস্ত নারীজাতিকে কর্তব্যের ধ্রুবপথে আকর্ষণ করিতেছ—তোমার সে ইচ্ছাও বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিড়ম্বনা নির্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে?

কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম নিলে,—সমাজ, সংসার, সম্ভব সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই, তাঁকে তাঁর বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, শক্র-মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেশ্যা বলিয়া! ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?

হায় রে, কোথায় তাঁহার এই-সব আত্মীয়-স্বজন, শক্র-মিত্র—এ যদি একবার জানিতে পারিতাম! সে দেশ যেখানে যত দূরেই হউক, এ দেশের বাহিরে হইলেও হয়ত এতদিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এই তোমাদের অনন্দা! এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী! তোমাদের যে মেয়েটিকে কুলত্যাগিনী বলিয়া

জানিয়া রাখিয়াছ, সকালবেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দুষ্ক্রিতির হাত এড়াইতে পারিবে।

তবে আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করিয়াছি। পূর্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এতবড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী তিনি ছাড়া, জগতে আর কেহ কি আছে, যে অনন্দাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।

তার পরে অনেক দিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙি কুলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আর একটি দিনমাত্র আমরা উভয়ে সেই নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ। তার পরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকা-যাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়। সেদিন অথগু স্বার্থপরতার যে উৎকর্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাটাই বলিব।

সেদিন কনকনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্ৰ। চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজিৱ। কহিল,—তে থিয়েটার হবে, যাবি? থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শীগুগিৰ আমাদের বাড়ি আয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহিৱ হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্ৰেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদেৰ বাড়িৰ গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হওয়া আছে; দেরি হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্র নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিঙ্কের মোজা, চক্রকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত ‘যাচ্ছতাই’ বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কি রে?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী—কান্ত—! শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, হঁকো-কলকে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে—তামাক সাজুক!

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গ করিয়া আদেশ করে না! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হল ধর, আমি তামাক সাজচি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্র মাস্তুল ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল. এ. পাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্নমুখে টানিতে টানিতে প্রশং করিলেন, তুই থাকিস্ কোথায় রে

কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কি রে? র্যাপার? আহা, র্যাপারের কি শ্রী।  
তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুট্চে—পেতে দে দেখি, বসি।

আমি দিচ্ছি নতুনদা। আমার শীত করচে না—এই নাও, বলিয়া ইন্দ্ৰ  
নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ে  
করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশংস্ত নয়। আধৰণ্টাৰ মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া  
ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্ৰ ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা এ যে ভাৱি মুশকিল হ'ল, হাওয়া  
প'ড়ে গেল। আৱ ত পাল চলবে না।

নতুনদা জবাৰ দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।  
কলিকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্ৰ ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কাৱৰু  
সাধ্য নেই নতুনদা, এই ৱেতন ঠেলে উজোন বয়ে যায়। আমাদেৱ ফিরতে হবে।

প্ৰস্তাৱ শুনিয়া, নতুনদা এক মুহূৰ্তেই একেবাৱে অগ্ৰিশৰ্মা হইয়া উঠিলেন,  
তবে আনলি কেন হতভাগা! যেমন ক'ৱে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে।  
আমায় থিয়েটাৱে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে—তাৱা বিশেষ ক'ৱে ধৰেচে। ইন্দ্ৰ  
কহিল, তাদেৱ বাজাবাৰ লোক আছে নতুনদা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না! আটকাবে না? এই মেড়োৱ দেশেৱ ছেলেৱা বাজাৰে হারমোনিয়াম!  
চল, যেমন ক'ৱে পারিস নিয়ে চল। বলিয়া তিনি যেৱেপ মুখভঙ্গি কৱিলেন,  
তাহাতে আমাৰ গা জ্বালিয়া গেল। হঁহাৱ বাজনা পৱে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে  
কথায় আৱ প্ৰয়োজন নাই।

ইন্দ্ৰ অবস্থা-সন্কট অনুভব কৱিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ইন্দ্ৰ, গুণ  
টেনে নিয়ে গেলে হয় না? কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকাইয়া  
উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁতমুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজও

মনে করিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে। জানোয়ারের মত  
ব'সে থাকা হচ্ছে কেন?

তার পরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে  
লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নীচে নামিয়া এবং  
সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া  
চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা  
থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন  
না। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে  
এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করিতে পারিবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেলো, না খুলে—

হ্যাঁ, দামী দস্তানাটা মাটি ক'রে ফেলি আর কি! নে—যা করছিস্ক কর।

বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্ঞ ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি।  
তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত  
চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার  
অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম! পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে,  
পাছে একফোটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে  
চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং  
অবিশ্রাম চেঁচমেচি করিয়া হৃকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্দেক হইল এবং  
দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল।  
এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রি ও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি  
দুটা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা,  
তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ইন্দ্র, এদিকে খোটামোটাদের  
বন্তি-বন্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?

ইন্দ্র কহিল, সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুনদা। সব জিনিস পাওয়া  
যায়।

তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ—টান্ না একটু জোরে—ভাত খাসনে?  
ইন্দ্র বল না তোর ওই ওটাকে, একটু জোর ক'রে টেনে নিয়ে চলুক

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই জবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম, তেমনি  
ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়া  
ঢালু ও বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সঙ্কীর্ণ  
জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, হাত-পা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার। অতএব ইন্দ্র  
তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ  
সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম।  
যদিচ বুঝিয়াছিলাম, এতরাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য সংগ্রহ করা সহজ  
ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিষ্ঠার ছিল না। অথচ তাঁর একাকী  
থাকিতেও ইচ্ছা নাই, সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইন্দ্র তৎক্ষণাত আহ্বান করিয়া  
কহিল, চল না নতুনদা, একলা তোমার ভয় করবে—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে  
আসবে। এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।

নতুনদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ভয়! আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে,  
যমকে ভয় করিনে তা জনিস্বি! কিন্তু তা ব'লে ছোটলোকদের dirty পাড়ার  
মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো  
হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং  
তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁর ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিলেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজি হইলাম না। ইন্দ্র সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন, ঠুন-ঠুন পেয়ালা—

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকীসুরে সঙ্গীচর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুঢ়া হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, এরা কলকাতার লোক কিনা, জল-হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝলি না শ্রীকান্ত!

আমি বলিলাম, হ্যঁ।

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই—দিতে দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি. এ. পাশ করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন; না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনতে পাই কি করিয়া? তখন তাঁহার প্রথম ঘোবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় নাকি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন, আর কোন কালে নয়। অথচ ঘণ্টাকয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এতকালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না, তবে ভাগ্যে এমন-সব নমুনা কদাচিং চোখে পড়ে; না হইলে বহু পূর্বেই সংসারটা রীতিমত একটা পুলিশ থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যিক। এ অঞ্চলে পথঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রের জানা ছিল। সে গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুক্ষ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরণ

অতলস্পর্শী সে কথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী নিষ্কর্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালী গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার ‘চারপাই’ আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথ-বধের পরিবর্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা-পাপে দন্ধ হইয়া মরিতে হইত তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চিৎকার করিয়া, এবং যত প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া, আধঘণ্টা পরে রিভুল্টে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! ‘দর্জিপাড়া’র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি-যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দু’জনে প্রাণপণে চিৎকার করিলাম—নতুনদা, ও নতুনদা! কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল।

এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশুণ্ডিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ ‘ভড়ারে’র জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যন্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে! ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এতবড় অভিশাপ ত দিই নাই!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছু দূরে বালুর উপরে কি একটা বস্ত চাঁদের আলোয় চক্রক করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সু’র একপাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল—শ্রীকান্ত রে! আমার মাসিমাও এসেছেন যে! আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না। তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিষ্কৃট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদীর দোকানে

দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থপ্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন এই দিকের কুকুরগুলাও যে সমবেত আতচীৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থপ্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয় মাত্র রহিল না যে নেকড়েগুলো তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া সেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাত ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি যাব। আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—তুমি পাগল হয়েচ ভাই! ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, তুই থাক শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস—আমি চললুম।

তাহার মুখ অত্যন্ত পাওুৱ, কিষ্ট চোখদুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরৰ্থক শূন্য আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দুটো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দস্ত মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না, সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কি বলিয়া বাধা দিব। যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও যা'হোক-একটা হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম। এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, তুই ক্ষেপেচিস্ শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মুহূর্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোন মতে গোপন করিয়া বলিলাম, তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?

প্রত্যন্তে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমারও দোষ নাই ভাই, আমিও নতুনদাকে আনতে চাইনি। কিন্তু একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু আমারও ত যাওয়া চাই। কারণ পূর্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরুৎ ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাদবিতঙ্গ না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। ইন্দ্র কহিল, বালির ওপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার, সে চেষ্টা করিস নে—জলে গিয়ে পড়বি।

সুযুক্তে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চিৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই! সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চিৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা!

নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—এই যে আমি!

দু'জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলা সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকঞ্চনিমজ্জিত মূর্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতৃত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া ‘ঠুন-ঠুন পেয়ালা’ ধরিয়াছিলেন, খুব সন্তু, সেই সঙ্গীচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা

আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং এই দুর্বাস্ত শীতের রাত্রে তুষারশীতল জলে আকর্ষ মগ্ন থাকিয়া এই অধর্ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙা করিয়া খুলিতেও, সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একপাটি পাম্প?

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ ক্লেশ বিশ্মৃত হইয়া তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য একে একে পুনঃপুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরক্ষার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্বাধের মত সে-সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে ত ধূলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এ-সব কখনো চোখ্খে দেখি নাই—এই সমস্ত অবিশ্রান্ত বকিতে বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিশ্মৃত হইলেন। উপলক্ষ্য যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই-সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দুটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্বে মুর্ছিত হইতে ছিলেন সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে করিতে—পা মুছিতেও ঘৃণ হয়, তাহা পুনঃপুনঃ শুনাইতে শুনাইতে ইন্দ্র খানি পরিধান করিয়া তিনি সে

যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হোক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাস্তকবণিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া আজ নৌকা চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁটমাত্র অবলম্বন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।

## আট

লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়ই আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই-সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ত তাহারা একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই। আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলোই বজায় আছে? তাও ত নাই। কত হারাইয়া গিয়াছে টের পাই, কিন্তু তরু ত শিকল ছিঁড়িয়া যায় না! কে তবে নৃতন করিয়া এ-সব জোড়া দিয়া রাখে?

আরও একটা বিস্ময়ের বন্ধ আছে। পঞ্চিতেরা বলেন, বড়দের চাপে ছোটরা গুঁড়াইয়া যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জীবনের প্রধান ও মুখ্য ঘটনাগুলিই ত কেবল মনে থাকিবার কথা। কিন্তু তাও ত দেখি না! ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ এক সময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না জানি বেশ বড় হইয়া জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছে, এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। অতএব বলিবার সময়েও ঠিক তাহা ঘটে। তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়ে না। অথচ কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়ত আমি পাঠককে দিতে পারিব না, শুধু যা ঘটে তাই জানাইয়া দিলাম।

এমনি একটা তুচ্ছ বিষয়ে যে মনের মধ্যে এতদিন নীরবে, এমন সঙ্গেপনে এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার সন্ধান পাইয়া আমি নিজেও বড় বিস্মিত হইয়া গেছি! সেইটাই আজ পাঠককে বলিব। অথচ জিনিসটি ঠিক কি, তাহার সমস্ত পরিচয়টা না দেওয়া পর্যন্ত, চেহারাটা কিছুতেই পরিষ্কার হইবে না। কারণ গোড়াতেই যদি বলি—সে একটা প্রেমের ইতিহাস—মিথ্যাভাষণের পাপ তাহাতে হইবে না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা নিজের চেষ্টায় যতটা বড় হইয়া উঠিয়াছে,

আমার ভাষ্টা হয়ত তাহাকেও ডিঙাইয়া যাইবে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক হইয়া  
বলা আবশ্যক।

সে বছকাল পরের কথা। দিদির স্মৃতিটাও তখন ঝাপসা হইয়া গেছে।  
যাঁর মুখখানি মনে করিলেই, কি জানি কেন প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা আপনি  
মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত, সে দিদিকে আর তখন তেমন করিয়া মনে পড়িত  
না। এ সেই সময়ের কথা। এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে তাঁহার শিকার-পার্টিতে  
গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এঁর সঙ্গে অনেকদিন স্কুলে পড়িয়াছি, গোপনে অনেক  
আঁক কষিয়া দিয়াছি—তাই তখন ভারি ভাব ছিল। তার পরে এন্ট্রাঙ্গ ক্লাস হইতে  
ছাড়াছাড়ি। রাজার ছেলেদের স্মৃতিশক্তি কম, তাও জানি। কিন্তু ইনি যে মনে  
করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শুরু করিবেন, ভাবি নাই। মাঝে হঠাত একদিন দেখা।  
তখন সবে সাবালক হইয়াছেন। অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে এবং তার  
পরে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ছেলের কানে গিয়াছে—অতিরঞ্জিত হইয়াই  
গিয়াছে—রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই, এবং আরও এত প্রকারের  
গুণগ্রামে ইতিমধ্যে মণিত হইয়া উঠিয়াছি যে, একমাত্র সাবালক রাজপুত্রেরই  
অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবার আমি উপযুক্ত।

তবে কিনা, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা আপনার লোকের সুখ্যাতিটা একটু  
বাড়াইয়াই করে, না হইলে সত্য সত্যই যে অতখানি বিদ্যা অমন বেশি পরিমাণে  
ওই বয়সটাতেও অর্জন করিতে পারিয়াছিলাম, সে অহঙ্কার করা আমার শোভা  
পায় না, অন্ততঃ একটু বিনয় থাকা ভাল। কিন্তু যাক সে কথা। শান্ত্রকারেরা  
বলেন, রাজা-রাজড়ার সাদর আস্থান কখনো উপেক্ষা করিবে না। হিঁর ছেলে,  
শান্ত্র অমান্য করিতেও ত আর পারি না। কাজেই গেলাম। স্টেশন হইতে দশ-  
বারো ক্রোশ পথ গজপঢ়ে গিয়া দেখি, হাঁ, রাজপুত্রের সাবালকের লক্ষণ বটে!  
গোটা-পাঁচেক তাঁবু পড়িয়াছে। একটা তাঁর নিজস্ব, একটা বন্ধুদের, একটা

তৃত্যদের, একটায় খাবার বন্দোবস্ত। আর একটা অমনি একটু দূরে—সেটা ভাগ করিয়া জন-দুই বাইজী ও তাঁহাদের সাঙ্গেপাঞ্জদের আড়ত।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপুত্রের খাসকামরায় অনেকক্ষণ হইতেই যে সঙ্গীতের বৈঠক বসিয়াছে, তাহা প্রবেশমাত্রই টের পাইলাম। রাজপুত্র অত্যন্ত সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। এমন কি আদরের আতিশয়ে দাঁড়াইবার আয়োজন করিয়া, তিনি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বন্ধবেরা বিহ্বল কলকঞ্চে সংবর্ধনা করিতে লাগিলেন। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু সেটা, তাঁহাদের যে অবস্থা, তাহাতে অপরিচয়ের জন্য বাধে না।

এই বাইজীটি পাটনা হইতে অনেক টাকার শর্তে দুই সপ্তাহের জন্য আসিয়াছেন। এইখানে রাজকুমার যে বিবেচনা এবং যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাইজী সুন্তী, অতিশয় সুকর্ষ এবং গান গাহিতে জানে।

আমি প্রবেশ করিতেই গানটা থামিয়া গিয়াছিল। তার পর সময়োচিত বাক্যালাপ ও আদব-কায়দা সমাপন করিতে কিছুক্ষণ গেল। রাজপুত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান ফরমাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমটা অত্যন্ত কৃষ্ণিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই বুঝিলাম, এই সঙ্গীতের মজলিসে আমিই যা-হোক একটু ঝাল্লা দেখি, আর সবাই ছুঁচোর মত কানা।

বাইজী প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পয়সার লোভে অনেক কাজই পারা যায় জানি। কিন্তু এই নিরেটের দরবারে বীণা-বাজানো বাস্তবিকই এতক্ষণ তাহার একটা সুকর্ষিত কাজ হইতেছিল। এইবার একজন সমবাদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। তার পরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে যেন শুধুমাত্র আমার জন্যই, তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য ও কঠের সমস্ত মাধুর্য দিয়া আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য মদোন্মততা ডুবাইয়া অবশেষে স্তৰ্ক হইয়া আসিল।

বাইজী পাটনার লোক—নাম পিয়ারী। সে রাত্রে আমাকে সে যেমন করিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া গান শুনাইয়াছিল, বোধ করি এমন আর সে কখনও শুনায় নাই। মুঞ্চ হইয়া গিয়াছিলাম। গান থামিলে আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—বেশ!

পিয়ারী মুখ নিচু করিয়া হাসিল। তারপর দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—সেলাম করিল না। মজলিস রাত্রির মত শেষ হইয়াছিল।

তখন দলের মধ্যে কেহ সুপ্ত, কেহ তন্দ্রাভিভূত—অধিকাংশই অচৈতন্য।

নিজের তাঁবুতে যাইবার জন্য বাইজী যখন তাহার দলবল লইয়া বাহির হইতেছিল, আমি তখন আনন্দের আতিশয়ে হিন্দী করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, বাইজী, আমার বড় সৌভাগ্য যে, তোমার গান দু-সপ্তাহ ধ'রে প্রত্যহ শুনতে পাব।

বাইজী প্রথমটা থমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত মনুকগঠে পরিষ্কার বাঙলা করিয়া কহিল, টাকা নিয়েছি, আমাকে ত গাইতেই হবে, কিন্তু আপনি এই পনর-যোল দিন ধ'রে এঁর মোসাহেবি করবেন? যান, কালকেই বাড়ি চলে যান।

কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি, কাঠ হইয়া গেলাম এবং কি জবাব দিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই বাইজী বাহির হইয়া গেল। সকালে সোরগোল করিয়া কুমারজী শিকারে বাহির হইলেন। মদ্য-মাংসের আয়োজনটাই সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে জন-দশেক শিকারী অনুচর। বন্দুক পনরটা, তার মধ্যে ছয়টা রাইফেল। স্থান—একটা আধশুক্নো নদীর উভয় তীর! এপারে গ্রাম, ওপারে বালুর চর। এপারে ক্রেশ ব্যাপিয়া বড় বড় শিমুলগাছ, ওপারে বালুর উপর স্থানে স্থানে কাশ ও কুশের ঝোপ। এইখানে এই পনরটা বন্দুক লইয়া শিকার করিতে হইবে। শিমুল গাছে-গাছে ঘুঘু গোটা-কয়েক দেখিলাম, মরা নদীর বাঁকের কাছটায় দুটো চকাচকি ভাসিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

কে কোন্ দিকে যাইবেন, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতে করিতেই সবাই দু-এক পাত্র টানিয়া লইয়া দেহ ও মন বীরের মত করিয়া

লইলেন। আমি বন্দুক রাখিয়া দিলাম। একে বাইজীর খোঁচা খাইয়া রাত্রি হইতেই  
মনটা বিকল হইয়া ছিল, তাহাতে শিকারের ক্ষেত্র দেখিয়া সর্বাঙ্গ জুলিয়া গেল।

কুমার প্রশ্ন করিলেন, কি হে শ্রীকান্ত, তুমি যে বড় চুপচাপ? ওকি, বন্দুক  
রেখে দিলে যে!

আমি পাখি মারি না।

সে কি হে? কেন, কেন?

আমি গোঁফ ওঠবার পর থেকে আর ছরৱা দেওয়া বন্দুক ছুঁড়িনি—ও  
আমি ভুলে গেছি।

কুমার সাহেব হাসিয়াই খুন। কিন্তু সে হাসির কতটা দ্রব্যগুণে, সে কথা  
অবশ্য আলাদা।

সূরযুর চোখ-মুখ আরুক হইয়া উঠিল। তিনিই এ দলের প্রধান শিকারী  
এবং রাজপুত্রের প্রিয় পার্শ্বচর। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি আমি আসিয়াই  
শুনিয়াছিলাম।। রঞ্চ হইয়া কহিলেন, চিড়িয়া শিকারমে কুছ সরম হ্যায়?

আমারও মেজাজ ত ভাল ছিল না; সুতরাং জবাব দিলাম, সবাইকার নেহি  
হ্যায়, কিন্তু আমার হ্যায়! যাক আমি তাঁবুতে ফিরিলাম—কুমারসাহেব, আমার  
শরীরটা ভাল নেই,—বলিয়া ফিরিলাম। ইহাতে কে হাসিল, কে চোখ ঘুরাইল, কে  
মুখ ভ্যাঙাইল, তাহা চাহিয়াও দেখিলাম না।

তখন সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরিয়া ফরাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছি এবং  
আর-এক পেয়ালা চা আদেশ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি, বেয়ারা আসিয়া  
সমন্বয়ে জানাইল, বাইজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। ঠিক এইটি আশাও  
করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সাক্ষাৎ করিতে  
চায়?

তা' জানিনে।

তুমি কে?

আমি বাইজীর খানসামা।

তুমি বাঙালী?

আজ্জে হাঁ—পরামাণিক। নাম রতন।

বাইজী হিন্দু?

রতন হাসিয়া বলিল, নইলে থাকব কেন বাবু?

আমাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া তাঁবুর দরজা দেখাইয়া দিয়া রতন সরিয়া গেল। পর্দা তুলিয়া ভিতরে চুকিয়া দেখিলাম, বাইজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওড়নায় ঠিক চিনিতে পারি নাই; আজ দেখিয়াই টের পাইলাম, বাইজী যেই হোক, বাঙালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ি পরিয়া বাইজী বসিয়া আছে। ভিজা এলোচুল পিঠের উপর ছড়ানো; হাতের কাছে পানের সাজ-সরঞ্জাম, সুমুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজা। আমাকে দেখিয়া গাত্রোথান করিয়া হাসিমুখে সুমুখের আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বোসো। তোমার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর—ওরে রতন, গুড়গুড়িটা নিয়ে যা। ওকি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো না?

রতন আসিয়া গুড়গুড়ি লইয়া গেল। বাইজী কহিল,—তুমি তামাক খাও তা জানি; কিন্তু দেব কিসে? অন্য জায়গায় যা কর, তা কর। কিন্তু আমি জেনেশুনে আমার গুড়গুড়িটা ত আর তোমাকে দিতে পারিনে! আচ্ছা, চুরুট আনিয়ে দিচ্ছি—ওরে ও—

থাক থাক, চুরুটে কাজ নেই; আমার পকেটেই আছে।

আছে? বেশ তা হ'লে ঠাণ্ডা হয়ে একটু বোসো; চের কথা আছে। ভগবান কখন যে কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন, তা কেউ বলতে পারে না। স্বপ্নের অগোচর। শিকারে গিয়েছিলে, হঠাত ফিরে এলে যে?

ভাল লাগলো না।

না লাগবারই কথা। কি নিষ্ঠুর এই পুরুষমানুষ জাতটা। অনর্থক জীবহত্যা করে কি আমোদ পায়, তা তারাই জানে। বাবা ভাল আছেন?

বাবা মারা গেছেন।

মারা গেছেন! মা?

তিনি আগেই গেছেন।

ওঃ—তাইতেই, বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। একবার মনে হইল তাহার চোখ দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল। কিন্তু সে হয়ত আমার মনের ভুল। পরক্ষণেই যখন সে কথা কহিল, তখন আর ভুল রহিল না যে, এই মুখরা নারীর চঁটুল ও পরিহাস-লঘু কর্তৃস্বর সত্য সত্যই মৃদু ও আর্দ্ধ হইয়া গিয়াছে। কহিল, তা হ'লে যত্নটত্ত্ব করবার আর কেউ নেই বল। পিসিমার ওখানেই আছ ত? নইলে আর থাকবেই বা কোথায়? বিয়ে হয়নি সে ত দেখতেই পাচ্ছি। পড়াশুনা করচ? না, তাও ঐ সঙ্গে শেষ ক'রে দিয়েচ?

এতক্ষণ পর্যন্ত ইহার কৌতূহল এবং প্রশ্নমালা আমি যথাসাধ্য সহ্য করিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই শেষ কথাটা কেমন যেন হঠাতে অসহ্য হইয়া উঠিল। বিরক্ত এবং রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, আচ্ছা, কে তুমি? তোমাকে জীবনে কখনো দেখেচি ব'লেও ত মনে হয় না। আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানতে চাইচই বা কেন? আর জেনেই বা তোমার লাভ কি?

বাইজী রাগ করিল না, হাসিল; কহিল, লাভ-ক্ষতিই কি সংসারে সব? মায়া, মমতা, ভালবাসাটা কি কিছু নয়? আমার নাম পিয়ারী, কিন্তু, আমার মুখ দেখেও যখন চিনতে পারলে না, তখন ছেলেবেলার ডাকনাম শুনেই কি আমাকে চিনতে পারবে? তা ছাড়া আমি তোমাদের—ও থামের মেয়েও নই।

আচ্ছা, তোমাদের বাড়ি কোথায় বল?

না, সে আমি বলব না।

তবে তোমার বাবার নাম কি বল?

বাইজী জিভ কাটিয়া কহিল, তিনি স্বর্গে গেছেন।

ছি-ছি, তাঁর নাম কি আর এ মুখে উচ্চারণ করতে পারিঃ?

আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, তা যদি না পারো, আমাকে চিনলে  
কি ক'রে সে কথা বোধ হয় উচ্চারণ করতে দোষ হবে না?

পিয়ারী আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া আবার মুখ টিপিয়া হাসিল।  
কহিল, না, তাতে দোষ নাই। কিন্তু সে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

বলেই দেখ না।

পিয়ারী কহিল, তোমাকে চিনেছিলাম ঠাকুর, দুরুদ্ধির তাড়ায়—আর  
কিসে? তুমি যত চোখের জল আমার ফেলেছিলে, ভাগ্য সূযিদেব তা শুকিয়ে  
নিয়েচেন, নইলে চোখের জলের একটা পুরু হয়ে থাকতো। বলি বিশ্বাস করতে  
পারো কি?

সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু সে আমারই ভুল। তখন  
কিছুতেই মনে পড়িল না যে, পিয়ারীর ঠোঁটের গঠনই এইরূপ—যেন সব কথাই  
সে তামাশা করিয়া বলিতেছে, এবং মনে মনে হাসিতেছে। আমি চুপ করিয়া  
রহিলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সত্য সত্যই হাসিয়া উঠিল।  
কিন্তু এতক্ষণে কেমন করিয়া জানি না, আমার সহসা মনে হইল, সে নিজের  
লজ্জিত অবস্থা যেন সামলাইয়া ফেলিল। সহাস্যে কহিল, না ঠাকুর, তোমাকে যত  
বোকা ভেবেছিলাম, তুমি তা নও। এ যে আমার একটা বলার ভঙ্গ, তা তুমি ঠিক  
ধরেচ। কিন্তু তাও বলি, তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমানও আমার এই কথাটায়  
অবিশ্বাস করতে পারেনি। তা এতই যদি বুদ্ধিমান, মোসাহেবী ব্যবসাটা ধরা হ'ল  
কেন? এই চাকরি ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না। যাও, চট্টপট স'রে  
পড়।

କ୍ରୋଧେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜୁଲିଆ ଗେଲ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇତେ ଦିଲାମ ନା । ସହଜଭାବେ ବଲିଲାମ, ଚାକରି ଯତଦିନ ହୟ, ତତଦିନଇ ଭାଲ । ବସେ ନା ଥାକି ବେଗାର ଖାଟି—ଜାନତ? ଆଚ୍ଛା, ଏଖନ ଉଠି । ବାଇରେର ଲୋକ ହୟତ ବା କିଛୁ ମନେ କରେ ବସବେ ।

ପିଯାରୀ କହିଲ, କରଲେ ସେ ତ ତୋମାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଠାକୁର! ଏ କି ଏକଟା ଆପସୋସେର କଥା?

ଉତ୍ତର ନା ଦିଯା ଯଥନ ଆମି ଦ୍ୱାରେର କାହେ ଆସିଯା ପଡ଼ିଯାଛି, ତଥନ ସେ ଅକ୍ଷ୍ମାଂ ହାସିର ଲହର ତୁଲିଆ ବଲିଆ ଉଠିଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୋ ଭାଇ, ଆମାର ସେଇ ଚୋଥେର ଜଳେର ଗଞ୍ଜଟା ଯେଣ ଭୁଲେ ଯେଯୋ ନା । ବନ୍ଧୁ-ମହଲେ, କୁମାରସାହେବେର ଦରବାରେ ପ୍ରକାଶ କରଲେ—ଚାଇ କି ତୋମାର ନସିବଟାଇ ହୟତ ଫିରେ ଯେତେ ପାରେ ।

ଆମି ନିରାନ୍ତରେ ବାହିର ହଇଯା ପଡ଼ିଲାମ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିର୍ଜ୍ଜାର ହାସି ଏବଂ କଦର୍ୟ ପରିହାସ ଆମାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ବ୍ୟାପିଯା ଯେଣ ବିହାର କାମଡେର ମତ ଜୁଲିତେ ଲାଗିଲ ।

ସ୍ଵସ୍ଥାନେ ଆସିଯା ଏକ ପେଯାଳା ଢା ଥାଇୟା ଚୁରଂଟ ଧରାଇୟା ମାଥା ଯଥାସମ୍ଭବ ଠାଣ୍ଡା କରିଯା ଭାବିତେ ଲାଗିଲାମ—କେ ଏ? ଆମାର ପାଁଚବଚର ବୟସେର ଘଟନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ କରିତେ ପାରି । କିନ୍ତୁ ଅତୀତେର ମଧ୍ୟେ ଯତଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଯ, ତତଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ତମ କରିଯା ଦେଖିଲାମ, କୋଥାଓ ଏଇ ପିଯାରୀକେ ଖୁଜିଯା ପାଇଲାମ ନା । ଅଥଚ ଏ ଆମାକେ ବେଶ ଚିନେ । ପିସିମାର କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନେ । ଆମି ଯେ ଦରିଦ୍ର, ଇହାଓ ତାହାର ଅବିଦିତ ନହେ । ସୁତରାଂ ଆର କୋନ ଅଭିସନ୍ଧି ଥାକିତେଇ ପାରେ ନା । ଅଥଚ ଯେମନ କରିଯା ପାରେ, ଆମାକେ ସେ ଏଖାନ ହଇତେ ତାଡ଼ାଇତେ ଚାଯ । କିନ୍ତୁ କିସେର ଜନ୍ୟ? ଆମାର ଥାକା-ନା-ଥାକାଯ ଇହାର କି? ତଥନ କଥାଯ କଥାଯ ବଲିଯାଛିଲ, ସଂସାରେ ଲାଭ-କ୍ଷତିଇ କି ସମସ୍ତ? ଭାଲବାସା-ଟାସା କିଛୁ ନାଇ?

ଆମି ଯାହାକେ କଥନୋ ଚୋଥେଓ ଦେଖି ନାଇ, ତାହାର ମୁଖେର ଏଇ କଥାଟା ମନେ କରିଯା ଆମାର ହାସି ପାଇଲ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତ ଛାପାଇୟା ତାହାର ଶେଷ ବିଦ୍ଵପଟାଓ ଆମାକେ ଯେଣ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ମର୍ମାନ୍ତିକ କରିଯା ବିଂଧିତେ ଲାଗିଲ ।

সন্ধ্যার সময় শিকারীর দল ফিরিয়া আসিল। চাকরের মুখে শুনিলাম আটটা ঘুঘুপাখি মারিয়া আনা হইয়াছে। কুমার ডাকিয়া পাঠাইলেন; অসুস্থতার ছুতা করিয়া বিছানায় পড়িয়াই রহিলাম; এবং এইভাবেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত পিয়ারীর গান এবং মাতালের বাহবা শুনিতে পাইলাম।

তার পরের তিন-চারিদিন প্রায় একভাবেই কাটিয়া গেল। ‘প্রায়’ বলিলাম—কারণ, এক শিকার করা ছাড়া আর সমস্তই একপ্রকার। পিয়ারীর অভিশাপ ফলিল না কি, প্রাণিহত্যার প্রতি আর কাহারো কোন উৎসাহই দেখিলাম না। কেহ তাঁবুর বাহির হইতেই যেন ঢাহে না। অথচ আমাকেও ছাড়িয়া দেয় না। আমার পলাইবার আর যে কোন বিশেষ কারণ ছিল তাহা নয়। কিন্তু এই বাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিত্তশা জনিয়া গেল; সে হাজির হইলেই আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত; উঠিয়া গিয়া স্বন্তি পাইতাম। উঠিতে না পারিলে, অন্ততঃ আর কোনদিকে মুখ ফিরাইয়া, কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিয়া, অন্যমনক্ষ হইবার চেষ্টা করিতাম। অথচ সে প্রতিমুহূর্তেই আমার সহিত চোখাচোখি করিবার সহস্র কৌশল করিত, তাহাও টের পাইতাম। প্রথম দুই-একদিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই পরিহাসের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া সেও একেবারে নির্বাক হইয়া গেল।

সেদিন ছিল শনিবার। আমি আর কোনমতেই থাকিতে পারি না। খাওয়া-দাওয়ার পরেই রওনা হইয়া পড়িব স্থির হওয়ায়—আজ সকাল হইতেই গান-বাজনার বৈঠক বসিয়া গিয়াছিল। শ্রান্ত হইয়া বাইজী গান থামাইয়াছে, হঠাৎ গল্পের সেরা গল্প—ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। নিমিষে যে যেখানে ছিল আগ্রহে বক্তা ঘেরিয়া ধরিল।

প্রথমটা আমি তাচ্ছিল্যভরেই শুনিতেছিলাম। কিন্তু শেষে উদ্গ্ৰীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্ৰবীণ ভদ্ৰলোক। গল্প কেমন করিয়া বলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন,

প্রেতযোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে—যেন আজিকার এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে, এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঙ্গন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন লোকই হন, এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রে মহাশূশানে যাওয়া তাহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার ঘোর রাত্রে এই শূশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়; তাহার কর্তৃস্বর শুনা যায় এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথাবার্তা পর্যন্ত বলা যায়। আমি ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বৃন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে আসুন। আমি নিকটে সরিয়া গেলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না?

না।

কেন করেন না? না করার বিশেষ কোন হেতু আছে?

না।

তবে? এই গ্রামেই এমন দুই-একজন সিদ্ধ সাধক আছেন, যাঁরা চোখে দেখেছেন। তবুও যে আপনারা বিশ্বাস করেন না, মুখের উপর হাসেন, সে শুধু দু'পাতা ইংরিজি পড়ার ফল। বিশেষতঃ বাঙালীরা ত নাস্তিক—ম্লেচ্ছ। কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। দেখিয়া আমি অবাক হইয় গেলাম। বলিলাম, দেখুন এ সম্বন্ধে আমি তর্ক করতে চাইনে। আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমি নাস্তিকই হই, ম্লেচ্ছই হই, ভূত মানিনে। যাঁরা চোখে দেখেছেন বলেন—হয় তাঁরা ঠকেচেন, নাহয় তাঁরা মিথ্যাবাদী—এই আমার ধারণা।

ভদ্রলোক খপ্ক করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আপনি আজ রাত্রে শূশানে যেতে পারেন? আমি হাসিয়া বলিলাম, পারি। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক শূশানেই অনেক রাত্রে গেছি।

বৃন্দ চাটিয়া উঠিয়া বলিলেন, আপ্ সেখি মৎ করো বাবু। বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে স্তুতি করিয়া, এই শূশানের মহা ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত

করিতে লাগিলেন। এ শুশান যে যে-সে স্থান নয়, ইহা মহাশুশান, এখানে সহস্র নরমুণ্ড গণিয়া লইতে পারা যায়, এ শুশানে মহাভৈরবী তাঁর সাঙ্গেপাঞ্জ লইয়া প্রত্যহ রাত্রে নরমুণ্ডের গেওয়া খেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহাদের খল্ খল্ হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিশ্বাসী ইংরাজ, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও হন্দ্ স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—এমনি সব লোমহর্ষণ কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে দিনের বেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পিয়ারী কোন একসময়ে কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছে এবং কথাগুলো যেন সর্বাঙ্গ দিয়া গিলিতেছে।

এইরপে এই মহাশুশানের ইতিহাস যখন শেষ হইল, তখন বত্তা গর্বভরে আমার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেয়া বাবুসাহেব, আপ্ যায়েগা?

যায়েগা বৈকি!

যায়েগা! আচ্ছা, আপ্কা খুশি। প্রাণ যানেসে—

আমি হাসিয়া বলিলাম, না বাবুজী, না। প্রাণ গেলেও তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না, তোমার ভয় নেই। কিন্তু অজানা জায়গায় আমি ত শুধু হাতে যাব না—বন্দুক নিয়ে যাব।

তখন আলোচনাটা একটু অতিমাত্রায় খর হইয়া উঠিল দেখিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। আমি পাখি মারিতে পারি না কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ভূত মারিতে পারি; বাঙালীরা ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুশাস্ত্র মানে না, তাহারা মুরগি খায়; তাহারা মুখে যত বড়াই করুক, কার্যকালে ভাগিয়া যায়; তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদের দাঁতকপাটি লাগে, এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যে-সকল সূক্ষ্ম যুক্তিকর্কের অবতারণা করিলে আমাদের রাজা-রাজড়াদের

ଆନନ୍ଦୋଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାରେ ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷକେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ଯାଏ ନା—ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାରାଓ ଦୁଃଖଥା କହିତେ ପାରେନ, ସେଇ ସବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ।

ଇହାଦେର ଦଲେ ଏକଟିମାତ୍ର ଲୋକ ଛିଲ, ଯେ ସ୍ଵିକାର କରିଯାଇଲି, ସେ ଶିକାର କରିତେ ଜାନେ ନା; ଏବଂ କଥାଟାଓ ସେ ସଚରାଚର ଏକଟୁ କମ କହିତ ଏବଂ ମଦଓ ଏକଟୁ କମ କରିଯା ଥାଇତ । ତାହାର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ । ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ଆସିଯା ଆମାକେ ଧରିଲ—ସଙ୍ଗେ ଯାଇବେ ।

କାରଣ ଇତିପୂର୍ବେ ସେଓ କୋନଦିନ ଭୂତ ଦେଖେ ନାହିଁ । ଅତେବ ଆଜ ଯଦି ଏମନ ସୁବିଧା ଘଟିଯାଇଛେ, ତବେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନା । ବଲିଯା ଖୁବ ହାସିତେ ଲାଗିଲ । ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, ତୁମି କି ଭୂତ ମାନ ନା?

ଏକେବାରେ ନା ।

କେନ ମାନ ନା?

ମାନି ନା, ନେଇ ବ'ଲେ, ଏହି ବଲିଯା ସେ ପ୍ରଚଳିତ ତର୍କ ତୁଲିଯା ବାରଂବାର ଅସ୍ମୀକାର କରିତେ ଲାଗିଲ । ଆମି କିନ୍ତୁ ଅତ ସହଜେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇତେ ସ୍ଵିକାର କରିଲାମ ନା । କାରଣ ବହୁଦିନେର ଅଭିଜ୍ଞତାଯ ଜାନିଯାଇଲାମ, ଏ-ସକଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କେର ବ୍ୟାପାର ନଯ—ସଂକ୍ଷାର । ବୁନ୍ଦି ଦିଯା ଯାହାରା ଏକେବାରେଇ ମାନେ ନା ତାହାରାଓ ଭୟେର ଜାୟଗାୟ ଆସିଯା ପଡ଼ିଲେ ଭୟେ ମୂର୍ଛା ଯାଏ ।

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିନ୍ତୁ ନାହୋଡ଼ିବାନ୍ଦା । ସେ ମାଲକୋଁଚା ମାରିଯା ପାକା ବାଁଶେର ଲାଠି ଘାଡ଼େ ଫେଲିଯା କହିଲ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତବାବୁ, ଆପନାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବନ୍ଦୁକ ନିନ, କିନ୍ତୁ ଆମାର ହାତେ ଲାଠି ଥାକତେ ଭୂତଇ ବଲ ଆର ପ୍ରେତଇ ବଲ, କାଉକେ କାହେ ସେଁଷେ ଦେବ ନା ।

କିନ୍ତୁ ସମୟେ ଲାଠି ହାତେ ଥାକବେ ତ?

ଠିକ ଥାକବେ ବାବୁ, ଆପନି ତଥନ ଦେଖେ ନେବେନ । ଏକ କ୍ରୋଷ ପଥ—ରାତ୍ରି ଏଗାରୋଟାର ମଧ୍ୟେଇ ରଗ୍ନା ହେଲା ଚାଇ ।

ଦେଖିଲାମ, ତାହାର ଆଗ୍ରହ୍ଟା ଯେନ ଏକଟୁ ଅତିରିକ୍ତ ।

যাত্রা করিতে তখনও ঘট্টাখানেক বিলম্ব আছে। আমি তাঁবুর বাহিরে পায়চারি করিয়া এই ব্যাপারটিই মনে মনে আন্দোলন করিয়া দেখিতেছিলাম—জিনিসটা সম্ভবতঃ কি হইতে পারে। এ-সকল বিষয়ে আমি যে লোকের শিষ্য তাহাতে ভূতের ভয়টা আর ছিল না।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে—সেই একটি রাত্রে যখন ইন্দ্র কহিয়াছিল, শ্রীকান্ত মনে মনে রাম নাম কর! ছেলেটি আমার পিছনে বসিয়া আছে—সেই দিনই শুধু ভয়ে চৈতন্য হারাইয়াছিলাম, আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার গল্লটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজে ভূত বিশ্বাস করিত। কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই। আমি নিজেও মনে মনে যত অবিশ্বাসই করি, স্থান এবং কাল-মাহাত্ম্যে গা ছমছম যে না করিত, তাহা নয়। সহসা সম্মুখের এই দুর্ভেদ্য অমাবস্যার অন্ধকারের পানে চাহিয়া আমার আর একটা অমা-রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল, সে দিনটাও এমনি শনিবারই ছিল।

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদ্দিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সৃতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাস ভুগিয়া ভুগিয়া মরেন, তখন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটির ঘরে তিনি একাকিনী বাস করিতেন। সকলের সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা, নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, সূচের কাজ শিখাইয়া, গৃহস্থালির সর্বপ্রকার দুর্নহ কাজকর্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। একান্ত নিঞ্চ শান্তস্মৰ্ভাব এবং সুনির্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালবাসিত না। কিন্তু সেই নিরুদ্দিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকর্ত্তন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন উঁচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে

একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার  
জন্য হাত বাঢ়াইল না।

এখন মনে করিয়া হাসি পায় সত্য; কিন্তু সেদিন অমাবস্যার ঘোর দুর্যোগ  
তুচ্ছ করিয়াও, বোধ করি বা ছুটিয়া পলাইতাম, যদি না এ কথা অসংশয়ে বিশ্বাস  
হইত—কপাট খুলিয়া বাহির হইলেই নিরংদিদির কালো কালো সেপাই-সান্ত্বীর  
ভিড়ের মধ্যে গিয়া পড়িব। অথচ এ-সব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও  
জানিতাম; মুমৰ্ম্ম যে কেবলমাত্র নিদারণ বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছিলেন,  
তাহাও বুবিয়াছিলাম। অথচ—

বাবু?

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, রতন।

কি রে?

বাইজী একবার প্রণাম জানাচ্ছেন।

যেমন বিশ্বিত হইলাম, তেমনি বিরক্ত হইলাম। এতরাত্রে অকস্মাত  
আহ্বান করাটা শুধু যে অত্যন্ত অপমানকর স্পর্ধা বলিয়া মনে হইল, তাহা নয়;  
গত তিন-চারি দিনের উভয়পক্ষের ব্যবহারগুলা স্মরণ করিয়াও এই প্রণাম  
পাঠানোটা যেন সৃষ্টিছাড়া কাণ বলিয়া ঠেকিল। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে কোনরূপ  
উত্তেজনা পাছে প্রকাশ পায়, সেই আশঙ্কায় নিজেকে প্রাণপণে সংবরণ করিয়া  
কহিলাম, আজ আমার সময় নেই রতন, আমাকে বেরুতে হবে; কাল দেখা হবে।

রতন সুশিক্ষিত ভৃত্য; আদব-কায়দায় পাকা। সম্মের সহিত মৃদুস্বরে  
কহিল, বড় দরকার বাবু, এখনি একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে। নইলে  
বাইজীই আসবেন বললেন।—কি সর্বনাশ! এই তাঁবুতে এতরাত্রে, এত লোকের  
সুমুখে! বলিলাম, তুমি বুঝিয়ে বল গে রতন, আজ নয়, কাল সকালেই দেখা  
হবে। আজ আমি কোনমতেই যেতে পারব না।

রতন কহিল, তা হ'লে তিনিই আসবেন। আমি এই পাঁচ বছর দেখে আসচি বাবু, বাইজীর কোনদিন এতটুকু কথার কথনো নড়চড় হয় না। আপনি না গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

এই অন্যায় অসঙ্গত জিদ দেখিয়া পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলিয়া গেল। বলিলাম, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আসচি। তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম বারুণীর কৃপায় জাগ্রত আর কেহ নাই। পুরুষোন্নত গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চাকরদের তাঁবুতে দুই-চারি জন জাগিয়া আছে মাত্র। তাড়াতাড়ি বুট্টা পরিয়া লইয়া একটা কোট গায়ে দিয়া ফেলিলাম। রাইফেল ঠিক করাই ছিল, হাতে লইয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর তাঁবুতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। পিয়ারী সুমুখেই দাঁড়াইয়া ছিল। আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, শুশানে-টশানে তোমার কোনমতেই যাওয়া হবে না—কোন মতেই না।

ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম—কেন?

কেন আবার কি? ভূত-প্রেত কি নেই যে, এই শনিবারের অমাবস্যায় তুমি যাবে শুশানে? প্রাণ নিয়ে কি তা হ'লে আর ফিরে আসতে হবে! বলিয়াই পিয়ারী অকস্মাত ঝর্ঘর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করিব, কি জবাব দিব, ভবিয়াই পাইলাম না। ভবিয়া না পাওয়ার আর আশ্চর্য কি? যাহাকে চিনি না, জানি না, সে যদি উৎকৃষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর রাত্রে ডাকাইয়া আনিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া খামোকা কান্না জুড়িয়া দেয়—হতবুদ্ধি হয় না কে? আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, তুমি কি কোন দিন শান্ত সুবোধ হবে না?

তেমনি একগুঁয়ে হয়ে চিরকালটা কাটাবে? কই, যাও দিকি কেমন করে যাবে, আমিও তা হ'লে সঙ্গে যাবো, বলিয়া সে শালখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইবার উপক্রম করিল।

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, বেশ চল! আমার এই প্রচন্ড বিদ্রূপে জ়ালিয়া উঠিয়া পিয়ারী বলিল, আহা! দেশ-বিদেশে তা হ'লে সুখ্যাতির আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। বাবু শিকারে এসে একটা বাইউলি সঙ্গে করে দুপুর রাত্রে ভূত দেখতে গিয়েছিলেন। বলি, বাড়িতে কি একেবারে আউট হয়ে গেছ নাকি? ঘেঁষা-পিণ্ডি লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই, বলিতে বলিতেই তাহার তীব্র কণ্ঠ ভিজিয়া যেন ভারি হইয়া উঠিল; কহিল, কখনো ত এমন ছিলে না। এত অধঃপথে তুমি যেতে পারো, কেউ ত কোন দিন ভাবেনি। তাহার শেষ কথাটায় অন্য কোন সময়ে আমার বিরক্তির হয়ত অবধি থাকিত না, কিন্তু এখন রাগ হইল না। মনে হইল পিয়ারীকে যেন চিনিয়াছি। কেন যে মনে হইল, তাহা পরে বলিতেছি। কহিলাম, লোকের ভাবাভাবির দাম কত, সে নিজেও ত জান? তুমিই যে এত অধঃপথে যাবে, সেই বা ক'জন ভেবেছিল?

মুহূর্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সহজ হাসির আভা দেখা দিল। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই সে ভীতস্বরে কহিল, আমার তুমি কি জানো? কে আমি, বল ত দেখি?

তুমি পিয়ারী।

সে ত সবাই জানে।

সবাই যা জানে না, তা আমি জানি—শুনলে কি তুমি খুশি হবে? হ'লে ত নিজেই তোমার পরিচয় দিতে। যখন দাওনি তখন আমার মুখ থেকেও কোন কথা পাবে না। এর মধ্যে ভেবো দেখো, আত্মপ্রকাশ করবে কি না। কিন্তু এখন আর সময় নেই—আমি চললুম।

পিয়ারী বিদ্যুদ্গতিতে পথ আগ্লাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যদি যেতে না দিই, জোর করে যেতে পার?

কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন?

পিয়ারী কহিল, দেবই বা কেন? সত্যিকারের ভূত কি নেই, যে তুমি যাবে  
বললেই যেতে দেব? মাইরি, আমি চেঁচিয়ে হাট বাধাব—তা বলে দিচ্ছি, বলিয়াই  
আমার বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি এক-পা পিছাইয়া গেলাম।  
কিছুক্ষণ হইতেই আমার বিরক্তির পরিবর্তে হাসি পাইতেছিল। এবার হাসিয়া  
ফেলিয়া বলিলাম, সত্যিকারের ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত  
আছে জানি। তারা সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কাঁদে, পথ আগলায়—এমন অনেক  
কীর্তি করে, আবার দরকার হ'লে ঘাড় মটকেও খায়। পিয়ারী মলিন হইয়া গেল;  
এবং ক্ষণকালের জন্য বোধ করি বা কথা খুঁজিয়া পাইল না। তারপরে বলিল,  
আমাকে তা হ'লে তুমি চিনেচ বল! কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক কীর্তি  
করে সত্যি, কিন্তু ঘাড় মটকাবার জন্যেই পথ আগলায় না। তাদেরও আপনার-  
পর বোধ আছে। আমি পুনরায় সহাস্যে প্রশংস করিলাম, এ ত তোমার নিজের  
কথা, কিন্তু তুমি কি ভূত?

পিয়ারী কহিল, ভূত বই কি! যারা মরে গিয়েও মরে না, তারাই ভূত; এই  
ত তোমার বলবার কথা। একটুখানি থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিতে লাগিল, এক  
হিসাবে আমি যে মরেছি, তা সত্যি। কিন্তু সত্যি হোক মিথ্যে হোক—নিজের মরণ  
আমি নিজে রটাই নি। মামাকে দিয়ে মা রটিয়েছিলেন। শুনবে সব কথা? তাহার  
মরণের কথা শুনিয়া এতক্ষণে আমার সংশয়ে কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে  
পারিলাম—এই সেই রাজলক্ষ্মী। অনেক দিন পূর্বে মায়ের সহিত সে তীর্থ্যাত্মা  
করিয়াছিল—আর ফিরে নাই। কাশীতে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা  
গামে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাকে কখনো যে আমি ইতিপূর্বে  
দেখিয়াছিলাম—এ কথা আমি মনে করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার একটা  
অভ্যাস আমি এখানে আসিয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া  
অধর চাপিয়া ধরিতেছিল। কখন, কোথায় কাহাকে যেন ঠিক এম্বিনি ধারা করিতে  
অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া কেবলি মনে হইতেছিল; কিন্তু কে সে, কোথায়

দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে দেখিয়া, আমি ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পঞ্জিতের পাঠশালের সর্দার-পোড়ো, সেই সময়ে ইহার দুইপুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়াইয়া দেয়। স্বামী-পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট-নয় বৎসর; সুরলক্ষ্মীর বারো-তেরো। ইহার রঙটা বরাবরই ফর্সা; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত, হাত-পা কাঠির মত, মাথার চুলগুলা তামার শলার মত—কতগুলি তাহা গুণিয়া বলা যাইতে পারিত। আমার মারের ভয়ে এই মেয়েটা বঁইচির বনে ঢুকিয়া প্রত্যহ একছড়া পাকা বঁইচি ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমাকে দিত। সেটা কোনদিন ছোট হইলেই পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাকে প্রাণ ভরিয়া চপেটাঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাকা ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে যাই হোক, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়েই সে এত ক্লেশ স্বীকার করিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ একটুখানি সংশয় হইল। তা সে যাক। তার পরে ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার! ভানীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাং জানা গেল, বিরিপ্তি দন্তের পাচকব্রান্থণ ভঙ্গকুলীনের সন্তান। এই কুলীন-সন্তানকে দত্তমশাই বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিরিপ্তি দন্তের দুয়ারে মামা ধন্বা দিয়া পড়িলেন—ব্রান্থণের জাতিরক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দন্তদের বামুনঠাকুর হাবাগোবা ভালোমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সাংসারিক বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একান্ন টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত সন্তায় হবে না মশায়—বাজারে যাচিয়ে দেখুন।

কিন্তু আমার কানাই সার হ'ল। আমি জবাব দিলাম না দেখিয়া পুনরায় কহিল, আচ্ছা যাও—পেছু ডেকে আর অমঙ্গল করব না। কিন্তু একটা-কিছু হ'লে, এই বিদেশ বিভূঁয়ে রাজ-রাজড়া বন্ধু-বন্ধব কোন কাজেই লাগবে না, তখন আমাকেই ভুগতে হবে। আমাকে চিনতে পারো না, আমার মুখের ওপর ব'লে তুমি পৌরষী করে গেলে, কিন্তু আমার মেয়েমানুষের মন ত? বিপদের সময় আমি ত আর বলতে পারব না—এঁকে চিনিনে; বলিয়া সে একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। আমি যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিলাম। কেমন যেন একটা ক্লেশ বোধ হইল। বলিলাম, বেশ ত বাইজী, সেও ত আমার একটা মন্ত লাভ। আমার কেউ কোথাও নেই—তবু ত জানতে পারব, একজন আছে—যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

পিয়ারী কহিল, সে কি আর তুমি জানো না? একশবার ‘বাইজী’ ব'লে যত অপমানই কর না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না—এ কি আর তুমি মনে মনে বোবো না? কিন্তু ফেলে যেতে পারলেই ভালো হ'তো। তোমাদের একটা শিক্ষা হ'তো। কিন্তু কি বিশ্রী এই মেয়েমানুষ জাতটা, একবার যদি ভালোবেসেচে, ত মরেচে!

আমি বলিলাম, পিয়ারী, ভালো সন্ধ্যাসীতেও ভিক্ষা পায় না, কেন জানো?

পিয়ারী বলিল, জানি। কিন্তু তোমার এ খোঁচায় এত ধার নেই যে, আমাকে বেঁধো! এ আমার ঈশ্বরদত্ত ধন। যখন সংসারের ভালমন্দ জ্ঞান পর্যন্ত হয়নি, তখনকার; আজকের নয়।

আমি নরম হইয়া বলিলাম, বেশ কথা। আশা করি, আমার আজ একটা-কিছু হবে। হলে তোমার ঈশ্বরদত্ত ধনের হাতে-হাতে একটা যাচাই হয়ে যাবে।

পিয়ারী কহিল, দুর্গা! দুর্গা! ছিঃ এমন কথা ব'লো না। ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসো—এ সত্যি আর যাচাই করে কাজ নেই। আমার কি সেই কপাল যে নিজের হাতে নেড়েচেড়ে সেবা ক'রে, দুঃসময়ে তোমাকে সুস্থ, সবল করে তুলব!

তা হলে ত জানতুম, এ জন্মের একটা কাজ করে নিলুম। বলিয়া সে যে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিল, তাহা হারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও টের পাইলাম।

আচ্ছা, ভগবান তোমার এ সাধ হয়ত একদিন পূর্ণ ক'রে দেবেন, বলিয়া আমি আর দেরি না করিয়া, তাঁবুর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তামাশা করিতে গিয়া যে মুখ দিয়া একটা প্রচণ্ড সত্য বাহির হইয়া গেল সে কথা তখন আর কে ভাবিয়াছিল?

তাঁবুর ভিতর হইতে অশ্রুবিকৃত কঢ়ের দুর্গা! দুর্গা! নামের সকাতর ডাক কানে আসিয়া পৌঁছিল! আমি দ্রুতপদে শুশানের পথে প্রস্থান করিলাম।

সমস্ত মনটা পিয়ারীর কথাতেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কখন যে আমবাগানের দীর্ঘ অন্ধকার পথ পার হইয়া গেলাম, কখন নদীর ধারের সরকারী বাঁধের উপর আসিয়া পড়িলাম, জানিতেই পারিলাম না। সমস্ত পথটা শুধু এই একটা কথাই ভাবিতে আসিয়াছি— এ কি বিরাট্ অচিন্তনীয় ব্যাপার এই নারীর মনটা। কবে যে এই পিলেরোগা মেয়েটা তাহার ধামার মত পেট এবং কাঠির মত হাত-পা লইয়া আমাকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল, এবং বাঁইচি ফলের মালা দিয়া তাহার দরিদ্র পূজা নীরবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল, আমি টেরও পাই নাই। যখন টের পাইলাম তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

বিস্ময় সেজন্যও নয়। নভেল নাটকেও বাল্যপ্রণয়ের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু এই বস্তুটি, যাহাকে সে তাহার ঈশ্বরদত্ত ধন বলিয়া সগর্বে প্রচার করিতেও কৃষ্ণিত হইল না, তাহাকে সে এতদিন তাহার এই ঘৃণিত জীবনের শতকোটী মিথ্যা প্রণয়-অভিনয়ের মধ্যে কোনখানে জীবিত রাখিয়াছিল? কোথা হইতে ইহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত? কোন্ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত?

বাপ্ত!

চমকিয়া উঠিলাম। সন্ধুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঘোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাভার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বালুকার আন্তরণের উপর যে-যাহার আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে! মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ, সংখ্যাতীত গ্রহতারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ ঘায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখিটা একবার ‘বাপ’ বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম-মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম। এই দিকেই সেই মহাশৃঙ্খান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমুলগাছগুলা দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছু দূরে আসিতেই তাহাদের কালো কালো ডাল পালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশৃঙ্খানের দ্বারপাল! ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আহ্বাদ করিবার মত নয়। আরো একটু অগ্রসর হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা ‘কুস্তকর্ণের ঘূম’ ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষকালে নিজীব হইয়া যে প্রকারে রহিয়া রহিয়া কাঁদে, ঠিক তেমনি করিয়া শৃঙ্খানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না, এবং পূর্বে শুনে নাই—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক-পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়, শকুন-শিশু অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে—না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই এ কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো কালো ঝুঁড়ির মত শিমুলের

ডালে ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে; এবং তাহাদেরই কোন একটা দুষ্ট ছেলে অমন করিয়া আর্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

গাছের উপরে সে কাঁদিতেই লাগিল; আমি নীচে দিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ মহাশৃঙ্খানের একপাণ্ঠে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালে তিনি যে বলিয়াছিলেন, লক্ষ নরমুণ গণিয়া লওয়া যায়—দেখিলাম, কথাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরকক্ষালে খচিত হইয়া আছে। গেওয়া খেলিবার নরকপাল অসংখ্য পড়িয়া আছে; তবে খেলোয়াড়েরা তখনও আসিয়া জুটিতে পারে নাই।

আমি ছাড়া আর কোন অশৰীরী দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন কি না, এই দুটা নশ্বর চক্ষে আবিঙ্কার করিতে পারিলাম না। তখন ঘোর অমাবস্যা। সুতরাং খেলা শুরু হইবার আর বেশি দেরী নাই আশা করিয়া, একটা বালুর ঢিপির উপর চাপিয়া বসিলাম। বন্দুকটা খুলিয়া, টোটাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া, পুনরায় যথাস্থানে সম্মিলিত করিয়া, কোলের উপর রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। হায় রে টোটা! বিপদের সময় কিন্তু সে কোন সাহায্য করিল না।

পিয়ারীর কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল, যদি অকপটে বিশ্বাসই কর না, তবে কর্মভোগ করিতে যাওয়া কেন? আর যদি বিশ্বাসের জোর না থাকে, তাহা হইলে ভূত-প্রেত থাক বা না থাক, তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। সত্যই ত! এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচরে ত পাপ নাই। আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি—আমার সাহস কত। সকালে যাহারা বলিয়াছিল, ভীরু বাঞ্ছলী কার্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদের কাছে শুধু এই কথাটা সপ্রমাণ করা যে, বাঞ্ছলী বড় বীর।

আমার বহুদিনের দৃঢ়-বিশ্বাস, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না; এবং যদি বা বাঁচে, যে শাশানে তাহার পার্থির দেহটাকে অশেষ প্রকারে নিপীড়িত করা হয়, সেইখানেই ফিরিয়া নিজের মাথাটায় লাঠি মারিয়া মারিয়া গড়াইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, উচিতও নয়—অন্ততঃ আমার পক্ষে ত

নয়। তবে কিনা, মানুষের রূচি ভিন্ন। যদিবা কাহারও হয়, তাহা হইলে এমন একটা চমৎকার রাত্রি-জাগিয়া আমার এতদূরে আসাটা নিষ্ফল হইবে না। অথচ এম্বিনি একটা গুরুতর আশাই আজিকার প্রবীণ ব্যক্তিটি দিয়াছিলেন।

হঠাতে একটা দমকা বাতাস কতকগুলো ধূলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল; এবং সেটা শেষ না হইতেই, আর একটা এবং আর একটা বহিয়া গেল। মনে হইল, এ আবার কি? এতক্ষণ ত বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। যতই কেন না বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু-একটা অজানা গোছের থাকে—এ সংক্ষার হাড়ে-মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড়-মাস আছে ততক্ষণ সেও আছে—তাহাকে স্বীকার করি, আর না করি। সুতরাং এই দমকা বাতাসটা শুধু ধূলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজাগত সেই গোপন সংক্ষারে গিয়াও ঘা দিল। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয়ত জানে না যে মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলাগোছের শব্দ হয়। দেখিতে দেখিতে আশেপাশে, সুমুখে, পিছনে দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াচ্ছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া, অবিশ্রাম হা-হতাশ করিয়া নিশাস ফেলিতেছে; এবং ইঁরেজিতে যাহাকে বলে ‘uncanny feeling’ ঠিক সেই ধরনের একটা অস্পষ্টি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটা-দুই ঝাঁকানি দিয়া গেল। সেই শকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে যেন পিছনে আরও বেশি করিয়া গোঙাইতে লাগিল। বুঝিলাম ভয় পাইয়াছি। বহু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ জানিতাম, এ যে-স্থানে আসিয়াছি, এখানে এই বস্তুটাকে সময়ে চাপিতে না পারিলে মৃত্যু পর্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়।

বস্তুত এইরূপ ভয়ানক জায়গায় ইতিপূর্বে আমি কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিত, সে ইন্দ্ৰ—আমি নয়। অনেকবার তাহার সঙ্গে অনেক ভয়ানক স্থানে গিয়া গিয়া আমারও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে আমি ও তাহার মত এই-সব স্থানে একাকী আসিতে পারি। কিন্তু

সেটা যে কত বড় ভৰ এবং আমি যে শুধু ঝোঁকের উপরেই তাহাকে অনুসরণ করিতে গিয়াছিলাম, এক মুহূর্তেই আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সেই চওড়া বুক কই? আমার সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই রামনামের অভেদ কবচ কই? আমি ত ইন্দ্র নই যে, এই প্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া, চোখ মেলিয়া, প্রেতাভার গেওয়াখেলা দেখিব? মনে হইতে লাগিল, একটা জীবন্ত বাঘ-ভালুক দেখিতে পাইলেও বুবি বাঁচিয়া যাই। হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলিল। তাহা এমনি শীতল যে তুষারকণার মত সেইখানেই জমিয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ নিশ্বাস যে নাকের মস্ত ফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, একফোঁটা রক্তের সংস্তুব পর্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহ্বর। সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অঙ্ককার। স্তব্ধ নিশ্চীথ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আশেপাশে হা-ভৃতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল। কানের উপর তেমনি কল্কনে ঠাণ্ডা নিশ্বাসের বিরাম নাই। এইটাই সর্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।

এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্ত এ কথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই আমার চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য। দেখি, ডান পা-টা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে। থামাইতে গেলাম, থামিল না। সে যেন আমার পা নয়।

ঠিক এমনি সময়ে অনেক দূরে অনেকগুলা গলার সমবেত চিৎকার কানে পৌঁছিল—বাবুজী! বাবুসাব! সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। কাহারা ডাকে? আবার চিৎকার করিল—গুলি ছুঁড়বেন না যেন! শব্দ ক্রমশঃঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—গোটা-দুই ক্ষীণ আলোর রেখাও আড়চোখে চাহিতে চোখে পড়িল। একবার মনে হইল, চিৎকারের মধ্যে যেন রতনের গলার আভাস পাইলাম।

খানিক পরেই টের পাইলাম, সে-ই বটে। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, সে একটা শিমুলের আড়ালে দাঁড়াইয়া, চেঁচাইয়া বলিল, বাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, গুলি-টুলি ছুঁড়বেন না—আমরা রতন। রতন লোকটা যে সত্যিই নাপিত, তাহাতে আর ভুল নাই।

উল্লাসে চেঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না। একটা প্রবাদ আছে, ভৃত-প্রেত যাবার সময় কিছু-একটা ভাঙিয়া দিয়া যায়। যে আমার পিছনে ছিল, সে আমার কষ্টস্বরটা ভাঙিয়া দিয়াই বিদায় হইল।

রতন এবং আরও তিনজন লোক গোটা-দুই লণ্ঠন ও লাঠিসোঁটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছটুলাল—সে তব্লা বাজায়; এবং আর একজন পিয়ারীর দরোয়ান। তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকিদার।

রতন কহিল, চলুন—তিনটে বাজে।

চল, বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে রতন বলিতে লাগিল, বাবু, ধন্য আপনার সাহস। আমরা চারজনে যে কত ভয়ে ভয়ে এসেছি, তা বলতে পারিনে।

এলি কেন?

রতন কহিল, টাকার লোভে। আমরা সবাই এক মাসের মাঝে নগদ পেয়ে গেছি। বলিয়া আমার পাশে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু আপনি চলে এলে গিয়ে দেখি, মা বসে বসে কাঁদচেন। আমাকে বললেন, রতন, কি হবে বাবা; তোরা পিছনে যা। আমি এক-একমাসের মাঝে তোদের বকশিশ দিচ্ছি। আমি বললুম, ছটুলাল আর গণেশকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারি মা; কিন্তু পথ চিনিনে। এমন সময় চৌকিদার হাঁক দিতেই মা বললেন, ওকে ডেকে আন রতন, ও নিশ্চয়ই পথ চেনে। বেরিয়ে গিয়ে ডেকে আনলুম। চৌকিদার ছ' টাকা হাতে পেয়ে, তবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা বাবু, কচি

হেলের কান্না শুনতে পেয়েছেন? বলিয়া রতন শিহরিয়া উঠিয়া, আমার কোটের  
পিছনটা চাপিয়া ধরিল; কহিল, আমাদের গণেশ পাঁড়ে বামুন-মানুষ, তাই আজ  
রক্ষে পাওয়া গেছে, নইলে—

আমি কথা কহিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া কাহারো ভুল ভাঙিবার মত  
মনের অবস্থা আমার ছিল না। আচছন, অভিভূতের মত নিঃশব্দে পথ চলিতে  
লাগিলাম।

কিছুদূর আসার পর রতন প্রশ্ন করিল, আজ কিছু দেখতে পেলেন, বাবু?  
আমি বলিলাম, না।

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে রতন ক্ষুঁক হইয়া কহিল, আমরা যাওয়ায়  
আপনি কি রাগ করেছেন, বাবু? মার কান্না দেখলে কিন্ত—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, না রতন, আমি একটুও রাগ করিনি।

তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া চৌকিদার তাহার কাজে চলিয়া গেল। গণেশ,  
ছটুলাল চাকরদের তাঁবুতে প্রস্থান করিল। রতন কহিল, মা বলেছিলেন যাবার  
সময় একটিবার দেখা দিয়ে যেতে।

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। চোখের উপর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, পিয়ারী  
দীপের সম্মুখে অধীর আগ্রহে, সজলচক্ষে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এবং  
আমার সমস্ত মন্টা উন্মত্ত উর্ধ্বশ্বাসে তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

রতন সবিনয়ে ডাকিল, আসুন।

মুহূর্তকালের জন্য চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়া দেখিলাম,  
সেখানে প্রকৃতিস্ত কেহ নাই! সবাই আকর্ষ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।  
ছি ছি! এই মাতালের দল লইয়া যাইব দেখা করিতে? সে আমি কিছুতেই পারি  
না।

বিলম্ব দেখিয়া রতন বিস্মিত হইয়া কহিল, ওখানে অন্ধকারে দাঁড়ালেন  
কেন বাবু—আসুন—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, না রতন, এখন নয়—আমি চললুম।  
রতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মা কিন্তু পথ চেয়ে বসে আছেন—  
পথ চেয়ে? তা হোক! তাঁকে আমার অসংখ্য নমস্কার দিয়ে বোলো, কাল  
যাবার আগে দেখা হবে—এখন নয়; আমার বড় ঘুম পেয়েছে রতন, আমি চললুম!  
বলিয়া বিস্মিত, ক্ষুঁক রতনকে জবাব দিবার সময়মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে ওদিকের  
তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলাম।

## ନୟ

ମାନୁଷେର ଅନ୍ତର ଜିନିସଟିକେ ଚିନିଆ ଲଇୟା, ତାହାର ବିଚାରେର ଭାର ଅନ୍ତର୍ୟାମୀର ଉପର ନା ଦିଯା ମାନୁଷ ସଖନ ନିଜେଇ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ବଲେ, ଆମି ଏମନ, ଆମି ତେମନ, ଏ କାଜ ଆମାର ଦ୍ୱାରା କଦାଚ ସ୍ଥିତ ନା, ସେ କାଜ ଆମି ମରିଯା ଗେଲେଓ କରିତାମ ନା—ଆମି ଶୁଣିଆ ଆର ଲଜ୍ଜାଯ ବାଁଚି ନା । ଆମାର ଶୁଧୁ ନିଜେର ମନ୍ଟାଇ ନୟ; ପରେର ସସ୍ଵଦେଓ ଦେଖି, ତାହାର ଅହଙ୍କାରେର ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ଏକବାର ସମାଲୋଚକେର ଲେଖାଗୁଲୋ ପଡ଼ିଯା ଦେଖ—ହାସିଆ ଆର ବାଁଚିବେ ନା । କବିକେ ଛାପାଇୟା ତାହାର କାବ୍ୟେର ମାନୁଷଟିକେ ଚିନିଆ ଲଯ । ଜୋର କରିଯା ବଲେ, ଏ ଚରିତ୍ର କୋନ ମତେଇ ଓରପ ହିତେ ପାରେ ନା, ସେ ଚରିତ୍ର କଖନଓ ସେରପ କରିତେ ପାରେ ନା—ଏମନି କତ କଥା । ଲୋକେ ବାହବା ଦିଯା ବଲେ, ବାଃ ରେ ବାଃ! ଏଇ ତ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ । ଏକେଇ ତ ବଲେ ଚରିତ୍ର-ସମାଲୋଚନା! ସତ୍ୟାଇ ତ! ଅମୁକ ସମାଲୋଚକ ବର୍ତମାନ ଥାକିତେ ଛାଇ-ପାଂଶ ଯା-ତା ଲିଖଲେଇ କି ଚଲିବେ? ଏଇ ଦେଖ ବହିଖାନାର ଯତ ଭୁଲ-ଅନ୍ତି ସମନ୍ତ ତମ୍ଭ ତମ୍ଭ କରିଯା ଧରିଯା ଦିଯାଛେ! ତା ଦିକ । ତ୍ରଣ୍ଟି ଆର କିମେ ନା ଥାକେ! କିନ୍ତୁ ତବୁଓ ଯେ ଆମି ନିଜେର ଜୀବନ ଆଲୋଚନା କରିଯା, ଏଇ ସବ ପଡ଼ିଯା ତାଦେର ଲଜ୍ଜାଯ ଆପନାର ମାଥାଟା ତୁଳିତେ ପାରି ନା । ମନେ ମନେ ବଲି, ହା ରେ ପୋଡ଼ା କପାଲ! ମାନୁଷେର ଅନ୍ତର ଜିନିସଟା ଯେ ଅନନ୍ତ, ସେ କି ଶୁଧୁ ଏକଟା ମୁଖେରଇ କଥା! ଦନ୍ତ-ପ୍ରକାଶେର ବେଳାୟ କି ତାହାର କାନାକଡ଼ିର ମୂଳ୍ୟ ନାହିଁ? ତୋମାର କୋଟି-କୋଟି ଜମ୍ମେର କତ ଅସଂଖ୍ୟ କୋଟି ଅଢୁତ ବ୍ୟାପାର ଯେ ଏଇ ଅନନ୍ତେ ମନ୍ଦ ଥାକିତେ ପାରେ, ଏବଂ ହଠାତ୍ ଜାଗରିତ ହଇୟା ତୋମାର ଭୂଯୋଦର୍ଶନ, ତୋମାର ଲେଖାପଡ଼ା, ତୋମାର ମାନୁଷ ବାହାଇ କରିବାର ଜ୍ଞାନଭାଣ୍ଡୁକୁ ଏକମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଗୁଡ଼ା କରିଯା ଦିତେ ପାରେ, ଏ କଥାଟା କି ଏକଟି ବାରଓ ମନେ ପଡ଼େ ନା! ଏଓ କି ମନେ ପଡ଼େ ନା, ଏଟା ସୀମାହିନ ଆତ୍ମାର ଆସନ!

এই ত আমি অন্নদাদিদিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার অম্লান দিব্যমূর্তি ত এখনো ভুলিয়া যাই নাই! দিদি যখন চলিয়া গেলেন, তখন কত গভীর স্তুর রাত্রে চোখের জলে বালিশ ভাসিয়া গিয়াছে; আর মনে মনে বলিয়াছি, দিদি, নিজের জন্য আর ভাবি না, তোমার পরশমানিকস্পর্শে আমার অন্তর-বাহিরের সব লোহা সোনা হইয়া গিয়াছে, কোথাকার কোন জল-হাওয়ার দৌরাত্ম্যেই আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভয় নাই। কিন্তু কোথায় তুমি গেলে দিদি! দিদি, আর কাহাকেও এ-সৌভাগ্যের ভাগ দিতে পারিলাম না। আর কেহ তোমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে, যে যেখানে আছে, সবাই যে সচরিত্র সাধু হইয়া যাইত তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইতে পারিত? তখন এ লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া ছেলেমানুষি কল্পনার বিরাম ছিল না। কখনো ভাবিতাম, দেবী-চৌধুরাণীর মত কোথাও যদি সাত ঘড়া মোহর পাই ত অন্নদাদিদিকে একটা মন্ত্র সিংহাসনে বসাই, বন কাটিয়া, জায়গা করিয়া, দেশের লোক ডাকিয়া তাঁর সিংহাসনের চতুর্দিকে জড় করি। কখনো ভাবিতাম, একটা প্রকাণ্ড বজরায় চাপাইয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাকে দেশ-বিদেশ লইয়া বেড়াই। এমনি কত কি যে উদ্গট আকাশকুসুমের মালা গাঁথা—সে-সব মনে করিলেও এখন হাসি পায়; চোখের জলও বড় কম পড়ে না।

তখন মনের মধ্যে এ বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ়ও ছিল, আমাকে ভুলাইতে পারে, এমন নারী ত ইহলোকে নাই-ই, পরলোকে আছে কিনা, তাহাও যেন ভাবিতে পারিতাম না।

মনে করিতাম, জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এমনি মৃদু কথা, ঠাঁঁটে এমনি মধুর হাসি, ললাটে এমনি অপরূপ আভা, চোখে এমনি সজল করুণ চাহনি দেখি, তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এমনি সতী, এমনি সাধ্বী হয়। প্রতি পদক্ষেপে তাহারও যেন এমনি অনিবর্চনীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে,

এম্বিনি করিয়া সেও যেন সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত ধর্মাধর্ম ত্যাগ করিয়াই গ্রহণ করিতে পারে।

সেই ত আমি! তবুও আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই কাহার মুখের কথা, কাহার ঠোঁটের হাসি, কাহার চোখের জল মনে পড়িয়া বুকের একান্তে একটুখানি ব্যথা বাজিল? আমার সন্ন্যাসিনী দিদির সঙ্গে কোথাও কোন অংশে কি তাহার বিন্দু-পরিমাণও সাদৃশ্য ছিল? অথচ, এমনিই বটে! ছয়টা দিন আগে, আমার অন্তর্যামী আসিয়াও যদি এ কথা বলিয়া যাইতেন, আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতাম, অন্তর্যামি! তোমার এই শুভকামনার জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু তুমি তোমার কাজে যাও, আমার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যিকতা নাই। আমার বুকের কষ্টিপাথরে পাকা সোনার কষ ধরানো আছে, সেখানে পিতলের দোকান খুলিলে খরিদ্দার জুটিবে না।

কিন্তু তবু ত খরিদ্দার জুটিল। আমার অন্তরের মধ্যে যেখানে অনন্দাদিদির আশীর্বাদে পাকা সোনার ছড়াছড়ি তার মধ্যেও যে এক দুর্ভাগ্য পিতলের লোভ সামলাইতে পারিল না, কিনিয়া বসিল—এ কি কম আশ্চর্যের কথা!

আমি বেশ বুঝিতেছি, যাঁরা খুব কড়া সমৰ্বদ্ধার তাঁরা আমার আত্মকথার এইখানে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিবেন, বাপু, এত ফেনিয়ে কি বলতে চাও তুমি? বেশ স্পষ্ট ক'রেই বল না, সেটা কি? আজ ঘুম ভাঙ্গিয়াই পিয়ারীর মুখ মনে করিয়া তোমার ব্যথা বাজিয়াছিল—এই ত? যাহাকে মনের দোরগোড়া হইতে বাঁটাইয়া বিদায় করিতেছিলে, আজ তাহাকেই ডাকিয়া ঘরে বসাইতে চাহিতেছ— এই ত? তা বেশ! এ যদি সত্য হয়, তবে এর মধ্যে তোমার অনন্দাদিদির নামটা আর তুলিয়ো না। কারণ তুমি যত কথা যেমন করিয়াই সাজাইয়া বল না কেন, আমরা মানবচরিত্র বুঝি। জোর করিয়া বলিতে পারি, সে সতী-সাধ্বীর আদর্শ তোমার মনের মধ্যে স্থায়ী হয় নাই, তাঁহাকে তোমার সমস্ত মন দিয়া কম্ভিন্-

কালেও গ্রহণ করিতে পার নাই। পারিলে এই ঝুটায় তোমাকে ভুলাইতে পারিত না।

তা বটে। তর্ক আর নয়। আমি টের পাইয়াছি মানুষ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই নিজের সমস্ত পরিচয় পায় না। সে যা নয়, তাই বলিয়া নিজেকে জানিয়া রাখে এবং বাহিরে প্রচার করিয়া শুধু বিড়স্বনার সৃষ্টি করে; এবং যে দণ্ড ইহাতে দিতে হয়, তা নিতান্ত লঘুও নয়। কিন্তু থাক। আমি ত নিজে জানি, আমি কোন্ নারীর আদর্শে এতদিন কি কথা ‘প্রিচ’ করিয়া বেড়াইয়াছি। সুতরাং আজ আমার এ দুর্গতির ইতিহাসে লোকে যখন বলিবে, শ্রীকান্তটা হম্বগ, হিপোক্রিট তখন আমাকে চুপ করিয়াই শুনিতে হইবে। অথচ হিপোক্রিট আমি ছিলাম না; হম্বগ করা আমার স্বভাব নয়। আমার অপরাধ শুধু এই যে, আমার মধ্যে যে দুর্বলতা আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে সময় পাইয়া মাথারাড়া দিয়া উঠিয়া, তাহারই মত আর একটা দুর্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া, একেবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিস্ময়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; কিন্তু যাও বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাও জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার ঠাঁই নাই; কিন্তু পুলক যে হৃদয়ের কানায় কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে!

লোকসান যা হয় তা হোক, হৃদয় যে ইহাকে ত্যাগ করিতে চাহে না।

বাবুসাব! রাজভূত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শয্যার উপর সোজা উঠিয়া বসিলাম। সে সসম্মানে নিবেদন করিল, কুমারসাহেব এবং বহুলোক আমার গতরাত্রির কাহিনী শুনিবার জন্য উদ্গীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। প্রশ্ন করিলাম, তাঁরা জানিলেন কিরূপে? বেহারা কহিল, তাঁবুর দরোয়ান জানাইয়াছে যে, আমি রাত্রিশেষে ফিরিয়া আসিয়াছি।

হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বড় তাঁবুতে প্রবেশ করিবামাত্রই সকলে হৈতে করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। একসঙ্গে এক লক্ষ প্রশ্ন হইয়া গেল।

দেখিলাম, কালকের সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিও আছেন এবং একপাশে পিয়ারী তাহার  
দলবল লইয়া নীরবে বসিয়া আছে। প্রতিদিনের মত আজ আর তাহার সহিত  
চোখাচোখি হইল না। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া  
বসিয়া ছিল।

উচ্ছ্বসিত প্রশ়িতরঙ্গ শান্ত হইয়া আসিলে জবাব দিতে শুরু করিলাম।  
কুমারজী কহিলেন, ধন্য সাহস তোমার শ্রীকান্ত! কত রাত্রে সেখানে পৌঁছুলে?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

প্রবীণ ব্যক্তিটি কহিলেন, ঘোর অমাবস্যা। সাড়ে-এগারোটার পর  
অমাবস্যা পড়িয়াছিল।

চারিপাশ হইতেই বিশ্বয়সূচক ধ্বনি উথিত হইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে  
কুমারজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর? কি দেখলে?

আমি বলিলাম, বিষ্টর হাড়গোড় আর মড়ার মাথা।

কুমারজী বলিলেন, উঃ, কি ভয়ঙ্কর সাহস! শাশানের ভেতরে তুকলে, না  
বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে?

আমি বলিলাম, ভেতরে তুকে একটা বালির টিপিতে গিয়ে বসলুম।

তারপর, তারপর? বসে কি দেখলে?

ধু-ধু করছে বালির চর।

আর?

কসাড় ঝোপ, আর শিমুলগাছ।

আর?

নদীর জল।

কুমারজী অধীর হইয়া কহিলেন, এ-সব ত জানি হে! বলি, সে-সব কিছু—  
আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আর গোটা-দুই বাদুড় মাথার উপর  
দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছিলুম।

প্রবীণ ব্যক্তিটি তখন নিজে অগ্রসর হইয়া জিজাসা করিলেন, আউর কুছ্‌  
নেহি দেখা?

আমি কহিলাম, না। উত্তর শুনিয়া এক-তাঁবু লোক সকলেই যেন নিরাশ  
হইয়া পড়িল। প্রবীণ লোকটি তখন হঠাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ্যাসা  
কভি হো নহি সক্তা। আপ্‌ গয়া নহি। তাঁহার রাগ দেখিয়া আমি শুধু হাসিলাম।  
কারণ, রাগ হইবারই কথা, কুমারজী আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে  
কহিলেন, তোমার দিবি শ্রীকান্ত, কি দেখলে সত্য বল।

সত্যিই বলচি, কিছু দেখিনি।

কতক্ষণ ছিলে সেখানে?

ঘণ্টা-তিনেক।

আচ্ছা, না দেখেচ, কিছু শুনতেও কি পাওনি?

তা পেয়েছি।

এক মুহূর্তেই সকলের মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কি শুনিয়াছি,  
শুনিবার জন্য তাহারা আরও একটু ঘেঁষিয়া আসিল। আমি তখন বলিতে লাগিলাম,  
কেমন করিয়া পথের উপরেই একটা রাত্রিচর পাথি বাপ্‌ বলিয়া উড়িয়া গেল;  
কেমন করিয়া শিশুকষ্টে শকুনশিশু শিমুলগাছের উপর গোঁওইয়া-গোঁওইয়া  
কাঁদিতে লাগিল, কেমন করিয়া হঠাতে ঝড় উঠিল এবং মড়ার মাথাগুলা দীর্ঘশ্বাস  
ফেলিতে লাগিল এবং সকলের শেষে কে যেন আমার পিছনে দাঁড়াইয়া অবিশ্রাম  
তুষার শীতল নিশ্বাস আমার ডান কানের উপর ফেলিতে লাগিল।

আমার বলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারো মুখ দিয়া  
একটা কথা বাহির হইল না। সমস্ত তাঁবুটা স্তুতি হইয়া রহিল। অবশেষে সেই  
প্রবীণ ব্যক্তিটি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার কাঁধের উপর একটা  
হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, বাবুজী, আপনি যথার্থ ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়াই  
কাল প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর কেহ হইলে পারিত না। কিন্তু

আজ হইতে এই বুড়ার শপথ রহিল বাবুজী, আর কখনো একবার দুঃসাহস করিবেন না। আপনার পিতামাতার চরণে আমার কোটি-কোটি প্রণাম—এ শুধু তাঁদেরই পুণ্যে আপনি বাঁচিয়াছেন। এই বলিয়া সে ঘোঁকের মাথায় খপ্প করিয়া আমার পায়েতেই হাত দিয়া ফেলিল।

আগে বলিয়াছি, এই লোকটি কথা কহিতে জানে। এইবার সে কথা শুরু করিল। চোখের তারা, ভুরু কখনো সঙ্কুচিত, কখনো প্রসারিত, কখনো নির্বাপিত, কখনো প্রজ্ঞলিত করিয়া, সে শকুনির কান্না হইতে আরম্ভ করিয়া কানের উপর নিশ্বাস ফেলার এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিল যে, দিনের বেলা এতগুলো লোকের মধ্যে বসিয়াও আমার পর্যন্ত মাথার চুল কাঁটা-দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। কাল সকালের মত আজও কখন যে পিয়ারী নিঃশব্দে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ একটা নিশ্বাসের শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, সে আমার ঠিক পিঠের কাছে বসিয়া নির্নিমেষ চোখে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। এবং তাহার নিজের দুটি নিঞ্চোজ্জ্বল গণ্ডের উপর ঝারা-অশ্বর ধারা দুটি শুকাইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। কখন কি জন্য যে চোখের জল গড়াইয়াছিল, এ বোধ করি সে টের পায় নাই; পাইলে মুছিয়া ফেলিত। কিন্তু সেই অশ্বকলুষিত তদগত মুখখানি পলকের দৃষ্টিপাতেই আমার বুকের মধ্যে আগুনের রেখায় আঁকিয়া গেল। গল্প শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কুমারজীকে একটা সেলাম করিয়া, অনুমতি লইয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আজ সকালেই আমার বিদায় লইবার কথা ছিল কিন্তু শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া, কুমারজীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া ও-বেলায় যাওয়াই স্থির করিয়া নিজেদের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিনের মধ্যে আজ এই প্রথম পিয়ারীর আচরণে ভাবাত্তর লক্ষ্য করিলাম। এতদিন সে পরিহাস করিয়াছে, বিদ্রপ করিয়াছে, কলহের আভাস পর্যন্ত তাহার দুই চোখের দৃষ্টিতে কতদিন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, অনুভব করিয়াছি; কিন্তু একবার উদাসীন্য কখনও দেখি নাই, অথচ

ব্যথার পরিবর্তে খুশিই হইলাম! কেন তাহা জানি! যদিচ যুবতী নারীর মনের গতিবিধি লইয়া মাথা ঘামানো আমার পেশা নহে, ইতিপূর্বে এ কাজ কোনদিন করিও নাই, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বহু জনমনের যে অখণ্ড ধারাবাহিকতা লুকাইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় রমণী-হৃদয়ের নিগৃঢ় তাৎপর্য ধরা পড়িয়া গেল। সে ইহাকে তাচ্ছিল্য মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং প্রণয়-অভিমান জানিয়া পুলকিত হইল। বোধ করি, ইহারই গোপন ইশারায় আমার শ্মশান-অভিযানের এতখানি ইতিহাসের মধ্যে শুধু এই কথাটার উল্লেখ পর্যন্ত করিলাম না যে, পিয়ারী কাল রাত্রে আমাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্মশানে লোক পাঠাইয়াছিল; এবং সে নিজেও গল্প-শেষে তেমনি নীরবেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাই অভিমান! কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিয়া বলি নাই, কি ঘটিয়াছিল। যে কথা সকলের আগে একলা বসিয়া তাহার শুনিবার অধিকার ছিল, তাহাই আজ সে সকলের পিছনে বসিয়া যেন দৈবাং শুনিতে পাইয়াছে।

কিন্তু অভিমান যে এত মধুর, জীবনে এই স্বাদ আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া শিশুর মত তাহাকে নির্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-চাখিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আজ দুপুরবেলাটা আমার ঘুমাইয়া পড়িবারই কথা; বিছানায় পড়িয়া মাঝে মাঝে তন্দ্রাও আসিতে লাগিল; কিন্তু রতনের আসার আশাটা ক্রমাগত নাড়া দিয়া দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া বেলা গড়াইয়া গেল, কিন্তু রতন আসিল না। সে যে আসিবেই, এ বিশ্বাস আমার মনে এত দৃঢ় ছিল যে, বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলাম সূর্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয় মনে হইল আমার কোন্ এক তন্দ্রার ফাঁকে রতন ঘরে তুকিয়া আমাকে নির্দিত মনে করিয়া ফিরিয়া গেছে। মূর্খ! একবার ডাকিতে কি হইয়াছিল! দ্বিপ্রহরের নির্জন অবসর নির্বর্থক বহিয়া গেল মনে করিয়াও ক্ষুঁজ হইয়া উঠিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার পর সে যে আবার আসিবে—একটা কিছু অনুরোধ—না হয় একছত্র

লেখা—যা হোক একটা, গোপনে হাতে দিয়া যাইবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু এই সময়টুকু কাটাই কি করিয়া? সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর ঝকঝক করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিস্তৃত জমিদারের মন্ত কীর্তি! দীঘিটা প্রায় আধ ক্রোশ দীর্ঘ। উত্তরদিকটা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না। কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটা যে কতদিনের এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরানো ভাঙা ঘাট ছিল, তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এক সময়ে ইহারই চতুর্দিক ঘিরিয়া বর্ধিষ্যুৎ গ্রাম ছিল; কবে নাকি ওলাউঠায় মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান। অন্তগামী সূর্যের তির্যক রশ্মিচ্ছটা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তারপরে ক্রমশঃ সূর্য ডুবিয়া দীঘির কালো জল আরো কালো হইয়া উঠিল, অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত শৃগাল ভয়ে ভয়ে জলপান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে, যে সময়টুকু কাটাইতে আসিয়াছিলাম তাহা কাটিয়া গিয়াছে—সমস্ত অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না—এই ভাঙা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়াছি, সেইখানে পা দিয়া কত লোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহারা স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথাকার কোন জলাশয়ে এই-সমস্ত নিত্যকর্ম সমাধা করে? এই গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এমনি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শান্তি দূর করিত। তারপরে অক্ষয়াৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারীরূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তখন কত মুমুর্ষ হয়ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া এই

ঘাটের উপরেই শেষ নিশ্চাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। হয়ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না তাহাই যে নাই এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? আজ সকালেই সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি বলিয়াছিলেন, বাবুজী, মৃত্যুর পরে যে কিছুই থাকে না, অসহায় প্রেতাত্মারা যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ ক্ষুধা-তৃষ্ণা লইয়া বিচরণ করে না, তাহা কদাচ মনে করিয়ো না।

এই বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের গন্ন, তাল-বেতাল সিদ্ধির গন্ন, আর কত তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন যে, সময় এবং সুযোগ হইলে তাহারা যে দেখা দিতে, কথা কহিতে পারে না বা করে না, তাহাও ভবিয়ো না, তোমাকে আর কখনো সে স্থানে যাইতে বলি না, কিন্তু যাহারা এ কাজ পারে তাহাদের সমস্ত দুঃখ যে কোনদিন সার্থক হয় না, এ কথা স্বপ্নেও অবিশ্বাস করিয়ো না!

তখন সকালবেলার আলোর মধ্যে যে কথাগুলো শুধু নির্থক হাসির উপাদান আনিয়া দিয়াছিল এখন এই কথাগুলাই এই নির্জন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আর একপ্রকার চেহারা লইয়া দেখা দিল। মনে হইতে লাগিল, জগতের প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে, ত সে মরণ। এই জীবনব্যাপী ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের অবস্থাগুলা যেন আতসবাজির বিচিত্র সাজ-সরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন্ বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর আছে কি? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম শুধু অন্ধকার, কেহ কোথাও নাই। একটা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া নিজের মনে হাসিয়া বলিলাম, না, আর বসে থাকা

নয়। কাল ডান কানের উপর নিশাস ফেলে গেছে, আজ এসে যদি বাঁ কানের উপর শুরু করে দেয় ত সে বড় সোজা হবে না।

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি? চলিয়াছি ত চলিয়াছি—এই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ আর শেষ হয় না। এতগুলা তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ হইতেই সম্মুখে একটা বাঁশবাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, হঠাত মনে হইল, কৈ এটা ত আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই। দিক্ ভুল করিয়া ত আর-একদিকে চলি নাই? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম, সেটা বাঁশবাড় নয়, গোটা-কয়েক তেঁতুলগাছ জড়াজড়ি করিয়া দিগন্ত আবৃত করিয়া অন্ধকার জমাট বাঁধাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নীচে দিয়া পথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জায়গাটা এমনি অন্ধকার যে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুরুগুরু করিয়া উঠিল—এ যাইতেছি কোথায়? চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে সেই তেঁতুলতলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায়, ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সুমুখে ওই উঁচু জায়গাটা কি? নদীর ধারে সরকারী বাঁধ নয়ত? বাঁধই ত বটে! পা-দুটা যেন ভাসিয়া আসিতে লাগিল; তবুও টানিয়া টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভবিয়াছিলাম, ঠিক তাই! ঠিক নীচেই সেই মহাশূশান। আবার কাহার পদশব্দ সুমুখ দিয়াই নীচে শূশানে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়া টলিয়া সেই ধূলা-বালুর উপরেই মুর্ছিতের মত ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশূশান হইতে আর এক মহাশূশানে পথ দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভঙ্গা ঘাটের উপর গা-বাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

## দশ

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার জিদটা মানুষের যে বয়সে থাকে, সে বয়স আমার পার হইয়া গেছে। সুতরাং কেমন করিয়াই যে এই সূচিতে অন্ধকার নিশ্চীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙাঘাট হইতে এই শুশানের উপকণ্ঠে অসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সেই পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এইমাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল, এ-সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। এ রহস্য আজও আমার কাছে তেমনি অঁধারে আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনি স্বীকার করাও এ স্বীকারোভিত্তির প্রচলন তাৎপর্য নয়। কারণ নিজের চোখেই ত দেখিয়াছি—আমাদের গ্রামেই একটা বৃক্ষ পাগল ছিল; সে দিনের বেলা বাড়ি বাড়ি ভাত চাহিয়া খাইত, আর রাত্রিতে একটা ছোট মইয়ের উপর কেঁচার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া, সেটা সুমুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া পথের ধারের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। সে চেহারা দেখিয়া অন্ধকারে কত লোকের যে দাঁতকপাটি লাগিয়াছে, তাহার অবধি নাই। কোন স্বার্থ নাই, অথচ এই ছিল তাহার অন্ধকার রাত্রির কাণ্ড। নির্থক মানুষকে ভয় দেখাইবার আরও কত প্রকারের অড্ডুত ফন্দি যে তাহার ছিল, তাহার সীমা নাই। শুকনো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন দিত; মুখে কালিবুলি মাখিয়া বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বহুক্লেশে খড়া বাহিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিত; গভীর রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া খোনা গলায় চাষাদের নাম ধরিয়া ডাকিত। অথচ কেহ কোন দিন তাহাকে ধরিতে পারে নাই; এবং দিনের বেলায় তাহার চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া ঘূণাগ্রেও তাহাকে সংশয় করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

আর এ শুধু আমাদের গ্রামেই নয়—আট-দশখানা গ্রামের মধ্যেই সে এই কর্ম করিয়া বেড়াইত। মরিবার সময় নিজের বজ্ঞাতি সে নিজে স্থীকার করিয়া যায়; এবং ভূতের দৌরাত্যও তখন হইতে শেষ হয়। এ ক্ষেত্রেও হয়ত তেমনি কিছু ছিল, হয়ত ছিল না। কিন্তু যাক গো!

বলিতেছিলাম যে সেই ধূলা-বালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দুটি লয় পদধ্বনি শুশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—চিঃ ছিঃ, ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য! আয় আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়! এমন অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একপাত্রে বসিস্ না—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্। কথাগুলো কানে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু তবুও যে চেতনা রহিল, তাহার কারণ—চেতন্যকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এম্বনি একরকম করিয়া বজায় থাকে; একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু-চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন এক তন্দ্রার চাহনি। সে ঘুমানও নয়, জাগাও নয়। তাহাতে নিদ্রিতের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদ্যমও আসে না। এই এক রকম।

তথাপি এ কথাটা ভুলি নাই যে অনেক রাত্রি হইয়াছে, আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে; এবং সে জন্য একবার অন্ততঃ চেষ্টা করিতাম কিন্তু মনে হইল সব বৃথা।

এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার কল্পনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যে পথে যেমন

করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলকধাঁধার মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সাবেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে!

সুতরাং চথল হইয়া ছটফট করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোনপ্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া যখন স্থির হইয়া বসিলাম, তখন অক্ষুণ্ণ যে জিনিসটি চোখে পড়িয়া গেল, তাহার কথা আমি কোনদিন বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি জাতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিতচক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্চাস রূপ্ত করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তুক হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্তবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার;

সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো. গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুষ্টর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দু-চক্ষু ভরিয়া যে-রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম! কখনও এ-সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ

মহাশুশ্রান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরূপায় নিঃসঙ্গ একাকিঞ্চকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কৃৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এম্বিনি অফুরন্ট, সুন্দর রূপে আমার দু-চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে, হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্বদুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাঁহার ওই নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তেবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে, মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?

নামিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়া ছিলাম, তখন ছঁশ ছিল না। ছঁশ হইলে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্দপ করিয়া জ্বলিতেছে। একটা চাপা কথাবার্তার কোলাহল কানে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমুল গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহাদের দুই-চারিটা লঞ্চনের আলোকও আশেপাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। পুনর্বার বাঁধের উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দুইখানা গরুর গাড়ির অগ্রপশ্চাত জন-কয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুবিলাম কাহারা এই পথে স্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক। কারণ আগন্তকের দল যত বুদ্ধিমান এবং সাহসীই হোক, হঠাৎ এই

অন্ধকার রাত্রিতে এরপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর-কিছু না করুক, একটা বিষম হৈ-হৈ রৈ-রৈ চিৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্বস্থানে দাঁড়াইলাম, এবং অন্তিকাল পরেই ছই-দেওয়া দুইখানি গো-শকট পাঁচ-ছয়জনের প্রহরায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার মনে হইল, ইহাদের অগ্রগামী লোক-দুটা আমার দিকে চাহিয়াই ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অতি মনুকগঠে কি যেন বলাবলি করিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইয়া গেল; এবং অন্তিকাল মধ্যেই সমস্ত দলবল বাঁধের একটা ঝাঁকড়া গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি আর বেশি বাকি নাই অনুভব করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে সু-উচ্চ কঠের ডাক কানে গেল, শ্রীকান্তবাবু—সাড়া দিলাম, কে রে, রতন?

আজ্ঞে, হাঁ বাবু, আমি। একটু এগিয়ে আসুন।

দ্রুতপদে বাঁধের উপরে উঠিয়া ডাকিলাম, রতন, তোরা কি বাড়ি যাচ্ছিস?

রতন উত্তর দিল, হাঁ বাবু, বাড়ি যাচ্ছি—মা গাড়িতে আছেন।

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পর্দার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দরোয়ানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। গাড়িতে উঠে এসো, কথা আছে।

আমি সন্ধিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কথা?

উঠে এসো বলচি!

না, তা পারব না, সময় নেই, ভোরের আগেই আমাকে তাঁবুতে পৌঁছুতে হবে। পিয়ারী হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া তীব্র জিদের স্বরে বলিল, চাকর-বাকরের সামনে আর ঢলাটলি কোরো না—তোমার পায়ে পড়ি একবার উঠে এসো—

তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কতকটা যেন-হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম; পিয়ারী গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ দিয়া কহিল, আজ আবার এখানে তুমি কেন এলে?

আমি সত্য কথাই বলিলাম। কহিলাম, জানি না।

পিয়ারী এখনও আমার হাত ছাড়ে নাই। বলিল, জান না? আচ্ছা বেশ। কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন?

বলিলাম, এখানে আসার কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু লুকিয়ে আসিনি।  
মিথ্যে কথা।

না।

তার মানে?

মানে যদি খুলে বলি, বিশ্বাস করবে? আমি লুকিয়েও আসিনি, আসবার ইচ্ছেও ছিল না।

পিয়ারী বিজ্ঞপ্তের স্বরে কহিল, তা হ'লে তাঁবু থেকে তোমাকে উড়িয়ে এনেচে—বোধ করি বলতে চাও?

না, তা বলতে চাইনে। উড়িয়ে কেউ আনেনি; নিজের পায়ে হেঁটে এসেছি সত্য। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।

পিয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, রাজলক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি না জানিনে, কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য। বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করিলাম।

শুনিতে শুনিতে আমার হাত-ধরা তাহার হাতখানা বারংবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না। পর্দা তোলা ছিল, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম আকাশ ফর্সা হইয়া গেছে। বলিলাম, এইবার আমি যাই।

পিয়ারী স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, না।

না কি-রকম? এমনভাবে চলে যাবার অর্থ কি হবে জান?

জানি—সব জানি। কিন্তু এরা ত তোমার অভিভাবক নয় যে, মানের দায়ে  
প্রাণ দিতে হবে? বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পা ধরিয়া ফেলিয়া  
রংধন্বরে বলিয়া উঠিল, কান্তদা, কিন্তু সেখানে ফিরে গেলে আর তুমি বাঁচবে না।  
তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু সেখানেও আর ফিরে যেতে দেব না।  
তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি, তুমি বাড়ি চলে যাও—কিংবা যেখানে খুশি যাও,  
কিন্তু ওখানে আর একদণ্ডও না।

আমি বলিলাম, আমার কাপড়-চোপড় রয়েছে যে।

পিয়ারী কহিল, থাক পড়ে। তাদের ইচ্ছা হয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে,  
নাহয় থাক গে। তার দাম বেশি নয়।

আমি বলিলাম, তার দাম বেশি নয় সত্য; কিন্তু যে মিথ্যা কৃৎসার রটনা  
হবে, তার দাম ত কম নয়!

পিয়ারী আমার পা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়ি এই  
সময় মোড় ফিরিতেই পিছনটা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে হইল,  
সম্মুখের ওই পূর্ব-আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগৃত  
সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরাট অম্বিপিণ্ড অন্ধকার ভেদ  
করিয়া আসিতেছে—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। কহিলাম, চুপ করে রইলে  
যে?

পিয়ারী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কি জানো কান্তদা, যে কলম  
দিয়ে সারা-জীবন শুধু জালখত তৈরি করেচি, সেই কলমটা দিয়েই আজ আর  
দানপত্র লিখতে হাত সরচে না। যাবে? আচ্ছা যাও! কিন্তু কথা দাও—আজ বেলা  
বারোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে?

আচ্ছা।

কারো কোন অনুরোধেই আজ রাত্রি ওখানে কাটাবে না, বল?

না।

পিয়ারী হাতের আঙ্গটি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবন্ধ হইয়া প্রণাম করিল; এবং পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আঙ্গটিটা আমার পকেটে ফেলিয়া দিল। বলিল, তবে যাও—বোধ করি ত্রোশ-দেড়েক পথ তোমাকে বেশি হাঁটতে হবে।

গো-যান হইতে অবতরণ করিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।

আমি স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলাম। একটিবারও পিছনে চাহিয়া দেখিলাম না, তখনও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে কিংবা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত অনুভব করিতে পারিলাম, দুটি চক্ষের সজল-করূণ দৃষ্টি আমার পিঠের উপর বারংবার আচাড় খাইয়া পড়িতেছে।

আড়ায় পৌঁছাইতে প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। পথের ধারে পিয়ারীর ভাঙা-তাঁবুর বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত জিনিসগুলা চোখে পড়িবামাত্র একটি নিষ্ফল ক্ষেত্র বুকের মধ্যে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে তাঁবুর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বড় ভোরেই বেড়াতে বার হ'য়েছিলেন?

আমি হাঁ-না কোন কথাই না বলিয়াই শয্যায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

## এগার

পিয়ারীর কাছে যে সত্য করিয়াছিলাম, তাহা যে রক্ষাও করিয়াছিলাম, বাটী ফিরিয়া এই সংবাদ জানাইয়া তাহাকে চিঠি দিলাম। অবিলম্বে জবাব আসিল। আমি একটা বিষয় বারবার লক্ষ্য করিয়াছিলাম—কোন দিন পিয়ারী আমাকে তাহার পাটনার বাটীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি ত করে নাই, সামান্য একটা মুখের নিম্নলিখিত পর্যন্ত জানায় নাই। এই পত্রের মধ্যেও তাহার লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। শুধু নীচের দিকে একটা ‘নিবেদন’ ছিল, যাহা আমি আজও ভুলি নাই। সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে তাহাকে বিস্মৃত না হই—এই প্রার্থনা।

দিন কাটিতে লাগিল। পিয়ারীর স্মৃতি ঝাপসা হইয়া প্রায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়িতে লাগিল—এবার শিকার হইতে ফিরিয়া পর্যন্ত আমার মন যেন কেমন বিমনা হইয়া গেছে; কেমন যেন একটা অভাবের বেদনা চাপা সর্দির মত দেহের রঞ্জে রঞ্জে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে। বিছানায় শুইতে গেলেই তাহা খচখচ করিয়া বাজে।

এটা মনে পড়ে, সে দিনটা হোলির রাত্রি। মাথা হইতে তখনও আবিরের গুঁড়া সাবান দিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলা হয় নাই। ক্লান্ত বিবশ দেহে শয়ার উপর পড়িয়া ছিলাম। পাশের জানালাটা খোলা ছিল; তাই দিয়া সুমুখের অশ্঵থ গাছের ফাঁক দিয়া আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া ছিলাম। এতটাই মনে পড়ে কিন্তু কেন যে দোর খুলিয়া সোজা স্টেশনে চলিয়া গেলাম এবং পাটনার টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম—তাহা মনে পড়ে না। রাত্রিটা গেল; কিন্তু দিনের বেলা যখন শুনিলাম সেটা ‘বাড়’ স্টেশন, এবং পাটনার আর দেরি নাই তখন হঠাৎ সেখানেই নামিয়া পড়িলাম। পকেটে হাত দিয়া দেখি উদ্বেগের কিছুমাত্র হেতু নাই, দু-আনি এবং পয়সাতে দশটা পয়সা তখনো আছে। খুশি হইয়া দোকানের

সন্ধানে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দোকান মিলিল। চুড়া, দহি এবং শর্করা সংযোগে অত্যুৎকৃষ্ট ভোজন সম্পন্ন করিতে অর্ধেক ব্যয় হইয়া গেল। তা যাক। জীবনে অমন কত যায়—সে জন্যে ক্ষুণ্ণ হওয়া কাপুরুষতা।

গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টা-খানেক ঘুরিতে না ঘুরিতে টের পাইলাম জায়গাটার দধি ও চুড়া যে পরিমাণে উপাদেয়, পানীয় জলটা সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট। আমার অমন ভূরিভোজন এইটুকু সময়ের মধ্যে এমনি পরিপাক করিয়া নষ্ট করিয়া দিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন দশ-বিশ দিন তঙ্গুল-কণাটি ও মুখে যায় নাই। এরূপ কদর্য স্থানে বাস করা আর একদণ্ড উচিত নয় মনে করিয়া স্থান ত্যাগের কল্পনা করিতেছি, দেখি অদূরে একটা আমবাগানের ভিতর হইতে ধূম দেখা দিয়াছে।

আমার ন্যায়শাস্ত্র জানা ছিল। ধূম দেখিয়া অঞ্চি নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম; বরঞ্চ অঞ্চিরও হেতু অনুমান করিতে আমার বিলম্ব হইল না। সুতরাং সোজা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, জলটা এখানকার বড় বদ।

বাঃ—এই ত চাই! এ যে খাঁটি সন্ধ্যাসীর আশ্রম। মন্ত ধূনির উপর লোটায় করিয়া চায়ের জল চড়িয়াছে। ‘বাবা’ অর্ধমুদ্রিত চক্ষে সম্মুখে বসিয়া আছেন; তাঁহার আশেপাশে গাঁজার উপকরণ। একজন বাচ্চা-সন্ধ্যাসী একটা ছাগী দোহন করিতেছে—চা-সেবায় লাগিবে। গোটা-দুই উট, গোটা-দুই টাট্টু ঘোড়া এবং সবৎসা গাভী কাছাকাছি গাছের ডালে বাঁধা রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট তাঁবু। উকি মারিয়া দেখি, ভিতরে আমার বয়সী এক চেলা দুই পায়ে পাথরের বাটি ধরিয়া মন্ত একটা নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ তৈয়ারি করিতেছে। দেখিয়া আমি ভক্তিতে আপ্নুত হইয়া গেলাম; এবং চক্ষের পলকে সাধু বাবাজীর পদতলে একেবারে লুটাইয়া পড়িলাম। পদধূলি মন্তকে ধারণ করিয়া করজোড়ে মনে মনে বলিলাম, ভগবান, তোমার কি অসীম করুণা! কি স্থানেই আমাকে আনিয়া দিলে! চুলোয়

যাক গে পিয়ারী,—এই মুক্তির্মার্গের সিংহদ্বার ছাড়িয়া তিলার্ধ যদি অন্যত্র যাই,  
আমার যেন অনন্ত নরকেও আর স্থান না হয়!

সাধুজী বললেন, কেঁও বেটা?

আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, আমি গৃহত্যাগী, মুক্তি-পথাম্বেষী  
হতভাগ্য শিশু; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণ-সেবার অধিকার দাও।

সাধুজী মৃদু হাস্য করিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দী করিয়া সংক্ষেপে  
বললেন, বেটা ঘরে ফিরিয়া যাও—এ পথ অতি দুর্গম।

আমি করুণকগ্রে তৎক্ষণাত্ প্রত্যন্তে করিলাম, বাবা, মহাভারতে লেখা  
আছে, মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্ণে গিয়াছিলেন; আর  
আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তিও পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।

সাধুজী খুশি হইয়া বললেন, বাত তেরো সাচ্চা হ্যায়। আচ্ছা বেটা  
রামজীকা খুশি। যিনি দুঞ্চ দোহন করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া চা তৈরি করিয়া  
'বাবা'কে দিলেন। তাঁহার সেবা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

ভাঙ্গ তৈয়ারি হইতেছিল সন্ধ্যার জন্যে। তখনও বেলা ছিল, সুতরাং অন্য  
প্রকার আনন্দের উদ্যোগ করিতে 'বাবা' তাঁর দ্বিতীয় চেলাকে গঞ্জিকার কলিকাটা  
ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন; এবং প্রস্তুত হইতে বিলম্ব না হয় সে বিষয়ে বিশেষ  
করিয়া উপদেশ দিলেন।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সর্বদশী 'বাবা' আমার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া  
বললেন, হাঁ বেটা, তোমার অনেক গুণ। তুমি আমার চেলা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

আমি পরমানন্দে আর একবার বাবার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্বাদে  
অভাব কিছুরই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাটকা একসুট গেরুয়া বস্ত্র, জোড়া-  
দশেক ছোট-বড় রুদ্রাক্ষ-মালা এবং একজোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া  
দিলেন। যেখানে যেটি মানায়—সাজগোজ করিয়া, খানিকটা ধূনির ছাই মাথায়

মুখে মাথিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী, আয়না-টায়না হ্যায়? মুখখানা যে ভারি একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে! দেখিলাম, তাঁহারও রস-বোধ আছে; তথাপি একটুখানি গভীর হইয়া তাচ্ছিল্যভরেই বলিলেন, হ্যায় একঠো।

তবে লুকিয়ে আনো না একবার!

মিনিট-দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম। পশ্চিমী নাপিতেরা যেরূপ একখানি আয়না হাতে ধরাইয়া দিয়া ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করে, সেইরূপ ছোট একটুখানি টিন-মোড়া আরশি। তা হোক, একটুখানি দেখিলাম, যত্নে এবং সদা ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না। কে বলিবে আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি কিছুকাল পূর্বেই রাজা-রাজড়ার মজলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন! তা যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে গুরুমাহারাজের সমীপে দীক্ষার জন্য নীত হইলাম। মহারাজ চেহারা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, বেটা, মহিনা এক-অধ ঠ্ঠরো।

মনে মনে বহুত আচ্ছা বলিয়া তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া যুক্তকরে, ভক্তিভরে একপাশে বসিলাম।

আজ কথায় কথায় তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উপদেশ দিলেন। ইহার দুরুহতার বিষয়, ইহার গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার বিষয়, আজকাল ভগ্ন পাষণ্ডেরা কি প্রকারে ইহা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ, এবং ভগবৎপাদপদ্মে মতি স্থির করিতে হইলেই বা কি-কি আবশ্যক, এতৎপক্ষে বৃক্ষজাতীয় শুষ্ক বস্তুবিশেষের ধূম ঘন ঘন মুখবিবর দ্বারা শোষণ করতঃ নাসারন্ধ্রপথে শনৈঃ শনৈঃ বিনির্গত করায় কিরূপ আশৰ্য উপকার, তাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এ বিষয়ে আমার নিজের অবস্থা যে অত্যন্ত আশাপ্রদ সেই ইঙ্গিত করিয়াও আমার উৎসাহবর্ধন করিলেন। এইরূপে সেদিন মোক্ষপথের অনেক

নিগৃঢ় তাৎপর্য অবগত হইয়া গুরুমহারাজের তৃতীয় চেলাগিরিতে বহাল হইয়া গেলাম।

গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার জন্য মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা অমনি একটু কঠোর রকমের ছিল। তাহার পরিমাণও যেমনি, রসনাতেও তাহা তেমনি। চা, রঞ্চি, ঘৃত, দধিদুঞ্চ, চূড়া, শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান। আবার ভগবৎপদারবিন্দ হইতেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, সেদিকেও আমাদের লেশমাত্র অবহেলা ছিল না। ফলে আমার শুক্নো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল,—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।

একটা কাজ ছিল—ভিক্ষায় বাহির হওয়া। সন্ধ্যাসীর পক্ষে ইহা সর্বপ্রধান কাজ না হইলেও, একটা প্রধান কাজ বটে। কারণ সাত্ত্বিক ভোজনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে ইহা করিতেন না, আমরা তাঁহার সেবকেরা পালা করিয়া করিতাম। সন্ধ্যাসীর অপরাপর কর্তব্যে আমি তাঁহার অন্য দুই চেলাকে অতি সত্ত্বর ডিঙাইয়া গেলাম; শুধু এইটাতেই বরাবর খোঁড়াইতে লাগিলাম। এটা কোনদিনই নিজের কাছে সহজ এবং ঝুঁকিকর করিয়া তুলিতে পারিলাম না। তবে এই একটা সুবিধা ছিল—সেটা হিন্দুস্থানীদের দেশ। আমি ভাল-মন্দর কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি, বাঙ্গলা দেশের মত সেখানকার মেয়েরা ‘হাতজোড়া—আর এক বাড়ি এগিয়ে দেখ’ বলিয়া উপদেশ দিত না, এবং পুরুষেরাও চাকরি না করিয়া ভিক্ষা করি কেন, তাহার কৈফিয়ত তলব করিত না। ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে প্রতি গৃহস্থই সেখানে ভিক্ষা দিত—কেহই বিমুখ করিত না।

এমনি দিন যায়। দিন-পনর ত সেই আম-বাগানের মধ্যেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কোন বালাই নাই, শুধু রাত্রে মশার কামড়ের জ্বালায় মনে হইত—থাক মোক্ষসাধন। গায়ের চামড়া আর একটু মোটা করিতে না পারিলে ত আর

বাঁচি না! অন্যান্য বিষয়ে বাঙালী যত সেরাই হোক, এ বিষয়ে বাঙালীর চেয়ে হিন্দুস্থানী-চামড়া যে সন্ধ্যাসের পক্ষে তের বেশি অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সাত্ত্বিক ভোজনের চেষ্টায় বহির্গত হইতেছি, গুরুমহারাজ ডাকিয়া বলিলেন—

“ভরদ্বাজ মুনি বসহি প্রয়াগা

যিনহি রামপদ অতি অনুরাগা—”

অর্থাৎ স্ট্রাইক দি টেন্ট—প্রয়াগ যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ ত সহজ নয়! সন্ধ্যাসীর যাত্রা কিনা! পা-বাঁধা টাটু খুঁজিয়া আনিয়া বোঝাই দিতে, উটের উপরে মহারাজের জিন কষিয়া দিতে, গরু-ছাগল সঙ্গে লইতে, পেঁটলা-পুঁটলি বাঁধিতে গুছাইতে একবেলা গেল। তার পরে রওনা হইয়া ক্রেশ-দুই দূরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিঠৌরা গ্রামপ্রান্তে এক বিরাট বটমূলে আস্তানা ফেলা হইল। জায়গাটি মনোরম, গুরুমহারাজের দিব্য পছন্দ হইল। তা ত হইল, কিন্তু সেই ভরদ্বাজ মুনির আস্তানায় পৌঁছিতে যে কয় মাস লাগিবে, সে ত অনুমান করিতেই পারিলাম না।

এই বিঠৌরা গ্রামের নামটা কেন আমার মনে আছে, তাহা এইখানে বলিব। সে দিনটা পূর্ণিমা তিথি। অতএব গুরু-আদেশে আমরা তিন জনেই তিন দিকে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একা হইলে উদরপূর্তির জন্য চেষ্টাচরিত্র মন্দ করিতাম না। কিন্তু আজ আমার সে চাড় ছিল না বলিয়া অনেকটা নিরীক্ষক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। একটা বাড়ির খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটা বাঙালী মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তার কাপড়খানা যদিচ দেশী তাঁতে-বোনা গুণচট্টের মতই ছিল, কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গিটাই আমার কৌতুহল উদ্বেক করিয়াছিল। ভাবিলাম, পাঁচ-ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায় সব ঘরেই গিয়াছি, কিন্তু বাঙালী মেয়ে ত দূরের কথা—একটা পুরুষের চেহারাও ত চোখে পড়ে নাই। সাধু-সন্ধ্যাসীর অবারিত দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই, মেয়েটি আমার

পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে, দশ-এগার বছরের মেয়ের চোখে এমন করণ, এমন মলিন উদাস চাহনি, আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার ঠেঁটে, তাহার চোখে, তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাঙলা করিয়া বলিলাম, চাটি ভিক্ষে আনো দেখি মা। প্রথমটা সে কিছুই বলিল না। তার পরে তার ঠেঁট-দুটি বার-দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তার পরে সে ঝরবর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কারণ সন্মুখে কেহ না থাকিলেও, পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া—দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্বেই মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে এক নিশ্চাসে সহস্র প্রশংস করিয়া ফেলিল,—তুমি কোথা থেকে আসচ? তুমি কোথায় থাক?

তোমার বাড়ি কি বর্ধমান জেলায়? কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেন?

আমি কহিলাম, তোমার বাড়ি কি বর্ধমানের রাজপুরে?

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, হাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাঁদের তুমি চেনো? আমি তিনমাস শুশুরবাড়ি এসেছি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে কিছু জানিনে। ঐ যে অশ্বথ গাছ—ওর তলায় আমার দিদির শুশুরবাড়ি। ও-সোমবারে দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে—এরা বলে, না—সে কলেরায় মরেছে।

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ব্যাপার কি? এরা ত দেখছি পুরা হিন্দুস্থানী, অথচ মেয়েটি একেবারে খাঁটি বাঙলীর মেয়ে। এতদূরে এ-বাড়িতে

এদের শুশ্রবাড়িটিই বা কি করিযা হইল, আর ইহাদের স্বামী শুশ্র-শাশুড়ীই বা  
এখানে কি করিতে আসিল?

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দিদি গলায় দড়ি দিল কেন?

সে কহিল, দিদি রাজপুরে যাবার জন্য দিনরাত কাঁদত, খেত না, শুত  
না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।  
তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে।

প্রশ্ন করিলাম, তোমারও শুশ্র-শাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী?

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হাঁ। আমি তাদের কথা  
কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে—আমি ত দিনরাত কাঁদি;  
কিন্তু বাবা আমাকে চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে তোমার বিয়ে দিলেন  
কেন?

মেয়েটি কহিল, আমরা যে তেওয়ারী। আমাদের ঘর ও-দেশে ত পাওয়া  
যায় না।

তোমাকে কি এরা মারধোর করে?

করে না? এই দেখ না, বলিয়া মেয়েটি বাহতে, পিঠের উপর, গালের  
উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমিও দিদির মত  
গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

তাহার কান্না দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর  
প্রশ্নেওর বা ভিক্ষার অপেক্ষা না কারিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি কিন্তু  
আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বল্বে  
ত আমাকে একবার নিয়ে যেতে? নইলে আমি—বলিতে আমি কোনোমতে একটা  
ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুকচেরা  
আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতেই লাগিল।

ରାନ୍ତର ମୋଡେର ଉପରେଇ ଏକଟା ମୁଦୀର ଦୋକାନ । ପ୍ରବେଶ କରିତେଇ ଦୋକାନଦାର ସସମ୍ମାନେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଲ । ଖାଦ୍ୟବ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ନା କରିଯା ଯଥନ ଏକଥାନା ଚିଠିର କାଗଜ ଓ କାଳି-କଲମ ଚାହିୟା ବସିଲାମ, ତଥନ ସେ କିଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଇଲ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଲ ନା । ସେଇଥାନେ ବସିଯା ଗୌରୀ ତେଓୟାରିର ନାମେ ଏକଥାନା ପତ୍ର ଲିଖିଯା ଫେଲିଲାମ । ସମ୍ମତ ବିବରଣ ବିବୃତ କରିଯା ପରିଶେଷେ ଏ କଥାଓ ଲିଖିତେ ଛାଡ଼ିଲାମ ନା ଯେ, ମେଯେଟିର ଦିଦି ସମ୍ପ୍ରତି ଗଲାଯ ଦଡ଼ି ଦିଯା ମରିଯାଛେ, ଏବଂ ସେଇ ଘରଧୋର ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରିତେ ନା ପାରିଯା ସେଇ ପଥେ ଯାଇବାର ସନ୍ଧଳ କରିଯାଛେ । ତିନି ନିଜେ ଆସିଯା ଇହାର ବିହିତ ନା କରିଲେ କି ଘଟେ ବଲା ଯାଯ ନା । ଖୁବ ସମ୍ଭବ, ତୋମାର ଚିଠିପତ୍ର ଇହାରା ମେଯେଟିକେ ଦେଇ ନା । ଠିକାନା ଦିଲାମ, ବର୍ଧମାନ ଜେଳାର ରାଜପୁର ଗ୍ରାମ । ଜାନି ନା, ସେ ପତ୍ର ଗୌରୀ ତେଓୟାରିର କାଛେ ପୋଁଛିଯାଛିଲ କି ନା; ଏବଂ ପୋଁଛାଇଲେଓ ସେ କିଛୁ କରିଯାଛିଲ କି ନା ।

କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାରଟା ଆମାର ମନେର ମଧ୍ୟେ ଏମନି ମୁଦ୍ରିତ ହଇଯା ଗିଯାଛିଲ ଯେ, ଏତକାଳ ପରେଓ ସମ୍ସ୍ତ ସ୍ଵରଣ ରହିଯାଛେ, ଏବଂ ଏହି ଆଦର୍ଶ ହିନ୍ଦୁସମାଜେର ସୁକ୍ଷାତିସୁକ୍ଷ ଜାତିଭେଦେର ବିରଳତାରେ ଏକଟା ବିଦ୍ରୋହେର ଭାବ ଆଜିଓ ଯାଯ ନାହିଁ ।

ହିତେ ପାରେ, ଏହି ଜାତିଭେଦ ବ୍ୟାପାରଟା ଖୁବ ଭାଲ; ଏହି ଉପାୟେଇ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁଜାତିଟା ଯଥନ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଁଚିଯା ଆଛେ, ତଥନ ଇହାର ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧେ ସଂଶୟ କରିବାର, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆର କିଛୁଇ ନାହିଁ । କେ କୋଥାଯ ଦୁଟୋ ହତଭାଗା ମେଯେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିତେ ନା ପାରିଯା ଗଲାଯ ଦଡ଼ି ଦିଯା ମରିବେ ବଲିଯା ଇହାର କଠୋର ବନ୍ଧନ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଶିଥିଲ କରାର କଲ୍ପନା କରାଓ ପାଗଲାମି । କିନ୍ତୁ ମେଯେଟିର କାନ୍ଦା ଯେ ଲୋକ ଚୋଥେ ଦେଖିଯା ଆସିଯାଛେ, ତାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେର ନିକଟେ ହିତେ ଥାମାଇଯା ରାଖେ ଯେ—କୋନମତେ ଟିକିଯା ଥାକାଇ କି ଚରମ ସାର୍ଥକତା? ଏମନ ଅନେକ ଜାତିଇ ତ ଟିକିଯା ଆଛେ । କୁକିରା ଆଛେ, କୋଲ-ଭୀଲ-ସାଁତାଲରା ଆଛେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରେ ଅନେକ ଛୋଟଖାଟୋ ଦ୍ୱାପେର ଅନେକ ଛୋଟଖାଟୋ ଜାତିରା ମାନୁଷ-ସୃଷ୍ଟିର ଶୁରୁ ହିତେଇ ବାଁଚିଯା ଆଛେ । ଆଫ୍ରିକାଯ ଆଛେ, ଆମେରିକାଯ ଆଛେ, ତାହାଦେରଓ ଏମନ

সকল কড়া সামাজিক আইন-কানুন আছে যে, শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়সের হিসাবে তাহারা যূরোপের অনেক জাতির অতি বৃদ্ধপ্রিপিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন, কিন্তু তাই বলিয়াই যে, ইহারা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার-ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ, এমন অঙ্গুত সংশয় বোধ করি কাহারো মনে উঠে না। সামাজিক সমস্যা বাঁক বাঁধিয়া দেখা দেয় না, এমনই এক-আধটা কুচিৎ আবির্ভূত হয়। নিজের বাঙালী মেয়ে-দুটির খোটার ঘরে বিবাহ দিবার সময় গৌরী তেওয়ারীর মনে বোধ করি এরূপ প্রশ্ন আসিয়াছিল। কিন্তু সে বেচারা এই দুর্নহ প্রশ্নের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়াই, শেষে সামাজিক ঘূর্পকাছ্টে কন্যাদুটিকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে-সমাজ এই দুইটি নিরূপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে-সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সে পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না। কোথায় একজন মস্ত বড়লোকের লেখায় পড়িয়াছিলাম, আমাদের সমাজ ‘জাতিভেদ’ বলিয়া যে একটা বড় রকম সামাজিক প্রশ্নের উত্তর জগতের সমক্ষে ধরিয়ে দিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজিও হয় নাই, এই রকম একটা কথা; কিন্তু এই-সমস্ত যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের উত্তর দিতেও যেমন প্রবৃত্তি হয় না—‘হয় নাই’, ‘হইবে না’, বলিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেরই উত্তর প্রবলকচ্ছে ঘোষণা করিয়া দিয়া যাহারা চাপিয়া বসিয়া যায়, তাহাদের জবাব দেওয়াও তেমনি কঠিন। যাক গে।

দোকান হইতে উঠিলাম। সন্ধান করিয়া বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া যখন আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার অন্যান্য সহযোগীরা আটা, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

দেখিলাম, সাধুবাবা আজ যেন বিরক্ত। হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, এ গ্রামটা সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়; সেবাদির ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক করে না; সুতরাং কালই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া তৎক্ষণাত্ অনুমোদন করিলাম। পাটনাটা দেখিবার জন্য মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল কৌতুহল ছিল, নিজের কাছে তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না।

তা ছাড়া এই-সকল বেহারী পল্লীগুলিতে কোন রকম আকর্ষণই খুঁজিয়া পাই না।

ইতিপূর্বে বাঙ্গলার অনেক থামেই ত বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সহিত ইহাদের কোন তুলনাই হয় না। নরনারী, গাছপালা, জলবায়ু—কোনটাই আপনার বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মনটা সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শুধু কেবল পালাই-পালাই করিতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় পাড়ায় পাড়ায় তেমন করিয়া খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তনের সুর কানে আসে না। দেবমন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টাগুলাও সেরূপ গম্ভীর মধুর শব্দ করে না। এ দেশের মেয়েরা শাঁখগুলাও কি ছাই তেমন মিষ্ট করিয়া বাজাইতে জানে না! এখানে মানুষ কি সুখেই থাকে! আর মনে হইতে লাগিল, এই-সব পাড়াগাঁয়ের মধ্যে না আসিয়া পড়িলে ত নিজেদের পাড়াগাঁয়ের মূল্য কোন দিনই এমন করিয়া চোখে পড়িত না। আমাদের জলে পানা, হাওয়ায় ম্যালেরিয়া, মানুষের পেটে-পেটে পিলে, ঘরে-ঘরে মামলা, পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলি—তা হোক, তবু তারই মধ্যে যে কত রস, কত তৃষ্ণি ছিল, এখন যেন তাহার কিছুই না বুঝিয়াও সমস্ত বুঝিতে লাগিলাম।

পরদিন তাঁবু ভাঙিয়া যাত্রা করা হইল, এবং সাধুবাবা যথাশক্তি ভরঘাজ মুনির আশ্রমের দিকে সদলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু পথটা সোজা হইবে বলিয়াই হোক, কিংবা মুনি আমার মন বুঝিয়াই হোক, পাটনার দশ ক্রোশের মধ্যে আর তাঁবু গাড়িলেন না। মনে একটা বাসনা ছিল। তা সে এখন থাক, পাপতাপ অনেক করিয়াছি, সাধুসঙ্গে দিন-কতক পবিত্র হইয়া আসি গে। একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে যে জায়গায় আমাদের আড়তা পড়িল, তাহার নাম ছোট বাঘিয়া।

আরা স্টেশন হইতে ক্রোশ-আঁষ্টেক দূরে। এই গ্রামে একটি মহাপ্রাণ বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সদাশয়তার এইখানে একটু বিবরণ দিব। তাঁহার পৈতৃক নামটা গোপন করিয়া রামবাবু বলাই ভাল। কারণ এখনও তিনি জীবিত আছেন, এবং পরে অন্যত্র যদিচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল, তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। না-পারা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব জানি—গোপনে তিনি যে-সকল সৎকার্য করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ্যে উল্লেখ করিলে তিনি বিনয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিতেছি। অতএব তাঁর নাম রামবাবু। কি সূত্রে যে রামবাবু এই গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া যে জমিজমা সংগ্রহ করিয়া চাষ-আবাদ করিতেছিলেন, অত কথা জানি না। এইমাত্র জানি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ এবং গুটি তিন-চার পুত্র-কন্যা লইয়া তখন সুখে বাস করিতেছিলেন।

সকালবেলা শোনা গেল, এই ছোটা-বড়া বাঘিয়া ত বটেই, আরও পাঁচ-সাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, গ্রামের এই-সকল দুঃসময়ের মধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা বেশ সন্তোষজনক হয়। সুতরাং সাধুবাবা অবিচলিতচিন্তে তথায় অবস্থান করিবার সকল্প করিলেন।

ভাল কথা। সন্ন্যাসী-জীবটার সমন্বে এইখানে আমি একটা কথা বলিতে চাই। জীবনে ইহাদের অনেকগুলিকেই দেখিয়াছি। বার-চারেক এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবেও মিশিয়াছি। দোষ যাহা আছে, সে ত আছেই। আমি গুণের কথাই বলিব। নিছক ‘পেটের দায়ে সাধুজী’ আপনারা ত আমাকেই জানেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও এই দুটো দোষ আমার চোখে পড়ে নাই। আর চোখের দৃষ্টিও যে আমার খুব মোটা তাও নয়।

স্ত্রীলোক সমন্বে ইহাদের সংযমই বলুন, আর উৎসাহের স্ফলতাই বলুন—খুব বেশি; এবং প্রাণের ভয়টা ইহাদের নিতান্তই কম, ‘যাবৎ জীবেৎ সুখৎ জীবেৎ’

ত আছেই; কি করিলে অনেকদিন জীবেৎ, এ খেয়াল নাই। আমাদের সাধুবাবারও এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা তিনি তুচ্ছ করিয়া দিলেন।

একটুখানি ধূনির ছাই এবং দু ফোঁটা কমগুলুর জলের পরিবর্তে যে-সকল বস্তু হ-হ করিয়া ঘরে আসিতে লাগিল, তাহা সন্ধ্যাসী, গৃহী—কাহারও বিরক্তিকর হইতে পারে না।

রামবাবু সন্তুষ্ট কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন। চারদিন জ্বরের পর আজ সকালে বড়ছেলের বসন্ত দেখা দিয়াছে, এবং ছোট ছেলেটি কাল রাত্রি হইতেই জ্বরে অচৈতন্য। বাঙালী দেখিয়া আমি উপযাচক হইয়া রামবাবুর সহিত পরিচয় করিলাম।

ইহার পরে গঞ্জের মধ্যে মাস-খানেকের বিচ্ছেদ দিতে চাই। কারণ কেমন করিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, কেমন করিয়া ছেলে-দুটি ভাল হইল—সে অনেক কথা। বলিতে আমার নিজেরই বৈর্য থাকিবে না, তা পাঠকের ত তের দূরের কথা। তবে মাঝের একটা কথা বলিয়া রাখি। দিন-পনর পরে রোগের যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন সাধুজী তাঁহার আস্তানা গুটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রামবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, সন্ধ্যাসীদাদা তুমি ত সত্যিই সন্ধ্যাসী নও—তোমার শরীরে দয়া-মায়া আছে। আমার নবীন, জীবনকে তুমি ফেলে চ'লে গেলে, তারা কখ খনো বাঁচবে না। কৈ, যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে? বলিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া ফেলিলেন। আমার চোখেও জল আসিল। রামবাবুও স্ত্রীর প্রার্থনায় যোগ দিয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমি যাইতে পারিলাম না। সাধুবাবাকে বলিলাম, প্রভু, তোমরা অগ্রসর হও; আমি পথের মধ্যে না পারি, প্রয়াগে গিয়া যে তোমার পদধূলি মাথায় লইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রভু ক্ষুঁশ হইলেন। শেষে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া নির্পর্ক কোথাও বিলম্ব না করি, সে বিষয়ে বারংবার সতর্ক করিয়া দিয়া সদলবলে যাত্রা করিলেন। আমি রামবাবুর বাটাতেই রহিয়া গেলাম। এই অল্পদিনের মধ্যেই আমি যে প্রভুর

সর্বাপেক্ষা মেহের পাত্র হইয়াছিলাম, এবং চিকিয়া থাকিলে তাঁহার সন্ধ্যাসী-লীলার অবসানে উত্তরাধিকার-সূত্রে টাটু এবং উট-দুটা যে দখল করিতে পারিতাম, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাক, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া, গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই।

ছেলে-দুটি সারিয়া উঠিল। মারী এইবার প্রকৃতই মহামারীরূপে দেখা দিলেন। এ যে কি ব্যাপার, তাহা যে না চোখে দেখিয়াছে, তাহার দ্বারা লেখা পড়িয়া, গল্প শুনিয়া বা কল্পনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। অতএব এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া প্রয়াস আমি করিব না। লোক পালাইতে আরম্ভ করিল— ইহার আর কোন বাচবিচার রহিল না। যে বাড়িতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত—শুধু মা তার পীড়িত সন্তানকে আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

রামবাবুও তাঁহার ঘরের গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই দিলেন। অনেকদিন আগেই দিতেন, শুধু বাধ্য হইয়াই পারেন নাই। দিন পাঁচ-ছয় হইতেই আমার সমস্ত দেহটা এমনি একটা বিশ্রী আলস্যে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, কিছুই ভাল লাগিত না। ভাবিতাম রাতজাগা

এবং পরিশ্রমের জন্যই এরূপ বোধ হইত। সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপ্টিপ্ করিতে লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইলাম, অপরাহ্নবেলায় বমি হইয়া গেল।

রাত্রি নটা-দশটার সময় টের পাইলাম জ্বর হইয়াছে। সেদিন সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহাদের উদ্দ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, সবাই জাগিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রে রামবাবুর স্ত্রী বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, সন্ধ্যাসীদাদা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গেই আরা পর্যন্ত চল না?

আমি বলিলাম, তাই যাব। কিন্তু তোমাদের গাড়িতে আমাকে একটু জায়গা দিতে হবে।

ভগিনী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন সন্ধ্যসীদাদা? গাড়ি ত দুটোর  
বেশি পাওয়া গেল না—আমাদের নিজেদেরই যে জায়গা হচ্ছে না।

আমি কহিলাম, আমার হাঁটবার যে ক্ষমতা নেই দিদি! সকাল থেকেই  
বেশ জ্বর এসেচে।

জ্বর? বলি কি গো? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার নৃতন  
ভগিনী মুখ কালি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কতক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না। জাগিয়া উঠিয়া  
দেখিলাম, বেলা হইয়াছে, বাড়ির ভিতরে ঘরে-ঘরে তালা বন্ধ—জনপ্রাণী নাই।

বাহিরের যে ঘরটায় আমি থাকিতাম তাহার সুমুখ দিয়াই এই গ্রামের  
কাঁচা রাস্তাটা আরা স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ  
পাঁচ-ছয়খানা গরুর গাড়ি মৃত্যুভীত নরনারী বোৰাই লইয়া স্টেশনে যাইত।  
সারাদিন অনেক চেষ্টার পরে ইহারই একখানিতে সন্ধ্যার সময় স্থান করিয়া লইয়া  
উঠিয়া বসিলাম। যে প্রাচীন বেহারী ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে  
লইয়াছিলেন, তিনি অতি প্রত্যুষেই স্টেশনের কাছে একটা গাছতলায় আমাকে  
নামাইয়া দিলেন। তখন আর আমার বসিবার সামর্থ্য ছিল না, সেইখানেই শুইয়া  
পড়িলাম। অদূরে একটা পরিত্যক্ত টিনের শেড ছিল। পূর্বে এটি মোসাফিরখানার  
কাজে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু বর্তমান সময়ে বৃষ্টি-বাদলার দিনে গরু-বাচুরের  
ব্যবহার ছাড়া আর কোন কাজে লাগিত না। ভদ্রলোক স্টেশন হইতে একজন  
বাঙালী যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহারই দয়ায়, জনকয়েক কুলীর  
সাহায্যেই এই শেডখানির মধ্যে নীত হইলাম।

আমার বড় দুর্ভাগ্য, আমি যুবকটির কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না;  
কারণ কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। মাস পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিবার যখন  
সুযোগ এবং শক্তি হইল, তখন সংবাদ লইয়া জানিলাম, বসন্ত রোগে ইতিমধ্যেই  
তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার কথা শুনিয়া এইমাত্র

জানিয়াছিলাম, তিনি পূর্ববঙ্গের লোক এবং পনর টাকা বেতনে স্টেশনে চাকরি করেন। খানিক পরে তিনি তাঁহার নিজের শতজীর্ণ বিছানাটি আনিয়া হাজির করিলেন, এবং বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খান এবং পরের ঘরে থাকেন; দুপুরবেলা একবাটি গরম দুধ আনিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবেন; কিন্তু আত্মীয়বদ্ধবান্ধব কাহাকেও যদি সংবাদ দিবার থাকে ত ঠিকানা দিলে তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে পারেন।

তখনও আমার বেশ জ্ঞান ছিল। সুতরাং ইহাও বেশ বুঝিতেছিলাম আর বেশিক্ষণ নয়। এমনি জ্বর যদি আর পাঁচ-ছয় ঘণ্টাও স্থায়ী হয় ত চৈতন্য হারাইতে হইবে। অতএব যাহা কিছু করিবার, ইতিমধ্যে না করিলে আর করাই হইবে না।

তা বটে, কিন্তু সংবাদ দিবার প্রস্তাবে ভাবনায় পড়িলাম। কেন তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাবিলাম গরীবের টেলিগ্রামের পয়সাটা অপব্যয় করাইয়া আর লাভ কি!

সন্ধ্যার পর ভদ্রলোক তাঁর ডিউটির ফাঁকে এক ভাঁড় জল ও একটা কেরোসিনের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্বরের যন্ত্রণায় মাথা ক্রমশঃ বেঠিক হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, যতক্ষণ আমার হঁশ আছে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে দেখবেন; তার পরে যা হয় তা হোক, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

ভদ্রলোক অত্যন্ত মুখচোরা প্রকৃতির লোক। কথা সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। প্রত্যুত্তরে তিনি ‘না না’ বলিয়াই চুপ করিলেন।

বলিলাম, আপনি সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি সন্ধ্যাসী মানুষ, আমার যথার্থ আপনার জন কেউ নাই। তবে পাটনার পিয়ারী বাইজীর ঠিকানায় যদি একখানা পোস্টকার্ড লিখে দেন, যে শ্রীকান্ত আরা স্টেশনের বাইরে একটা টিনশেডের মধ্যে মরণাপন্ন হ'য়ে পড়ে আছে, তা হ'লে—

ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি এখনি দিচ্ছি, চিঠি এবং টেলিগ্রাম দুই-ই পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ভগবান, সংবাদটা যেন সে পায়।

জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় হাত দিয়া ঠাহর করিয়া টের পাইলাম, সেটা আইস্-ব্যাগ। চোখ মেলিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপরে শুইয়া আছি। সুমুখের টুলের উপর একটা আলোর কাছে গোটা দুই-তিন গুঁড়ের শিশি; এবং তাহারই পাশে একটা দড়ির খাটিয়ার উপরে কে একজন লাল-চেক র্যাপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। তার পরে একটু একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে কত কি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া, ধরাধরি করিয়া আমাকে ডুলিতে তোলা, মাথা ন্যাড়া করিয়া ওষুধ খাওয়ানো—এমনি কত কি ব্যাপার।

খানিক পরে লোকটি যখন উঠিয়া বসিল, দেখিলাম ইনি একজন বাঙালী ভদ্রলোক, বয়স আঠারো-উনিশের বেশি নয়। তখন আমার শিয়রের নিকট হইতে মৃদুস্বরে যে তাহাকে সম্মোধন করিল, তাহার গলা চিনিতে পারিলাম।

পিয়ারী অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, বক্ষ, বরফটা একবার কেন বদ্লে দিলিনে বাবা!

ছেলেটি বলিল, দিচ্ছি, তুমি একটুখানি শোও না মা। ডাক্তারবাবু যখন ব'লে গেলেন বসন্ত নয়, তখন ত আর কোন ভয় নেই মা।

পিয়ারী কহিল, ওরে বাবা, ডাক্তারে ভয় নেই বললেই কি মেয়েমানুষের ভয় যায়? তোকে সে ভাবনা করতে হবে না বক্ষ, তুই শুধু বরফটা বদলে দিয়ে শুয়ে পড়,—আর রাত জাগিস্ক নে।

বক্ষু আসিয়া বরফ বদলাইয়া দিল এবং ফিরিয়া গিয়া সেই খাটিয়ার উপর  
শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, আমি আস্তে  
আস্তে ডাকিলাম, পিয়ারী!

পিয়ারী মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কপালের জলবিন্দুগুলা আঁচলে  
মুছাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে কি চিন্তে পারচ? এখন কেমন আছ? কা—

ভাল আছি। কখন এলে? এ কি আরা?

হাঁ, আরা। কাল আমরা বাড়ী যাব।

কোথায়?

পাটনায়। আমার বাড়ি ছাড়া আর কি কোথাও এখন তোমাকে ছেড়ে  
দিতে পারি?

এই ছেলেটি কে রাজলক্ষ্মী?

আমার সতীন-পো। কিন্তু বক্ষু আমার পেটের ছেলেই। আমার কাছে  
থেকেই ও পাটনা কলেজে পড়ে। আজ আর কথা কয়ো না, ঘুমোও—কাল সব  
কথা বলব। বলিয়া সে আমার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আমার মুখ বন্ধ  
করিয়া দিল।

আমি হাত বাড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ডান হাতখানি মুঠোর মধ্যে লইয়া পাশ  
ফিরিয়া শুইলাম।

## বার

যাহাতে অচেতন্য শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বসন্ত নয়, অন্য ভুর। ডাঙ্গারিশাস্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার একটা-কিছু গালভরা শক্ত নাম ছিল, কিন্তু আমি তাহা অবগত নই। খবর পাইয়া পিয়ারী তাহার ছেলেকে লইয়া জন-দুই ভৃত্য এবং দাসী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দিনই একটা বাসা ভাড়া করিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করে এবং শহরের ভালমন্দ নানাবিধি চিকিৎসক জড় করিয়া ফেলে। ভালই করিয়াছিল। না হইলে অন্য ক্ষতি না হোক, ‘ভারতবর্ষে’র পাঠক-পাঠিকার দৈর্ঘ্যের মহিমাটা সংসারে অবিদিত থাকিয়া যাইত।

ভোরবেলা পিয়ারী কহিল, বক্ষু আর দেরি করিস নে বাবা, এই বেলা একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি রিজার্ভ ক'রে আয়। আমি একদণ্ডও এখানে রাখতে সাহস করিনে।

বক্ষুর অত্পত্তি নিদ্রা তখনও দু চক্ষু জড়ইয়া ছিল; সে মুদ্রিত-নেত্রে অব্যক্ত-স্বরে জবাব দিল, তুমি খেপেছ মা, এ অবস্থায় কি নাড়ানাড়ি করা যায়?

পিয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আগে তুই উঠে চোখে-মুখে জল দে দেখি! তার পরে নাড়ানাড়ির কথা বোৰা যাবে। লক্ষ্মী বাপ আমার, ওঠ।

বক্ষু অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাঢ়িয়া স্টেশনে চলিয়া গেল। তখন সবেমাত্র সকাল হইতেছিল—ঘরে আর কেহ ছিল না। ধীরে ডাকিলাম, পিয়ারী! আমার শিয়রের দিকে আর একখানা খাটিয়া জোড়া দেওয়া ছিল। তাহারই উপর ক্লান্তিবশতঃ বোধ করি সে ইতিমধ্যে একটুখানি চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙল?

আমি ত জেগেই আছি। পিয়ারী উৎকর্ষিত ঘন্টের সহিত আমার মাথায়  
কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, জ্বর এখন খুব কম। একটুখানি চোখ  
বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর না কেন?

তা ত বরাবরই করচি পিয়ারী! আজ জ্বর আমার ক'দিন হ'ল?

তেরো দিন, বলিয়া সে কতই যেন একটা বর্ষায়সী প্রবীণার মত  
গম্ভীরভাবে কহিল, দেখ, ছেলেপিলেদের সামনে আর আমাকে ও ব'লে ডেকো  
না। চিরকাল লক্ষ্মী বলে ডেকেচো, তাই কেন বল না?

দিন-দুই হইতেই পূর্ণ সচেতন ছিলাম, আমার সমস্ত কথাই স্মরণ  
হইয়াছিল। বলিলাম, আচ্ছা। তারপরে যাহা বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম, মনে  
মনে সেই কথাগুলি একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা  
করচ, কিন্তু তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে চাইনে।

তবে কি করতে চাও?

আমি ভাবছি এখন যেমন আছি, তাতে তিন-চার দিনেই বোধ হয়  
একরকম সেবে যাবো। তোমরা বরঞ্চ এই কটা দিন অপেক্ষা ক'রে বাঢ়ি যাও।

তখন তুমি কি করবে শুনি?

সে যা হয় একটা হবে।

তা হবে, বলিয়া পিয়ারী একটুখানি হাসিল। তার পর সুমুখে উঠিয়া  
আসিয়া খাটের একটা বাজুর উপর বসিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চুপ  
করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া কহিল, তিন-চার দিনে না হোক  
দশ-বারো দিনে এ রোগ সারবে তা জানি, কিন্তু আসল রোগটা কতদিনে সারবে,  
আমাকে বলতে পারো?

আসল রোগ আবার কি?

পিয়ারী কহিল, ভাববে একরকম, বলবে একরকম, করবে আর-  
একরকম—চিরকাল ঐ এক রোগ। তুমি জানো যে একমাসের আগে তোমাকে

চোখের আড়াল করতে পারব না—তবু বলবে—তোমাকে কষ্ট দিলুম, তুমি যাও। ওগো দয়াময়! আমার উপর যদি তোমার এতই দরদ তবে যাই হোক গে—সন্ন্যাসী নও, সন্ন্যাসী সেজে কি হাঙ্গামাই বাধালে! এসে দেখি, মাটির ওপর ছেঁড়া কাঁথায় প’ড়ে অঘোর অচৈতন্য! মাথাটা ধুলো-কাদায় জট পাকিয়েছে; সর্বাঙ্গে রংব্রাক্ষি বাঁধা; হাতে দুগাছা পেতলের বালা। মা গো মা! দেখে কেঁদে বাঁচিনে! বলিতে বলিতেই উদ্দেল অশ্রুজল তাহার দুই চোখ ভরিয়া টলটল করিয়া উঠিল। হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বক্ষু বলে, ইনি কে মা? মনে মনে বললুম, তুই ছেলে, তোর কাছে সে কথা আর কি বলব বাবা! উঃ, কি বিপদের দিনই সে দিনটা গেছে। মাইরি, কি শুভক্ষণেই পাঠশালে দুজনের চার-চক্ষুর দেখা হয়েছিল! যে দুঃখটা তুমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভূ-ভারতে কেউ কখনো কাউকে দেয় নি—দেবে না! শহরের মধ্যে বসন্ত দেখা দিয়েছে—সবাইকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় পালাতে পারলে যে বাঁচি! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সেই রাত্রেই আমরা আরা ত্যাগ করিলাম। একজন ছোকরা ডাক্তারবাবু অনেক প্রকার ঔষধের সরঞ্জাম লইয়া আমাদের পাটনা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে সঙ্গে গেলেন।

পাটনায় পৌঁছিয়া বার-তেরো দিনের মধ্যেই একপ্রকার সারিয়া উঠিলাম। একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। এমন যে ইতিপূর্বে দেখি নাই, তাহা নয়। জিনিসগুলি ভালো এবং বেশি মূল্যের, তা বটে; কিন্তু এই মারোয়াড়ী-পাড়ার মধ্যে এই-সকল ধনী ও অল্পশিক্ষিত শৌখিন মানুষের সংস্করে এত সামান্য জিনিসপত্রেই এ সন্তুষ্ট রহিল কি করিয়া? ইতিপূর্বে আমি আরও যতগুলি এই ধরনের ঘরবার দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত কোথাও কোন অংশে ইহার সাদৃশ্য নাই। সেখানে তুকিলেই মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালও অবস্থান করে কি করিয়া? ইহার বাড়ি,

ଲଞ୍ଛନ, ଛବି, ଦେଓଯାଳଗିରି, ଆୟନା, ପ୍ଲାସକେସେର ମଧ୍ୟେ ଆନନ୍ଦେର ପରିବର୍ତ୍ତ ଆଶଙ୍କା ହ୍ୟ—ସହଜ ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସେର ଅବକାଶଟୁକୁ ଓ ବୁଝି ମିଲିବେ ନା । ବହୁଲୋକେର ବହୁବିଧ କାମନା-ସାଧନାର ଉପହାରରାଶି ଏମନି ଠାସାଠାସି ଗାଦାଗାଦି-ଭାବେ ଚୋଖେ ପଡ଼େ ଯେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତମାତ୍ରେଇ ମନେ ହ୍ୟ, ଏହି ଅଚେତନ ଜିନିସଗୁଲାର ମତ ତାହାଦେର ସଚେତନ ଦାତାରାଓ ଯେଣ ଏହି ବାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ଏକଟୁଖାନି ଜାୟଗାର ଜନ୍ୟ ଏମନି ଭିଡ଼ କରିଯା ପରମ୍ପରେର ସହିତ ରେଷାରେଷି ଠେଲାଠେଲି କରିତେଛେ! କିନ୍ତୁ ଏ ବାଡ଼ିର କୋନ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟେର ଅତିରିକ୍ତ ଏକଟା ବନ୍ଦ୍ର ଚୋଖେ ପଡ଼ିଲ ନା; ଏବଂ ଯାହା ଚୋଖେ ପଡ଼ିଲ, ସେଗୁଲି ଯେ ଗୃହସ୍ଥମନୀର ଆପନାର ପ୍ରୋଜନେଇ ଆହ୍ଵତ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ତାହାର ନିଜେର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିରୁଚିକେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ଆର କାହାର ପ୍ରଲୁକ୍ତ ଅଭିଲାଷ ଯେ ଅନ୍ଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଯା ଜାୟଗା ଜୁଡ଼ିଯା ବସିଯା ନାଇ, ତାହା ଅତି ସହଜେଇ ବୁଝା ଗେଲ । ଆରଓ ଏକଟା ବ୍ୟାପାର ଆମାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଲ । ଏକଟା ନାମଜାଦା ବାଇଜୀର ଗୃହେ ଗାନବାଜନାର କୋନ ଆୟୋଜନ କୋଥାଓ ନାଇ । ଏ-ଘର ସେ-ଘର ସୁରିଯା ଦୋତଳାର ଏକଟା କୋଣେର ଘରେର ଦରଜାର ସୁମୁଖେ ଆସିଯା ଦାଁଡ଼ାଇଲାମ । ଏହି ଯେ ବାଇଜୀର ନିଜେର ଶୟନମନ୍ଦିର, ତାହା ଭିତରେ ଚାହିବାମାତ୍ରେଇ ଟେର ପାଇଲାମ; କିନ୍ତୁ ଆମାର କଲ୍ପନାର ସହିତ ଇହାର କତଇ ନା ପ୍ରଭେଦ!

ଯାହା ଭାବିଯାଛିଲାମ, ତାହାର କିଛୁଇ ନାଇ । ମେଜେଟି ସାଦା ପାଥରେର, ଦେଯାଳଗୁଲି ଦୁଧେର ମତ ସାଦା ଝକ୍ଝକ୍ କରିତେଛେ । ଘରେର ଏକଧାରେ ଏକଟା ଛୋଟ ତତ୍ତ୍ଵପୋଶେର ଉପର ବିଛାନା ପାତା, ଏକଟି କାଠେର ଆଲନାୟ ଖାନ-କରେକ ବନ୍ଦ ଏବଂ ତାହାରଇ ପିଛନେ ଏକଟି ଲୋହର ଆଲମାରି । ଆର କୋଥାଓ କିଛୁ ନାଇ । ଜୁତାପାଯେ ପ୍ରବେଶ କରିତେ କେମନ ଯେନ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ ହଇଲ—ଚୌକାଠେର ବାହିରେ ଖୁଲିଯା ରାଖିଯା ଭିତରେ ଢୁକିଲାମ । ବୋଧ କରି କ୍ଲାନ୍ତିବଶତଃଇ ତାହାର ଶୟାୟ ଆସିଯା ବସିଯାଛିଲାମ, ନା ହଇଲେ ଘରେ ଆର କିଛୁ ବସିବାର ଜାୟଗା ଥାକିଲେ ତାହାତେଇ ବସିତାମ । ସୁମୁଖେର ଖୋଲା ଜାନାଲା ଢାକିଯା ଏକଟା ମନ୍ତ୍ର ନିମଗାଛ; ତାହାରଇ ଭିତର ଦିଯା ଘିରିବିର କରିଯା ବାତାସ ଆସିତେଛିଲ । ସେଇଦିକେ ଚାହିୟା ହଠାତ କେମନ ଏକଟୁ ଅନ୍ୟମନକ୍ଷ ହେଇଯା

পড়িয়াছিলাম। একটা মিষ্টি শব্দে চমকিত হইয়া দেখিলাম, গুণ্ঠন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়াছে। সে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতে আসিয়াছে। সে এদিকে একেবারেই তাকায় নাই। সোজা আলনার কাছে গিয়া শুষ্কবন্ধে হাত দিতেই, আমি ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিলাম—ঘাটে কাপড় নিয়ে যাও না কেন?

পিয়ারী চমকিয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, অ্যাঁ—চোরের মত আমার ঘরে চুকে বসে আছ? না, না, বোস বোস,—যেতে হবে না; আমি ও-ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসছি, বলিয়া লম্বু পদক্ষেপে গরদের কাপড়খানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেক পরে প্রফুল্লমুখে ফিরিয়া আসিয়া, হাসিয়া কহিল, আমার ঘরে ত কিছুই নেই; তবে কি চুরি করতে এসেছিলে বল ত? আমাকে নয় ত?

আমি বলিলাম, আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ পেয়েছ? তুমি আমার এত করলে, আর শেষে তোমাকেই চুরি করব? আমি অত লোভী নই।

পিয়ারীর মুখ স্নান হইয়া গেল। কথাটায় সে যে ব্যথা পাইতে পারে বলিবার সময় তাহা ভাবি নাই। ব্যথা দিবার ইচ্ছাও ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। বিশেষতঃ দুই-একদিনের মধ্যেই আমি প্রস্থানের সন্ধান করিতেছিলাম, বেফাঁস কথাটা সারিয়া লইবার জন্য জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, নিজের জিনিস বুঝি কেউ চুরি করতে আসে? এই বুঝি তোমার বুদ্ধি?

কিন্তু এত সহজে তাকে ভুলানো গেল না। মলিনমুখে কহিল, তোমাকে আর কৃতজ্ঞ হতে হবে না—দয়া করে সে সময়ে যে একটা খবর পাঠিয়েছিলে, এই আমার তের।

তাহার শুন্দি স্নান প্রফুল্লহাসি মুখখানি এই রৌদ্রেজ্জল সকালবেলাটাতেই স্নান করিয়া দিলাম দেখিয়া, একটা বেদনার মত বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল। সেই হাসিটুকুর মধ্যে কি যেন একটা মাধুর্য ছিল যে, তাহা নষ্ট হইবামাত্র ক্ষতিটা

সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফিরিয়া পাইবার আশায় তৎক্ষণাত্ অনুতপ্তস্বরে বলিয়া উঠিলাম, লক্ষ্মী, তোমার কাছে ত লুকানো কিছু নেই—সবই ত জান। তুমি না গেলে আমাকে সেই ধুলোবালির উপরেই ম'রে থাকতে হ'ত, কেউ ততদূর গিয়ে একবার হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা পর্যন্তও করত না। সেই যে চিঠিতে লিখেছিলে, সুখের দিনে না হোক দুঃখের দিনে যেন মনে করি—নেহাঁ পরমায়ু ছিল বলেই কথাটা মনে পড়েছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি।

পারো?

নিশ্চয়।

তা হ'লে আমার জন্যই প্রাণটা ফিরে পেয়েছ বল?

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তা হ'লে ওটা দাবি করতে পারি বল?

তা পার। কিন্তু আমার প্রাণটা এত তুচ্ছ যে, তার পরে তোমার লোভ হওয়াই উচিত নয়।

পিয়ারী এতক্ষণ পরে একটু হাসিয়া বলিল, তবু ভাল যে নিজের দামটা এতদিনে টের পেয়েচ। কিন্তু পরক্ষণেই গন্তীর হইয়া কহিল, তামাশা থাক—অসুখ ত একরকম ভাল হ'ল, এখন যাবে কবে মনে করচ?

তাহার প্রশ্ন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গন্তীর হইয়া কহিলাম, কোথাও যাবার ত আমার এখন তাড়া নেই। তাই আরও কিছুদিন থাকব ভাবছি।

পিয়ারী কহিল, কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজকাল বাঁকিপুর থেকে আসচে। বেশিদিন থাকলে সে হয়ত কিছু ভাবতে পারে।

আমি বলিলাম, ভাবলেই বা। তাকে ত তোমার ভয় ক'রে চলতে হয় না। এমন আরাম ছেড়ে শীত্র কোথাও আমি নড়ছি নে।

পিয়ারী বিরসমুখে বলিল, তা কি হয়! বলিয়া হঠাতে উঠিয়া গেল।

পরদিন বিকালবেলায় আমার ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় একটা  
ইজিচেয়ারে শুইয়া সূর্যাস্ত দেখিতেছিলাম, বক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন  
তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই। একটা চেয়ারে  
বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, বক্ষ, কি পড় তুমি?

চেলেটি অতিশয় সাদাসিধা ভালমানুষ। কহিল, গতবৎসর আমি এন্ট্রাস  
পাশ করেছি।

এখন তা হলে বাঁকিপুর কলেজে পড়চ ত?

আজ্জে হাঁ।

তোমরা ক'টি ভাই-বোন?

ভাই আর নেই। চারটি বোন।

তাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে?

আজ্জে হাঁ। মা-ই বিয়ে দিয়েছেন।

তোমার আপনার মা বেঁচে আছেন?

আজ্জে হাঁ, তিনি দেশের বাড়িতেই আছেন।

তোমার এ মা কখনো তোমাদের দেশের বাড়িতে গেছেন?

অনেকবার। এই ত পাঁচ-ছ'মাস হ'ল এসেছেন।

সেজন্য দেশে কোন গোলযোগ হয় না?

বক্ষ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, হলোই বা। আমাদের ‘একঘরে’  
ক’রে রেখেচে বলে ত আর আমি আপনার মাকে ত্যাগ করতে পারি নে। আর  
অমন মা-ই বা ক’জনের আছে!

মুখে আসিল জিজ্ঞাসা করি, মায়ের উপর এত ভক্তি আসিল কিরূপে?  
কিন্তু চাপিয়া গেলাম।

বক্ষ কহিতে লাগিল, আচ্ছা আপনিই বলুন, গানবাজনা করাতে কি কোন  
দোষ আছে? আমার মা ত শুধু তাই করেন। পরনিন্দে পরচর্চা ত করেন না?

বৰঞ্চ গ্ৰামে আমাদেৱ যাৱা পৱন শক্ৰ, তাৰেই আট-দশজন ছেলেৱ পড়াৰ খৰচ  
দেন; শীতকালে কত লোককে কাপড় দেন, কম্বল দেন। এ কি মন্দ কাজ কৱেন?

আমি বলিলাম, না; এ ত খুব ভাল কাজ।

বন্ধু উৎসাহিত হইয়া কহিল, তবে বলুন ত। আমাদেৱ গাঁয়েৱ মত পাজী  
গাঁ কি কোথাও আছে? এই দেখুন না, সে বছৱ ইঁট পুড়িয়ে আমাদেৱ কোঠা-  
বাড়ি তৈৱি হল। গ্ৰামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখে মা আমাৰ মাকে বললেন, দিদি,  
আৱও কিছু টাকা খৰচ কৱে ইঁটখোলাটাকেই একটু পুৰুৱ কাটিয়ে দিই। তিন-  
চার হাজাৱ টাকা খৰচ ক'ৱে তাই ক'ৱে দিলেন, ঘাট বাধিয়ে দিলেন। কিন্তু  
গাঁয়েৱ লোক সে পুৰুৱ মাকে প্ৰতিষ্ঠা কৱতে দিলে না। অমন জল—কিন্তু কেউ  
খাবে না, ছোঁবে না, এমনি বজ্জাত লোক। কেবল এই হিংসায় সবাই মৱে যায়  
যে আমাদেৱ কোঠাৰাড়ি তৈৱি হ'ল! বুৰলেন না?

আমি আশচৰ্য হইয়া বলিলাম, বল কি হে! এই দারুণ জলকষ্ট ভোগ  
কৱবে, তবু অমন জল ব্যবহাৱ কৱবে না?

বন্ধু একটু হাসিয়া কহিল, তাই ত। কিন্তু সে কি বেশি দিন চলে? প্ৰথম  
বছৱ ভয়ে কেউ সে জল ছুলে না, কিন্তু এখন ছোটলোকেৱা সবাই নিচ্ছে, খাচ্ছে—  
বামুন-কায়েতোৱা চৈত্ৰ-বৈশাখ মাসে লুকিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু তবু, পুৰুৱ  
প্ৰতিষ্ঠা কৱতে দিলে না—এ কি মায়েৱ কম কষ্ট?

আমি কহিলাম, নিজেৱ নাক কেটে পৱেৱ যাত্রা ভাঙ্গবাৱ যে একটা কথা  
আছে, এ যে দেখি তাই।

বন্ধু জোৱ দিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই! এমন গাঁয়ে আলাদা, একঘৰে  
হয়ে থাকাই শাপে বৱ। আপনি কি বলেন? প্ৰত্যন্তৰে আমি শুধু হাসিয়া ঘাড়  
নাড়িলাম। হাঁ-না স্পষ্ট কৱিয়া কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সেজন্য বন্ধুৱ উদ্দীপনা  
বাধা পাইল না। দেখিলাম, ছেলেটি তাহাৱ বিমাতাকে সত্যই ভালবাসে। অনুকূল

শ্রোতা পাইয়া শক্তির আবেগে সে দেখিতে দেখিতে মাতিয়া উঠিল এবং তাঁহার অজস্র স্মৃতিবাদে আমাকে প্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময়ে তাহার হৃঁশ হইল যে, এতক্ষণের মধ্যে আমি একটি কথাতেও কথা যোগ করি নাই। তখন সে অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না, কাল সকালেই আমি যাচ্ছি।

কাল?

হাঁ, কালই।

কিন্তু আপনার দেহ ত এখনো সবল হয়নি। অসুখটা একেবারে সেরেচে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে?

বলিলাম, সকাল পর্যন্ত সেরেচে বলেই মনে হয়েছিল বটে; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না। আজ দুপুর থেকেই আবার মাথাটা ধরেছে।

তবে কেন এত শীঘ্ৰ যাবেন? এখানে ত আপনার কোন কষ্ট নেই, বলিয়া ছেলেটি চিন্তিতমুখে আমার মুখের পানে চাহিয়া রাখিল।

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া তাহার মুখের উপর ভিতরের যথার্থ কথাটা পড়িতে চেষ্টা করিলাম, যতটা পড়িলাম, তাহাতে সত্য গোপনের কোন প্রয়াস অনুভব করিলাম না। তবে, ছেলেটি লজ্জা পাইল বটে; এবং সেই লজ্জাটা ঢাকিয়া ফেলিবারও চেষ্টা করিল; কহিল, আপনি এখন যাবেন না।

কেন বল দেখি?

আপনি থাকলে মা বড় আনন্দে থাকেন। বলিয়া ফেলিয়াই মুখ রাঙ্গা করিয়া চট্ট করিয়া উঠিয়া গেল। দেখিলাম, ছেলেটি খুব সরল বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়। পিয়ারী কেন যে বলিয়াছিল, আর বেশি দিন থাকলে আমার ছেলে কি ভাববে। কথাটার সহিত ছেলেটির ব্যবহার আলোচনা করিয়া অর্থটা যেন বুঝিতে

পারিলাম বলিয়া বোধ হইল; মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায় যেন একটা নৃতন জ্ঞান লাভ করিলাম। পিয়ারীর হস্তয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়; এবং সে যে সংসারে সব দিক্ দিয়া সর্বপ্রকারেই স্বাধীন, তাহাও কল্পনা করা বোধ করি পাপ নয়। তবুও সে যে মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃ পদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শত পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে! তাহার অসংযত কামনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাউক, কিন্তু এ কথাও সে ভুলিতে পারেনা—সে একজনের মা!

এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করিতে পারে না! তাহার বিহুল-যৌবনের লালসামত বসন্ত-দিনে কে যে ভালবাসিয়া তাহার পিয়ারী নাম দিয়াছিল, আমি জানি না; কিন্তু এই নামটা পর্যন্ত সে তাহার ছেলের কাছে গোপন করিতে চায়, এই কথাটা আমার স্মরণ হইয়া গেল।

চোখের উপর সূর্য অস্ত গেল। সেই দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গলিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না। আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এত দিন চলুক না, মেহ যতই মাধুর্য ঢালিয়া দিক না, উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবারবেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাতে বক্ষুর মা অব্রতেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রূদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে মনে বলিলাম, কাল সকালেই ত আমি এখান হইতে যাইতেছি, কিন্তু তখন যেন মনের মধ্যে লাভালাভের হিসাব করিতে গিয়া হাতের পাঁচ রাখিবার চেষ্টা না করি। আমার এই ঘাওয়াটা, যেন ঘাওয়াই হয়। দেখিতে

পাই নাই—ছল করিয়া, একখানি অতিসূক্ষ্ম বাসনার বাঁধন রাখিয়া না যাই, যাহার সূত্র ধরিয়া আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

অন্যমনক্ষ হইয়া সেইখানেই বসিয়া ছিলাম। সন্ধ্যার সময় ধুনুচিতে ধৃপধুনা দিয়া সেটা হাতে করিয়া রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর একটা ঘরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাথা ধরেচে, হিমে বসে কেন, ঘরে যাও।

হাসি পাইল। বলিলাম, অবাক করলে লক্ষ্মী! হিম এখানে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হিম না থাক্, ঠাণ্ডা বাতাস ত বইচে। সেইটাই কোন্ ভাল?

না, সেও তোমার ভুল। ঠাণ্ডা-গরম কোন বাতাসই বইচে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার সমস্তই ভুল। কিন্তু মাথাধরাটা ত আর আমার ভুল নয়—সেটা ত সত্যি? ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড় না! রতন কি করচে? সে কি একটু ওডিকোলন মাথায় দিতে পারে না? এ বাড়ির চাকরগুলোর মত ‘বাবু’-চাকর আর পৃথিবীতে নেই। বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

রতন যখন ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া ওডিকোলন, জল প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল, এবং তাহার ভুলের জন্য বারংবার অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রতন সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, এতে আমার যে দোষ নেই, সে কি আমি জানিনে বাবু? কিন্তু মাকে ত বলবার জো নেই যে, তুমি রেংগে থাকলে মিছিমিছি বাড়িশুন্দ লোকের দোষ দেখতে পাও।

কৌতূহলী হইয়াই প্রশ্ন করিলাম, রাগ কেন?

রতন কহিল, সে কি কারো জানবার জো আছে? বড়লোকের রাগ বাবু শুধু শুধু হয় আবার শুধু শুধু যায়। তখন গা-তাকা দিয়ে না থাকতে পারলেই চাকর-বাকরদের প্রাণ গেল! দ্বারের নিকট হইতে হঠাতে প্রশ্ন আসিল, তখন

তোদের কি আমি মাথা কেটে নিই রে রতন? আর বড়লোকের বাড়িতে যদি এত  
জ্বালা ত আর কোথাও যাস্নে কেন?

মনিবের প্রশ্নে রতন কৃষ্ণিত অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী  
কহিল, তোর কাজটা কি? ওঁর মাথা ধরেছে—বক্ষুর মুখে শুনে আমি তোকে  
জানালুম। তাই এখন আট্টা রাস্তিরে এসে আমার সুখ্যাতি গাইচিস্। কাল থেকে  
আর কোথাও কাজের চেষ্টা করিস্—এখানে হবে না! বুবালি?

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে, রতন ওডিকোলন জল দিয়া আমার মাথায়  
বাতাস করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তৎক্ষণাত ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,  
কাল সকালেই নাকি বাড়ি যাবে? আমার যাবার সন্ধিল্ল ছিল বটে, কিন্তু বাড়ি  
ফিরিবার সন্ধিল্ল ছিল না। তাই প্রশ্নটার আর-একরকম করিয়া জবাব দিলাম, হাঁ,  
কাল সকালেই যাব।

সকাল ক'টার গাড়িতে যাবে?

সকালেই বেরিয়ে পড়ব—তাতে যে গাড়ি জোটে।

আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবলের জন্য কাউকে নাহয় স্টেশনে পাঠিয়ে  
দিই গে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপরে যথাসময়ে রতন কাজ সারিয়া প্রস্থান করিল। নীচে ভূত্যদের  
শব্দসাড়া নীরব হইল; বুঝিলাম, সকলেই এবার নিদ্রার জন্য শয্যাশ্রয় করিয়াছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটা কথা  
কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিয়ারী বিরক্ত হইল কেন? এমন কি করিয়াছি  
যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যে অধীর হইয়া উঠিয়াছে? রতন বলিয়াছিল,  
বড়লোকের ক্রোধ শুধু শুধু হয়। কথাটা আর কোন বড়লোকের সম্বন্ধে খাটে কি  
না জানি না, কিন্তু পিয়ারীর সম্বন্ধে কিছুতেই খাটে না। সে যে অত্যন্ত সংযমী  
এবং বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি; এবং আমার নিজেরও বুদ্ধি  
নাই থাক, প্রবৃত্তি-সম্পর্কে সংযম তার চেয়ে কম নয়—বোধ করি কারও চেয়ে

কম নয়। বুকের মধ্যে যাই হোক, মুখ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনা আমার অতি বড় বিকারের ঘোরেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। ব্যবহারেও কোন দিন কিছু ব্যক্ত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাহার নিজের কার্যের দ্বারা লজ্জার হেতু কিছু ঘটিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা; কিন্তু আমার উপর রাগ করিবার তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। সুতরাং বিদায়ের সময় তাহার এই ওদ্দাসীন্য আমাকে যে বেদনা দিতে লাগিল, তাহা অকিঞ্চিতকর নয়।

অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে তুকিয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া, ও-দিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয্যার কাছে আসিয়া এক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উভাপ অনুভব করিল, পরে জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উভাপ বারংবার অনুভব করিতে লাগিল। নিঃতচারিণীর এই গোপন করস্পর্শে প্রথমটা কৃষ্ণিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল, সংজ্ঞাহীন রোগে সেবা করিয়া যে চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে আমার লজ্জা পাইবার আছে কি। তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্যন্ত টানিয়া দিল; শেষে মশারির ধারণুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অতঙ্গ সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্ত বুঝিলাম। যে গোপনেই আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশ্চীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সকালে প্রস্ফুট জ্বর লইয়াই ঘূম ভঙ্গিল। চোখ-মুখ জ্বালা করিতেছে, মাথা এত ভারি যে, শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তবু যাইতেই হইবে। এ বাটীতে নিজেকে আর এক দণ্ড বিশ্বাস নাই, সে যে-কোন মুহূর্তেই ভাঙিয়া পড়িতে

পারে। নিজের জন্যও তত নয়। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জন্যই রাজলক্ষ্মীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র দ্বিধা করা চলিবে না।

মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, সে তাহার বিগত জীবনের কালি অনেকখানিই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার চারিপাশে ছেলে-মেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রীতি ও ভক্তির আনন্দধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া, ছিনাইয়া বাহির করিয়া আনিব—এত বড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশ্যে আমার জীবন অধ্যায়েই চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে?

পিয়ারী ঘরে চুকিয়া কহিল, এখন দেহটা কেমন আছে?

বলিলাম, খুব মন্দ নয়! যেতে পারব।

আজ না গেলেই কি নয়?

হাঁ, আজ যাওয়া চাই।

তা হলে বাড়ি পৌঁছেই একটা খবর দিয়ো। নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।

তাহার অবিচলিত ধৈর্য দেখিয়া মুঞ্চ হইয়া গেলাম। তৎক্ষণাত সম্মত হইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আমি বাড়িতেই যাব। আর গিয়েই তোমাকে খবর দেব।

পিয়ারী বলিল, দিয়ো। আমিও চিঠি লিখে তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বাহিরে পালকিতে যখন উঠিতে যাইতেছি, দেখি দ্বিতলের বারান্দায় পিয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুকের ভিতরে যে কি করিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমার অনন্দাদিদিকে মনে পড়িল। বহুকাল পূর্বের একটা শেষদিনে তিনিও যেন ঠিক এম্বিনি গভীর, এম্বিনি স্তুর হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সেই দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি আমি আজিও ভুলি নাই, কিন্তু সে চাহনিতে যে

তখন কত বড় একটা আসন্ন-বিদায়ের ব্যথা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পড়িতে পারি নাই। কি জানি, আজিও তেমনি ধারা একটা-কিছু ওই দুটি নিবিড় কালো চোখের মধ্যেও আছে কি না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া পালকিতে উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখেশ্বর্য-পরিপূর্ণ মেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত। বাহকেরা পালকি লইয়া স্টেশন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিলাম, লক্ষ্মী, দুঃখ করিয়ো না ভাই, এ ভালই হইল যে, আমি চলিলাম। তোমার খণ ইহজীবনের শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে জীবন তুমি দান করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সন্ধান আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।

## ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ

### ଏକ

ଏই ଛନ୍ଦଚାଡ଼ା ଜୀବନେର ସେ ଅଧ୍ୟାୟଟା ସେଦିନ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର କାହେ ଶେଷ ବିଦାୟେର କ୍ଷଣେ ଚୋଖେର ଜଳେର ଭିତର ଦିଯା ଶେଷ କରିଯା ଦିଯା ଆସିଯାଛିଲାମ, ମନେ କରି ନାହିଁ, ଆବାର ତାହାର ଛିନ୍ନ-ସୂତ୍ର ଯୋଜନା କରିବାର ଜନ୍ୟ ଆମାର ଡାକ ପଡ଼ିବେ । କିନ୍ତୁ ଡାକ ସଥନ ସତ୍ୟଇ ପଡ଼ିଲ, ତଥନ ବୁଝିଲାମ, ବିଶ୍ୱଯ ଏବଂ ସଙ୍କୋଚ ଆମାର ଯତ ବୁଝି ହୋଇ, ଏ ଆହ୍ଵାନ ଶିରୋଧାର୍ୟ କରିତେ ଲେଶମାତ୍ର ଇତ୍ସତଃ କରା ଚଲିବେ ନା ।

ତାଇ, ଆଜ ଆବାର ଏହି ଅଷ୍ଟ ଜୀବନେର ବିଶ୍ୱଜ୍ଞଲ ଘଟନାର ଶତଚିନ୍ମ ଗ୍ରହିଣୀ ଆର ଏକବାର ବାଧିତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଇଯାଛି ।

ଆଜ ମନେ ପଡ଼େ, ବାଡ଼ି ଫିରିଯା ଆସାର ପରେ ଆମାର ଏହି ସୁଖେ-ଦୁଃଖେ-ମେଶାନୋ ଜୀବନଟାକେ କେ ଯେନ ହଠାତ୍ କାଟିଯା ଦୁଇ ଭାଗେ ଭାଗ କରିଯା ଦିଯାଛିଲ । ତଥନ ମନେ ହଇଯାଛିଲ, ଆମାର ଏ ଜୀବନେର ଦୁଃଖେର ବୋବା ଆର ଆମାର ନିଜେର ନୟ । ଏ ବୋବା ବହିଯା ବେଡ଼ାକ ସେ, ଯାହାର ନିତାନ୍ତ ଗରଜ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆମି ଯେ ଦୟା କରିଯା ବାଁଚିଯା ଥାକିବ, ଏହି ତ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭାଗ୍ୟ । ଚୋଖେ ଆକାଶେର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଯା ଗେଲ, ବାତାସେର ସ୍ପର୍ଶ ଆର-ଏକରକମ କରିଯା ଗାୟେ ଲାଗିତେ ଲାଗିଲ,—କୋଥାଓ ଯେନ ଆର ଘର-ବାର, ଆପନାର-ପର ରହିଲ ନା । ଏମନି ଏକପ୍ରକାର ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଉତ୍ସାହେ ଅନ୍ତର-ବାହିର ଏକାକାର ହଇଯା ଉଠିଲ ଯେ, ରୋଗକେ ରୋଗ ବଲିଯା, ବିପଦକେ ବିପଦ ବଲିଯା, ଅଭାବକେ ଅଭାବ ବଲିଯା ଆର ମନେଇ ହଇଲ ନା । ସଂସାରେର କୋଥାଓ ଯାଇତେ, କୋନ୍ତ କିଛୁ କରିତେ ଦ୍ୱିଧା-ବାଧାର ଯେନ ଆର ଲେଶମାତ୍ର ସଂସ୍ରବ ରହିଲ ନା ।

ଏସବ ଅନେକ ଦିନେର କଥା । ସେ ଆନନ୍ଦ ଆର ଆମାର ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସେଦିନେର ଏହି ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସେର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିର୍ଭରତାର ସ୍ଵାଦ ଏକଟା ଦିନେର ଜନ୍ୟଓ ଯେ ଜୀବନେ ଉପଭୋଗ କରିତେ ପାଇଯାଛି, ଇହାଇ ଆମାର ପରମ ଲାଭ । ଅର୍ଥଚ ହାରାଇଯାଛି ବଲିଯାଓ

কোন দিন ক্ষেত্র করি না। শুধু এই কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয়, যে-শক্তি সেদিন এই হৃদয়টার ভিতর হইতেই জাগ্রত হইয়া, এত সত্ত্বর সংসারের সমস্ত নিরানন্দকে হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে কি বিরাট শক্তি! আর মনে হয়, সেদিন আমারই মত আর দুটি অক্ষম, দুর্বল হাতের উপর এতবড় গুরুভারটা চাপাইয়া না দিয়া, যদি সমস্ত জগদ্ব্রক্ষাণের ভারবাহী সেই দুটি হাতের উপরেই আমার সেদিনের সে অখণ্ড বিশ্বাসের সমস্ত বোৰা সঁপিয়া দিতে শিখিতাম, তবে আজ আর আমার ভাবনা কি ছিল? কিন্তু যাক সেকথা।

রাজলক্ষ্মীকে পৌঁছান সংবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে চিঠির জবাব আসিল অনেকদিন পরে। আমার অসুস্থ দেহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া, অতঃপর সংসারী হইবার জন্য সে আমাকে কয়েকটা মোটা রকমের উপদেশ দিয়াছে, এবং সংক্ষিপ্ত পত্র শেষ করিয়াছে এই বলিয়া যে, সে কাজের ঝঝঝাটে সময়মত পত্রাদি লিখিতে না পারিলেও আমি যেন মাঝে মাঝে নিজের সংবাদ দিই, এবং তাহাকে আপনার লোক মনে করি।

তথাস্ত! এতদিন পরে সেই রাজলক্ষ্মীর এই চিঠি!

আকাশকুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল, এবং যে দুই-একটা শুকনা পাপড়ি বাতাসে ঝরিয়া পড়িল, তাহাদের কুড়াইয়া ঘরে তুলিবার জন্যও মাটি হাতড়াইয়া ফিরিলাম না। চোখ দিয়া যদিবা দু-এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে ত, হয়ত পড়িয়াছে, কিন্তু সে কথা আমার মনে নাই। তবে এ কথা মনে আছে যে, দিনগুলা আর স্বপ্ন দিয়া কাটিতে চাহিল না। তবুও এমনিভাবে আরও পাঁচ-ছয় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি, হঠাৎ একখানা অদ্ভুত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরে মেঝেলী কাঁচা অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা। খুলিতেই পত্রের ভিতর হইতে একখানি ছোট পত্র ঠুক করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া তাহার অক্ষর এবং নাম-সহের পানে চাহিয়া সহসা

নিজের চোখ-দুটাকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার যে মা দশ  
বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই শ্রীহস্তের লেখা। নাম-সই তাঁরই।  
পড়িয়া দেখিলাম, মা তাঁর ‘গঙ্গাজল’কে যেমন করিয়া অভয় দিতে হয়, তা  
দিয়াছেন। ব্যাপারটা সম্ভবত: এই যে, বছর বারো-তেরো পূর্বে এই ‘গঙ্গাজলে’র  
যথন অনেক বয়সে একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ দৈন্য এবং  
দুশ্চিন্তা জানাইয়া মাকে বোধ করি পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে  
আমার স্বর্গবাসিনী জননী এ গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া  
যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখানি সেই মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত  
হইয়া মা উপসংহারে লিখিয়াছেন, সুপাত্র আর কোথাও না জোটে, তাঁর নিজের  
হেলে ত আছে! তা বটে! সংসারে সুপাত্রের যদিবা একান্ত অভাব হয়, তখন  
আমি ত আছি! সমস্ত লেখাটা আগাগোড়া বার-দুই পড়িয়া দেখিলাম, মুসিয়ানা  
আছে বটে। মার উকিল হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যত প্রকারে কল্পনা করা  
যাইতে পারে, তিনি নিজেকে, মায় তাঁর বংশধরটিকেও দায়িত্বে বাঁধিয়া গিয়াছেন।  
দলিলের কোথাও এতটুকু ক্রটি রাখিয়া যান নাই।

সে যাই হোক, গঙ্গাজল যে এই সুদীর্ঘ তেরো বৎসর কাল এই পাকা  
দলিলটির উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নীরবে বসিয়া ছিলেন, তাহা মনে  
হইল না। বরঞ্চ মনে হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থ ও লোকাভাবে সুপাত্র যথন  
তাঁহার পক্ষে একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনূটা কন্যার শারীরিক  
উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকে বুকের রক্ত মগজে চড়িবার উপক্রম  
করিয়াছে, তখনই এই হতভাগা সুপাত্রের উপর তাঁহার একমাত্র ব্রহ্মাণ্ড নিষ্কেপ  
করিয়াছেন।

মাতা বাঁচিয়া থাকিলে এই চিঠির জন্য আজ তাঁর মাথা খাইয়া ফেলিতাম।  
কিন্ত এখন যে উঁচুতে বসিয়া তিনি হাসিতেছেন, সেখানে লাফ দিয়াও যে তাঁর

পায়ের তলায় সজোরে একটা টুঁ মারিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইব, সে-পথও আমার  
বন্ধ হইয়া গেছে।

সুতরাং মায়ের কিছু না করিতে পারিয়া, তাঁর গঙ্গাজলের কি করিতে  
পারি না পারি, পরখ করিবার জন্য একদিন রাত্রে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত  
হইলাম। সারারাত্রি ট্রেনে কাটাইয়া পরদিন তাঁহার পল্লীভবনে আসিয়া যখন  
পৌঁছিলাম, তখন বেলা অপরাহ্ন। গঙ্গাজল-মা প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিলেন  
না। শেষে পরিচয় পাইয়া এই তেরো বৎসর পরে এমন কানাই কাঁদিলেন যে,  
মায়ের মৃত্যুকালে তাঁর কোন আপনার লোক চোখের উপর তাঁকে মরিতে  
দেখিয়াও এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বলিলেন, লোকতঃ ধর্মতঃ তিনিই এখন আমার মাতৃস্থানীয়া এবং দায়িত্ব  
গহণের প্রথম সোপান-স্বরূপ আমার সাংসারিক অবস্থা পুজ্ঞানুপুজ্ঞরূপে  
পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবা কত রাখিয়া গিয়াছেন, মায়ের কি কি  
গহনা আছে, এবং তাহা কাহার কাছে আছে, আমি চাকরি করি না কেন, এবং  
করিলে কত টাকা আন্দাজ মাহিনা পাইতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার মুখ  
দেখিয়া মনে হইল, এই আলোচনার ফল তাঁহার কাছে তেমন সন্তোষজনক হইল  
না। বলিলেন, তাঁর কোন-এক আত্মীয় বর্মামুল্লকে চাকরি করিয়া ‘লাল’ হইয়া  
গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে-ঘাটে টাকা ছড়ানো  
আছে—শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষামাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না  
নামিতে বাঙালীদের সাহেবেরা কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া চাকরি দেয়—এইরূপ  
অনেক কাহিনী।

পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভাস্তু বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে, এমন  
অনেক লোকই এই মায়া-মরীচিকায় উন্মত্প্রায় হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়  
সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে এবং মোহভঙ্গের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে  
আমাদের কম ক্লেশ সহিতে হয় নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। গঙ্গাজল-মায়ের

বর্মামুঞ্জুকের বিবরণ আমাকে তীরের মত বিঁধিল। ‘লাল’ হইবার আশায় নহে—আমার মধ্যে যে ‘ভবঘুরে’টা কিছুদিন হইতে বিমাইতেছিল, সে তাহার শ্রান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া হইয়া উঠিল। যে সমুদ্রকে ইতিপূর্বে শুধু দূর হইতে দেখিয়াই মুঞ্চ হইয়া গিয়াছিলাম, সেই অনন্ত অশ্রান্ত জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে পাইব, এই চিন্তাই আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কোন মতে একবার ছাড়া পাইলে হয়।

মানুষকে মানুষ যতপ্রকারে জেরা করিতে পারে, তাহার কোনটাই গঙ্গাজল-মা আমাকে বাদ দেন নাই। সুতরাং নিজের মেয়ের পাত্র হিসাবে আমাকে যে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি একপ্রকার নিশ্চিন্তাই ছিলাম। কিন্তু রাত্রে খাবার সময় তাঁহার ভূমিকার ধরন দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাকে একেবারে হাতছাড়া করা তাঁহার অভিধায় নয়। তিনি এই বলিয়া শুরু করিলেন যে, মেয়ের বরাতে সুখ না থাকিলে, যেমন কেন না টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি, বিদ্যা-সাধ্য দেখিয়া দাও, সমস্তই নিষ্ফল; এবং এ সম্বন্ধে নামধাম, বিবরণাদি সহযোগে অনেকগুলি বিশ্বাসযোগ্য নজির তুলিয়াও বিফলতার প্রমাণ দেখাইয়া দিলেন। শুধু তাই নয়। অন্য পক্ষে এমন কতকগুলি লোকের নাম উল্লেখ করিলেন, যাহারা আকাট-মূর্খ হইয়াও, সুন্দরী আয়-পয়ের জোরেই সম্প্রতি টাকার উপরে দিবারাত্রি উপবেশন করিয়া আছে।

আমি তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, টাকা জিনিসটার প্রতি আমার আসঙ্গি থাকিলেও চরিষ ঘণ্টা তাহার উপরেই উপবেশন করিয়া থাকাটা আমি প্রীতিকর বিবেচনা করি না; এবং এজন্য স্তৰীর আয়-পয় যাচাই করিয়া দেখিবার কৌতুহলও আমার নাই। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তাঁহাকে নিরস্ত করা গেল না। কারণ যিনি সুনীর্ধ তেরো বৎসর পরেও এমন একটা পত্রকে দলিলরূপে দাখিল করিতে পারেন, তাঁহাকে এত সহজে ভুলানো যায় না। তিনি বার বার

বলিতে লাগিলেন, ইহাকে মায়ের ঝণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত এবং যে সন্তান সমর্থ হইয়াও মাতৃঝণ পরিশোধ করে না—সে ইত্যাদি।

যখন নিরতিশয় শক্তিত ও উদ্ভান্ত হইয়া উঠিয়াছি, তখন কথায় কথায় অবগত হইলাম, নিকটবর্তী গ্রামে একটি সুপাত্র আছে বটে, কিন্তু পাঁচ শত টাকার কম তাহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি চোখে পড়িল। মাসখানেক পরে যা হোক একটা উপায় করিব—কথা দিয়া, পরদিন সকালেই প্রস্থান করিলাম। কিন্তু উপায় কি করিয়া করিব—কোন দিকে চাহিয়া তাহার কোন কিনারা দেখিতে পাইলাম না।

আমার উপরে আরোপিত এই বাঁধনটা যে আমার পক্ষে সত্যকার বস্তু হইতেই পারে না, তাহা অনেক করিয়া নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম; কিন্তু তথাপি মাকে তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির ফাঁস হইতে অব্যাহতি না দিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার কথাও কোনমতে ভাবিতে পারিলাম না।

বোধ করি, এক উপায় ছিল, পিয়ারীকে বলা; কিন্তু কিছুদিন পর্যন্ত এ সমস্কেও মনস্থির করিতে পারিলাম না। অনেকদিন হইল, তাহার সংবাদও জানিতাম না। সেই পৌঁছান খবর ছাড়া আমিও আর চিঠি লিখি নাই, সেও তাহার জবাব দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পত্র লেখে নাই। বোধ করি, চিঠিপত্রের ভিতর দিয়াও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, এ তার অভিপ্রায় ছিল না। অন্তত: তাহার সেই একটা চিঠি হইতে আমি এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। তবুও আশ্চর্য এই যে, পরের মেয়ের জন্য ভিক্ষার ছলে একদিন যথার্থই পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া নীচের বসিবার ঘরের বারান্দায় দেখিলাম, দুজন উদ্দিপরা দরোয়ান বসিয়া আছে। তাহারা হঠাৎ একটা শ্রীহীন অপরিচিত আগন্তুক দেখিয়া এমন করিয়া চাহিয়া রহিল যে, আমার সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। ইহাদের পূর্বে দেখি নাই। পিয়ারীর সাবেক বুড়া দরোয়ানজীর

পরিবর্তে কেন যে তাহার এমন দুজন বাহারে দরোয়ানের আবশ্যক হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাই হোক, ইহাদের অগ্রহ করিয়া উপরে উঠিয়া যাইব কিংবা সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিব, স্থির করিতে না করিতে দেখি, রতন ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। অকস্মাত আমাকে দেখিয়া সে প্রথমে অবাক হইয়া গেল। পরে পায়ের কাছে চিপ্প করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন? এখানে দাঁড়িয়ে যে?

এইমাত্র আসচি রতন। খবর সব ভাল?

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সব ভাল বাবু। ওপরে যান—আমি বরফ কিনে নিয়ে এখনি আসচি, বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তোমার মনিব ঠাকরুন ওপরেই আছেন?

আছেন, বলিয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ঠিক পাশের ঘরটাই বসিবার ঘর। ভিতর হইতে একটা উচ্চ হাসির শব্দ এবং অনেকগুলি লোকের গলা কানে গেল। একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আগের বারে এ ঘরটার ব্যবহার হইতে দেখি নাই। নানাপ্রকার আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিস একটা কোণে গাদা করিয়া রাখা থাকিত, বড় কেহ এ ঘরে আসিত না। আজ দেখি, সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া বিছানা। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপর শুভ্র জাজিম ধপ্ধপ্ত করিতেছে। তাকিয়াগুলার অড় পরানো হইয়াছে, এবং তাহারই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক আশ্চর্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের পরনে বাঙালীর মত ধূতি-পিরান থাকিলেও, মাথার উপর কাজ-করা মসলিনের টুপিতে বেহারী বলিয়াই মনে হইল। এক জোড়া বাঁয়া-তবলার কাছে একজন হিন্দুস্থানী তবল্চি এবং তাহারই অদূরে বসিয়া পিয়ারী বাইজী নিজে। একপাশে একটা ছোট হারমোনিয়াম।

পিয়ারীর গায়ে মুজ্রার পোশাক ছিল না বটে, কিন্তু সাজসজ্জারও অভাব ছিল না। বুঝিলাম, এটা সঙ্গীতের বৈঠক—ক্ষণকাল বিশ্রাম চলিতেছে মাত্র।

আমাকে দেখিয়া পিয়ারীর মুখের সমস্ত রক্ত কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। তার পরে জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, এ কি! শ্রীকান্তবাবু যে! কবে এলেন?

আজই।

আজই? কখন? কোথা উঠলেন?

ক্ষণকালের জন্য হয়ত বা একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকিব, না হইলে জবাব দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইতেও বিলম্ব হইল না। বলিলাম, এখানকার সমস্ত লোককেই ত তুমি চেন না, নাম শুনলে চিনতে পারবে না।

যে ভদ্রলোকটি সবচেয়ে জমকাইয়া বসিয়াছিলেন, বোধ করি এ যজ্ঞের যজমান তিনিই। বলিলেন, আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে; বলিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। তাবে বুঝাইলেন যে, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা তিনি ঠিক আঁচ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে একটা সসম্মান অভিবাদন করিয়া জুতার ফিতা খুলিবার ছলে মুখ নিচু করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া লইতে চাহিলাম।

বিচারের সময় বেশি ছিল না বটে, কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এটা স্থির করিয়া ফেলিলাম যে, ভিতরে আমার যাই থাক, বাহিরের ব্যবহারে তাহা কোনমতেই প্রকাশ পাইলে চলিবে না। আমার মুখের কথায়, আমার চেখের চাহনিতে, আমার সমস্ত আচরণের কোন ফাঁক দিয়া যেন অন্তরের ক্ষেত্র বা অভিমানের একটি বিন্দুও বাহিরে আসিয়া না পড়িতে পারে। ক্ষণকাল পরে ভিতরে সকলের মধ্যে আসিয়া যখন উপবেশন করিলাম, তখন নিজের মুখের চেহারাটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু অন্তরে অনুভব করিলাম যে, তাহাতে অপ্রসন্নতার চিহ্ন লেশমাত্রও আর নাই। রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া সহাস্যে

কহিলাম, বাইজীবিবি, আজ শুকদেব ঠাকুরের ঠিকানা পেলে তাঁকে তোমার সামনে বসিয়ে একবার মনের জোরটা তাঁর যাচাই করে নিতুম। বলি, করেচ কি? এ যে রূপের সমুদ্র বইয়ে দিয়েচ!

প্ৰশংসা শুনিয়া কৰ্মকৰ্ত্তা বাবুটি আহুদে গলিয়া বারংবার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। তিনি পূর্ণিয়া জেলার লোক; দেখিলাম, তিনি বাঙলা বলিতে না পারলেও বেশ বুঝেন। কিন্তু পিয়ারীর কান পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেটা যে লজ্জায় নয়—রাগে, তাহাৰ বুঝিতে আমাৰ বাকি রহিল না। কিন্তু জ্ঞক্ষেপ কৱিলাম না, বাবুটিকে উদ্দেশ কৱিয়া তেমনি হাসিমুখে বাঙলা কৱিয়া কহিলাম, আমাৰ আসাৰ জন্যে আপনাদেৱ আমোদ-আহুদেৱ যদি এতটুকু বিঘ্ন হয় ত অত্যন্ত দুঃখিত হব। গানবাজনা চলুক।

বাবুটি এত খুশি হয়ে উঠিলেন যে আবেগে আমাৰ পিঠেৰ উপৰ একটা চাপড় মারিয়া বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা বাবু!—পিয়ারীবিবি, একঠো ভালা সঙ্গীত হোক।

সন্ধ্যাৰ পৰে হবে—আৱ এখন নয়, বলিয়া পিয়ারী হারমোনিয়ামটা দূৰে ঠেলিয়া দিয়া সহসা উঠিয়া গেল।

এইবার বাবুটি আমাৰ পৱিচয় গ্ৰহণেৰ উপলক্ষে নিজেৰ পৱিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁৰ নাম রামচন্দ্ৰ সিংহ। তিনি পূর্ণিয়া জেলাৰ একজন জমিদাৰ, দ্বাৰভাঙাৰ মহারাজ তাঁৰ কুটুম্ব, পিয়ারীবিবিকে তিনি সাত-আট বৎসৱ হইতে জানেন। সে তাঁৰ পূর্ণিয়াৰ বাড়িতে তিনি-চাৱবাৰ মুজৰা কৱিয়া আসিয়াছে। তিনি নিজেও অনেকবাৰ এখানে গান শুনিতে আসেন; কখনও কখনও দশ-বাৰো দিন পৰ্যন্ত থাকেন—মাস-তিনেক পূৰ্বেও একবাৰ আসিয়া এক সপ্তাহ বাস কৱিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কেন আসিয়াছি—এইবার তাহা জিজ্ঞাসা কৱিলেন।

আমি উত্তর দিবার পূর্বেই পিয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, বাইজীকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন এসেচি।

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিল, কিন্তু জবাব দিল সহজ শান্ত স্বরে; কহিল, উনি আমার দেশের লোক।

আমি হাসিয়া কহিলাম, বাবুজী, মধু থাকলেই মৌমাছি এসে জোটে— তারা দেশ-বিদেশের বিচার করে না। কিন্তু বলিয়াই দেখিলাম, রহস্যটা গ্রহণ করিতে না পারিয়া পূর্ণিয়া জেলার জমিদার মুখখানা গম্ভীর করিলেন, এবং তাঁর চাকর আসিয়া যেই জানাইল, সন্ধ্যা-আহিকের জায়গা করা হইয়াছে, তিনি তখনই প্রস্থান করিলেন। তবল্চী এবং আর দুইজন ভদ্রলোকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। তাঁর মনের ভাবটা অকস্মাত কেন এমন বিকল হইয়া গেল তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিলাম না।

রতন আসিয়া কহিল, মা, বাবুর বিছানা করি কোথায়?

পিয়ারী বিরক্ত হইয়া বলিল, আর কি ঘর নেই রতন? আমাকে জিজ্ঞেস না করে কি এতটুকু বুদ্ধি খাটাতে পারিস নে? যা এখান থেকে, বলিয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাহির হইয়া গেল। বেশ দেখিতে পাইলাম, আমার আকস্মিক শুভাগমনে এ বাড়ির ভারকেন্দ্রটা সাংঘাতিক রকম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এখন হঠাৎ আসা হল যে?

বলিলাম, দেশের লোক, অনেকদিন না দেখে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম বাইজী!

পিয়ারীর মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল। আমার পরিহাসে সে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া বলিল, আজ রাত্রে এখানেই থাকবে ত?

থাকতে বল, থাকব।

আমার আর বলাবলি কি! তবে তোমার হয়ত অসুবিধে হবে। যে ঘরটায়  
তুমি শুতে, স্টোতে বাবু শুচ্ছেন? বেশ! আমি নীচে শোবো, তোমার নীচের  
ঘরগুলোও ত চমৎকার।

নীচে শোবে? বল কি! মনের মধ্যে এতটুকু বিকার নেই—দু-দিনেই  
এতবড় পরমহংস হয়ে উঠলে কি করে?

মনে মনে বলিলাম, পিয়ারী, আমাকে তুমি এখনও চেনোনি। মুখে  
বলিলাম, আমার তাতে মান-অভিমান একবিন্দু নেই। আর কষ্টের কথা যদি মনে  
কর ত সেটা একেবারে নির্থক। আমি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় খাবার-  
শোবার ভাবনাগুলোও ফেলে রেখে আসি। সে ত তুমি নিজেও জানো। বেশী  
বিছানা থাকে ত একটা পেতে দিতে বলো, না থাকে দরকার নেই—আমার কম্বল  
সম্বল আছে।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আছে জানি। কিন্তু এতে তোমার মনে  
কোনরকম দুঃখ হবে না ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না। কারণ স্টেশনে পড়ে থাকার চেয়ে এটা ত্রে  
ভাল।

পিয়ারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি হলে বরঞ্চ গাছতলায়  
পড়ে থাকতুম, এত অপমান সহ করতুম না।

তাহার উভেজনা লক্ষ্য করিয়া আমি না হাসিয়া পারিলাম না। সে যে কি  
কথা আমার মুখ হইতে শুনিতে চায়, তাহা আমি অনেকক্ষণ টের পাইয়াছিলাম।  
কিন্তু শান্ত, স্বাভাবিক কঢ়ে জবাব দিলাম, আমি এত নির্বোধ নই যে, মনে করব  
তুমি ইচ্ছে করে আমাকে নীচে শুতে বলে অপমান করচ। তোমার সাধ্য থাকলে  
তুমি সেবারের মতই আমার শোবার ব্যবস্থা করতে। সে যাক, এই তুচ্ছ ব্যাপার  
নিয়ে কথা কাটাকাটি করবার দরকার নেই—তুমি রতনকে পাঠিয়ে দাও গে,

আমাকে নীচের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসুক, আমি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভারি  
ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

পিয়ারী কহিল, তুমি জ্ঞানী লোক, তুমি আমার ঠিক অবঙ্গা বুঝবে না ত  
বুঝবে কে? যাক, বাঁচলুম! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা  
করিল, হঠাতে আসার সত্যি কারণটা শুনতে পাইনে কি?

বলিলাম, প্রথম কারণটা শুনতে পাবে না, কিন্তু দ্বিতীয়টা পাবে।

প্রথমটা পাব না কেন?

অনাবশ্যক বলে।

আচ্ছা, দ্বিতীয়টা শুনি।

আমি বর্মায় যাচ্ছি। হয়ত আর কখনো দেখা হবে না। অন্ততঃ অনেক  
দিন যে দেখা হবে না, সে নিশ্চয়। যাবার আগে একবার দেখতে এলুম।

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, আপনার বিছানা তৈরি হয়েছে, আসুন!

খুশি হইয়া কহিলাম, চল। পিয়ারীকে বলিলাম, আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে।  
ঘণ্টাখানেক পরে যদি সময় পাও ত একবার নীচে এসো—আমার আরও কথা  
আছে, বলিয়া রতনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলাম।

পিয়ারীর নিজের শোবার ঘরে আনিয়া রতন যখন আমাকে শয্যা দেখাইয়া  
দিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বলিলাম, আমার বিছানা নীচের ঘরে  
না করে এ ঘরে করা হল কেন?

রতন আশ্চর্য হইয়া কহিল, নীচের ঘরে?

আমি বলিলাম, সেই রকমই ত কথা ছিল!

সে অবাক হইয়া ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল,  
আপনার বিছানা হবে নীচের ঘরে? আপনি কি যে তামাশা করেন বাবু! বলিয়া  
হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মনিব  
শোবেন কোথায়?

রতন কহিল, বঙ্গুবাবুর ঘরে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়েছি। কাছে আসিয়া দেখিলাম, এ সেই রাজলক্ষ্মীর দেড়-হাত চওড়া তত্ত্বাপোশের উপর বিছানা পাতা হয় নাই। একটা মস্ত খাটের উপর মস্ত পুরু গদি পাতিয়া রাজশয়্যা প্রস্তুত হইয়াছে। শিয়ারের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর সেজের মধ্যে বাতি জুলিতেছে। একধারে কয়েকখানি বাঙ্গলা বই, অন্যধারে একটা বাটির মধ্যে কতকগুলি বেলফুল। চোখ চাহিবামাত্র টের পাইলাম, এর কোনটাই ভৃত্যের হাতে তৈরি হয় নাই—যে বড় ভালবাসে, এ-সব তাহারই স্বহস্ত-প্রস্তুত। উপরের চাদরখানি পর্যন্ত যে রাজলক্ষ্মী নিজের হাতে পাতিয়া রাখিয়া গেছে, এ যেন নিজের অন্তরের ভিতর হইতে অনুভব করিলাম।

আজ ওই লোকটার সম্মুখে আমার অচিন্ত্যপূর্ব অভ্যাগমে রাজলক্ষ্মী হতবুদ্ধি হইয়া প্রথমে যে ব্যবহারই করুক, আমার নির্বিকার ঔদাসীন্যে মনে মনে সে যে কতখানি শক্তি হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমার অগোচর ছিল না, এবং কেন যে আমার মধ্যে একটা ঈর্ষার প্রকাশ দেখিবার জন্য সে এতক্ষণ ধরিয়া এত প্রকারে আমাকে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত জানিয়াও যে নিজের নিষ্ঠুর রূচিতাকেই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া তাহার অভিমানের কোন মান্য রাখি নাই, তাহার প্রত্যেক স্কুল আঘাতটিকেই শতগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি, এই অন্যায় আমার মনের মধ্যে এখন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। নিশ্চয় জানিতাম, একবার সে আসিবেই। এখন সেই সময়টুকুর জন্যই উদ্গ্ৰীব হইয়া রাখিলাম।

শ্রান্তিবশতঃ হয়ত একটুখানি ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। সহসা চোখ মেলিয়া দেখিলাম, পিয়ারী আমার গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া বসিয়াছে। উঠিয়া বসিতেই সে কহিল, বর্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না—সে খবর জানো?

না, তা জানিনে।

তবে?

ফিরতেই হবে, এমন ত কারো মাথার দিব্যি নেই।

নেই? তুমি কি পৃথিবীর সকলের মনের কথাই জানো নাকি?

কথাটা অতি সামান্য। কিন্তু সংসারের এই একটা ভারি আশ্চর্য যে মানুষের দুর্বলতা কখন কোন্ ফাঁক দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ইতিপূর্বে কত অসংখ্য গুরুতর কারণ ঘটিয়া গিয়াছে, আমি কোনদিন আপনাকে ধরা দিই নাই; কিন্তু আজ তাহার মুখের এই অত্যন্ত সোজা কথাটা সহ্য করিতে পারিলাম না। মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল—সকলের মনের কথা ত জানিনে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু একজনের জানি। যদি কোনদিন ফিরে আসি ত শুধুই তোমার জন্যই আসব। তোমার মাথার দিব্যি আমি অবহেলা করব না।

পিয়ারী আমার পায়ের উপর একেবারে ভাসিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়াই পা টানিয়া লইলাম না। কিন্তু মিনিট-দশেক কাটিয়া গেলেও যখন সে মুখ তুলিল না, তখন তাহার মাথার উপর আমার ডান হাতখানা রাখিতেই, সে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তেমনি পড়িয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বলিলাম, উঠে বস, এ অবস্থায় কেউ দেখলে সে ভারি আশ্চর্য হয়ে যাবে।

কিন্তু পিয়ারী একটা জবাব পর্যন্ত যখন দিল না, তখন জোর করিয়া তুলিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার নীরব অশ্রুতে সেখানকার সমস্ত চাদরটা একেবারে ভিজিয়া গেছে। টানাটানি করিতে, সে রংদন্ত্বের বলিয়া উঠিল, আগে আমার দু-তিনটে কথার জবাব দাও, তবে আমি উঠব।

কি কথা বল?

আগে বল, ও লোকটা এখানে থাকাতে তুমি আমাকে কোন মন্দ মনে করনি?

না।

পিয়ারী আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে ভাল নই, সে ত তুমি জানো! তবে কেন সন্দেহ হয় না?

প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন। সে যে ভাল নয়, তাও জানি; সে যে মন্দ এও ভাবিতে পারি না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাতে সে ঢোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভাল হতে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে, অভাবে পড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হতে দেবে না?

আমি বলিলাম, আমরা কোনদিন মানা করিনে। আর করলেও সংসারে ভাল হবার পথ কেউ কারো আটকে রাখতে পারে না।

পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বেশ। তা হলে তুমিও আটকাতে পারবে না।

আমি জবাব দিবার পূর্বেই রতনের কাসির শব্দ দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কি রে রতন?

রতন মুখ বাড়াইয়া বলিল, মা, রাত্রি ত অনেক হল—বাবুর খাবার নিয়ে আসবে না? বামুনঠাকুর ঢুলে ঢুলে রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েচে।

তাইত, তোদের কারুর যে এখনো খাওয়া হয়নি, বলিয়া পিয়ারী ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার খাবারটা সে বরাবর নিজের হাতেই লইয়া আসিত; আজও আনিবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আহার শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেছে। পিয়ারী আসিয়া আবার আমার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, তোমার জন্যে অনেক রাত্রি একলা জেগে কাটিয়েচি—আজ তোমাকেও জাগিয়ে

ରାଖବ । ବଲିଯା ସମ୍ମତିର ଜନ୍ୟେ ଅପେକ୍ଷାମାତ୍ର ନା କରିଯା ଆମାର ପାଯେର ବାଲିଶଟୀ ଟାନିଯା ଲହିଯା ବା ହାତଟା ମାଥାଯ ଦିଯା ଆଡ଼ ହଇଯା ପଡ଼ିଯା ବଲିଲ, ଆମି ଅନେକ ଭେବେ ଦେଖିଲୁମ, ତୋମାର ଅତ ଦୂରଦେଶେ ଯାଓଯା କିଛୁତେଇ ହତେ ପାରେ ନା ।

ଜିଙ୍ଗାସା କରିଲାମ, କି ହତେ ପାରେ ତା ହଲେ? ଏମନି କରେ ସୁରେ ସୁରେ ବେଡ଼ାନୋ?

ପିଯାରୀ ତାହାର ଜବାବ ନା ଦିଯା ବଲିଲ, ତା ଛାଡ଼ା କିମେର ଜନ୍ୟେ ବର୍ମାଯ ଯେତେ ଚାଚ ଶୁଣି?

ଚାକରି କରତେ, ସୁରେ ବେଡ଼ାତେ ନୟ ।

ଆମାର କଥା ଶୁଣିଯା ପିଯାରୀ ଉତ୍ତେଜନାୟ ସୋଜା ହଇଯା ଉଠିଯା ବସିଯା ବଲିଲ, ଦେଖ, ଅପରକେ ଯା ବଳ, ତା ବଳ; କିନ୍ତୁ ଆମାକେ ଠକିଓ ନା । ଆମାକେ ଠକାଲେ ତୋମାର ଇହକାଳଓ ନେଇ, ପରକାଳଓ ନେଇ—ତା ଜାନୋ?

ସେଟା ବିଲକ୍ଷଣ ଜାନି; ଏବଂ କି କରତେ ବଳ ତୁମି?

ଆମାର ସ୍ଵିକାରୋତ୍ତିତେ ପିଯାରୀ ଖୁଶି ହଇଲ; ହାସିମୁଖେ ବଲିଲ, ମେଯେମାନୁଷେ ଚିରକାଳ ଯା ବଲେ ଥାକେ, ଆମିଓ ତାଇ ବଲି । ଏକଟା ବିଯେ କରେ ସଂସାରୀ ହଓ—ସଂସାରଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଲନ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନ କରଲାମ, ସତି ଖୁଶି ହବେ ତାତେ?

ସେ ମାଥା ନାଡିଯା, କାନେର ଦୁଲ ଦୁଲାଇଯା ସୋଃସାହେ କହିଲ, ନିଶ୍ଚୟ! ଏକଶ' ବାର । ଏତେ ଆମି ସୁଖୀ ହବ ନା ତ ସଂସାରେ କେ ହବେ ଶୁଣି?

ବଲିଲାମ, ତା ଜାନିନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆମାର ଏକଟା ଦୁର୍ଭାବନା ଗେଲ! ବାନ୍ତବିକ ଏଇ ସଂବାଦ ଦେବାର ଜନ୍ୟେଇ ଆମି ଏସେଛିଲାମ ସେ ବିଯେ ନା କରେ ଆମାର ଆର ଉପାୟ ନେଇ ।

ପିଯାରୀ ଆର ଏକବାର ତାହାର କାନେର ସ୍ଵର୍ଗଭବନ ଦୁଲାଇଯା ମହା ଆନନ୍ଦେ ବଲିଯା ଉଠିଲ, ଆମି ତ ତା ହଲେ କାଲୀଘାଟେ ଗିଯେ ପୁଜୋ ଦିଯେ ଆସବ । କିନ୍ତୁ ମେଯେ ଆମି ଦେଖେ ପଛନ୍ଦ କରବ, ତା ବଲେ ଦିଚି ।

আমি বলিলাম, তার আর সময় নেই—পাত্রী স্থির হয়ে গেছে।

আমার গন্তব্যের কঠিন বোধ করি পিয়ারী লক্ষ্য করিল। সহসা তাহার হাসিমুখে একটা ম্লান ছায়া পড়িল, কহিল, বেশ ত, ভালই ত! স্থির হয়ে গেলে ত পরম সুখের কথা।

বলিলাম, সুখ-দুঃখ জানিনে রাজলক্ষ্মী; যা স্থির হয়ে গেছে, তাই তোমাকে জানাচ্ছি।

পিয়ারী হঠাতে রাগিয়া উঠিয়া বলিল, যাও—চালাকি করতে হবে না—সব মিছে কথা।

একটা কথাও মিথ্যে নয়; চিঠি দেখলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া জামার পকেট হইতে দুখানা পত্রই বাহির করিলাম।

কৈ দেখি চিঠি, বলিয়া হাত বাড়াইয়া পিয়ারী চিঠি দুখানা হাতে লইতেই, তাহার সমস্ত মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। হাতের মধ্যে পত্র দুখানা ধরিয়া রাখিয়াই বলিল, পরের চিঠি পড়বার আমার দরকারই বা কি! তা কোথায় স্থির হল?

পড়ে দেখ।

আমি পরের চিঠি পড়িনে।

তা হলে পরের খবর তোমার জেনেও কাজ নেই।

আমি জানতেও চাইনে, বলিয়া সে ঝুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। চিঠি দুটা কিন্তু তাহার মুঠার মধ্যেই রহিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কথা কহিল না। তারপরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া দীপের সম্মুখে, মেজের উপর সেই দুইখানা পত্র লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। লেখাগুলা বোধ করি সে দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিল। তারপরে উঠিয়া আসিয়া আবার তেমনি করিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ঘুমুলে?

না।

এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। সে মেয়ে ভাল নয়, তাকে আমি হেলেবেলা দেখেচি।

মার চিঠি পড়লে?

হাঁ, কিন্তু খুড়িমার চিঠিতে এমন-কিছু লেখা নেই যে তোমাকে তাকে ঘাড়ে করতে হবে। আর থাক ভাল, না থাক ভাল, এ মেয়ে আমি কোনমতেই ঘরে আনব না।

কিরকম মেয়ে ঘরে আনতে চাও, শুনতে পাই কি?

সে আমি এখনি কি করে বলব! বিবেচনা করে দেখতে হবে ত!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলাম, তোমার পছন্দ আর বিবেচনার ওপর নির্ভর করে থাকতে হলে আমাকে আইবুড়ো নাম খণ্টাতে আর একজন্ম এগিয়ে যেতে হবে—এতে কুলোবে না। যাক, যথাসময়ে তাই নাহয় যাবো, আমার তাড়াতাড়ি নেই। কিন্তু এই মেয়েটিকে তুমি উদ্ধার করে দিয়ো। শ' পাঁচেক টাকা হ'লেই তা হবে, আমি তাঁর মুখেই শুনে এসেছিলুম।

পিয়ারী উৎসাহে আর একবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, কালই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব, খুড়িমার কথা মিথ্যে হ'তে দেব না; একটুখানি থামিয়া কহিল, সত্যি বলচি তোমাকে, এ মেয়ে ভাল নয় বলেই আমার আপত্তি, নইলে —

নইলে কি?

নইলে আবার কি! তোমার উপযুক্ত মেয়ে আমি খুঁজে বার করে তবে কথার উত্তর দেব—এখন নয়।

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, তুমি মিথ্যে চেষ্টা করো না রাজলক্ষ্মী, আমার উপযুক্ত মেয়ে তুমি কোনদিন খুঁজে বার করতে পারবে না।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাতে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, সে নাহয় নাই পারব; কিন্তু তুমি বর্মায় যাবে, আমাকে সঙ্গে নেবে?

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া হাসিলাম, কহিলাম, আমার সঙ্গে যেতে তোমার  
সাহস হবে?

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, সাহস! এ কি  
একটা শক্ত কথা বলে তুমি মনে কর?

আমি যাই করি, কিন্তু তোমার এই-সমস্ত বাড়িঘর, জিনিসপত্র, বিষয়-  
আশয় তার কি হবে?

পিয়ারী কহিল, যা ইচ্ছে তা হোক। তোমাকে চাকরি করবার জন্যে যখন  
এত দূরে যেতে হ'ল, এত থাকতেও কোন কাজেই কিছু এল না, তখন বক্সুকে  
দিয়ে যাবো।

এ কথার জবাব দিতে পারিলাম না। খোলা জানালার বাহিরে অঙ্ককারে  
চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সে পুনরায় কহিল, অতদূরে না গেলেই কি নয়? এ-সব তোমার কি  
কোনদিন কোন কাজেই লাগতে পারে না?

বলিলাম, না, কোনদিন নয়।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু নেবে আমাকে সঙ্গে?  
বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে ধীরে আবার তাহার হাতখানি রাখিল। একদিন  
এই পিয়ারীই আমাকে যখন তাহার বাড়ি হইতে একরকম জোর করিয়াই বিদায়  
করিয়াছিল, সেদিন তাহার অসাধারণ ধৈর্য ও মনের জোর দেখিয়া অবাক হইয়া  
গিয়াছিলাম। আজ তাহারই আবার এতবড় দুর্বলতা, এই করুণ কঢ়ের সকাতর  
মিনতি, সমস্ত একসঙ্গে মনে করিয়া আমার বুক ফাটিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই  
স্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারিনে বটে, কিন্তু  
যখনি ডাকবে, তখনি ফিরে আসব। যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই  
থাকব রাজলক্ষ্মী!

এই পাপিষ্ঠার হয়ে তুমি চিরদিন থাকবে?

হাঁ, চিরদিন থাকব।

তা হ'লে ত তোমার কোনদিন বিয়েও হবে না বল?

না। তার কারণ, তোমার অমতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে এ কাজে আমার কোনদিন প্রবৃত্তি হবে না।

পিয়ারী অপলকচক্ষে কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রাখিল। তার পরে তাহার দুই চক্ষু অশ্রূজলে পরিপূর্ণ হইয়া, বড় বড় ফেঁটা গাল বাহিয়া টপটপ বারিয়া পড়িতে লাগিল। চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, এই হতভাগিনীর জন্যে তুমি সমস্ত জীবন সন্ধ্যাসী হয়ে থাকবে?

বলিলাম, তা আমি থাকব। তোমার কাছে যে জিনিস আমি পেয়েছি, তার বদলে সন্ধ্যাসী হয়ে থাকাটা আমার লোকসান নয়; যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই কথাটা তুমি কোনদিন অবিশ্বাস ক'রো না।

পলকের জন্য দুইজনের চোখাচোখি হইল, এবং পরক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া, কাঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়িটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অঙ্ককার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিত্তির সহিত দেখিতেছে।

## দুই

এক-একটা কথা দেখিয়াছি, সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে—তাহার শব্দগুলা পর্যন্ত যেন কানের মধ্যে বাজিয়া উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলাও তেমনি। আজও আমি তাহার রেশ শুনিতে পাই। সে যে স্বভাবতঃই কত বড় সংযমী, সে পরিচয় ছেলেবেলাতেই সে বহুবার দিয়াছে। তাহার উপর এতদিনের এই এত বড় সাংসারিক শিক্ষা! গতবারে বিদায়ের ক্ষণটিতে কোনমতে পলাইয়া সে আত্মরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এবার কিছুতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, চাকর-বাকরদের সামনেই কাঁদিয়া ফেলিল। রূদ্ধকঠে বলিয়া ফেলিল, দেখ, আমি অবোধ নয়, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে জানি; কিন্তু তবু বলচি আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়! একেও এর শান্তি একদিন পেতে হবে! ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন!

সমাজের উপর কেন যে সে এত বড় অভিশাপ দিল, তাহা সেই জানে, আর তাহার অন্তর্যামী জানেন। আমিও যে না জানি, তা নয়, কিন্তু নির্বাক হইয়া রহিলাম। বুড়া দরোয়ান গাড়ির কপাট খুলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেছি, পিয়ারী চোখের জলের ভিতর দিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল; কহিল, কোথায় যাচ্ছ—আর হয়ত দেখা হবে না—একটা ভিক্ষা দেবে?

বলিলাম, দেব।

পিয়ারী কহিল, ভগবান না করুন, কিন্তু তোমার জীবনযাত্রার যে ধরন, তাতে—আচ্ছা যেখানেই থাকো, সে সময়ে একটা খবর দেবে? লজ্জা করবে না?

না, লজ্জা করব না—খবর দেব, বলিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। পিয়ারী পিছনে পিছনে আসিয়া আজ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে আমার পায়ের ধূলা লইল।

ওগো, শুনচ? মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সে তাহার ওষ্ঠাধরের কাঁপুনিটা প্রাণপণে দমন করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি এক হইবামাত্রই তাহার চোখের জল আবার ঝরিবার করিয়া ঝরিয়া পড়িল; অস্ফুট অবরুদ্ধ স্বরে চুপিচুপি বলিল, নাই গেলে অত দূরে? থাক গে, যেও না!

নিঃশব্দে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়িয়া দিল। চাবুক ও চারখানা চাকার সম্মিলিত সপাসপ ও ঘড়ঘড় শব্দে অপরাহ্নবেলা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত চাপা দিয়া একটা ধরা-গলার চাপা কানাই শুধু আমার কানে বাজিতে লাগিল।

## তিনি

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন ভোরবেলায় একটা লোহার তোরঙ্গ এবং একটা পাতলা বিছানামাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতার কয়লাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ি হইতে নামিতে না নামিতে, এক খাঁকি-কুর্তি-পরা কুলি আসিয়া এই দুটাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া কোথায় যে চক্ষের পলকে অন্তর্ধান হইয়া গেল, খুঁজিতে খুঁজিতে দুশ্চিন্তায় চোখ ফাটিয়া জল না-আসা পর্যন্ত আর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। গাড়িতে আসিতেই দেখিয়াছিলাম, জেটি ও বড় রাস্তার অন্তর্বর্তী সমস্ত ভূখণ্টাই নানা রঙের পদার্থে বোঝাই হইয়া আছে। লাল, কালো, পাঁশটে, গেরুয়া—একটু কুয়াশা করিয়াও ছিল—মনে হইল একপাল বাচুর বোধ হয় বাঁধা আছে, চালান যাইবে। কাছে আসিয়া ঠাহর করিয়া দেখি, চালান যাইবে বটে কিন্তু বাচুর নয়—মানুষ। মোটঘাট লইয়া স্তৰী-পুত্রের হাত ধরিয়া সারারাত্রি অমনি করিয়া হিমে পড়িয়া আছে—প্রত্যুষে সর্বাগ্রে জাহাজের একটু ভালো স্থান অধিকার করিয়া লইবে বলিয়া। অতএব কাহার সাধ্য পরে আসিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া জেটির দোরগোড়ায় যায়! অনতিকাল পরে এই দল যখন সজাগ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম, কাবুলের উত্তর হইতে কুমারিকার শেষ পর্যন্ত এই কয়লাঘাটে প্রতিনিধি পাঠাইতে কাহারও ভুল হয় নাই।

সব আছে। কালো কালো গেঞ্জি গায়ে একদল চীনাও বাদ যায় নাই। আমিও নাকি ডেকের যাত্রী (অর্থাৎ যার নীচে আর নাই), সুতরাং ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আমারও একটুখানি বসিবার জায়গা করিয়া লইবার কথা। কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। অথচ যখন যাইতেই হইবে, এবং জাহাজ ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানও জানা নাই, তখন যেমন করিয়া

হোক, ইহাদের দৃষ্টান্তই অবলম্বন করা কর্তব্য বলিয়া যতই নিজের মনকে সাহস দিতে লাগিলাম, ততই সে যেন হাল ছাড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ যে কখন আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে, সে জাহাজই জানে; সহসা চাহিয়া দেখি, এই চোদ্দ-পনর শ' লোক ইতিমধ্যে কখন ভেড়ার পালের মত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু, বেশ ত সকলে বসেছিলে—হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন?

সে কহিল, ডগ্রির হোগা।

ডগ্রির পদার্থটি কি বাপু?

লোকটা পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া বিরক্তমুখে কহিল, আরে, পিলেগ্রুকা ডগ্রির।

জিনিসটা আরও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু বুঝি-না-বুঝি, এতগুলো লোকের যাহা আবশ্যিক, আমারও ত তাহা চাই। কিন্তু কি কৌশলে যে নিজেকে ওই পালের মধ্যে গুঁজিয়া দিব, সে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কোথাও একটু ফাঁক আছে কি না খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, অনেক দূরে কয়েকটি খিদিরপুরের মুসলমান সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এটা আমি স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র দেখিয়াছি—যাহা লজ্জাকর ব্যাপার, বাঙালী সেখানে লজ্জিত হইয়াই থাকে। ভারতের অপরাপর জাতির মত অসঙ্গেচে ঠেলাঠেলি মারামারি করিতে পারে না। এমন করিয়া দাঁড়ানোটাই যে একটা হীনতা, এই লজ্জাতেই যেন সকলের অগোচরে মাথা হেঁট করিয়া থাকে। ইহারা রেঙ্গুনে দর্জির কাজ করে, অনেকবার যাতায়াত করিয়াছে। প্রশ্ন করিলে বুঝাইয়া দিল যে, বর্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না, তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ইংরাজ রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রতাপ। শুনিয়াছি কসাইখানার যাত্রীদের পর্যন্ত জবাই হওয়ার

অধিকারটুকুর জন্য এদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অবস্থা হিসাবে  
রেঙুনযাত্রীদের সহিত তাহাদের যে এতবড় মিল ছিল, এ কথা তখন কে  
ভাবিয়াছিল? ক্রমশঃ ‘পিলেগ্কা ডগ্দরি’ আসন্ন হইয়া উঠিল—সাহেব ডাঙ্গার স-  
পেয়াদা দেখা দিলেন। সেই লাইনবর্তী অবস্থায় বেশি ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিবার  
সুযোগ ছিল না, তথাপি পুরোবর্তী সঙ্গীদের প্রতি পরীক্ষা-পদ্ধতির যতটুকু প্রয়োগ  
দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে ভাবনার সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেহের উপরাখ্য  
অনাবৃত করায় ভীত হইবে, অবশ্য বাঙালী ছাড়া এরূপ কাপুরুষ সেখানে কেহ  
ছিল না; কিন্তু সম্মুখবর্তী সেই সাহসী বীর পুরুষগণকেও পরীক্ষায় চমকাইয়া  
চমকাইয়া উঠিতে দেখিয়া শক্তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম। সকলেই অবগত  
আছেন, প্লেগ রোগে দেহের স্থান-বিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাঙ্গারসাহেব যেরূপ  
অবলীলাক্রমে ও নির্বিকার চিত্তে সেই-সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ  
করাইয়া স্ফীত অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি  
হইবার কথা। কিন্তু ভারতবাসীর সনাতন সভ্যতা আছে বলিয়াই তবু যা হোক  
একবার চমকাইয়া স্থির হইতে পারিতেছিল; আর কোন জাত হইলে ডাঙ্গারের  
হাতটা সেদিন মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া না দিয়া আর নিরস্ত হইতে পারিত না।

সে যাই হোক, পাশ করা যখন অবশ্য কর্তব্য, তখন আর উপায় কি?  
যথাসময়ে চোখ বুজিয়া সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া একপ্রকার মরিয়া হইয়াই ডাঙ্গারের  
হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, এবং পাশ হইয়াও গেলাম। অতঃপর জাহাজে  
উঠিবার পালা। কিন্তু ডেক প্যাসেঞ্জারের এই অধিরোহণক্রিয়া যে কিভাবে নিপত্তি  
হয়, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে ধারণা করা অসাধ্য। তবে কলকারখানায়  
দাঁতওয়ালা চাকার ক্রিয়া দেখা থাকিলে বুঝা কতকটা সম্ভব হইবে। সে যেমন  
সুমুখের টানে ও পিছনের ঠেলায় অগ্রসর হইয়া চলে, আমাদেরও এই কাবুলী,  
পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী, মাদ্রাজী, মারহাট্টী, বাঙালী, চীনা, খোট্টা, উড়িয়া গঠিত  
সুবিপুল বাহিনী সুন্দরাত্ম পরম্পরারের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বেগে ডঙ্গা হইতে

জাহাজের ডেকে প্রায় অজ্ঞাতসারে উঠিয়া আসিল; এবং সেই গতি সেইখানেই প্রতিরোধ হইল না। সম্মুখেই দেখিলাম, একটা গর্তের মুখে সিঁড়ি লাগানো আছে। জাহাজের খোলে নামিবার এই পথ। আবদ্ধ নালার মুখ খুলিয়া দিলে বৃষ্টির সঞ্চিত জল যেমন খরবেগে নীচে পড়ে, ঠিক তেমনি করিয়া এই দল স্থান অধিকার করিতে মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হইয়া অবরোহণ করিতে লাগিল; আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার নীচে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না, পা দিয়া হাঁটিয়াও নামি নাই। ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, কেন সন্দেহ প্রকাশ করিলেও বোধ করি, শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সচেতন হইয়া দেখিলাম, খোলের মধ্যে অনেক দূরে এককোণে একাকী দাঁড়াইয়া আছি। পায়ের নীচে চাহিয়া দেখি, ইতিমধ্যে ভোজবাজির মত চক্ষের পলকে যে যাহার কম্বল বিছাইয়া বাঞ্চ-পেঁতার বেড়া দিয়া নিরাপদে বসিয়া প্রতিবেশীর পরিচয় গ্রহণ করিতেছে। এতক্ষণে আমার সেই নম্বর-আঁটা কুলি আসিয়া দেখা দিল; কহিল, তোরঙ্গ ও বিছানা উপরে রেখেচি; যদি বলেন, নীচে আনি।

বলিলাম, না; বরঞ্চ আমাকেও কোন মতে উদ্বার ক'রে উপরে নিয়ে চল।

কারণ, পরের বিছানা না মাড়াইয়া তাহার সহিত হাতাহাতির সম্ভাবনা না ঘটাইয়া পা ফেলিতে পারি এমন একটুখানি স্থানও চোখে পড়িল না। বর্ষার দিনে উপরে জলে ভিজি, সেও ভালো, কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও না। কুলিটা অধিক পয়সার লোভে, অনেক চেষ্টায়, অনেক তর্কাতর্কি করিয়া কম্বল ও সতরঞ্চির এক-আধুটু ধার মুড়িয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল এবং আমার জিনিসপত্র দেখাইয়া দিয়া বকশিশ লইয়া প্রস্থান করিল।

এখানেও সেই ব্যাপার—বিছানা পাতিবার জায়গা নেই। কাজেই নিরূপায় হইয়া নিজের তোরঙ্গটার উপরেই নিজের বসিবার উপায় করিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিন্তে মা ভাগীরথীর উভয় কূলের মহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। স্টীমার তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বহুক্ষণ হইতেই পিপাসা পাইয়াছিল। এই দুই-

ঘণ্টা কাল যে কাণ্ড মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহাতে বুক শুকাইয়া উঠে না—এমন কঠিন বুক সংসারে অল্পই আছে। কিন্তু বিপদ এই হইয়াছিল যে, সঙ্গে না ছিল একটা প্লাস, না ছিল একটা ঘটি। সহ্যাত্বীদের মধ্যে যদি কোথাও কোন বাঙালী থাকে ত একটা উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে নামিবার সেই গর্ত্তার কাছাকাছি হইবামাত্র একপ্রকার তুমুল শব্দ কানে পৌঁছিল—যাহার সহিত তুলনা করি, এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে আগুন ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওয়াজ উঠিবার কথা বটে, কিন্তু ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যত বড় গোশালার আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার যদি থাকিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু এই কলিকালে কাহারও যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সভয় চিত্তে সিঁড়ির দুই-এক ধাপ নামিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা যে যাহার national সঙ্গীত শুরু করিয়া দিয়াছে। কাবুল হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্যন্ত যত প্রকারের সুর-ব্ৰহ্ম আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে! এ মহাসঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচি�ৎ ঘটে; এবং সঙ্গীতই যে সর্বশ্ৰেষ্ঠ ললিতকলা, তাহা সেইখানেই দাঁড়াইয়া সসম্মে স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময় এই যে এতগুলা সঙ্গীতবিশারদ একসঙ্গে জুটিল কিৰূপে?

নীচে নামা উচিত হইবে কি না, সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, ইংরাজের মহাকবি সেক্সপীয়র নাকি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে না মুঢ় হয়, সে খুন করিতে পারে, না এমনি কি-একটা কথা। কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায়, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি তাঁহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপানির পীঠস্থান কি না জানি না; না হইলে, কাবুলিয়ালা গান গায়, এ কথা কে ভাবিতে পারে! একপ্রান্তে এই অডুত কাণ্ড

চলিতেছিল! হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি, হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি তাহারই অদূরে  
দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাত নাড়িয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে।

অনেক কষ্টে অনেক লোকের চোখরাঙ্গনি মাথায় করিয়া এই লোকটির  
কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাঞ্জণ শুনিয়া সে হাতজোড় করিয়া নমস্কার  
করিল, এবং নিজেকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। পাশে  
একটি বিগতযৌবনা স্তুলাঙ্গী বসিয়া একদৃষ্টে আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি  
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুষের এত বড় দুটো ভাঁটার  
মত চোখ ও এত মোটা জোড়াভুরু আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী  
তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, বাবুমশায়, ইটি আমার পরি-

কথাটা শেষ না হতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিয়া গর্জাইয়া উঠিল—পরিবার!  
আমার সাত পাকের সোয়ামী বলচেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিস্ত্রী, যার-  
তার কাছে মিছে কথা ব'লে আমার বদনাম করো না ব'লে দিচ্ছি।

আমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস কেন টগর?  
পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বচ্ছর—

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া  
কপাল! জাতবোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবত্তের পরিবার! কেন, কিসের  
দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে  
দিয়েচি? সে কথা কারও বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু  
জাতজন্ম খোয়াবে না—তা জানো? বলিয়া এই জাতবোষ্টমের মেয়ে জাতের গবে  
আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ-দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।

নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, দেখলেন মশায়,  
দেখলেন? এখনো এদের জাতের দেমাক! দেখলেন! আমি তাই সহ্য করি, আর

কেউ হ'লে—কথাটা সে তাহার বিশ বছরের পরিবারের চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতে পারিল না।

আমি কোন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এই জাতবোষ্ঠমীর কথাগুলা মনে করিয়া হাসি চাপিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ত একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং শহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে! এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা সুন্দরী খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়াই পরিভ্রান্ত পাইতেছে! তবে এমন হইতে পারে বটে, এদেশে পুরুষের বেলা হাসি আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই।

আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পরে সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পরদিন সকালবেলা হইতেই শিষ্টশান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্রপীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলেবেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল; সুতরাং বমি করার দায়টা আমি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সপরিবার নন্দ মিষ্ট্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কল্যাকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশই তখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহারা এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিষ্ট্রী ও তাহার বিশ বছরের পরিবার গন্তীরভাবে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাত্রে কেমন ছিলে মিষ্ট্রীমশাই?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তর্জন করিয়া উঠিল, বেশ, না ছাই! মা গো মা, কি  
কাণ্ডই হয়ে গেল!

একটু উদ্বিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাণ্ড?

নন্দ মিষ্ট্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, গোটা-দুই তুড়ি দিয়া,  
অবশ্যে কহিল, কাণ্ড এমন-কিছুই নয় মশাই। বলি, কলকাতায় গলির মোড়ে  
সাড়ে বত্রিশভাজা বিক্রি করা দেখেছেন? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থাটি ঠিক  
বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙ্গার নীচে গুটি দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা  
চাল-ডাল-মটর-কড়াই-ছোলা-বরবটি-মুসুরি-খেঁসারি সব একাকার করে দেয়,  
দেবতার কৃপায় আমরা সবাই ঠিক তেমনি মিশিয়ে গিয়েছিলুম—এই খানিকক্ষণ  
হ'ল যে যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি। তাহার পর টগরের পানে চাহিয়া  
কহিল, মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না, নইলে টগর আমার—

টগর ক্ষিণ্ঠ ভল্লুকের মত গর্জিয়া উঠিল—আবার! ফের!

না, তবে থাক, বলিয়া নন্দ উদাসীনের মত আর একদিকে চাহিয়া চুপ  
করিল। মূর্তিমান নোংরা একজোড়া কাবুলিয়ালা আপাদমস্তক সমস্ত পৃথিবীর  
অপরিচ্ছন্নতা লইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রূটি ভক্ষণ করিতেছিল। ক্রুদ্ধ টগর  
নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি তাহার অত বড় দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ  
করিতে লাগিল।

নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশংস করিল, আজ তা হলে খাওয়া-দাওয়া  
হবে না বল?

পরিবার কহিল, মরণ আর কি! হবে কি ক'রে শুনি!

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, এই ত মোটে সকাল, একটু  
বেলা হ'লে নন্দ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কলকাতা থেকে দিবি  
একহাঁড়ি রসগোল্লা আনা হয়েছিল মশায়, জাহাজে উঠে পর্যন্ত বলচি, আয় টগর

কিছু খাই, আস্থাকে কষ্ট দিসনে—নাঃ রেঙ্গুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না  
এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে!

টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানে  
একটিবার মাত্র আমার পানে চাহিয়াই, পুনরায় সেই হতভাগ্য কাবুলিকে চোখের  
দৃষ্টিতে দন্ধ করিতে লাগিল।

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রসগোল্লা?

নন্দ টগরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিল, সেগুলোর কি হ'ল বলতে  
পারিনে। ওই দেখুন ভাঙা হাঁড়ি, আর ওই দেখুন বিছানাময় তার রস; এর বেশি  
যদি কিছু জানতে চান ত ওই দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বলিয়া টগরের  
দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নিচু করিয়া বলিলাম, তা যাক, সঙ্গে  
চিঁড়ে আছে ত!

নন্দ কহিল, সেদিকেও সুবিধে হয়েছে। বাবুকে একবার দেখা ত টগর!

টগর একটা ছোট পুঁটলি পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখাও  
গে তুমি—

নন্দ কহিল, যাই বলুন বাবু, কাবুলি জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায়  
না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায়, ওর কাবুল দেশের মোটা ঝুঁটি অমনি বেঁধে  
দেয়! ফেলিস নে টগর, তুলে রাখ, তোর মালসা-ভোগে লেগে যেতে পারে।

নন্দর এই পরিহাসে আমি ত হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, কিন্তু  
পরক্ষণেই টগরের মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ক্রোধে সমস্ত মুখ  
কালো করিয়া, মোটা গলায় বজ্র-কর্কশ-শব্দে জাহাজের সমস্ত লোককে সচকিত  
করিয়া, টগর চিৎকার করিয়া উঠিল—জাত তুলে কথা ক'য়ো না বলচি মিস্তিরী—  
ভাল হবে না, তা বলচি—

চিত্কার-শব্দে যাহারা মুখ ভুলিয়া চাহিল, তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে  
নন্দ এতটুকু হইয়া গেল। টগরকে সে ভালোমতোই চিনিত, একটা বেফাঁস ঠাটার  
জন্য ক্রোধটা তাহার সে শান্ত করিতে পারিলেই বাঁচে। লজিত হইয়া তাড়াতাড়ি  
বলিল, মাথা খাস্ টগর, রাগ করিস্ নে—আমি তামাশা করেছি বৈ ত নয়।

টগর সে কথা কানেও তুলিল না। চোখের তারা, ভুরু একবার বামে ও  
একবার দক্ষিণে ঘুরাইয়া লইয়া, গলার সূর আরও এক পর্দা ঢ়াইয়া দিয়া বলিল,  
কিসের তামাশা! জাত তুলে আবার তামাশা কি! মোচলমানের রংটি দিয়ে মালসা-  
ভোগ হবে? তোর কৈবল্যের মুখে আগুন—দরকার থাকে, তুই তুলে রাখ্ গে—  
বাপের পিণ্ডি দিস্।

জ্যা-মুক্ত ধনুর মত নন্দ খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াই টগরের কেশাকর্ণ  
করিয়া ধরিল—হারামজাদি, তুই বাপ তুলিস্!

টগর কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,  
হারামজাদা, তুই জাত তুলিস্! বলিয়াই আকর্ণ মুখ্যব্যাদান করিয়া নন্দের বাহুর  
একাংশ দংশন করিয়া ধরিল, এবং মুহূর্ত-মধ্যেই নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর  
মল্লযুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত লোক ভিড় করিয়া ঘেরিয়া  
ধরিল। হিন্দুস্থানীরা সমুদ্রপীড়া ভুলিয়া উচ্চকঞ্চে বাহবা দিতে লাগিল। পাঞ্জাবীরা  
ছি-ছি করিতে লাগিল, উৎকলবাসীরা চেঁচমেচি করিতে লাগিল—সবসুন্দ একটা  
কাণ্ড বাধিয়া গেল। আমি স্তুপ্তি বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত সামান্য কারণে  
এত বড় অনাবৃত নির্লজ্জতা যে সংসারে ঘটিতে পারে, ইহা ত আমি কল্পনা  
করিতেও পারিতাম না। তাহাই আবার বাঙ্গলী নরনারীর দ্বারা এক-জাহাজ  
লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে  
লাগিলাম। কাছেই একজন জৌনপুরী দরোয়ান অত্যন্ত পরিত্বক্তির সহিত তামাশা  
দেখিতেছিল; আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবুজী, বাঙ্গলীন् তো বহুত আচিছ  
লড়নেওয়ালী হ্যায়! হটতি নহি!

আমি তাহার পানে চাহিতেও পারিলাম না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া  
কোন মতে ভিড় ঠেলিয়া উপরে পলাইয়া গেলাম।

## চার

সেদিন এমন প্রবৃত্তি হইল না যে নীচে যাই। সুতরাং নন্দ-টগরের যুদ্ধের অবসান কি ভাবে হইল, সন্ধিপত্রে কোন্ কোন্ শর্তাদি নির্দিষ্ট হইল, কিছুই জানি না। তবে, পরে দেখিয়াছি, শর্ত যাই হোক, বিপদের দিনে সেই স্ত্র্যাপ-অফ-পেপারটা কোন কাজেই লাগে না। যাহার যখন আবশ্যক হয়, অবলীলাক্রমে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অপরের বৃহ ভোদ করে। বিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিয়াছে; এবং আরও বিশ বৎসর যে করিবে না, এমন শপথ বোধ করি স্বয়ং বিধাতাপুরূষও করিতে পারেন না।

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্নের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘ দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলাফেরার মধ্যেও একপ্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃন্দগোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্তা, নীচে যাও; কাঞ্চন কইচে ছাইক্লোন হোতি পারে।

মিনিট-পনের পরেই দেখিলাম কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসীরা হোল্ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দু-চারিজন আপত্তি করায়, সেকেন্দ অফিসার নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানাপত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে

আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা দশ টাকার বেশি ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া গর্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপই বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন ডঙাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অঙ্গেল ঘটাইবার কথানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা অদ্যষ্টে যা ঘটে তা ঘটুক।

আর ঝড়ে জাহাজ যদি মারাই যায়, ত অমন প্লেগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবন্দ হইয়া, মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন? যতক্ষণ পারি, হাত-পা নাড়িয়া, চেউয়ের উপরে নাগরদোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, এক সময়ে টুপ করিয়া ডুব দিয়া পাতালের রাজবাড়িতে অতিথি হইলেই চলিবে। কিন্তু রাজার জাহাজ যে আগে-পিছে লক্ষকোটি হাঙ্গর-অনুচর ছাড়া কালাপানিতে এক পা চলেন না, এবং জলযোগ করিয়া ফেলিতেও যে তাহাদের মুহূর্ত বিলম্ব হয় না—এ-সকল তথ্য তখনও আমার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ হইতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে পালাইয়া বেড়াইবার আর জো রহিল না, যেখানে হোক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্তানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়ো কাপ্টেন দূরবীন হাতে বিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া

গেল। একধারে অনেকগুলা ভেড়া, মুরগি ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকি ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব-কটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্রতরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই সাইক্লোন; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোপ্যদম্যাত্ম, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাতে বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেলে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাঙ্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে; পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রাণ্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুবাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে তুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুরুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যুবন্ধনায় চিঁকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পঢ়িবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি-একটা বিপ্লব বাধিয়াছে; তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়, শতকোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—বাড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই তের ভাল ছিল।

এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত তের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত

করিয়া শুন্দমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষে হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়া ছিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাতে মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্র বজ্র করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—  
দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখ-দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারে সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টিকে তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজতশুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন গতিকেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ-সন্তান! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানিই; কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ মিনিটকাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ তা হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট।

কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে সেই অপরিমেয় গতিশক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রজলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীরকৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল; এবং ভয়ার্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছিয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল।

যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ডগোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশেপাশে, উপরে-নীচে চারিদিকেই কালো জল। জাহাজ-সুন্দ সবাই যে পাতালের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে। কিন্তু মিনিটখানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজ-সুন্দ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পেলাম, কেন কাণ্ডেনসাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্তে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস-মুরগিগুলা

বার-কতক ঝট্টপট্ট করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েকবার ম্যা-ম্যা করিয়া ভবলীলা সঙ্গ করিল ।

আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম । কিন্তু এখন আর-একপ্রকারের বিপদ জুটিল । শুধু যে জলের ছাট ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে-দাঁতে ঠক্ঠক্ করিয়া বাজিতে লাগিল । মনে হইল জলে ডোবার হাত হইতে যদিবা সম্প্রতি নিষ্ঠার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এইভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম । সুতরাং যেমন করিয়া হোক, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট বন্ধনের ফলার মত গায়ে বেঁধে না । একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয়? কিন্তু তাই বা কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনা জলের স্বোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি-না ম্যা-ম্যা করি, মা-মা করিয়াও অন্ততঃ ইহলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে ।

শুধু এক উপায় আছে । জাহাজের পার্শ্ব-পরিবর্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয়ত বাঁচিতেও পারি । যে কথা, সেই কাজ । কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদিবা সেকেও ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ । লোহার কপাট হাজার ঠেলাঠেলিতেও পথ দিল না । সুতরাং আবার সেই পথ তেমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফাস্ট ক্লাসের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম । এবার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন । লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম ।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন  
ভোরবেলা পর্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

আমার জিনিসপত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, বিশেষ করিয়া  
মিষ্ট্রীমশায় সন্ত্রীক কি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, জানিবার জন্য  
সকালবেলা নীচে নামিয়া গেলাম। কাল নন্দ মিষ্ট্রী একটু রসিকতা করিয়াই  
বলিয়াছিল, মশায়, সাড়েবত্রিশভাজার মত আমরা মিশিয়ে গিয়েছিলুম; এইমাত্র  
যে-যার কোটে ফিরে এসেচি।

আজিকার মিশামিশি সাড়েবত্রিশভাজায় চলে কিনা, জানি না; কিন্তু এখন  
পর্যন্ত কেহই যে কাহারও নিজের কোটে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, তাহা  
স্বচক্ষে দেখিলাম।

তাহাদের অবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই ‘তিন-চারশ’ যাত্রীর  
মধ্যে সমর্থ থাকা ত অনেক দূরের কথা, বোধ করি, অক্ষত কেহই ছিল না।

মেয়েরা শিলের উপর নোঢ়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার  
সাইক্লোন এই ‘তিন-চারশ’ লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা  
বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিসপত্র, বাল্ক-পেঁটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি  
জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে। বমি এবং অনুরূপ আর দুটা  
প্রক্রিয়া এত করিয়াছে যে, দুর্গন্ধে দাঁড়ানো ভার। এখন ডাঙ্কারবাবু জাহাজের  
মেঠের ও খালাসীদের লইয়া ইহাদের পক্ষেন্দার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ডাঙ্কারবাবু আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বোধ করি  
আমাকে সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী ঠিক করিয়াছিলেন। তথাপি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া  
বলিলেন, মশাইকে ত খুব তাজা দেখাচ্ছে; বোধ করি একটা হ্যাঁমক পেয়েছিলেন,  
না?

হ্যাঁমক কোথায় পাব মশাই, পেয়েছিলাম একটা ভ্যাড়ার খাঁচা। তাই তাজা  
দেখাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলিলাম, ডাক্তারবাবু, অধমও এই নরককুণ্ডেরই যাত্রী। কিন্তু দুর্বল বলিয়া এখানে তুকিতে পারি নাই। শুরু হইতে ডেকের উপরেই ছিলাম। কাল সাইক্লোনের খবর পাইয়া খানিকটা সময় ভ্যাড়ার খাঁচার উপরে বসিয়া, আর বাকি রাত্রিটা ফাস্ট ক্লাসের একটা ঘরের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছি। কি বলেন, অন্যায় করিয়াছি কি?

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া ডাক্তারবাবু এমনি খুশি হইয়া গেলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে বাকি দুটো দিন কাটাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশ্য সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, শুধু ডেকচেয়ারটা তাঁহার লইয়াছিলাম।

দুপুরবেলা, ক্ষুধার তাড়নে নিজীবের মত এই কেদারটার উপরে পড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডের খাদ্যবস্ত্র চিন্তা করিতেছি—কোথায় গিয়া কি ফন্দি করিলে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য মিলিবে, সেই দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময়ে খিদিরপুরের সেই মুসলমান দর্জিদের একজন আসিয়া কহিল, বাবুমশায়, একটি বাঙালী মেয়েলোক আপনাকে ডাকতেচে।

মেয়েলোক? বুঝিলাম ইনি টগর। কেন যে ডাকিতেছেন, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। নিশ্চয়ই মিন্দীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর স্বত্ত্ব-সাব্যস্ত ব্যাপারে আবার মতভেদ ঘটিয়াছে! কিন্তু আমাকে কেন? Trial by ordeal ছাড়া বাহিরের লোক আসিয়া কোনদিন যে ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে, তাহা মনে করাও ত শক্ত।

বলিলাম, ঘণ্টাখানেক পরে যাবো, বল গে।

লোকটি কৃষ্ণতভাবে কহিল, না বাবুমশায়, বড় কাতর হয়ে ডাকতেচে—

কাতর? কিন্তু টগর ত আমার কাতর হবার মানুষ নয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষমানুষটি কি করচে?

লোকটি কহিল, তেনার বেমারির জন্যেই ত ডাকতেচে।

বেমারি হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়—কাজেই উঠিলাম। লোকটি সঙ্গে করিয়া আমাকে নীচে লইয়া গেল। অনেক দূরে এক কোণে কতকগুলা কাছি বিঁড়ার মত করিয়া রাখা ছিল; তাহারই আড়ালে একটি বাইশ-তেইশ বছরের বাঙালী মেয়ে যে বসিয়াছিল, তাহা একদিনও আমার চোখে পড়ে নাই। কাছেই একখানি ময়লা সতরপঞ্চির উপরে এই বয়সেরই একটি অত্যন্ত ক্ষীণকায় যুবক মড়ার মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে—অসুখ ইহারই।

আমি নিকটে আসিতে মেয়েটি আন্তে আন্তে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল, কিন্তু আমি ইহার মুখ দেখিতে পাইলাম।

সে খুব সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ, বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি; কিন্তু এই তরুণীর প্রশংসন ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপমারা দেখিতে পাইলাম যাহা কদাচিত দেখিয়াছি। আমার অনন্দাদিদির কপালও বড় ছিল—অনেকটা যেন তাঁর মতই। সিঁথায় সিন্দূর ডগ্ডগ্ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা—আর কোন অলঙ্কার নাই, পরনে একখানি নিতান্ত সাদাসিধা রাঙাপেড়ে শাঢ়ি।

পরিচয় নাই, অথচ এমন সহজভাবে কথা কহিলেন যে, বিস্মিত হইয়া গেলাম। কহিলেন, আপনার সঙ্গে ডাঙ্গারবাবুর ত আলাপ আছে, একবার ডেকে আনতে পারেন?

বলিলাম, আলাপ আজই হয়েচে। তবে মনে হয় ডাঙ্গারবাবু লোক ভাল—  
কিন্তু, কি প্রয়োজন?

তিনি বলিলেন, ডাকলে যদি ভিজিট দিতে হয়, ত কাজ নেই, ইনি নাহয় কষ্ট করে উপরেই যাবেন। বলিয়া সেই রংগ লোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম, জাহাজের ডাঙ্গারকে ডাকলে বোধ করি কিছু দিতে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, এঁর হয়েচে কি?

আমি মনে করিয়াছিলাম, লোকটি এঁর স্বামী। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কথায় যেন সন্দেহ হইল। লোকটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ি থেকেই তোমার একটু পেটের অসুখ ছিল, না?

লোকটি মাথা নাড়িলে তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন, হাঁ, এর পেটের অসুখ দেশেতেই হয়েছিল, কাল থেকে জ্বর হয়েচে। এখন দেখচি জ্বর খুব বেশি, একটা কিছু ওষুধ না দিলেই নয়।

আমি নিজেও হাত দিয়া লোকটির গায়ের উভাপ অনুভব করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু নীচে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধপত্র দিয়া কহিলেন, চলুন শ্রীকান্তবাবু, ঘরে গিয়ে দুটো গল্লগাছা করা যাক।

ডাক্তারবাবু লোকটি চমৎকার। তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, চা খান ত?

বলিলাম, হাঁ।

বিস্কুট?

তাও খাই।

আচ্ছা।

খাওয়-দাওয়া সমাপ্ত হইবার পর দুজনে মুখোমুখি দুখানা চেয়ারে বসিলে, ডাক্তারবাবু কহিলেন, আপনি জুটলেন কি ক'রে?

বলিলাম, স্ত্রীলোকটি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পাঠাবারই কথা। বিয়ে-টিয়ে করেচেন? বলিলাম, না।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, তা হলে জুটে পড়ুন, নেহাঁ মন্দ হবে না। লোকটার ঐ ত চেহারা; তাতে টাইফয়েডের লক্ষণ বলেই মনে হচ্ছে। যা হোক, বেশি দিন

টিকবে না, তা ঠিক। ইতিমধ্যে একটু নজর রাখবেন, আর কোন ব্যাটা না ভিড়ে  
যায়।

অবাক হইয়া বলিলাম, আপনি এ-সব কি বলচেন ডাঙ্গারবাবু?

ডাঙ্গারবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, ছেঁড়টা বার  
ক'রে আন্চে, না ওকেই বার করে এনেচে, কি মনে হয় বলুন ত শ্রীকান্তবাবু?  
খুব forward, না? দিব্যি কথাবার্তা কয়।

বলিলাম, এ রকম ধারণা আপনার মনে কি করে এল?

ডাঙ্গারবাবু বলিলেন, প্রতি ট্রিপেই দেখি কিনা, একটা-না-একটা আছেই!  
গতবারেই ত বেলঘোরের একজোড়া ছিল। একবার বর্মায় গিয়ে পা দিন, তখন  
দেখবেন, আমার কথাটা ঠিক কি না।

বর্মার কথাটা যে তাঁর অনেকটাই সত্য, তাহা পরে দেখিয়াছিলাম বটে;  
কিন্তু আপাততঃ সমস্ত মনটা বিত্তশায় যেন তিক্ত হইয়া উঠিল।

ডাঙ্গারবাবুর নিকট বিদ্যায় লইয়া একবার নন্দ মিস্ট্রীর খবর লইতে নীচে  
গেলাম। ‘সপরিবার’ মিস্ট্রীমশাই তখন ফলাহারের আয়োজন করিতেছিল; একটা  
নমস্কার করিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, ঐ মেয়েমানুষটি কে মশাই?

টগর শিরঃপীড়া বাবদে মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিতেছিল—ফোঁস করিয়া  
গর্জাইয়া উঠিল, তোমার সে খবরে কাজ কি শুনি?

মিস্ট্রী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, দেখলেন মশাই, মাগীর ছেট মন?  
কে বাঙালী মেয়েটা রেঙ্গুনে যাচ্ছে —খবরটা নিতেও দোষ?

টগর শিরঃপীড়া ভুলিয়া, পাগড়িটা ফেলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল।  
সেই দুটি গো-চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মশাই, টগর বোষ্টমীর হাত দিয়ে  
ওর মত কত গঙ্গা মিস্ট্রীর মানুষ হয়ে গেল—এখন ও আমার চোখে ধূলো দেবে?  
আরে, তুই ডাঙ্গার না বদ্য যে, যেই একটু জল আনতে গেছি, অমনি ছুটে

দেখতে গেছিস? কেন, কে ও? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি মিস্ত্রী! আর যদি ওদিকে যেতে দেখি ত, তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!

নন্দ মিস্ত্রীও গরম হইয়া কহিল, তোর কি আমি পোষা বাঁদর যে, যে-দিকে শিকল ধরে নিয়ে যাবি সেই দিকে যাবো? আমার ইচ্ছে হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আসব—তুই যা পারিস, তা করিস। বলিয়া ফলারে মন দিল।

টগরও শুধু একটা ‘আচ্ছা’ বলিয়া তাহার পাগড়ি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও প্রস্থান করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে গেলাম, এমনি করিয়া ইহারা বিশ বৎসর কাটাইয়াছে। অনেক পোড় খাইয়া টগর এটা বুঝিয়াছে যে, যেখানে সত্যকার বন্ধন নাই, সেখানে এতটুকু রাশ শিথিল করিলে চলিবে না, ঠকিতেই হইবে; হয় অহনিষ্ঠি সতর্ক হইয়া জোর করিয়া দখল বজায় রাখতে হইবে, নাহয় যৌবনের মত নন্দ মিস্ত্রীও একদিন অঙ্গতসারে খসিয়া পড়িবে। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া টগরের এই বিদ্যে, ডাঙ্গারবাবুর এমন কৃৎসিত তীব্র কটাক্ষ—সে কে, এবং কি? টগর কহিয়াছিল, এই কাজ করিয়া সে নিজে চুল পাকাইয়াছে—তাহার চক্ষে ধূলি দিবে, এমন মেয়েমানুষ আছে কোথায়?

ডাঙ্গারবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই কাণ্ড নিত্য দেখিয়া তাঁর চোখে দিব্যদৃষ্টি আসিয়াছে; আজ ভুল করিলে এমন চোখ তিনি উপড়াইয়া ফেলিতে রাজি আছেন।

এমনিই বটে। অপরকে বিচার করিতে বসিয়া কোন মানুষকেই কখনো বলিতে শুনি নাই, সে অন্তর্যামী নয়, কিংবা তাহার ভ্রম-প্রমাদ কখনো হয়। সবাই কহে, মানুষ চিনিতে তাহার জোড়া নাই, এবং এ বিষয়ে সে একটি পাকা জভূরী। অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে, তাহাই ত জানি না। তবে আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অনন্দাদিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে, ভালো ভাবিয়া নির্বোধ হওয়াতেই যে মোটের

উপর বুদ্ধির দামটা বেশিই পাওয়া যায়, সে কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। তাই এই দুটি পরম বিজ্ঞ নরনারীর উপদেশ অভ্যন্ত বলিয়া অসঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ডাঙ্গারবাবু বলিয়াছিলেন, অত্যন্ত forward, তা বটে। এই কথাটাই শুধু আমাকে থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে আবার ডাক পড়িল। এইবার এই স্ত্রীলোকটির পরিচয় পাইলাম। নাম শুনিলাম, অভয়া। উত্তররাট্টি কায়স্ত, বাড়ি বালুচরের কাছে। যে ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সে গ্রাম-সম্পর্কে ভাই হয়। নাম রোহিণী সিংহ।

ওষধে রোহিণীবাবুর যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া অভয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে আত্মীয় করিয়া লইল। অথচ স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমার মনের মধ্যে অনিছা সত্ত্বেও একটা কঠোর সমালোচনার ভাবই বরাবর জাগ্রত ছিল। তথাপি এই স্ত্রীলোকটির সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোথাও একটা অসঙ্গতি বা অশোভন প্রগল্ভতা ধরিতে পারিলাম না।

অভয়ার মানুষ বশ করিবার আশ্চর্য শক্তি! ইহারই মধ্যে শুধু যে সে আমার নাম-ধাম জানিয়া লইল, তাহা নয়, তাহার নিরগদিষ্ট স্বামীকে যেমন করিয়া পারি খুঁজিয়া দিব, তাহাও আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইল। তাহার স্বামী আট বৎসর পূর্বে বর্মায় চাকরি করিতে আসিয়াছিল। বছর-দুই তাহার চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই ছয় বৎসর আর কোন উদ্দেশ নাই। দেশে আত্মীয়স্বজন আর কেহ নাই। মা ছিলেন, তিনি মাসখানেক পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করায় অভিভাবকহীন হইয়া বাপের বাড়িতে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ায়, রোহিণীদাদাকে রাজি করিয়া বর্মায় চলিয়াছে। একটুখানি চুপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এতটুকু চেষ্টা না করে কোনমতে দেশের বাড়িতে পড়ে থাকলেই কি আমার ভাল কাজ হ'ত? তা ছাড়া এ বয়সে দুর্নাম কিনতেই বা কতক্ষণ!

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তিনি এতকাল আপনার কোন খোঁজ নেন না, কিছু জানেন? না, কিছু জানিনে।

তার পূর্বে কোথায় ছিলেন, তা জানেন?

জানি। রেঙ্গুনেই ছিলেন, বর্মা রেলওয়েতে কাজ করতেন; কিন্তু কত চিঠি দিয়েছি, কখনো জবাব পাইনি। অথচ একটা চিঠিও কোনদিন আমার ফিরে আসেনি।

প্রতি পত্রই যে অভয়ার স্বামী পাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু কেন যে জবাব দেয় নাই, তাহার সম্ভবত: হেতু এইমাত্র ডাঙ্কারবাবুর কাছেই শুনিয়াছিলাম। অনেক বাঙালীই সেখানে গিয়া, কোন সুন্দরী ব্রহ্মণী লইয়া আবার নৃতন করিয়া ঘর-সংসার পাতে। এমনও অনেকে আছে, যাহারা সারাজীবন আর কখনো দেশে ফিরিয়াও যায় না। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অভয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বেঁচে নেই, তাই কি আপনার মনে হয়?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, বরং ঠিক তার উল্টো। তিনি যে বেঁচে আছেন এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি।

খপ্ করিয়া অভয়া আমার পায়ে হাত দিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছুই চাইনে। তিনি বেঁচে থাকলেই হ'ল।

আমি পুনরায় মৌন হইয়া রহিলাম। অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি কি ভাবছেন, আমি জানি।

জানেন?

জানিনে? আপনি পুরুষমানুষ হয়ে ভাবতে পারলেন, আর আমার মেয়েমানুষের মনে সে ভয় হয়নি? তা হোক, আমি ভয় করিনে—আমি সতীন নিয়ে খুব ঘর করতে পারব।

তথাপি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমার মনের কথা অনুমান করিতে এই বুদ্ধিমতী নারীর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। কহিল, আপনি ভাবছেন, আমি ঘর করতে রাজি হ'লেই ত হ'ল না; আমার সতীন রাজি হবে কি না, এই ত?

বাস্তবিক, আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বলিলাম, বেশ তাই যদি হয় ত কি করবেন?

এইবার অভয়ার চোখ-দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। আমার মুখের প্রতি সজল দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া কহিল, সে বিপদে আপনি একটু আমাকে সাহায্য করবেন শ্রীকান্তবাবু! আমার রোহিণীদাদা বড় সাদাসিধে ভাল মানুষ, তাঁর দ্বারা তখন ত কোন উপকারই হবে না।

সম্মত হইয়া বলিলাম, সাধ্য থাকলে নিশ্চয় করব; কিন্তু এ-সব বিষয়ে বাইরের লোক দিয়ে কাজ ত প্রায় হয়ই না, বরং অকাজই বেড়ে যায়।

সে-কথা সত্যি, বলিয়া অভয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা quarantine: তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় শহরে থাকে, এবং সে Port Health Officer-এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা।

ডাক্তারবাবু আমাকে তাঁহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, শ্রীকান্তবাবু, একখানা চিঠি যোগাড় না ক'রে আপনার আসা উচিত ছিল না; Quarantine-এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে কসাইখানায় গর-ছাগল-ভেড়াকেও এত কষ্ট সহিতে হয় না। তবে ছোটলোকেরা কোন রকমে সহিতে পারে, শুধু ভদ্রলোকদেরই মর্মাত্তিক ব্যাপার। একে ত মুটে নেই, নিজের

সমস্ত জিনিস নিজে কাঁধে করে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নামাতে ওঠাতে হয়—  
ততদূরে বয়ে নিয়ে যেতে হয়; তার পরে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে খুলে ছড়িয়ে  
স্টিমে ফুটিয়ে লগ্নভণ করে ফেলে—মশাই, এই রোদের মধ্যে কষ্টের আর অবধি  
থাকে না।

অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলাম, এর কি কোন প্রতিকার নেই, ডাঙ্গারবাবু?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তবে ডাঙ্গারসাহেবে জাহাজে উঠলে  
একবার আপনার জন্য ব'লে দেখব, তাঁর কেরানীবাবুটি যদি আপনার ভার নিতে  
রাজি—কিন্তু কথাটা তাঁর ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড  
ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। একটা গোলমাল শুনিয়া  
দুইজনেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, জাহাজের সেকেন্ড অফিসার ৬-৭ জন  
খালাসীকে এলোপাতাড়ি লাঠি মারিতেছে; এবং বুটের চোটে যে যেখানে  
পারিতেছে পলায়ন করিতেছে। এই ইংরাজ যুবকটি অত্যন্ত উদ্ধৃত বলিয়া বোধ  
করি ডাঙ্গারবাবুর সহিত ইতিপূর্বে কোনদিন বচসা হইয়া থাকিবে, আজও কলহ  
হইয়া গেল।

ডাঙ্গারবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমার এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত  
গর্হিত—একদিন তোমাকে এ জন্য দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি।

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন?

ডাঙ্গারবাবু বলিলেন, এভাবে লাঠি মারা ভারি অন্যায়।

লোকটা জবাব দিল, মার ছাড়া ক্যাটল্ সিধা হয়?

ডাঙ্গারবাবু একটু স্বদেশী। তাই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এরা  
জানোয়ার নয়, গরীব মানুষ। আমাদের দেশী লোকেরা নম্র এবং শান্ত বলিয়াই  
কাণ্ডেনসাহেবের কাছে তোমার নামে অভিযোগ করে না, এবং তুমিও অত্যাচার  
করিতে সাহস কর।

হঠাতে সাহেবের মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল। ডাঙ্গারের হাতটা টানিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, Look, Doctor, they are your countrymen; you ought to be proud of them!

চাহিয়া দেখি, কয়েকটা উঁচু পিপার আড়ালে দাঁড়াইয়া এই লোকগুলো দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছে। সাহেব একগাল হাসিয়া, ডাঙ্গারবাবুর মুখের উপর দুহাতের বুড়া আঙ্গুল-দুটা নাড়িয়া দিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া শিস দিতে দিতে প্রস্থান করিল। জয়ের গর্ব তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাঙ্গারবাবুর মুখখানা লজ্জায়, ক্ষেত্রে, অপমানে কালো হইয়া গেল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া ক্রুদ্ধকষ্টে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া ব্যাটারা, দাঁত বার ক'রে হাসচিস যে!

এইবার এতক্ষণে দেশী লোকের আভ্যন্তরীণ বোধ ফিরিয়া আসিল। সবাই একযোগে হাসি বন্ধ করিয়া চড়া কঢ়ে জবাব দিল, তুমি ডাঙ্গারবাবু, ব্যাটা বলবার কে? কারো কর্জ করে খায়ে হাসতেচি মোরা?

আমি জোর করিয়া টানিয়া ডাঙ্গারবাবুকে তাঁর ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম, তিনি চৌকির উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুধু বলিলেন, উঃ—!

আর দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না। হওয়াও অসম্ভব ছিল।

বেলা এগারটার সময় Quarantine-এর কাছাকাছি একটা ছেট স্টীমার আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিড়িল। এইখানি করিয়াই নাকি সমস্ত ডেকের যাত্রীদের সেই ভয়নক স্থানে লইয়া যাইবে। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদার ধুমধাম পড়িয়া দিয়াছে। আমার তাড়া ছিল না, কারণ ডাঙ্গারবাবুর লোক এইমাত্র জানাইয়া গেছে যে, আমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রী ও খালাসীদের চেঁচামেচি দৌড়োঁপ করকটা অন্যমনক্ষের মত নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাতে

পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, অভয়া দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য হইয়া কহিলাম,  
আপনি এখানে যে?

অভয়া কহিল, কৈ, আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন না?

বলিলাম, না—আমার এখনো একটু দেরি আছে। আমাকে ওখানে যেতে  
হবে না, একেবারে শহরে গিয়েই নামব।

অভয়া কহিল, না—না, শিগ্গির গুছিয়ে নিন।

বলিলাম, আমার এখনও তের সময় আছে।

অভয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, সে হবে না। আমাকে ছেড়ে  
আপনি কিছুতে যেতে পারবেন না।

অবাক হইয়া বলিলাম, সে কি কথা! আমার ত ওখানে যাওয়া হতে পারে  
না।

অভয়া বলিল, তা হলে আমারও না। আমি বরং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব,  
তবু কিছুতেই এমন নিরাশ্রয় হয়ে ও- জায়গায় যাব না। ওখানকার সব কথা  
শুনেছি। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ-দুটি জলে টলটল করিয়া উঠিল। আমি  
হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কে যে এমন জোর করিয়া তাহার জীবনের  
সঙ্গে আমাকে ধীরে ধীরে জড়াইয়া তুলিতেছে!

সে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমাকে একলা ফেলে চলে যাবেন—এত  
নিষ্ঠুর আপনি হতে পারেন, আমি ভাবতেও পারিনে। উঠুন, নীচে চলুন। আপনি  
না থাকলে ওই রোগা মানুষটিকে নিয়ে আমি একলা মেয়েমানুষ কি করব বলুন  
ত?

নিজের জিনিসপত্র লইয়া যখন ছোট স্টীমারে উঠিলাম, তখন ডাঙ্কারবাবু  
উপরের ঢেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ আমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া তিনি চিৎকার  
করিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না, না, আপনাকে যেতে হবে না। ফিরুন,  
ফিরুন—আপনার হৃকুম হয়েছে—আপনি—

আমিও হাত নাড়িয়া চেঁচাইয়া কহিলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আর  
একটা হৃকুমে আমাকে যেতেই হচ্ছে।

সহসা বোধ করি তাঁহার দৃষ্টি অভয়া ও রোহিণীর উপর পড়িল। মুখ  
টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, তবে মিছে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন?

তার জন্যে ক্ষমা চাইচি।

না, না, তার দরকার নেই, আমি জানতাম। Good-bye, চললুম! বলিয়া  
ডাক্তারবাবু হাসিমুখে সরিয়া গেলেন।

## পাঁচ

কেরেন্টিন্ কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য—ভদ্রলোকের জন্য নয়; এবং যে-কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশি দেয় নাই, সেই কুলি। চা বাগানের আইনে কি বলে জানি না, তবে জাহাজী আইন এই বটে এবং কর্তৃপক্ষরাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কি জানেন, তা তাঁরাই জানেন, কিন্তু অফিসিয়েলি তাঁহাদের ইহার অধিক জানার রীতি নাই। অতএব সে-যাত্রায় আমরা সকলেই কুলি ছিলাম। সাহেবরা ইহাও জানেন যে, কুলির জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জাম এমনকিছু হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়, যাহা সে নিজে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ঘাট হইতে কেরেন্টিন্ যাত্রীদের জিনিসপত্র বহন করাইবার যে কোন ব্যবস্থাই নাই, তাতে ক্ষুব্ধ হইবারও কিছু নাই। এ সকলই সত্য, তথাপি আমরা তিনটি প্রাণী যে মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য এবং পদতলে ততোধিক উগ্র উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে এক অপরিচিত নদীকূলে, একরাশ মোটঘাট সুমুখে লইয়া কিংকর্তব্যবিমুচ্তভাবে পরস্পরে মুখোমুখি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে শুধু আমাদের দূরদৃষ্টি। সহযাত্রীদের পরিচয় ইতিপূর্বেই দিয়াছি। তাঁহারা যে-যাহার লোটা-কস্তল পিঠে ফেলিয়া, এবং অপেক্ষাকৃত ভারী বোঝাগুলি তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদের মাথার উপরে তুলিয়া দিয়া, স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রোহিণীদাদা একটা বিছানার পুঁটুলিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। জ্বর, পেটের অসুখ এবং চরম শ্রান্তি—এইগুলি এক করিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ যে, চলা ত ঢের দূরের কথা, বসাও অসম্ভব—শুইয়া পড়িতে পারিলেই তিনি বাঁচেন! অভয়া স্ত্রীলোক। রহিলাম শুধু আমি এবং নিজের ও পরের নানা আকারের ছেট-বড় বোঁচকা-বুঁচকিগুলি! অবস্থাটা আমার একবার ভাবিয়া দেখিবার মত বটে!

অকারণে চলিয়াছি ত এক অজ্ঞাত অপ্রীতিকর স্থানে; এক ক্ষফে ভর করিয়াছেন নিঃসম্পর্কীয়া নিরূপায় নারী, অপর ক্ষফে ঝুলিতেছেন তেমনি অপরিচিত এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ। মোটঘাটগুলা ত সব ফাউ। এই-সকলের মধ্যে ভীষণ রৌদ্রে আকর্ষ পিপাসা লইয়া এক অজানা জায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। চিত্রিত কল্পনা করিয়া, পাঠক হিসাবে লোকের প্রচুর আমোদ বোধ হইতে পারে; হয়ত কোন সহদয় পাঠক এই নিঃস্বার্থ পরোপকার-বৃত্তির প্রশংসা করিতেও পারেন; কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই, এই হতভাগ্যের তৎকালে সমস্ত মন বিত্ত্বণায় ও বিরক্তিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া মন বলিতেছিল, এতবড় গাধা ত্রিসংসারে কি আর কেউ আছে! কিন্তু পরমাশৰ্য এই যে, এ পরিচয় ত আমার গায়ে লেখা ছিল না, তবে এক-জাহাজ লোকের মধ্যে ভার বহিবার জন্য একদণ্ডেই অভয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল কি করিয়া? কিন্তু আমার চমক ভাসিল তাহার হাসিতে। সে মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল। এই হাসির চেহারা দেখিয়া শুধু আমার চমক নয়, তাহার ভয়ানক কষ্টটাও এইবার চোখে পড়িয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে আশৰ্য হইয়া গেলাম—এই পল্লীবাসিনী মেয়েটির কথায়। কোথাও লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় মাটির সহিত মিশিয়া গিয়া করুণা ভিক্ষা চাহিবে, না, হাসিয়া কহিল, খুব ঠকেচেন—মনে করবেন না যেন। অনায়াসে যেতে পেরেও যে যাননি, তার নাম দান। এতবড় দান করবার সুযোগ জীবনে হয়ত খুব কমই পাবেন, তা ব'লে রাখচি। কিন্তু সে কথা যাক। জিনিসপত্রের এইখানেই প'ড়ে থাক, চলুন, এঁকে যদি কোথাও ছায়ায় একটু শোয়াতে পারা যায়।

বোঁচকা-বুঁচকির মমতা আপাততঃ ত্যাগ করিয়াই আমি রোহিণীদাদাকে পিঠে করিয়া কেরেন্টিনের উদ্দেশে রওনা হইলাম। অভয়া ছোট একটি হাতবাক্স মাত্র হাতে লইয়া আমার অনুসরণ করিল, অন্যান্য জিনিসপত্র সেইখানেই পড়িয়া

রহিল। অবশ্য সে-সকল আমাদের খোয়া যায় নাই, ঘণ্টা-দুই পরে তাহাদের আনাইয়া লইবার উপায় হইয়াছিল।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সত্যকার বিপদ কান্নানিক বিপদের চেয়ে তের সুসহ। প্রথম হইতেই ইহা স্মরণ থাকিলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত এড়ানো যায়। সুতরাং কিছু কিছু ক্লেশ ও অসুবিধা যদিও নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কেরেন্টিনের নির্দিষ্ট মিয়াদের দিনগুলি আমাদের একপ্রকার ভালই কাটিল। তা ছাড়া পয়সা খরচ করিতে পারিলে যমের বাটীতেও যখন বড়কুটুম্বের আদর পাওয়া যায়, তখন এ ত মোটে কেরেন্টিন। জাহাজের ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকটি বেশ forward; কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই স্ত্রীলোকটি যে কিরণ বেশ forward হইতে পারে তাহা বোধ করি, তিনি কল্পনাও করেন নাই। রোহিণীবাবুকে যখন পিঠ হইতে নামাইয়া দিলাম, তখন অভয়া কহিল, হয়েচে, আর আপনাকে কিছু করতে হবে না শ্রীকান্তবাবু, এবার আপনি বিশ্রাম করুন, যা করবার আমি করচি।

বিশ্রামের আমার যথার্থই আবশ্যক হইয়াছিল—পা-দুটি শান্তিতে ভাসিয়া পড়িতেছিল; তথাপি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, আপনি কি করবেন?

অভয়া জবাব দিল, কাজ কি কম রয়েচে? জিনিসগুলি আনতে হবে, একটা ভাল ঘর যোগাড় করে আপনাদের দুজনের বিছানা তৈরি করে দিতে হবে, রান্না করে যা হোক দুটো দুজনকে খাইয়ে দিয়ে তবে ত আমার ছুটি হবে, তবে ত একটু বসতে পাবো। না না, মাথা খান, উঠবেন না; আমি এক্ষুনি সমস্ত ঠিকঠাক করে দিচ্ছি। একটু হাসিয়া কহিল, ভাবচেন, মেয়েমানুষ হয়ে একা এ-সব যোগাড় করব কি ক'রে, না? তা বৈ কি! আপনাদের যোগাড় করেছিল কে! সে আমি না আর কেউ? বলিয়া সে ছোট বাক্সটি খুলিয়া গুটিকতক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া কেরেন্টিনের অফিস ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে পারুক আর না পারুক, আমি ত আপাততঃ বসিতে পারিয়া বাঁচিয়া গেলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই একজন চাপরাসী আমাদের ডাকিতে আসিল। রোহিণীকে লইয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, ঘরটি ভালই বটে। মেমসাহেব-ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া লোক দিয়া সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইতেছেন, জিনিসপত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে, দুখানি খাটিয়ার উপর দুজনের বিছানা পর্যন্ত তৈরি হইয়া গিয়াছে। একাধারে নৃতন হাঁড়ি, চাল, ডাল, আলু, ঘি, ময়দা কাঠ সমস্তই মজুত। মাদ্রাজী ডাক্তারের সঙ্গে অভয়া ভাঙা হিন্দিতে কথাবার্তা চালাইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই কহিল, ততক্ষণ একটু শুয়ে পড়ুন গে, আমি মাথায় দু' ঘটি জল ঢেলে নিয়ে এবেলার মত চারটি চালে-ডালে খিচুড়ি রেঁধে নিই। ও বেলা তখন দেখা যাবে। বলিয়া গামছা এবং কাপড় লইয়া মেমসাহেবকে সেলাম করিয়া একজন খালাসীকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। অতএব ইহারই অভিভাবকতার এখানের দিনগুলি যে আমাদের ভালই কাটিয়াছিল, তাহা বলায় নিশ্চয় বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় নাই।

এই অভয়াতে আমি দুটো জিনিস শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এরপ অবস্থায় নিঃসম্পর্কীয় নর-নারীর ঘনিষ্ঠতা স্বতঃই দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায়; কিন্তু ইহা সে কোনদিন ঘটিবার সুযোগ দেয় নাই। ইহার ব্যবহারের মধ্যে কি যে একটা ছিল, তাহা প্রতিক্ষণেই স্মরণ করাইয়া দিত, আমরা এক-জায়গার যাত্রী মাত্র। কাহারও সহিত কাহারও সত্যকার সম্বন্ধ নাই—দু'দিন পরে হয়ত সারা জীবনের মধ্যেও আর কখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে না।

আর এমন আনন্দের পরিশ্রমও কখনও দেখি নাই। সারাদিন আমাদের সেবার জন্যেই ব্যস্ত, সমস্ত কাজ নিজেই করিতে চায়। সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলেই হাসিয়া বলিত, এ ত সমস্তই আমার নিজের কাজ। নইলে রোহিণীদাদারই বা এ কষ্টের কি আবশ্যক ছিল, আপনারই বা কি মাথা-ব্যথা পড়েছিল এই জেলখানায় আসতে। আমার জন্যেই ত আপনাদের এত দুঃখ।

হয়ত খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু গল্প হইতেছে, অফিসের ঘন্টায় দুটি বাজিতেই একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই, আপনাদের চা তৈরি ক'রে আনি—দুটো বাজল।

মনে মনে বলিতাম, তোমার স্বামী যত পাপিষ্ঠই হোন, পুরুষমানুষ ত! যদি কখনো তাঁকে পাও, তোমার মূল্য তিনি বুঝবেনই।

তার পরে একদিন মিয়াদ ফুরাইল। দাদাও ভাল হইলেন, আমারাও সরকারি ছাড়পত্র পাইয়া আর-একবার পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া রেঙ্গুন যাত্রা করিলাম। কথা ছিল, শহরে মোসাফিরখানায় দুই-একদিনের জন্য আশ্রয় লইয়া একটা বাসা তাঁহাদের ঠিক করিয়া দিয়া তবে আমি নিজের জায়গায় যাইব, এবং যেখানেই থাকি, তাঁহার স্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহাকে একটা সংবাদ পাঠাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

শহরে যেদিন পদার্পণ করিলাম, সে দিনটি ব্ৰহ্মবাসীদের কি একটা পৰ্বদিন। আৱ পৰ্বও তাহাদের লাগিয়াই আছে। দলে দলে ব্ৰহ্ম নৱ-নারী রেশমের পোশাক পরিয়া তাহাদের মন্দিরে চলিয়াছে। স্তৰী-স্বাধীনতার দেশ, সুতৰাং আনন্দ-উৎসবে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। বৃন্দা, যুবতী, বালিকা—সকল বয়সের স্তৰীলোকই অপূৰ্ব পোশাক-পরিচ্ছেদে সজ্জিত হইয়া, হাসিয়া, গল্প করিয়া, গান গাইয়া সমস্ত পথটা মুখৰিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের রং অধিকাংশই খুব ফৰসা; মেঘের মত চুলের বোৰা ত শতকৱা নৰুই জন রমণীৰ হাঁটুৱ নীচে পড়ে। খোঁপায় ফুল, কানে ফুল, গলায় ফুলের মালা—ঘোমটার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইবার আগ্রহাতিশয়ে হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়া নাই—দ্বিধা-সঙ্কোচলেশহীন—যেন ঝৱনার মুক্ত প্ৰবাহেৰ মতই স্বচ্ছন্দে, অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। প্ৰথম দৃষ্টিতে একেবারে মুক্ত হইয়া গেলাম। নিজেদেৱ দেশেৱ তুলনায় মনে মনে তাহাদেৱ অশেষ প্ৰশংসা কৰিয়া বলিলাম, এই ত চাই! এই নইলে আৱাৰ জীৱন! তাহাদেৱ সৌভাগ্যটা সহসা যেন ঈৰ্ষাৰ মত বুকে বাজিল।

কহিলাম, এই যে ইহারা চতুর্দিকে আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সে কি অবহেলার জিনিস? রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া এ দেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরাই বা তাহাদের আস্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি! আমাদের মেয়েরাও যদি এমনি একদিন— হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া পিছনে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আজও আমার তেমনি স্পষ্ট মনে আছে। বচসা বাঁধিয়াছে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া লইয়া। গাড়োয়ান আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান। সে কহিতেছে, চুক্তি হইয়াছিল আট আনা, আর তিনজন ভদ্রঘরের ব্রহ্মরমণী গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছেন—না, পাঁচ আনা; মিনিট দুই-তিন তর্কাতর্কির পরেই, বলং বলং বাহুবলং। পথের ধারে একটা লোক মোটা মোটা ইক্ষুদণ গাদি করিয়া বিক্রি করিতেছিল, অকস্মাত তিনজনেই ছুটিয়া গিয়া তিনগাছা হাতে তুলিয়া হতভাগা গাড়োয়ানকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। সে কি এলোপাথাড়ি মার! বেচারা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতেও পারে না—শুধু আত্মরক্ষা করিতে একে আটকায় ত ওর বাড়ি মাথায় পড়ে, ওকে আটকায় ত তার বাড়ি মাথায় পড়ে। চারিদিকে লোক জমিয়া গেল—কিন্তু সে শুধু তামাশা দেখিতে। সে দুর্ভাগার কোথায় গেল টুপি-পাগড়ি, কোথায় গেল হাতের ছিপটি—আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে রণে ভঙ্গ দিয়া পুলিশ! পুলিশ! পিয়াদা! পিয়াদা! চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল!

সবে বাঙলা দেশ হইতে আসিতেছি, তাও আবার পাড়াগাঁ হইতে। কলিকাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—কানে শুনিয়াছি, চোখে দেখি নাই। কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে ভদ্রঘরের অবলারাও যে একটা জোয়ান-মদ পুরুষমানুষকে প্রকাশ্য রাজপথের উপর আক্রমণ করিয়া লাঠিপেটা করিতে পারে—ক্রমশঃঃ এতখানি সবলা হইয়া উঠার সম্ভাবনা আমার কল্পনার অতীত ছিল। অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বকার্যে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে কহিতে

ଲାଗିଲାମ, ସ୍ତ୍ରୀ-ସ୍ଵାଧୀନତା ଭାଲ କିଂବା ମନ୍ଦ, ସମାଜେ ଆନନ୍ଦେର ମାତ୍ରା ଇହାତେ ବାଡ଼େ  
କିଂବା କମେ—ଏ ବିଚାର ଆର ଏକଦିନ କରିବ—କିନ୍ତୁ ଆଜ ସ୍ଵଚକ୍ଷେ ଯାହା ଦେଖିଲାମ,  
ତାହାତେ ତ ସମ୍ମତ ଚିନ୍ତ ଉଦ୍ଭାବିତ ହଇଯା ଗେଲା ।

## ছয়

অভয়া ও রোহিণীদাদাকে তাহাদের নৃতন বাসায় নৃতন ঘরকম্বার মধ্যে  
প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেদিন সকালে নিজের জন্য আশ্রয় খুঁজিতে রেঙ্গনের রাজপথে  
বাহির হইয়া পড়িলাম, সেদিন ওই দুটি লোকের সমন্বে আমার মনের মধ্যে যে  
একেবারেই কোন গ্লানি স্পর্শ করে নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু  
এই অপবিত্র চিন্তাটাকে বিদায় করিতেও আমার বেশি সময় লাগে নাই। কারণ  
কোন দুটি বিশেষ বয়সের নর-নারীকে কোন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে  
দেখিতে পাওয়ামাত্রই একটা বিশেষ সমন্বন্ধ কল্পনা করা যে কত বড় ভাস্তি—এ  
শিক্ষা আমার হইয়া গিয়াছিল; এবং ভবিষ্যতের জটিল সমস্যাও ভবিষ্যতের হাতে  
ছাড়িয়া দিতে আমার বাধে না। সুতরাং সুন্দর্মাত্র নিজের ভারটাই নিজের কাঁধে  
তুলিয়া লইয়া সেদিন প্রভাতকালে তাহাদের নৃতন বাসা হইতে বাহির  
হইয়াছিলাম। এখনকার মত তখনকার দিনে নৃতন বাঙালী বর্মা মুঞ্গুকে পদার্পণ  
করামাত্রই পুলশের প্রকাশ্য এবং গুণ্ঠ কর্মচারীর দল তাহাকে প্রশংসন করিয়া বিদ্রূপ  
করিয়া লাঙ্গিত করিয়া, বিনা অপরাধে থানায় টানিয়া লইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া  
যন্ত্রণার একশেষ করিত না। মনের মধ্যে পাপ না থাকিলে তখনকার দিনে  
পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকেরই নির্ভয়ে বিচরণ করিবার অধিকার ছিল; এবং  
এখনকার মত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার নিরতিশয় অপমানকর গুরুত্বারও  
তখন নবাগত বঙ্গবাসীর ঘাড়ের উপর চাপানো হয় নাই। অতএব স্বচ্ছন্দচিত্তে  
কোন একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত সকালটাই সেদিন পথে পথে ঘুরিয়া  
বেড়াইয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে পড়ে। একজন বাঙালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।  
সে মুটের মাথায় এক ঝাঁকা তরিতরকারি চাপাইয়া ঘাম মুছিতে দ্রুতপদে

চলিযাছিল—জিজ্ঞাসা করিলাম, মশাই, নন্দ মিস্ত্রীর বাসাটা কোথায়, ব'লে দিতে পারেন?

লোকটা থামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কোন্ নন্দ? রিবিট ঘরের নন্দ পাগড়িকে খুঁজছেন?

বলিলাম, সে ত জানিনে মশাই—কোন্ ঘরের তিনি! শুধু পরিচয় দিয়েছিলেন, রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী ব'লে।

লোকটা অসম্মানসূচক একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া কহিল,—ওঃ—মিস্ত্রী। অমন সবাই নিজেকে মিস্ত্রী কবলায় মশায়! মিস্ত্রী হওয়া সহজ নয়! মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছিল, হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্ত্রী হবার লোক ত দেখতে পাইনে! তখন বড়সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশখানি। আরে, কাস্তের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম! কেটে যে জোড়া দিতে পারি। তবে কি জানেন মশাই—

দেখিলাম, অজ্ঞাত লোকটার এমন জায়গায় আঘাত করিয়া ফেলিয়াছি যে, মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম, তা হলে নন্দ ব'লে কোন লোককে আপনি জানেন না।

শোন কথা! চল্লিশ বছর রেঙ্গুনে বাস, আমি জানিনে আবার কাকে? নন্দ কি একটা? তিনটে নন্দ আছে যে! নন্দ মিস্ত্রী বললেন? আসচেন কোথেকে? বাঙ্গলা থেকে বুঝি? ওঃ—তাই বলুন—টগরের মানুষকে খুঁজছেন?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হাঁ—হাঁ, তিনিই বটে!

লোকটা কহিল, তাই বলুন। পরিচয় না পেলে চিনব কি করে? আসুন আমার সঙ্গে! বরাতে করে খাচে মশাই, নইলে নন্দ পাগড়ি নাকি আবার একটা মিস্ত্রী। মশাই আপনারা?

ব্রাহ্মণ শুনিয়া লোকটা পথের উপরেই প্রণাম করিল; কহিল, সে দেবে আপনার চাকরি ক'রে? তা সাহেবকে ব'লে দিতেও পারে একটা যোগাড় ক'রে,

কিন্তু দুটি মাসের মাইনে আগাম ঘূষ দিতে হবে। পারবেন? তা হলে আঠারো আনা পাঁচসিকে রোজ ধরতেও পারে। এর বেশি নয়!

জানাইলাম যে, আপাততঃ চাকরির উমেদারিতে যাইতেছি না, একটু আশ্রয় যোগাড় করিয়া দিবে, এই আশা আমাকে নন্দ মিস্ত্রী জাহাজের উপরেই দিয়াছিল।

শুনিয়া হরিপদ মিস্ত্রী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা কহিল, মশাই ভদ্রলোক, কেন ভদ্রলোকদের মেসে যান না?

কহিলাম, মেস কোথায়, সে ত চিনি না!

সেও চিনে না—তাহা সেও স্বীকার করিল। কিন্তু ও-বেলা সন্ধান করিয়া জানাইবে আশা দিয়া বলিল, কিন্তু এত বেলায় নন্দের সঙ্গে দেখা হবে না—সে কাজে গেছে—টগর খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। ডাকাডাকি করে তার ঘুম ভাঙালে আর রক্ষে থাকবে না মশাই।

সেটা খুব জানি। সুতরাং পথের মধ্যে আমাকে ইত্ততঃ করিতে দেখিয়া সে সাহস দিয়া কহিল, নাই গেলেন সেখানে! অমন তোফা দাঠাকুরের হোটেলে রয়েচে—চান করে সেবা করে ঘুম দিয়ে বেলা পড়লে তখন দেখা যাবে। চলুন।

হরিপদের সহিত গল্প করিতে করিতে দাঠাকুরের হোটেলে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হোটেলের ডাইনিং রুমে জন-পনের লোক খাইতে বসিয়াছে।

ইংরাজিতে দুটো কথা আছে *instinct* এবং *prejudice*; কিন্তু আমাদের কাছে শুধু সংক্ষার। একটা যে আর একটা নয়, তাহা বুঝা কঠিন নয়, কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদ, খাওয়া-ছোঁওয়া বস্তুটা যে *instinct* হিসাবে সংক্ষার নয়, তাহা দাঠাকুরের এই হোটেলের সংস্কারে আজ প্রথম টের পাইলাম; এবং সংক্ষার হইলেও যে ইহা কত তুচ্ছ সংক্ষার, ইহার বাঁধন হইতে মুক্ত হওয়া যে কত সহজ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমাদের দেশে

এই যে অসংখ্য জাতিভেদের শৃঙ্খল — তাহা দুপায়ে পরিয়া ব্যবহার করিয়া বিচরণ করার মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল কতখানি বিদ্যমান, সে আলোচনা এখন থাক; কিন্তু এ কথা আমি অসংশয়ে বলিতে পারি যে, যাঁহারা নিজেদের গ্রামটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে-প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ইহার শাসন-পাশ ছিন্ন করার দুর্লভতা সম্বন্ধে যাঁহাদের লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই, তাঁহারা একটা ভুল জিনিস জানিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ যে-কোন দেশে খাওয়া-ছোঁয়ার বাচ-বিচার প্রচলিত নাই, তেমন দেশে পা দেওয়া মাত্রই বেশ দেখিতে পাওয়া যায় এই ছান্নান পুরুষের খাওয়া-ছোঁয়ার শেকল কি করিয়া না জানি রাতারাতিই খসিয়া গেছে। বিলাত গেলে জাতি যায়; একটা মুখ্য কারণ, নিষিদ্ধ মাংস আহার করিতে হয়। যে নিজের দেশেও কোন কালে মাংস খায় না, তাহারও যায়। কারণ জাতি মারিবার মালিকেরা বলেন, সেও একই কথা—না খেলেও, সে ওই খাওয়াই ধরে নিতে হবে। নেহাঁ মিথ্যা বলেন না। বর্মা ত তিন-চার দিনের পথ; অথচ দেখি, পনর আনা বাঙ্গলী ভদ্রলোকই—বোধ করি ব্রাঞ্ছণই বেশি হইবেন, কারণ এ যুগে তাঁহাদের লোভটাই সকলকে হার মানাইয়াছে—জাহাজের হোটেলে সস্তায় পেট ভরিয়া আহার করিয়া ডাঙ্গায় পদার্পণ করেন। সেখানে মুসলমান ও গোয়ানিজ পাচক ঠাকুরেরা কি রাঁধিয়া সার্ভ করিতেন, প্রশ্ন করা রূঢ় হইতে পারে। কিন্তু তাহারা যে হবিষ্যান পাক করিয়া কলাপাতায় তাহাদিগকে পরিবেশন করে নাই, তাহা ভাটপাড়ার ভট্চায়িদের পক্ষেও অনুমান করা বোধ করি কঠিন নয়। আমি ত সহযাত্রী! যাঁহারা নিতান্তই এই-সকল খাইতে চাহেন না, তাঁহারা অন্ততঃ চা রুটি, ফলটা পাকড়টাও ছাড়েন না।

অথচ সেই একদম নিষিদ্ধ মাংস হইতে বর্তমান রস্তা পর্যন্ত সমস্তই একত্রে গাদাগাদি করিয়া জাহাজের কোল্ড-রুমে রাখা হইয়া থাকে, এবং তাহা কাহারও অগোচর রাখার পদ্ধতি ও জাহাজের নিয়ম-কানুনের মধ্যে দেখি নাই।

তবে আরাম এইটুকু যে, বর্মা-প্রবাসীর জাতি যাইবার আইনটা বোধ করি কোন গতিকে শান্ত্রিকারের কোডিসিলটা এড়াইয়া গেছে। না হইলে হয়ত আবার একটা ছোটখাটো ব্রাঞ্ছণ-সভার আবশ্যক হইত। যাক, ভদ্রলোকের কথা আজ এই পর্যন্তই থাক। হোটেলে যাহারা সারি সারি পঙ্কজিভোজনে বসিয়া গেছে, তাহারা ভদ্রলোক নয়। অন্ততঃ আমরা বলি না। সকলেই কারিকর, ওয়ার্কশপে কাজ করে। সাড়ে-দশটায় ছুটিতে ভাত খাইতে আসিয়াছে। শহরের প্রান্তে মন্ত একটি ঘাঠের তিনদিকে নানা রকমের এবং নানা আকারের কারখানা, এবং একধারে এই পল্লীর মধ্যে দাঠাকুরের হোটেল। এ এক বিচ্ছিন্ন পল্লী। লাইন করিয়া গায়ে গায়ে মিশাইয়া জীর্ণ কাঠের ছোট ছোট কুটীর। ইহাতে চীনা আছে, বর্মা আছে, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তৈলঙ্গী আছে, চট্টগ্রামী মুসলমান ও হিন্দু আছে, আর আছে আমাদের স্বজাতি বাঙালী। ইহাদেরই কাছে আমি প্রথম শিখিয়াছি যে, ছোটজাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে রাখার বদ্ধ অভ্যাসটা পরিত্যাগ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। যাহারা করে না, তাহারা যে পারে না বলিয়া করে না, তাহা নয়; যে জন্য করে না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বিবাদ বাধিবে।

দাঠাকুর আসিয়া আমাকে স্যন্তে গ্রহণ করিলেন, একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনি যতদিন ইচ্ছা এই ঘরে থেকে আমার কাছে আহার করুন, চাকরি-বাকরি হ'লে পরে দাম চুকিয়ে দেবেন।

কহিলাম, আমাকে ত তুমি চেন না, একমাস থেকে এবং খেয়ে দাম না দিয়েও ত চলে যেতে পারি?

দাঠাকুর নিজের কপালটা দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, এটা ত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না মশাই?

বলিলাম, না, ওতে আমার লোভ নেই।

দাঠাকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে এবার পরম গাঞ্জীর্ঘের সহিত কহিলেন, তবেই দেখুন! বরাত মশাই, বরাত! এ ছাড়া আর পথ নেই, এই আমি সকলকে বলি।

বস্তুতঃ, এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। এ সত্য তিনি যে নিজে কিরণ অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হাতেনাতে সপ্রমাণ করিবার জন্য মাস চার-পাঁচ পরে একদিন প্রাতঃকালে অনেকের গচ্ছিত টাকাকড়ি, আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শুধু তাহাদের নিরেট কপালগুলি শূন্য হোটেলের মেঝের উপর সজোরে ঘূর্কিবার জন্য বর্মায় ফেলিয়া রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

যাই হোক, দাঠাকুরের কথাটা শুনিতে মন্দ লাগিল না, এবং আমিও একজন তাঁর নৃতন মক্কেল হইয়া একটা ভাঙা ঘর দখল করিয়া বসিলাম। রাত্রে একজন কাঁচা বয়সের বাঙালী যি আমার ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া খাবার জায়গা করিয়া দিতে আসিল। অদূরে ডাইনিং রুমে বহু লোকের আহারের কলরব শুনা যাইতেছিল। প্রশ্ন করিলাম, আমাকেও সেখানে না দিয়া এখানে দিচ্ছ কেন?

সে কহিল, তারা যে নোয়াকাটা বাবু, তাদের সঙ্গে কি আপনাকে দিতে পারি?

অর্থাৎ তাহারা ওয়ার্কমেন, আমি ভদ্রলোক। হাসিয়া বলিলাম, আমাকেও যে কি কাটতে হবে, সে ত এখনও ঠিক হয়নি। যাই হোক, আজ দিচ্ছ দাও, কিন্তু কাল থেকে আমাকেও ঐ ঘরেই দিয়ো।

যি কহিল, আপনি বামুনমানুষ, আপনার সেখানে খেয়ে কাজ নেই।

কেন?

যি গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, সবাই বাঙালী বটে, কিন্তু একজন ডোম আছে।

ডোম! দেশে এই জাতিটা অস্পৃশ্য। ছুঁইয়া ফেলিলে স্নান করা compulsory কি না, জানি না; কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি। অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর সবাই?

ঝি কহিল, আর সবাই ভাল জাত; কায়েত আছে, কৈবর্ত আছে, সদ্গোপ আছে, গয়লা আছে, কামার—

এরা কেউ আপত্তি করে না?

ঝি আবার একটু হাসিয়া বলিল, এই বিদেশে সাতসমুদ্র-পারে এসে কি অত বাম্নাই করা চলে বাবু? তারা বলে, দেশে ফিরে গঙ্গামান ক'রে একটা অঙ্গ-প্রাচিতির করলেই হবে।

হয়ত হয়; কিন্তু আমি জানি, যে দুই-চারিজন মাঝে মাঝে দেশে আসে, তাহারা চলতিমুখে কলিকাতার গঙ্গায় একবার গঙ্গামানটা হয়ত করিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রাচিতির কোনকালেই করে না। বিদেশের আবহাওয়ার গুণে ইহা তাহারা বিশ্বাসই করে না।

দেখিলাম, হোটেলে মাত্র দুটি ছঁকা আছে; একটি ব্রাক্ষণের অপরটি যাহারা ব্রাক্ষণ নয় তাহাদের। আহারাদির পর কৈবর্তের হাত হইতে ডোম এবং ডোমের হাত হইতে কর্মকারমশাই স্বচ্ছন্দে হাত বাড়াইয়া ছঁকা লইয়া তামাক ইচ্ছা করিলেন। দ্বিধার লেশমাত্র নাই। দিন-দুই পরে এই কর্মকারটির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এতে তোমাদের জাত যায় না?

কর্মকার কহিল, যায় না আর মশাই, যায় বৈ কি।

তবে?

ও কি আর প্রথমে ডোম ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, বলেছিল, কৈবর্ত। তার পর সব জানাজানি হয়ে গেল।

তখন তোমরা কিছু বললে না?

কি আর বলব মশাই, কাজটা ত খুবই অন্যায় করেচে, সে বলতেই হবে।  
তবে লজ্জা পাবে, এইজন্য সবাই জেনেও চেপে গেল।

কিন্তু দেশে হ'লে কি হ'ত?

লোকটা শিহরিয়া উঠিল। কহিল, তা হলে কি আর কারও রক্ষে ছিল?  
তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন, তবে কি জানেন  
বাবু, বামুনের কথা ধরিনে, তাঁরা হলেন বর্ণের গুরু, তাঁদের কথা আলাদা। নইলে  
আর সবাই সমান; নবশাখাই বলুন আর হাড়ি-ডোমই বলুন কিছুই কারো গায়ে  
লেখা থাকে না; সবাই ভগবানের সৃষ্টি, সবাই এক, সবাই পেটের জ্বালায় বিদেশে  
এসে লোহা পিটচে। আর যদি ধরেন বাবু, হরি মোড়ল ডোম হলে কি হয়, মদ  
খায় না, গাঁজা খায় না—আচার-ব্যবহারে কার সাধ্য বলে ও ভাল জাত নয়,  
ডোমের ছেলে; আর ঐ লক্ষণ, ও ত ভাল কায়েতের ছেলে, ওর দেখুন দিকি  
একবার ব্যবহারটা? ব্যাটা দু-দুবার জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। আমরা সবাই  
না থাকলে এত দিন ওকে জেলে মেথবের ভাত খেতে হ'ত যে!

লক্ষণের সম্বন্ধেও আমার কৌতুহল ছিল না, কিংবা হরি মোড়ল তাহার  
ডোমত্ত গোপন করিয়া কত বড় অন্যায় করিয়াছে, সে মীমাংসা করিবারও প্রযুক্তি  
হইল না; আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, যে-দেশে ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত চর লাগাইয়া  
তাহাদের আজন্ম প্রতিবেশীর ছিদ্র অঙ্গেষণ করিয়া, তাহার পিতৃশান্তি পণ্ড করিয়া  
দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক হইয়াও ইহারা  
একজন অপরিচিত বাসালীর এতবড় মারাত্মক অপরাধও মাপ করিয়াছে; এবং  
সুন্দ তাই নয়, পাছে এই প্রবাসে তাহাকে লজ্জিত ও হীন হইয়া থাকিতে হয়,  
এই আশঙ্কায় সেকথা উত্থাপন পর্যন্ত করে নাই, এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব  
হইল! বিদেশী বুঝিবে না বটে, কিন্তু আমরা ত বুঝিতে পারি, হৃদয়ের কতখানি  
প্রশংসন্তা, মনের কত বড় ঔদার্য ইহার জন্য আবশ্যিক। এ যে শুধু তাহাদের দেশ  
ছাড়িয়া বিদেশে আসার ফল তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। মনে হইল, এই

শিক্ষাই এখন আমাদের দেশের জন্য সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। ঐ যে নিজের পল্লীটুকুর মধ্যে সারাজীবন বসিয়া কাটানো, মানুষকে সর্বিষয়ে ছোট করিয়া দিতে এত বড় শক্ত বোধ করি কোন একটা জাতির আর নাই।

যাক। বহুদিন পর্যন্ত আমি ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। কিন্তু আমার যে অক্ষর-পরিচয় আছে এ সংবাদ যতদিন না তাহারা জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, শুধু ততদিনই আমি ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাদের সকল সুখ-দুঃখের অংশ পাইয়াছি। কিন্তু যে মুহূর্তে জানিয়াছে, আমি ভদ্রলোক, আমি ইংরাজি জানি, সেই মুহূর্তেই তাহারা আমাকে পর করিয়া দিয়াছে। ইংরাজি-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে ইহারা আপদ-বিপদের দিনে আসেও বটে, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তাহাও সত্য; কিন্তু বিশ্বাসও করে না, আপনার লোক বলিয়াও ভাবে না। আমি যে তাহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করি না, আড়ালে উপহাস করি না, দেশের এই কুসংস্কারটা তাহারা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু এইজন্যই আমার কত সৎসঙ্গই যে ইহাদের মধ্যে বিফল হইয়া গিয়াছে, বোধ করি, তাহার অবধি নাই। কিন্তু সে কথাও আজ থাক। দেখিলাম বাঙালী মেয়েদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে বড় কম নাই। তাহাদের কুলের পরিচয় প্রকাশ না করাই ভাল, কিন্তু আজ তাহারা আর একভাবে পরিবর্তিত হইয়া একেবারে খাঁটি গৃহস্থ-পরিবার হইয়া গেছে। পুরুষদের মনে মনে হয়ত আজও একটা সাবেক জাতের স্মৃতি বজায় আছে, কিন্তু মেয়েরা দেশেও আসে না, দেশের সহিত আর কোন সংস্রবও রাখে না। তাহাদের ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করিলে বলে, আমরা বাঙালী, অর্থাৎ মুসলমান, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী নই, বাঙালী হিন্দু। আপোষের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান স্বচ্ছন্দে চলে, শুধু বাঙালী হলেই যথেষ্ট এবং চট্টগ্রামী বাঙালী ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়াইয়া দুই হাত এক করিয়া দিলেই ব্যস্ত। বিধবা হইলে বিধবা-বিবাহের রেওয়াজ নাই, বোধ করি, পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে রাজি হন না বলিয়াই; কিন্তু বৈধব্যও ইহারা

ভালবাসে না; আবার একটা ঘর-সংসার পাতাইয়া লয়—আবার ছেলে-মেয়ে হয়; তাহারাও বলে, আমরা বাঙালী। আবার তাহাদের বিবাহের সেই পুরোহিত আসিয়াই বৈদিক মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ দিয়া যান—এবার কিন্তু আর একতিল আপত্তি করেন না। স্বামী অত্যধিক দুঃখ-যন্ত্রণা দিলে ইহারা অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণটাও অত্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইহারা যথার্থ-ই হিন্দু এবং দুর্গাপূজা হইতে শুরু করিয়া ষষ্ঠী-মাকাল কোন পূজাই বাদ দেয় না।

## সাত

পথে যাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে এই বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঘটনাচক্রে তাহারা রহিয়া গেল শহরের এক প্রান্তে, আর আমার আশ্রয় মিলিল অন্য প্রান্তে। সুতরাং পনর-যোল দিনের মধ্যে ওদিকে আর যাইতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সারাদিন চাকরির উমেদারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে এমনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া এ-শক্তি আর থাকে না যে, কোথাও বাহির হই। ক্রমশঃ যত দিন যাইতেছিল, আমারও ধারণা জন্মিতেছিল যে, এই সুদূর বিদেশে আসিয়াও চাকরি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে ঠিক দেশের মতই সুকর্তন।

অভয়ার কথা মনে পড়িল। যে লোকটির উপর নির্ভর করিয়া সে স্বামীর সঙ্গানে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সঙ্গান না মিলিলে, সে লোকটির অবস্থা কি হইবে! বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইবার পথ যথেষ্ট উন্মুক্ত থাকিলেও, ফিরিবার পথটি যে ঠিক তেমনি প্রশস্ত পড়িয়া থাকে, বাঙ্গলা দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া এত বড় আশার কথা কল্পনা করিবার সাহস আমার নাই। নিজেদের অধিক দিন প্রতিপালন করিবার মত অর্থবলও যে সংগ্রহ করিয়া তাহারা পা বাড়ায় নাই, তাহা অনুমান করা কর্তৃন নয়। বাকী রহিল শুধু সেই রাস্তাটা, যাহা পনের আনা বঙ্গালীর একমাত্র অবলম্বন; অর্থাৎ মাস-মাহিনায় পরের চাকরি করিয়া মরণ পর্যন্ত কোনমতে হাড়-মাংসগুলাকে একত্র রাখিয়া চলা। রোহিণীবাবুরও যে সে-ছাড়া পথ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই রেঙ্গুনের বাজারে কেবলমাত্র নিজের উদরটা চালাইয়া লইবার মত চাকরি যোগাড় করিতে আমারই যখন এই হাল, তখন একটি স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া সেই হাবাগোবা-বেচারা-গোছের অভয়ার দাদাটির যে কি অবস্থা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার পর্যন্ত যেন ভয়

করিয়া উঠিল। স্থির করিলাম, কাল যেমন করিয়াই হোক, একবার গিয়া তাহাদের খবর লইয়া আসিব।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় প্রায় ক্রোশ-দুই পথ হাঁটিয়া তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট মোড়ার উপর রোহিণীদাদা আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল নবজলধরমণ্ডিত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের ন্যায় গুরুগন্ধীর; কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু যে! ভাল ত?

বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ।

যান ভিতরে গিয়ে বসুন।

সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, আপনাদের খবর সব ভাল ত?

হঁ—ভেতরে যান না। তিনি ঘরেই আছেন।

তা যাচ্ছ—আপনিও আসুন।

না—আমি এইখানেই একটু জিরুই। খেটে খেটে ত একরকম খুন হবার জো হয়েচি, দুদণ্ড পা ছড়িয়ে একটু বসি।

তিনি পরিশ্রমাধিক্যে যে মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার চেহারায় প্রকাশ না পাইলেও, মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রোহিণীদার মধ্যেও যে এতখানি গান্ধীর্য এতদিন প্রচলনভাবে বাস করিতেছিল, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ত বিশ্বাস করাই দুরহ। কিন্তু ব্যাপার কি? আমি নিজেও ত পথে পথে ঘূরিয়া আর পারি না। আমার এই দাদাটি কি—

কপাটের আড়াল হইতে অভয়া তাহার হাসিমুখখানি বাহির করিয়া নিঃশব্দ সঙ্কেতে আমাকে ভিতরে আহ্বান করিল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে কঠিলাম, চলুন না রোহিণীদা, ভিতরে গিয়ে দুটো গল্প করি গে।

রোহিণীদা জবাব দিলেন, গল্প! এখন মরণ হলেই বাঁচি, তা জানেন শ্রীকান্তবাবু?

জানিতাম না—তাহা স্বীকার করিতেই হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে শুধু একটা প্রচণ্ড নিশ্চাস মোচন করিয়া কহিলেন, দুদিন পরেই জানতে পারবেন।

অভয়ার পুনশ্চ নীরব আস্থানে আর বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে রান্নাঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। সুমুখের খানাই বড়, রোহিণীবাবু ইহাতে শয়ন করেন। একধারে দড়ির খাটের উপর তাঁহার শয্যা। প্রবেশ করিতেই চোখে পড়িল—মেঝের উপর আসন পাতা, একখানি রেকাবিতে লুটি ও তরকারি, একটু হালুয়া ও একগ্লাস জল। গণনায় নিরপণ করিয়া এ আয়োজন যে পূর্বানু হইতে আমার জন্য করিয়া রাখা হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং এক মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলাম, একটা রাগারাগি চলিতেছিল। তাই রোহিণীদার মুখ মেঘাচ্ছন্ন—তাই তাঁহার মরণ হইলে তিনি বাঁচেন। নীরবে খাটের উপর গিয়া বসিলাম। অভয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন? এতদিন পরে বুঝি গরীবদের মনে পড়ল?

খাবারের থালাটা দেখাইয়া কহিলাম, আমার কথা পরে হবে; কিন্তু এ কি?

অভয়া হাসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ও কিছু না; আপনি কেমন আছেন বলুন।

কেমন আছি সে ত নিজেই জানি না, পরকে বলিব কি করিয়া? একটু ভাবিয়া কহিলাম, একটা চাকরির যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন।

রোহিণীবাবু যে বলছিলেন—আমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। রোহিণীদা তাঁহার ছেঁড়া চটিতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলিয়া পটপট শব্দে ঘরে তুকিয়া কাহারও প্রতি দৃকপাতমাত্র না করিয়া, জলের গেলাসটা তুলিয়া লইয়া এক নিশ্চাসে অর্ধেকটা এবং বাকীটুকু দুই-তিন চুমুকে জোর করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া, শূন্য গেলাসটা কাঠের মেঝের উপর ঠকাস করিয়া রাখিয়া দিয়া বলিতে

বলিতে বাহির হইয়া গেলেন—যাক, শুধু জল খেয়েই পেট ভরাই! আমার আপনার  
আর কে আছে এখানে যে, ক্ষিধে পেলে খেতে দেবে!

আমি অবাক হইয়া অভয়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, পলকের জন্য তাহার  
মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাত্ আত্মসংবরণ করিয়া সে সহায়ে  
কহিল, ক্ষিধে পেলে কিন্তু জলের গেলাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের  
আগে চোখে পড়ে।

রোহিণী সে কথা কানেও তুলিলেন না—বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু  
অর্ধমিনিট না যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে  
সম্মোধন করিয়া বলিলেন, সারাদিন অফিসে খেটে খেটে ক্ষিদেয় গা-মাথা ঘুরছিল  
শ্রীকান্তবাবু—তাই তখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারিনি—কিছু মনে করবেন  
না।

আমি বলিলাম, না।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে আমার একটুকু  
বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন?

তাঁহার মুখের ভঙ্গিতে আমি হাসিয়া ফেলিলাম; কহিলাম, কিন্তু সেখানে  
লুচিমোহনভোগ হয় না।

রোহিণী বলিলেন, দরকার কি! ক্ষুধার সময় একটু গুড় দিয়ে যদি কেউ  
জল দেয়, সেই যে অমৃত! এখানে তাই বা দেয় কে?

আমি জিজ্ঞাসু-মুখে অভয়ার মুখের প্রতি চাহিতেই সে ধীরে ধীরে বলিল,  
মাথা ধ'রে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই খাবার তৈরি করতে আজ একটু  
দেরি হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু।

আশচর্য হইয়া কহিলাম, এই অপরাধ?

অভয়া তেমনি শাস্তভাবে কহিল, এ কি তুচ্ছ অপরাধ শ্রীকান্তবাবু?

তুচ্ছ বৈ কি?

অভয়া কহিল, আপনার কাছে হতে পারে, কিন্তু যিনি গলগ্রহকে খেতে দেন, তিনি এই বা মাপ করবেন কেন? আমার মাথা ধরলে তাঁর কাজ চলে কি করে!

রোহিণী ফোঁস করিয়া গর্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, তুমি গলগ্রহ—এ কথা আমি বলেচি?

অভয়া বলিল, বলবে কেন, হাজার রাকমে দেখাচ্ছো।

রোহিণী কহিলেন, দেখাচ্ছি! ওঃ—তোমার মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ! তোমার মাথা ধরেছিল—আমাকে বলেছিলে?

অভয়া কহিল, তোমাকে ব'লে লাভ কি? তুমি কি বিশ্বাস করতে?

রোহিণী আমার দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন! ওঁর জন্যে আমি দেশত্যাগী হলুম—বাড়ি ফেরবার পথ বন্ধ—আর ওঁর মুখের কথা শুনুন। ওঃ—

অভয়াও এবার সক্রোধে উন্নত দিল, আমার যা হবার হবে—তুমি যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাও। আমার জন্যে কেন তুমি এত কষ্ট সহিবে? তোমার কে আমি? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই রোহিণী প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, দুটো রেঁধে দেবার জন্যে—কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন! আচ্ছা, আজ থেকে যদি তুমি আমার জন্যে রান্নাঘরে যাও ত তোমার অতি বড়—আমি বরঞ্চ হোটেলে—বলিতে বলিতেই তাহার কান্নায় কষ্ট রোধ হইয়া গেল; তিনি কোঁচার খুঁটটা মুখে চাপা দিয়া দ্রুতবেগে বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া বিবর্গ মুখ হেঁট করিল—কি জানি চোখের জল গোপন করিতে কি না; কিন্তু আমি একেবারে কাঠ হইয়া গেলাম। কিছুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে যে কলহ চলিতেছে, সে ত চোখেই দেখিলাম। কিন্তু ইহার নিগৃঢ় হেতুটা দৃষ্টির একান্ত অন্তরালে থাকিলেও সে যে ক্ষুধা এবং খাবার তৈরির ক্ষতি হইতে বহু দূর

বহিতেছে, তাহা বুঝিতে লেশমাত্র বিলম্ব ঘটিল না, তবে কি স্বামী-অন্নেষণের গল্পটাও—

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে নিজেরই কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিলাম, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে—এখন তা হলে আসি।

অভয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আবার কবে আসবেন?

অনেক দূর—

তা হলে একটু দাঁড়ান, বলিয়া অভয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটুকরা কাগজ দিয়া বলিল, যে জন্যে আমার আসা, তা সমস্তই এতে সংক্ষেপে লিখে দিলুম। পড়ে দেখে যা ভাল বোধ হয় করবেন। আপনাকে এর বেশি আমি বলতে চাইনে। বলিয়া, আজ সে আমাকে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঠিকানাটা কি?

প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমি সেই ছোট কাগজখানি মুঠার মধ্যে গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। বারান্দায় সেই মোড়াটি এখন শূন্য—রোহিণীদাদাকে আশেপাশে কোথাও দেখিলাম না। বাসা পর্যন্ত কৌতুহল দমন করিতে পারিলাম না। অনতিদূরেই পথিপার্শ্বে একখানি ছোট চায়ের দোকান দেখিয়া দুকিয়া পড়িলাম, এবং একবাটি চা লইয়া ল্যাম্পের আলোকে সেই লেখাটুকু চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলাম। পেঙ্গিলের লেখা কিন্তু ঠিক পুরুষমানুষের মত হস্তাক্ষর। প্রথমেই সে তাহার স্বামীর নাম এবং তাহার পূর্বেকার ঠিকানা দিয়া নীচে লিখিয়াছে—আজ যাহা মনে করিয়া গেলেন, সে আমি জানি; এবং বিপদে আপনার উপর আমি যে কতখানি নির্ভর করিয়াছি, সেও আপনি জানেন। তাই আপনার ঠিকানা জানিয়া লইলাম।

অভয়ার লেখাটুকু বার বার পড়িলাম; কিন্তু ওই কয়টা কথা ছাড়া আর একটা কথাও বেশি আন্দাজ করিতে পারিলাম না। আজ তাহাদের পরম্পরের ব্যবহার চোখে দেখিয়া যে কোন একটা বাহিরের লোক যে কি মনে করিবে, তাহা অভয়ার মত বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে অনুমান করা একেবারেই কঠিন নয়। কিন্তু তথাপি সে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে একবিন্দু ইঙ্গিত করিল না। তাহার স্বামীর নাম ও ঠিকানা ত পূর্বেই শুনিয়াছি; বিপদে আমার উপর নির্ভর করিতে ত তাহাকে বারংবার চোখেই দেখিয়াছি; কিন্তু তার পরে? এখন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে সে চায় কি না, কিংবা আর কোন বিপদ অবশ্যভাবী বুঝিয়া সে আমার ঠিকানা জানিয়া লইল—কোনটার আভাস পর্যন্ত তাহার লেখার মধ্যে হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারিলাম না। কথায়-বার্তায় অনুমান হয়, রোহিণী কোন একটা অফিসে চাকরি যোগাড় করিয়াছে। কি করিয়া করিল, জানি না—তবে খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তাটা আপাততঃ আমার মত তাহাদের নাই; লুচিও জোটে। তথাপি যে কি রকম বিপদের সন্তাননাটা আমাকে শুনাইয়া রাখিল, এবং শুনাইবার সার্থকতাই বা কি, তাহা অভয়াই জানে।

তথা হইতে বাহির হইয়া সমস্ত পথটা শুধু ইহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুই স্থির হইল না; শুধু এইটা আজ নিজের মধ্যে স্থির হইয়া গেল যে, অভয়ার স্বামী লোকটা যেই হোক, এবং যেখানে যে ভাবেই থাকুক, স্ত্রীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ইহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করার কৌতুহল আমাকে সংবরণ করিতেই হইবে।

পরদিন হইতে পুনরায় নিজের চাকরির উমেদারিতে লাগিয়া গেলাম; কিন্তু সহস্র চিন্তার মধ্যেও অভয়ার চিন্তাকে মনের ভিতর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না।

কিন্তু চিন্তা যাই করি না কেন, দিনের পর দিন সমভাবেই গড়াইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অদৃষ্টবাদী দাঠাকুরের প্রফুল্ল মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভাতের তরকারি প্রথমে পরিমাণে, এবং পরে সংখ্যায় বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু চাকরি আমার সম্মতে লেশমাত্র মত পরিবর্তন করিলেন না; যে চক্ষে প্রথম দিনটিতে দেখিয়াছিলেন, মাসাধিককাল পরেও ঠিক সেই চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। কাহার ‘পরে জানি না, কিন্তু ক্রমশঃ উৎকর্ষিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন ত জানিতাম না, চাকরি পাবার যথেষ্ট প্রয়োজন না হইলে আর ইনি দেখা দেন না। এই জ্ঞানটি লাভ করিলাম হঠাৎ একদিন রোহিণীবাবুকে পথের মধ্যে দেখিয়া। তিনি বাজারে পথের ধারে তরিতরকারি কিনিতেছিলেন। আমি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে দেখিতে লাগিলাম—যদিচ তাঁহার গায়ের জামাকাপড় জুতা জীর্ণতার প্রায় শেষ-সীমায় পৌঁছিয়াছে—তাঁক্ষণ্যে মাথায় একটা ছাতি পর্যন্ত নাই, কিন্তু আহার্য দ্রব্যগুলি তিনি বড়লোকের মতই ক্রয় করিতেছেন; সেদিকে তাঁহার খোঁজাখুঁজি ও যাচাই-বাচাইয়ের অবধি নাই। হঙ্গামা ও পরিশ্রম যতই হোক, ভাল জিনিসটি সংগ্রহ করিবার দিকে যেন তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে। চক্ষের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখে পড়িয়া গেল। এই-সব কেনাকাটার ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যগ্র ব্যাকুল মেহ যে কোথায় গিয়া পৌঁছিতেছে, এ যেন আমি সূর্যের আলোর মত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কেন যে এই-সকল লইয়া তাঁহার বাড়ি পৌঁছান একান্তই চাই, কেন যে এই-সকলের মূল্য দিবার জন্য চাকরি তাঁহাকে পাইতেই হইল, এ সমস্যার মীমাংসা করিতে আর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। আজ বুঝিলাম, কেন সে এই জনারণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং আমি পাই নাই।

ঐ যে শীর্ণ লোকটি রেঙ্গনের রাজপথ দিয়া একরাশ মোট হাতে লইয়া, শতচিন্ময় মলিন বাসে গৃহে চলিয়াছে—আড়ালে থাকিয়া আমি তাহার পরিত্তপ্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। নিজের প্রতি দৃক্পাত করিবার তাহার যেন অবসরমাত্র নাই। হৃদয় তাহার ঘাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার কাছে জামাকাপড়ের দৈন্য যেন একেবারেই অকিঞ্চিত্কর হইয়া গেছে। আর

আমি? বন্দের সামান্য মলিনতায় প্রতিপদেই যেন সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া উঠিতেছি; পথচারী একান্ত অপরিচিত লোকেরও দৃষ্টিপাতে লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছি!

রোহিণীদা চলিয়া গেলেন—আমি তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না, এবং পরক্ষণেই লোকের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেন জানি না, এইবার অশ্রুজলে আমার দুচক্ষ ঝাপসা হইয়া গেল। চাদরের খুঁটে মুছিতে মুছিতে পথের একধার দিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম এবং নিজের মনেই বার বার বলিতে লাগিলাম, এই ভালবাসাটার মত এত বড় শক্তি, এত বড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই। ইহা পারে না এত বড় কাজও বুঝি কিছু নাই।

তথাপি বহু-বহু-যুগ-সঞ্চিত অন্ধ সংস্কার আমার কানে কানে ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, ভাল নয়, ইহা ভাল নয়! ইহা পবিত্র নয়—শেষ পর্যন্ত ইহার ফল ভাল হয় না!

বাসায় আসিয়া একখানি বড় লেফাফার পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি, চাকরির দরখাস্ত মণ্ডুর হইয়াছে। সেগুল কাঠের প্রকাণ ব্যবসায়ী—অনেক আবেদনের মধ্যে ইঁহারাই গরীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

চাকরি বন্ধুটির সহিত সাবেক পরিচয় ছিল না; সুতরাং পাইলেও সন্দেহ রাখিল, তাহা বজায় থাকিবে কি না। আমার যিনি ‘সাহেব’ হইলেন, তিনি খাঁটি সাহেব হইলেও দেখিলাম, বেশ বাঙ্গলা জানেন। কারণ কলিকাতার অফিস হইতে তিনি বদলি হইয়া বর্মায় গিয়াছিলেন।

দুই সপ্তাহ চাকরির পরে ডাকিয়া কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু, তুমি ঐ টেবিলে আসিয়া কাজ কর—মাহিনাও প্রায় আড়াই গুণ বেশি পাইবে।

প্রকাশ্যে এবং মনে মনে সাহেবকে এক লক্ষ আশীর্বাদ করিয়া হাড়-বাহির-করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ বনাত-মোড়া টেবিলের উপর ঢাড়িয়া

বসিলাম। মানুষের যখন হয়, তখন এমনি করিয়াই হয়! আমাদের হোটেলের দাঠাকুর নেহাত মিথ্যা বলেন না।

গাড়ি ভাড়া করিয়া অভয়কে সুসংবাদ দিতে গেলাম। রোহিণীদা অফিস হইতে ফিরিয়া সেইমাত্র জলযোগে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নিছক জল দিয়া ক্ষুণ্ণবৃত্তির প্রবৃত্তি কিছুমাত্র দেখিলাম না। বরঞ্চ যা দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, তা দিয়া পূর্ণ করিতে সংসারে আর যাহারই আপত্তি থাক, আমার ত ছিল না। অতএব অভয়ার প্রস্তাবে যে অসম্মত হইলাম না, তাহা বলাই বাহ্যিক। খাওয়া শেষ হইতেই রোহিণীদা জামা গায়ে দিতে লাগিলেন। অভয়া ক্ষুণ্ণকঞ্চে কহিল, তোমাকে বরাবর বলচি রোহিণীদাদা, এই শরীরে তুমি এত পরিশ্রম ক'রো না, তুমি কি কিছুতেই শুনবে না? আচ্ছা, কি হবে আমাদের বেশি টাকায়? দিন ত বেশ চলে যাচ্ছে।

রোহিণীদার দুচক্ষু দিয়া ম্বেহ যেন ঝারিয়া পড়িতে লাগিল। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। একটা বামুন পর্যন্ত রাখতে পারচি নে, খেটে খেটে দুবেলা আগুন-তাতে তোমার দেহ যে শুকিয়ে গেল! বলিয়া পান মুখে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অভয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্চাস চাপিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন ত শ্রীকান্তবাবু, এঁর অন্যায়! সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে বাড়ি এসে কোথায় একটু জিরুবেন, তা নয়, আবার রাত্রি নটা পর্যন্ত ছেলে পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। আমি অত বলি, কিছুতে শুনবেন না। এই দুটি লোকের রান্নায় আবার একটা রাঁধুনি রাখার কি দরকার বলুন ত? ওঁর সবই যেন বাড়াবাড়ি, না? বলিয়া সে আর একদিকে চোখ ফিরাইল।

আমি নিঃশব্দে শুধু একটু হাসিলাম। না, কি হাঁ, এ জবাব দিবার সাধ্য আমার ছিল না—আমার বিধাতাপুরুষেরও ছিল কিনা সন্দেহ।

অভয়া উঠিয়া গিয়া একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। কয়েক দিন হইল, বর্মা রেল কোম্পানির অফিস হইতে ইহা আসিয়াছে। বড়সাহেব দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, অভয়ার স্বামী প্রায় দুই বৎসর পূর্বে কি একটা গুরুতর অপরাধে কোম্পানির চাকরি হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোথায় গিয়াছে—তাঁহারা অবগত নহেন।

উভয়েই বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তন্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে অভয়াই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, এখন আপনি কি উপদেশ দেন?

আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, আমি কি উপদেশ দেব?

অভয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, সে হবে না। এ অবস্থায় আপনাকেই কর্তব্য স্থির ক'রে দিতে হবে। এ চিঠি পাওয়া পর্যন্ত আমি আপনার আশাতেই পথ চেয়ে আছি।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ কথা! আমার পরামর্শ লইয়া বাহির হইয়াছিলে কিনা, তাই আমার উপদেশের জন্য পথ চাহিয়া আছ!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি?

অভয়া কহিল, কিছুই না। বলেন, যেতে পারি, কিন্তু আমার ত সেখানে কেউ নেই।

রোহিণীবাবু কি বলেন?

তিনি বলেন, তিনি ফিরবেন না। অন্ততঃ দশ বছর ওমুখো হবেন না।

আবার বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলাম, তিনি কি বরাবর আপনার ভার নিতে পারবেন?

অভয়া বলিল, পরের মনের কথা কি ক'রে জানব বলুন? তা ছাড়া তিনি নিজেই বা জানবেন কি ক'রে? বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নিজেই

কহিল, একটা কথা। আমার জন্যে তিনি একবিন্দু দায়ী ন'ন। দোষ বলুন, ভুল  
বলুন, সমস্তই একা আমার।

গাড়োয়ান বাহির হইতে চীৎকার করিল, বাবু, আর কত দেরি হবে?

আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। এই অবস্থা-সঙ্কটের ভিতর হইতে সহসা  
পরিদ্রাশের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অভয়া যে যথার্থই অকূল-  
পাথারে পড়িয়া হাবুড়ুর খাইতেছে, আমার মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাইতেছিল  
না সত্য, কিন্তু নারীর এতরকমের উল্টা-পাল্টা ব্যবস্থা আমি দেখিয়াছি যে, বাহির  
হইতে এই দুটা চোখের দৃষ্টিকে প্রত্যয় করা কতবড় অন্যায়, তাহাও নিঃসংশয়ে  
বুঝিতেছিলাম।

গাড়োয়ানের পুনশ্চ আহ্বানে আর আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া  
দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি শীঘ্ৰই আর একদিন আসব। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির  
হইয়া গেলাম। অভয়া কোন কথা কহিল না, নিশ্চল মূর্তিৰ মত মাটিৰ দিকে  
চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল; কিন্তু দশহাত না যাইতেই  
মনে পড়িল ছড়িটা ভুলিয়া আসিয়াছি। তাড়াতাড়ি গাড়ি থামাইয়া ফিরিয়া বাড়ি  
চুকিতেই চোখে পড়িল—ঠিক দ্বারের সম্মুখে অভয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া, শরবিদ্ব  
পশুর মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় আছাড় খাইয়া যেন প্রাণ বিসর্জন করিতেছে।

কি বলিয়া যে তাহাকে সাঞ্চনা দিব, আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু বজ্রাহতের  
ন্যায় স্তন্ধৰ্মে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার তেমনি নীরবে ফিরিয়া গেলাম।  
অভয়া যেমন কাঁদিতেছিল, তেমনি কাঁদিতেই লাগিল। একবার জানিতেও পারিল  
না—তাহার এই নিগৃত অপরিসীম বেদনার একজন নির্বাক সাক্ষী এ জগতে  
বিদ্যমান রহিল।

## আট

রাজলক্ষ্মীর অনুরোধ আমি বিস্মৃত হই নাই। পাটনায় একখানা চিঠি পাঠাইবার কথা আসিয়া পর্যন্তই আমার মনে ছিল, কিন্তু একে ত সংসারে যত শক্ত কাজ আছে, চিঠি লেখাকে আমি কারও চেয়ে কম মনে করি না। তার পরে, লিখবাই বা কি? আজ কিন্তু অভয়ার কান্না আমার বুকের মধ্যে এমনি ভারি হইয়া উঠিল যে, তার কতকটা বাহির করিয়া না দিলে যেন বাঁচি না, এমনি বোধ হইতে লাগিল। তাই বাসায় পৌঁছিয়াই কাগজ-কলম জোগাড় করিয়া বাইজীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম। আর সে ছাড়া আমার দুঃখের অংশ লইবার লোক ছিলই বা কে! ঘণ্টা দুই-তিন পরে সাহিত্য-চর্চা সঙ্গ করিয়া যখন কলম রাখিলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে; কিন্তু পাছে সকালবেলায় দিনের আলোকে এ চিঠি পাঠাইতে লজ্জা করে, তাই মেজাজ গরম থাকিতে থাকিতেই তাহা সেই রাত্রেই ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

একজন ভদ্রনারীর নিদারণ বেদনার গোপন ইতিহাস আর একজন রমণীর কাছে প্রকাশ করা কর্তব্য কি না, এ সন্দেহ আমার ছিল, কিন্তু অভয়ার এই পরম এবং চরম সংকটের কালে যে রাজলক্ষ্মী একদিন পিয়ারী বাইজীরও মর্মান্তিক তৃষ্ণা দমন করিয়াছে, সে কি হিতোপদেশ দেয়, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, প্রশংস্ত উল্টাদিক দিয়া একবারও ভাবিলাম না। অভয়ার স্বামীর উদ্দেশ না পাওয়ায় সমস্যাই বার বার মনে উঠিয়াছে। কিন্তু পাওয়ার মধ্যেও যে সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে, এ চিন্তা একটিবারেও মনে উদয় হইল না। আর এ গোলযোগ আবিষ্কার করিবার ভারটা যে বিধাতাপুরূষ আমার উপরেই নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল! দিন চার-পাঁচ পরে আমার

একজন বর্মা কেরানী টেবিলের উপর একটা ফাইল রাখিয়া গেল—উপরে নীল পেসিলে বড়সাহেবের মন্তব্য। তিনি কেসটা আমাকে নিজেই নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিয়াছেন। ব্যাপারটা আগাগোড়া পড়িয়া মিনিট-কয়েক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—

আমাদের প্রোম অফিসের একজন কেরানীকে সেখানকার সাহেব ম্যানেজার কাঠ চুরির অভিযোগে সম্পেক্ষে করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। কেরানীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমাদের অভয়ার স্বামী। ইহারও চার-পাঁচ পাতা-জোড়া কৈফিয়ত ছিল।

বর্মা রেলওয়ে হইতে যে কোন্ গুরুতর অপরাধে চাকরি গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। খানিক পরেই আমার সেই কেরানীটি আসিয়া জানাইল, এক ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহে। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিশ্চয় জানিতাম, প্রোম হইতে তিনি কেসের তদ্বির করিতে স্বয়ং আসিবেন। সুতরাং কয়েক মিনিট পরেই ভদ্রলোক সশরীরে আসিয়া যখন দেখা দিলেন, তখন অনায়াসে চিনিলাম, ইনিই অভয়ার স্বামী। লোকটার প্রতি চাহিবামাত্রই সর্বাঙ্গ ঘৃণায় যেন কণ্ঠকিত হইয়া উঠিল। পরনে হ্যাট-কোট—কিন্তু যেমন পুরনো, তেমনি নোংরা। সমস্ত কালো মুখখানা শক্ত গোঁফ-দাঢ়িতে সমাচ্ছন্ন। নীচেকার ঠোঁটটা বোধ করি দেড়-ইঞ্চি পুরু। তাহার উপর, এত পান খাইয়াছে যে, পানের রস দুই কসে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে; কথা কহিলে ভয় করে, পাছে বা ছিটকাইয়া গায়ে পড়ে।

পতি নারীর দেবতা—তাহার ইহকাল-পরকাল; সবই জানি। কিন্তু, এই মূর্তিমান ইতরটার পাশে অভয়কে কল্পনা করিতে আমার দেহ-মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অভয়া আর যাই গোক, সে সুশ্রী এবং সে মার্জিতরঞ্চি ভদ্রমহিলা; কিন্তু এই মহিষটা যে বর্মার কোন্ গভীর জঙ্গল হইতে অকস্মাত বাহির হইয়া আসিল, তাহা, যে-দেবতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বলতে পারেন।

তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বিরুদ্ধে নালিশটা কি সত্য? প্রত্যুভৱে লোকটা মিনিট- দশেক অনর্গল বকিয়া গেল। তাহার ভাবার্থ এই যে, সে একেবারে নির্দোষ; তবে সে থাকায় প্রোম অফিসের সাহেবে দুই হাতে ঝুঠ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্রোশ। কোন রকমে তাহাকে সরাইয়া একজন আপনার লোক ভর্তি করাই তাঁহার অভিসন্ধি। একবিন্দু বিশ্বাস করিলাম না। বলিলাম, এ চাকরি গেলেই বা আপনার বিশেষ কি ক্ষতি? আপনার মত কর্মদক্ষ লোকের বর্মা মূলুকে কাজের ভাবনা কি? রেলওয়ের চাকরি গেলে কদিনই বা আপনাকে ব'সে থাকতে হয়েছিল?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া পরে কহিল, যা বলচেন তা নেহাত মিথ্যে বলতে পারিনে। কিন্তু কি জানেন মশাই, ফ্যামিলি-ম্যান, অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা—

আপনি কি বর্মার মেয়ে বিয়ে করেচেন নাকি?

লোকটা হঠাতে চাটিয়া উঠিয়া বলিল, সাহেবব্যাটা রিপোর্টে লিখেচে বুঝি? এই থেকেই বুঝাবেন শালার রাগ।—বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি নরম হইয়া কহিল, আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তাতেই বা দোষ কি?

লোকটা উৎসাহিত হইয়া কহিল, যা বলেছেন মশাই। আমি ত তাই সবাইকে বলি, যা করব, তা বোল্ডলি স্বীকার করব। আমার অমন ভেতরে এক, বাইরে আর নেই। আর পুরুষমানুষ—বুঝালেন না? যা বলব, তা স্পষ্ট বলব মশাই, আমার ঢাক্-ঢাক্ নেই। আর দেশেও ত কেউ কোথাও নেই—আর এখানেই যখন চিরকাল চাকরি ক'রে খেতে হবে—বুঝালেন না মশাই!

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, সমস্ত বুঝিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার দেশে কি কেউ নেই?

লোকটা অম্বানমুখে কহিল, আজ্জে না, কেউ কোথাও নেই—কাকস্য পরিবেদনা—থাকলে কি এই সূয়িমামার দেশে আসতে পারতাম? মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা যে-সে ঘরের ছেলে নই, আমারও একটা জমিদার। এখনো আমার দেশের বাড়িটার পানে চাইলে আপনার চোখ ঠিকরে যাবে। কিন্তু অল্প বয়সেই সবাই মরেছেজে গেল,—বললাম, দূর হোক গে; বিষয়-আশয় ঘরবাড়ি কার জন্যে? সমস্ত জ্ঞাত-গুর্ণিদের বিলিয়ে দিয়ে বর্মায় চলে এলাম।

একটুখানি স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি অভয়াকে চেনেন?

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তাকে জানলেন কি ক'রে?

বলিলাম, এমন ত হ'তে পারে, সে আপনার খোঁজ নিয়ে খাওয়া-পরার জন্যে এ অফিসে দরখাস্ত করেচে। লোকটা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, ওঃ—তাই বলুন। তা স্বীকার করচি, একসময় সে আমার স্ত্রী ছিল বটে—

এখন?

কেউ নয়। তাকে ত্যাগ ক'রে এসেচি।

তার অপরাধ?

লোকটা বিমর্শতার ভান করিয়া বলিল, কি জানেন, ফ্যামিলি-সিক্রেট বলা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যখন আমার আত্মীয়ের সামিল, তখন বলতে লজ্জা নেই যে, সে একটা নষ্ট স্ত্রীলোক। তাই ত মনের ঘে়োয় দেশত্যাগী হ'লাম। নইলে সাধ ক'রে কি কেউ কখনো এমন দেশ পা দিয়ে মাড়ায়! আপনিই বলুন না—এ কি সোজা মনের ঘে়োয়!

জবাব দিব কি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। গোড়া হইতেই এই ঘোর মিথ্যবাদীটার একটা কথাও বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু এখন নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, এ যেমন নীচ, তেমনি নিষ্ঠুর।

অভয়ার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তবুও শপথ করিয়া বলিতে পারি—  
যে অপবাদ স্বামী হইয়া এই পাষণ্ড নিঃসঙ্গেচে দিল—পর হইয়াও আমি তাহা  
উচ্চারণ করিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিলাম, তার এই  
অপরাধের কথা আপনি আসবার সময় ত ব'লে আসেন নি! এখানে এসেও  
কিছুদিন যখন চিঠিপত্র এবং টাকাকড়ি পাঠিয়েছিলেন, তখনও ত লিখে জানান  
নি।

মহাপাপিষ্ঠ স্বচ্ছন্দে তাহার বিরাট স্থূল ওষ্ঠাধর হাস্যে বিস্ফারিত করিয়া  
বলিল, এই নিন কথা! জানেন ত মশাই, আমরা ভদ্রলোক, শুধু চুপিচুপি সহ  
করতেই ছোটলোকের মত নিজের স্ত্রীর কলঙ্ক ত আর ঢাক পিটে প্রচার করতে  
পারিনে। থাকগে, সে-সব দুঃখের কথা ছেড়ে দিন মশাই—এ-সব মেয়েমানুষের  
নাম মুখে আনলেও পাপ হয়। তাহ'লে কেসটা ত আপনিই ডিস্পোজ করবেন?  
যাক, বাঁচা গেল, কিন্তু তাও ব'লে রাখচি, সাহেবব্যাটাকে অমনি অমনি ছাড়া হবে  
না। বেশ এমন একটু দিয়ে দিতে হবে, বাছাধন যাতে আর কখনো আমার  
পেছনে না লাগেন। আমারও মুরুবিবর জোর আছে, এটা যেন তিনি মনে বোবেন।  
বুঝলেন না? আচ্ছা, আমি বলি, হারামজাদাকে হেড অফিসে টেনে আনা যায় না?

আমি বললাম, না।

লোকটা হাসির ছটায় ফাইলটা একটুখানি সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিল,  
নিন তামাশা রাখুন। বড়সাহেব একেবারে আপনার মুঠোর মধ্যে, সে খবর কি  
আমি না নিয়েই এসেচি ভাবেন? তা মরুক গে, আর একবার আমার সঙ্গে লেগে  
যেন তিনি দেখেন। আচ্ছা, বড়সাহেবের অর্ডারটা আজই বার ক'রে আমার হাতে  
দিতে পারা যায় না? নটার গাড়িতেই চ'লে যেতুম, রান্তিরটা কষ্ট পেতে হ'ত না;  
কি বলেন?

হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ খোশামোদ জিনিসটা এম্বনি যে,  
সমস্ত দুরভিসন্ধি জানিয়া বুঝিয়াও—ক্ষুণ্ণ করিতে ক্লেশ বোধ হয়। উলটা কথাটা

মুখের উপর শুনাইয়া দিতে বাধ বাধ করিতে লাগিল; কিন্তু সে বাধা মানিলাম না। নিজেকে শক্ত করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, বড়সাহেবের হৃকুম হাতে নিয়ে আপনার লাভ নেই। আপনি আর কোথাও চাকরির চেষ্টা দেখবেন।

এক মুহূর্তে লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, তার মানে?

তার মানে, আপনাকে ডিস্মিস্ করবার নোটিই আমি দেব। আমার দ্বারা আপনার কোন সুবিধা হবে না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ ছলছল করিতে লাগিল—হাত জোড় করিয়া কহিল, বাঙালী হ'য়ে বাঙালীকে মারবেন না বাবু, হেলেপুলে নিয়ে আমি মারা যাবো।

সে দেখবার ভার আমার ওপরে নেই। তা ছাড়া আপনাকে আমি জানিনে, আপনার সাহেবের বিরুদ্ধেও আমি যেতে পারব না।

লোকটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি বুবিল, কথাগুলো পরিহাস নয়। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরেই অকস্মাত হাউমাট করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেরানী দরোয়ান, পিয়ন—যে যেখানে ছিল, এই অভাবনীয় ব্যাপারে অবাক হইয়া গেল। আমি নিজেও কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে থামিতে বলিয়া কহিলাম, অভয়া আপনার জন্যেই বর্মায় এসেচে। দুশ্চরিত্বা স্ত্রীকে আমি অবশ্য নিতে বলিনে, কিন্তু আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে মাপ করে—তার কাছ থেকে চিঠি আনতে পারেন—আপনার চাকরি আমি বজায় রাখবার চেষ্টা দেখব। না হ'লে আর আমার সঙ্গে দেখা ক'রে লজ্জা দেবেন না—আমি মিছে কথা বলিনে।

এই নীচপ্রকৃতির লোকগুলা যে অত্যন্ত ভীরু হয় তাহা জানিতাম। সে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কোথায় আছে?

কাল এম্বনি সময়ে আসবেন, তার ঠিকানা বলে দেব।

লোকটা আর কোন কথা না কহিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আমার মুখ হইতে অভয়া নিঃশব্দে নতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আঁচল দিয়া শুধু চোখ মুছিল, কিছুই বলিল না। আমার ক্ষেত্রেও সে কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পরে আবার আমিই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তাঁকে মাপ করতে পারবে?

অভয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে যাবে?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল।

বর্মা-মেয়েদের স্বভাব যে কি, সে ত তুমি প্রথম দিনেই টের পেয়েচ; তবু সেখানে যাবার সাহস হবে?

এবার অভয়া মুখ তুলিতে দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রূর ধারা বহিতেছে। সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তার পরে বার বার আঁচলে চোখ মুছিয়া রংন্ধনবরে বলিল, না গেলে আর আমার উপায় কি বলুন?

কথাটা শুনিয়া খুশি হইব, কি চোখের জল ফেলিব, ভাবিয়া পাইলাম না;  
কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। বাসায় ফিরিবার সমস্ত পথটা এই একটা কথাই পুনঃপুনঃ আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনদিকে চাহিয়া কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বুকের ভিতরটা—তা সে কাহার উপর জানি না—একদিকে যেমন নিষ্পল ক্রোধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনিই এক নিরাশ্রয় রমণীর ততোধিক নিরূপায় প্রশ়ে ব্যথিত, ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল; পরদিন অভয়ার ঠিকানার জন্য যখন লোকটা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পর্যন্ত পারিলাম না। আমার মনের ভাব বুঝিয়া, আজ সে বেশি কথা না কহিয়া শুধু ঠিকানা লিখিয়া লইয়াই বিনীতভাবে প্রস্থান করিল। কিন্তু তাহার পরের দিন আবার যখন

সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন তাহার চোখ-মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেছে। নমস্কার করিয়া অভয়ার একছত্র লেখা আমার টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া বলিল, আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, তা মুখে ব'লে কি হবে—যতদিন বাঁচব, আপনার গোলাম হ'য়ে থাকব।

অভয়ার লেখাটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম, আপনি কাজ করুন গো, বড়সাহেব এবার মাপ করেচেন।

সে হাসিমুখে কহিল, বড়সাহেবের ভাবনা আমি আর ভাবিনে, শুধু আপনি ক্ষমা করলেই আমি বর্তে যাই—আপনার শ্রীচরণে আমি বহু অপরাধ করেচি; এই বলিয়া আবার সে বলিতে শুরু করিয়া দিল—তেমনি নির্জলা মিথ্যা এবং চাটুবাক্য, এবং মাঝে মাঝে রূমাল দিয়া চোখ মুছিতেও লাগিল। অত কথা শুনিবার দৈর্ঘ্যে কাহারও থাকে না—সে শাস্তি আপনাদের দিব না—আমি শুধু তাহার মোট বক্তব্যটা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, সে স্ত্রীর নামে যে অপবাদ দিয়াছিল, তাহা একেবারেই মিথ্যা। সে কেবল লজ্জার দায়েই দিয়াছিল; না হইলে অমন সতীলক্ষ্মী কি আর আছে! এবং মনে মনে অভয়াকে সে চিরকালই প্রাণের অধিক ভালবাসে। তবে এখানে এই যে আবার একটা উপসর্গ জুটিয়াছে, তাহাতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, শুধু বর্মাদের ভয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করিয়াছে (কিছু সত্য থাকিতেও পারে)।

কিন্তু আজ রাত্রিই যখন সে তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে লইয়া যাইতেছে, তখন সে-বেটিকে দূর করিতে কতক্ষণ! আর ছেলেপুলে? আহা! বেটাদের যেমন শ্রী-ছাঁদ, তেমনি স্বভাব! তারা কি কাজে লাগবে? সময়ে দুটো খেতে পরতে দেবে, না মরলে এক গুুষ জলের প্রত্যাশা আছে! গিয়াই সমস্ত একসঙ্গে বাঁটাইয়া বিদায় করিবে, তবে তাহার নাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অভয়াকে কি আজ রাত্রেই নিয়ে যাবেন? সে বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল বিলক্ষণ! যতদিন চোখে দেখিনি, ততদিন কোনৱকমে নাহয়

ছিলাম; কিন্তু চোখে দেখে আর কি চোখের আড়াল করতে পারি? একলা এত  
দূরে এত কষ্ট সয়ে সে যে শুধু আমার জন্যেই এসেছে। একবার ভেবে দেখুন  
দেখি ব্যাপারটা!

জিঞ্জাসা করিলাম, তাকে কি একসঙ্গে রাখবেন?

আজ্জে না, এখন প্রোমের পোস্টমাস্টার মশায়ের ওখানেই রাখব। তাঁর  
স্ত্রীর কাছে বেশ থাকবে। কিন্তু শুধু দুদিন—আর না। তার জন্যেই একটা বাসা  
ঠিক ক'রে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবো।

অভয়ার স্বামী প্রস্থান করিলে, আমিও আমার দিনের কাজে মন দিবার  
জন্য সুমুখের ফাইলটা টানিয়া লইলাম।

নীচেই অভয়ার লেখাটুকু পুনরায় চোখে পড়িল! তার পরে কতবার যে  
সেই দু-ছত্র পড়িয়াছি এবং আরো কতবার যে পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না।  
পিয়ন বলিতেছিল, বাবুজী, আপনার বাসায় কি আজ কাগজপত্র কিছু দিয়ে  
আসতে হবে? চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, কখন সুমুখের ঘড়িতে সাড়ে-চারিটা  
বাজিয়া গেছে এবং কেরানীর দল দিনের কর্ম সমাপন করিয়া যে যাহার বাড়ি  
প্রস্থান করিয়াছে।

## ନୟ

ଆବାର ଅଭୟାର ସ୍ଵାମୀର ପତ୍ର ପାଇଲାମ । ପୂର୍ବବ୍ୟ ସମ୍ମତ ଚିଠିମୟ କୃତଜ୍ଞତା ଛଡ଼ାଇଯା ଦିଯା, ଏବାର ସେ ଯେ କି ସଙ୍କଟେ ପଡ଼ିଯାଛେ, ତାହାଇ ସସ୍ତମେ ଓ ସବିଷ୍ଟାରେ ନିବେଦନ କରିଯା ଆମାର ଉପଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଯାଛେ । ବ୍ୟାପାରଟା ସଂକ୍ଷେପେ ଏହି ଯେ, ତାହାର ସାଧ୍ୟେର ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଯା ସତ୍ତ୍ଵେ ମେ ଏକଟା ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଭାଡ଼ା ଲାଇଯାଛେ, ଏବଂ ତାହାର ଏକଦିକେ ତାହାର ବର୍ମୀ ସ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ରକେ ଆନିଯା, ଅନ୍ୟଦିକେ ଅଭୟାକେ ଆନିବାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ସାଧ୍ୟସାଧନା କରିତେଛେ; କିନ୍ତୁ କୋନମତେଇ ତାହାକେ ସମ୍ମତ କରିତେ ପାରିତେଛେ ନା । ସହ୍ୱର୍ମିଣୀର ଏହି ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟତାୟ ମେ ଅତିଶ୍ୟ ମର୍ମପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିତେଛେ । ଇହା ଯେ ଶୁଦ୍ଧ କଲିକାଲେର ଫଳ, ଏବଂ ସତ୍ୟଗୁଣେ ଯେ ଏକମ ସାରି ଘାଟିତ ନା— ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି-ଝାଷିରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ—ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ-ସମେତ ତାହାର ପୁନଃପୁନଃ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯା ମେ ଲିଖିଯାଛେ, ହା�ୟ! ମେ ଆର୍ଯ୍ୟ-ଲଳନା କୈ! ମେ ସୀତା-ସାବିତ୍ରୀ କୋଥାୟ! ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟନାରୀ ସ୍ଵାମୀର ପଦ୍ୟୁଗଳ ବକ୍ଷେ ଧାରଣ କରିଯା ହାସିତେ ହାସିତେ ଚିତାଯ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଯା ସ୍ଵାମୀସହ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ଵର୍ଗଲାଭ କରିତେନ, ତାଁରା କୋଥାୟ? ଯେ ହିନ୍ଦୁ-ମହିଳା ହାସ୍ୟବଦନେ ତାହାର କୁଠ-ଗଲିତ ସ୍ଵାମୀଦେବତାକେ କ୍ଷକ୍ଷେ କରିଯା ବାରାଙ୍ଗନାର ଗୃହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଯା ଗିଯାଛିଲ, କୋଥାୟ ମେହି ପତିର୍ବତା ରମଣୀ? କୋଥାୟ ମେହି ସ୍ଵାମୀଭକ୍ତି! ହା�ୟ ଭାରତବର୍ଷ! ତୁମି କି ଏକେବାରେଇ ଅଧଃପଥେ ଗିଯାଛ?

ଆର କି ଆମରା ମେ-ସକଳ ଚକ୍ଷେ ଦେଖିବ ନା? ଆର କି ଆମରା—ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାୟ ଦୁଇପାତା-ଜୋଡ଼ା ବିଲାପ । କିନ୍ତୁ ଅଭୟା ପତିଦେବତାକେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋବେଦନା ଦିଯାଇ କ୍ଷାନ୍ତ ହ୍ୟ ନାଇ । ଆରଓ ଆଛେ । ମେ ଲିଖିଯାଛେ, ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ତାହାର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗନୀ ଏଖନେ ପରେର ବାଟାତେ ବାସ କରିତେଛେ ତାଇ ନୟ, ମେ ଆଜ ପରମ ବନ୍ଧୁ ପୋସ୍ଟମାସ୍ଟାରେର କାହେ ଜ୍ଞାତ ହାଇଯାଛେ ଯେ, କେ-ଏକଟା ରୋହିଣୀ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀକେ ପତ୍ର

লিখিয়াছে এবং টাকা পাঠাইয়াছে। ইহাতে হতভাগ্যের কি পর্যন্ত যে ইজৎ নষ্ট হইতেছে, তাহা লিখিয়া জানান অসাধ্য।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে হাসি সামলাইতে না পারিলেও রোহিণীর ব্যবহারে রাগ কম হইল না। আবার তাহাকে চিঠি লেখাই বা কেন, টাকা পাঠানোই বা কেন? যে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর করিতে এত দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, বুবিয়া হোক, না বুবিয়া হোক আবার তাহার চিন্তকে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন কি? আর অভয়াই বা এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে কিসের জন্য? সে কি চায় তাহার স্বামী যাহাকে স্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়াছে, ছেলেমেয়ে হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া শুধু তাহাকে লইয়াই সংসার করে? কেন, বর্মাদের মেয়ে কি মেয়ে নয়? তার কি সুখ-দুঃখ মান-অপমান নাই? ন্যায়-অন্যায়ের আইন কি তাহার জন্য আলাদা করিয়া তৈরি করা হইয়াছে? আর তাই যদি, তবে সেখানে তাহার যাওয়াই বা কেন? সব ঝঙ্গাট এখান হইতে স্পষ্ট করিয়া চুকাইয়া দিলেই ত হইত।

সেই পর্যন্ত রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। সে যে অথবা ক্লেশ পাইতেছে, তাহা মনে মনে বুবিয়াই, বোধ করি সেদিকে পা বাড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। আজ ছুটির পূর্বেই গাড়ি ডাকিতে পাঠাইয়া উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময়ে অভয়ার পত্র আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলাম, আগাগোড়া লেখা রোহিণীর কথাতেই ভরা। যেন সর্বদাই তাহার প্রতি নজর রাখি—সে যে কত দুঃখী, কত দুর্বল, কত অপটু, কত অসহায় এই একটা কথাই ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে এমনি মর্মান্তিক ব্যথায় ফাটিয়া পড়িয়াছে যে, অতি বড় সরলচিত্ত লোকও এই আবেদনের তাৎপর্য বুবিতে ভুল করিবে মনে হইল না। নিজের সুখ-দুঃখের কথা প্রায় কিছুই নাই। তবে নানা কারণে এখনও সে যে সেইখানেই আছে, যেখানে আসিয়া প্রথমে উঠিয়াছিল, তাহা পত্রের শেষে জানাইয়াছে।

পতিই সতীর একমাত্র দেবতা কি না, এ-বিষয়ে আমার মতামত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নাই; তাহার আবশ্যকতাও দেখি না। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ সতীধর্মের একটা অপূর্বতা, দুঃসহ দুঃখ ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভ্যন্তরে বিরাট মহিমা—যাহা আমার অনন্দাদিদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়ইয়া আছে, এবং চোখে না দেখিলে যাহার অসহ্য সৌন্দর্য ধারণা করাই যায় না—যাহা একই সঙ্গে নারীকে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহৎ করিয়াছে—আমার সে যে অব্যক্ত উপলক্ষ্মি—তাহাই আজ এই অভয়ার চিঠিতে আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

জানি সবাই অনন্দাদিদি নয়; সেই কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ধৈর্য বুক পাতিয়া গহণ করিবার মত অতবড় বুকও সকল নারীতে থাকে না; এবং যাহা নাই, তাহার জন্য অহরহ শোক প্রকাশ করা গ্রস্তকারমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য কি না, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি নাই, কিন্তু তরুণ সমস্ত চিন্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। রাগ করিয়াই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম; এবং সেই অপদার্থ, পরস্তীতে আসক্ত রোহিণীটাকে বেশ করিয়া যে দুকথা শুনাইয়া তাহাই মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার বাসার অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া, কপাট ঠেলিয়া যখন তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ জ্বালানো হইয়াছে কি হয় নাই। অর্থাৎ দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রির আঁধার নামিয়া আসিতেছে মাত্র।

সেটা মাহ ভাদরও নয়, ভরা বাদরও নয়,—কিন্তু শূন্য মন্দিরের চেহারা যদি কিছু থাকে ত, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সেদিন যাহা চোখে পড়িল, সে যে এছাড়া আর কি, সে ত আজও জানি না। সব কয়টা ঘরেরই দরজা হাঁ-হাঁ করিতেছে, শুধু রামাঘরের একটা জানালা দিয়া ধুঁয়া বাহির হইতেছে। ডান দিকে একটু আগাইয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উন্নুন জ্বলিয়া প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে এবং অদূরে মেঝের উপর রোহিণী বাঁচি পাতিয়া একটা বেগুন দুখানা

করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ তাহার কানে যায় নাই; কারণ, কর্ণেন্দ্রিয়ের মালিক যিনি, তিনি তখন আর যেখানেই থাকুন, বেগুনের উপরে যে একাগ্র হইয়া ছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। আরও একটা কথা এমনি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কিন্তু নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে একে সেই ঘর-দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্মাধর্ম, সমস্ত পাপপুণ্যের অতীত একটা উৎকৃত বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্থির হইয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া বারান্দার মোড়টার উপর বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে বোধ করি আলো জ্বালিবার জন্যই রোহিণী বাহির হইয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে ও?

সাড়া দিয়া বলিলাম, আমি শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্তবাবু? ওঃ—বলিয়া সে দ্রুতপদে কাছে আসিল এবং ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া আমাকে ভিতরে আনিয়া বসাইল। তাহার পরে কাহারো মুখে কথা নাই—দুজনেই চুপচাপ। আমি প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম, রোহিণীদা, আর কেন এখানে! চলুন আমার সঙ্গে।

রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

বলিলাম, এখানে আপনার কষ্ট হচ্ছে, তাই।

রোহিণী কিছুক্ষণ পরে কহিল, কষ্ট আর কি!

তা বটে! কিন্তু এ-সকল বিষয়ে ত আলোচনা করা যায় না। কতই-না তিরক্ষার করিব, কতই-না সৎপরামর্শ দিব ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলাম, সব ভাসিয়া গেল! এত বড় ভালবাসাকে অপমান করিতে পারি—নীতিশাস্ত্রের পুঁথি আমি এত বেশি পড়ি নাই। কোথায় গেল আমার ক্রোধ, কোথায় গেল আমার বিদেশ! সমস্ত সাধুসকল যে কোথায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তাহার উদ্দেশও পাইলাম না।

ରୋହିଣୀ କହିଲ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟିଉଶାନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଯା ଦିଯାଛେ; କାରଣ ତାହାତେ ଶରୀର ଖାରାପ କରେ । ତାହାର ଅଫିସଟ୍ ଓ ଭାଲ ନୟ—ବଡ଼ ଖାଟୁନି । ନା ହଇଲେ ଆର କଷ୍ଟ କି!

ଚୁପ କରିଯା ରହିଲାମ । କାରଣ ଏଇ ରୋହିଣୀର ମୁଖେଇ କିଛୁଦିନ ପୂର୍ବେ ଠିକ ଉଲ୍ଟା କଥା ଶୁଣିଯାଛିଲାମ । ସେ କ୍ଷଣକାଳ ନୀରବ ଥାକିଯା ପୁନରାୟ ବଲିତେ ଲାଗିଲ, ଆର ଏଇ ରାଧାବାଡ଼ା, ଅଫିସ ଥେକେ କ୍ଳାନ୍ଟ ହ'ଯେ ଏସେ ଭାରି ବିରକ୍ତିକର । କି ବଲେନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତବାବୁ?

ବଲିବ ଆର କି! ଆଣୁ ନିବିଯା ଗେଲେ ଶୁଧୁ ଜଳେ ଯେ ଇଞ୍ଜିନ ଚଲେ ନା, ଏ ତ ଜାନା କଥା ।

ତଥାପି ସେ ଏଇ ବାସା ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇତେ ରାଜୀ ହଇଲ ନା । କଲ୍ପନାର ତ କେହ ସୀମାନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯା ଦିତେ ପାରେ ନା, ସୁତରାଂ ମେ କଥା ଧରି ନା, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ଆଶା ଯେ କୋନଭାବେଇ ତାହାର ମନେର ମଧ୍ୟେ ଆଶ୍ରୟ ପାଯ ନାଇ, ତାହା ତାହାର କଯଟା କଥା ହଇତେ ବୁଝିତେ ପାରିଯାଛିଲାମ । ତବୁଓ ଯେ କେନ ମେ ଏଇ ଦୁଃଖେର ଆଗାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିତେ ଚାହେ ନା, ତାହା ଆମି ଭାବିଯା ପାଇଲାମ ନା ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀର ଅଗୋଚର ଛିଲ ନା ଯେ, ଯେ ହତଭାଗ୍ୟର ଗୃହେର ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗ ହଇଯା ଗେଛେ, ତାହାକେ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସରେର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ବେଦନା ଯଦି ଖାଡ଼ା ରାଖିତେ ନା ପାରେ, ତ ଧୂଲିସାଂ ହଇତେ ନିବାରଣ କରିବାର ସାଧ୍ୟ ସଂସାରେ ଆର କାହାରେ ନାଇ ।

ବାସାଯ ପୌଁଛିତେ ଏକଟୁ ରାତ୍ରି ହଇଲ । ସରେ ଢୁକିଯା ଦେଖି, ଏକ କୋଣେ ବିଛାନା ପାତିଯା କେ ଏକଜନ ଆଗାଗୋଡ଼ା ମୁଡ଼ି ଦିଯା ପଡ଼ିଯା ଆଛେ । ବିକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯା କହିଲ ଭଦ୍ରଲୋକ ।

ତାଇ ଆମାର ସରେ!

ଆହାରାଦିର ପରେ ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକଟିର ସହିତ ଆଲାପ ହଇଲ । ତାଁର ବାଡ଼ି ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଜେଲାଯ । ବଚର-ଚାରେକ ପରେ ନିରଗନ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଭାଇଯେର ସନ୍ଧାନ ମିଲିଯାଛେ । ତାହାକେଇ ସରେ ଫିରାଇବାର ଜନ୍ୟ ନିଜେ ଆସିଯାଛେନ । ତିନି ବଲିଲେନ, ମଶାଇ, ଗନ୍ଧେ

ଶୁଣି, ଆଗେ କାମରାପେର ମେଯେରା ବିଦେଶୀ ପୁରୁଷଦେର ଭେଡ଼ା କ'ରେ ଧରେ ରାଖତ । କି ଜାନି, ସେକାଳେ ତାରା କି କରତ; କିନ୍ତୁ ଏକାଳେ ବର୍ମାମେଯେଦେର କ୍ଷମତା ଯେ ତାର ଚେଯେ ଏକତିଲ କମ ନୟ, ସେ ଆମି ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଟେର ପେଯେଛି ।

ଆରା ଅନେକ କଥା କହିଯା, ତିନି ଛୋଟ ଭାଇକେ ଉଦ୍ଧାର କରିତେ ଆମାର ସାହାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଲେନ । ତାହାର ଏହି ସାଧୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିତେ ଆମି କୋମର ବାଁଧିଆ ଲାଗିବ, କଥା ଦିଲାମ । କେନ, ତାହା ବଲାଇ ବାହୁଳ୍ୟ । ପରଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧାନ କରିଯା ଛୋଟ ଭାଇଯେର ବର୍ମା-ଶ୍ଵଶୁରବାଡିତେ ଗିଯା ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀୟ ହଇଲାମ, ବଡ଼ ଭାଇ ଆଡ଼ାଳେ ରାସ୍ତାର ଉପର ପାଯଚାରି କରିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ଛୋଟ ଭାଇ ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀୟ ଛିଲେନ ନା, ସାଇକେଳ କରିଯା ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣେ ନିଷ୍କାନ୍ତ ହଇଯାଛିଲେନ । ବାଡିତେ ଶ୍ଵଶୁର-ଶାଶୁଦ୍ଧି ନାଇ, ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ଵୀପ ତାହାର ଏକଟି ଛୋଟ ବୋନ ଲଇଯା ଏବଂ ଜନ-ଦୁଇ ଦାସୀ ଲଇଯା ବାସ କରେ । ଇହାଦେର ଜୀବିକା ବର୍ମା-ଚୁରଙ୍ଗ ତୈରି କରା । ତଥନ ସକାଳେ ସବାଇ ଏହି କାଜେଇ ବ୍ୟାପ୍ତ ଛିଲ । ଆମାକେ ବାଙ୍ଗଲୀ ଦେଖିଯା ଏବଂ ସମ୍ଭବତ ତାହାର ସ୍ଵାମୀର ବନ୍ଧୁ ଭାବିଯା ସମାଦରେର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଲ । ବ୍ରକ୍ଷ-ରମଣୀରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ; କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷେରା ତେମନି ଅଲ୍ସ; ସରେର କାଜକର୍ମ ହଇତେ ଶୁରୁ କରିଯା ବାହିରେର ବ୍ୟବସା-ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭବତେ ମେଯେଦେର ହାତେ । ତାଇ ଲେଖାପଡ଼ା ତାହାଦେର ନା ଶିଖିଲେଇ ନୟ । କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଦେର ଆଲାଦା କଥା । ଶିଖିଲେ ଭାଲ, ନା ଶିଖିଲେଓ ଲଜ୍ଜାଯ ସାରା ହଇତେ ହୁଏ ନା । ନିଷ୍କର୍ମା ପୁରୁଷ ଦ୍ଵୀପ ଉପାର୍ଜନେର ଅଳ୍ପ ବାଡିତେ ଧ୍ୱଂସ କରିଯା ବାହିରେ ତାହାରଇ ପଯସାଯ ବାବୁଯାନା କରିଯା ବେଡ଼ାଇଲେ, ଲୋକେ ଆଶ୍ରୟ ହୁଏ ନା । ଦ୍ଵୀପାଓ ଛି-ଛି କରିଯା, ଘ୍ୟାନଘ୍ୟାନ, ପ୍ୟାନପ୍ୟାନ କରିଯା ଅତିଷ୍ଠ କରିଯା ତୋଳା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରେ ନା । ବରଞ୍ଚ ଇହାଇ କତକଟା ଯେନ ତାହାଦେର ସମାଜେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଆଚାର ବଲିଯା ସ୍ଥିର ହଇଯା ଗେଛେ ।

ମିନିଟ-ଦଶେକେର ମଧ୍ୟେ ‘ବାବୁସାହେବ’ ଦିଚକ୍ରମାନେ ଫିରିଯା ଆସିଲେନ । ତାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଇଂରାଜି ପୋଶାକ, ହାତେ ଦୁ-ତିନଟା ଆଙ୍ଗଟି, ଘଡ଼ି-ଚେନ—କାଜକର୍ମ କିଛୁଇ କରିତେ ହୁଏ ନା—ଅର୍ଥଚ ଅବସ୍ଥାଓ ଦେଖିଲାମ ବେଶ ସଚଳ । ତାହାର ବର୍ମା-ଗୃହିଣୀ ହାତେର

কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি এবং ছড়িটা হাত হইতে লইয়া রাখিয়া দিল। ছোট বোন চুরুট, দেশলাই প্রভৃতি আনিয়া দিল, দাসী চায়ের সরঞ্জাম এবং অপরে পানের বাটা আগাইয়া দিল। বাঃ—লোকটাকে যে সবাই মিলিয়া একেবারে রাজার হালে রাখিয়াছে! লোকটার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ হয় চারু-টারু এমনি কি-একটা যেন হইবে। যাক্ গে, আমরা নাহয় তাঁকে শুধু বাবু বলিয়াই ডাকিব।

বাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি কে।

বলিলাম, আমি তাঁর দাদার বন্ধু।

তিনি বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, আপনি ত কলকেতিয়া, কিন্তু আমার দাদা ত কখনো সেখানে যাননি। বন্ধুত্ব হ'ল ক্যামনে?

কেমন করিয়া বন্ধুত্ব হইল, কোথায় হইল, কোথায় আছেন ইত্যাদি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্যটাও জানাইলাম এবং তিনি যে আতুরত্বের দর্শনাভিলাষে উদ্গীব হইয়া আছেন, তাহাও নিবেদন করিলাম।

পরদিন সকালেই আমাদের হোটেলে বাবুটির পদধূলি পড়িল, এবং উভয় ভাতায় বহুক্ষণ কথাবার্তার পরে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই দুই ভাইয়ের কি যে মিল হইয়া গেল—সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, বাবুটি দাদা ডাক দিয়া যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ফিসফিস মন্ত্রণা, আলাপ-আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়ার আর অবধি রহিল না। একদিন অপরাহ্নে দাদাকে ও আমাকে চা-বিস্কুট ভোজন করিবার নিম্নলিঙ্গ পর্যন্ত করিয়া গেলেন।

সেই দিন তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ হইল। মেয়েটি অতিশয় সরল, বিনয়ী, এবং ভদ্র। ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় ইহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং সেই অবধি বোধ করি একদিনের জন্যেও তাহাকে দুঃখ দেয় নাই। দিন-চারেক পরে দাদাটি আমাকে একগাল হাসিয়া কানে কানে জানাইলেন যে, পরশু সকালের জাহাজে তাঁহারা বাড়ি যাইতেছেন। শুনিয়াই কেমন একটা ভয় হইল; জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাই আবার ফিরে আসবেন ত?

দাদা বলিলেন, আবার! রাম রাম বলে একবার জাহাজে চড়তে পারলে  
হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে জানিয়েছেন?

দাদা কহিলেন, বাপ রে! তা হ'লে আর রক্ষা থাকবে। বেটির যে যেখানে  
আছে, রঞ্জবীজের মত এসে ছেঁকে ধরবে। বলিয়া চোখ দুটো মিটমিট করিয়া  
সহাস্যে কহিলেন, ফ্রেঞ্চ লিভ মশাই, ফ্রেঞ্চ লিভ—এ আর বুঝলেন না?

অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইল; কহিলাম, মেয়েটি ত তা হলে ভারি কষ্ট পাবে?

আমার কথা শুনিয়া দাদা ত একবারে হসিয়াই আকুল। কোনমতে হসি  
থামিলে, বলিতে লাগিলেন, শোন কথা একবার! বর্মা-বেটিদের আবার কষ্ট! এ  
শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না—না আছে এঁটোকাঁটার বিচার, না আছে  
একটা জাতজন্ম। বেটিরা সব নেঙ্গী (এক প্রকার পচা মাছ যাহাকে ‘ঙাপি’ বলে)  
খায়, মশাই নেঙ্গী খায়! গন্ধের চোটে ভূত-পেত্তী পালায়। এ ব্যাটা-বেটিদের  
আবার কষ্ট! একটা যাবে, আর একটা পাকড়াবে—ছোটজাত ব্যাটারা—

থামুন মশাই, থামুন, আপনার ভাইটিকে যে এই চার বছর ধ’রে রাজার  
হালে খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, আর কিছু না হোক, তারও ত একটা কৃতজ্ঞতা আছে!

দাদার মুখ গম্ভীর হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি যে  
অবাক করলেন মশাই! পুরুষবাচ্চা বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে বয়সের দোষে নাহয়  
একটা শখ ক’রেই ফেলেচে। কোন্ মানুষটাই বা না করে বলুন? আমার ত আর  
জানতে বাকি নেই, এর না-হয় একটু জানাজানি হ’য়েই পড়েচে—তাই ব’লে বুঝি  
চিরকালটা এমনি ক’রেই বেড়াতে হবে! ভাল হ’য়ে সংসার-ধর্ম ক’রে পাঁচজনের  
একজন হ’তে হবে না? মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়সে কত লোক হোটেলে চুকে  
যে মুরগি পর্যন্ত খেয়ে আসে! কিন্তু বয়স পাকলে কি আর তাই করে, না, করলে  
চলে? আপনিই বিচার করুন না, কথাটা সত্যি বলচি, না মিথ্যে বলচি!

বস্তুতই এ বিচার করিবার মত বুদ্ধি আমাকে ভগবান দেন নাই, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। অফিসের বেলা হইতেছিল, স্নানহার করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু অফিস হইতে ফিরিলে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, ভেবে দেখলাম, আপনার পরামর্শই ভাল মশাই। এ জাতকে বিশ্বাস নেই, কি জানি, শেষে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে না কি,—ব'লে যাওয়াই ভালো। এ বেটিরা আর পারে না কি! না আছে লজ্জাশরম, না আছে একটা ধর্মজ্ঞান! জানোয়ার বললেই ত চলে!

বলিলাম, হ্যাঁ, সেই ভাল।

কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, ভিতরে কি-একটা ষড়যন্ত্র আছে। ষড়যন্ত্র সত্য ছিল। কিন্তু সে যে এত নীচ, এত নিষ্ঠুর, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে বলিয়াও ভাবিতে পারি না।

চট্টগ্রামের জাহাজ রাবিবারে ছাড়ে। অফিস বন্ধ, সকালবেলাটায় করিই বা কি, তাই তাঁকে see off করিতে জাহাজঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জাহাজ তখন জেটিতে ভিড়িয়াছে, যাহারা যাইবে এবং যাহারা যাইবে না—এই দুই শ্রেণীর লোকেরই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে কে বা কাহার কথা শুনে—এমনি ব্যাপার। এদিকে-ওদিকে চাহিতেই সেই বর্মা-মেয়েটির দিকে চোখ পড়িল। একধারে সে ছোট বোনটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারা রাত্রির কাঙ্গায় তাহার চোখ দুটি ঠিক জবাফুলের মত রাঙ্গা। ছোটবাবু মহা ব্যস্ত। তাঁহার দু'চাকার গাড়ি লইয়া, তোরঙ-বিছানা লইয়া, আরও কত কি যে লট-বহর লইয়া কুলিদের সহিত দৌড়ঝাঁপ করিয়া ফিরিতেছেন—তাঁহার মুহূর্ত অবসর নাই।

ক্রমে সমস্ত জিনিসপত্র জাহাজে উঠিল, যাত্রীরা সব ঠেলাঠেলি করিয়া গিয়া উপরে উঠিল, অ-যাত্রীরা নামিয়া আসিল, সুমুখের দিকে নোঙ্গর-তোলা চলিতে লাগিল—এইবার ছোটবাবু তাঁহার দ্রব্য-সম্পত্তির হেফাজত করিয়া, জায়গা

ঠিক করিয়া তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর কাছে বিদায়ের ছলে সংসারের নিষ্ঠুরতম এক অঙ্কের অভিনয় করিতে জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—সে অধিকার তাঁহার ছিল।

আমি অনেক সময় ভাবি, ইহার কি প্রয়োজন ছিল? কেন মানুষ গায়ে পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে! সে মন্ত্র-পড়া স্ত্রী নাই বা হইল, কিন্তু সে ত নারী! সে ত কন্যা-ভগিনী-জননীর জাতি। তাহারই আশ্রয়ে সে ত এই সুদীর্ঘ কাল স্বামীর সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে। তাহারই বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত অমৃত সে ত সমস্ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল! তবে কিসের লোভে সে এই অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকেই এত বড় নির্দয় বিজ্ঞপ্ত ও হাসির পাত্রী করিয়া ফেলিয়া গেল!

লোকটা এক হাতে রুমাল দিয়া নিজের দুচক্ষু আবৃত করিয়া এবং অপর হাতে তাহার বর্মা-স্ত্রীর গলা ধরিয়া কান্নার সুরে কি-সব বলিতেছে; এবং মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে।

আশেপাশে অনেকগুলি বাঙালী ছিল। তাহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে; কেহবা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু দূরে ছিলাম বলিয়া প্রথমটা কথাগুলা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিতেই সকল কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। লোকটা রোদনের কঢ়ে বর্মা-ভাষায় এবং বাঙলা ইতর ভাষায় মিশাইয়া বিলাপ করিতেছে। বাঙলাটা কথখিঁৎ মার্জিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শুনায়,—একমাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আসিব, তা আমিই জানি। ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম।

এগুলি শুধু আমাদের মত কয়েকজন অপরিচিত বাঙালী দর্শকদের আমোদ দিবার জন্যই; কিন্তু মেয়েটি ত বাঙলা বুঝে না, শুধু কান্নার সুরেই তাহার

যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এবং কোনমতে সে হাত তুলিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া  
সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

লোকটা টানিয়া টানিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল, মোটে পাঁচশ'  
টাকা তামাক কিনতে দিলি—আর যে তোর কিছু নেই—পেট ভরল না—অমনি  
তোর বাড়িটাও বিক্রি করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যেতে পারতাম, তবে ত  
বুবতাম একটা দাঁও মারা গেল। এ যে কিছুই হ'ল না রে! কিছুই হ'ল না!

আশেপাশে লোকগুলা অবরুদ্ধ হাস্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু  
যাহাকে লইয়া এত আমোদ, তাহার চক্ষু-কর্ণ তখন দুঃখের বাস্পে একেবারে  
সমাচ্ছন্ন! মনে হইতে লাগিল, বুঝি বেদনার ভারে ভঙ্গিয়া পড়ে বা।

খালাসীরা উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, বাবু সিঁড়ি তোলা হচ্ছে।

লোকটা গলা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাত সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়াই আবার ফিরিয়া  
আসিল। মেয়েটির হাতে সাবেক-কালের একটি ভাল চুনির আংটি ছিল, সেইটির  
উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ওরে, দে রে, আংটিটাও বাগিয়ে  
নিয়ে যাই। যেমন করে হোক দুশ-আড়াইশ' টাকা দাম হবে—এটাই বা ছাড়ি  
কেন!

মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেটি খুলিয়া প্রিয়তমের আঙুলে পরাইয়া দিল। যথা  
লাভ! বলিয়া লোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে গিয়া উঠিল।  
জাহাজ জেটি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং মেয়েটি মুখে  
আঁচল চাপা দিয়া হাঁটু গাড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অনেকেই দাঁত বাহির  
করিয়া হাসিতে চলিয়া গেল। কেহ বা কহিল, আচ্ছা ছেলে। কেহ বা  
বলিল, বাহাদুর ছোকরা! অনেকেই বলিতে বলিতে গেল, কি মজাটাই করলে!  
হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধ'রে গেল। এম্বিনি কত কি ঘন্টব্য। শুধু আমি কেবল  
সেই সকলের হাসি-তামাশার পাত্রী বোকা মেয়েটার অপরিসীম দুঃখের নিঃশব্দ  
সাক্ষীর মত স্তনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছোট বোনটি চোখ মুছিতে পাশে দাঁড়াইয়া দিদির হাত ধরিয়া  
টানিতেছিল। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই, সে আস্তে আস্তে কহিল, বাবুজী  
এসেছেন দিদি, ওঠো!

মুখ তুলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কান্না তাহার বাঁধ  
ভাঙ্গিয়া আচড়াইয়া পড়িল। আমার সাঞ্চনা দিবার কি-ই বা ছিল! তবুও সেদিন  
তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাহারই পিছনে পিছনে তাহারই গাড়িতে  
গিয়া উঠিলাম। সমস্ত পথটা সে কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু এই কথাই বলিতে লাগিল,  
বাবুজী, বাড়ি আমার আজ খালি হইয়া গেছে।

কি করিয়া আমি সেখানে গিয়া তুকব। একমাসের জন্য তামাক কিনিতে  
গেছেন—এই একটা মাস আমি কি করিয়া কাটাইব। বিদেশে না জানি কত কষ্টই  
হবে, কেন

আমি যাইতে দিলাম। রেঙ্গুনের বাজারে তামাক কিনিয়া ত এতদিন  
আমাদের চলিতেছিল;—কেন তবে বেশি লাভের আশায় এতদূরে তাঁকে  
পাঠাইলাম। দুঃখে আমার বুক ফাটিতেছে বাবুজী, আমি পরের মেলেই তাঁর কাছে  
চলিয়া যাইব। এমনি কত কি!

আমি একটা কথারও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু মুখ ফিরাইয়া  
জানালার বাহিরে চাহিয়া চোখের জল গোপন করিতে লাগিলাম।

মেয়েটি কহিতে লাগিল, বাবুজী, তোমাদের জাতের লোক যত  
ভালবাসিতে পারে, এমন আমাদের জাতের লোক নয়। তোমাদের মত দয়া-মায়া  
আর কোন দেশের লোকের নাই।

একটু থামিয়া আবার বার দুই-তিন চোখ মুছিয়া কহিতে লাগিল,  
বাবুজীকে ভালবাসিয়া যখন দুজনে একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম, কত লোক  
আমাকে ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু আমি কারও কথা শুনি নাই।  
এখন কত মেয়ে আমাকে হিংসা করে।

চোমাথার কাছে আসিয়া আমি বাসায় যাইতে চাহিলে, সে ব্যাকুল হইয়া দুই হাত দিয়া গাড়ির দরজা আটকাইয়া বলিল, না বাবুজী, তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়া এক পিয়ালা চা খাইয়া আসিবে চল।

আপত্তি করিতে পারিলাম না। গাড়ি চলিতে লাগিল। সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবুজী, রংপুর কত দূর? তুমি কখনো গিয়াছ? সে কেমন জায়গা? অসুখ করিলে ডাঙ্কার মিলে ত?

বাহিরের দিকে চাহিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, মিলে বৈ কি।

সে একটা নিশাস ফেলিয়া বলিল, ফয়া ভাল রাখুন। তাঁর দাদাও সঙ্গে আছেন, তিনি খুব ভাল লোক, ছোট ভাইকে প্রাণ দিয়া দেখিবেন। তোমাদের যে মায়ার শরীর! আমার কোন ভাবনা নাই, না বাবুজী?

চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ মহাপাতকের কথানি অংশ আমার নিজের? আলস্যবশতঃই হোক বা চক্ষুলজ্জাতেই হোক, বা হতবুদ্ধি হইয়াই হোক, এই যে মুখ বুজিয়া এতবড় অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলাম, কথাটি কহিলাম না, ইহার অপরাধ হইতে কি আমি অব্যাহতি পাইব? আর তাই যদি হইবে, ত মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারি না কেন? তাহার চেতের প্রতি চাহিতে সাহস হয় না কিসের জন্য?

চা-বিস্কুট খাইয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের লক্ষ কোটি তুচ্ছ ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস শুনিয়া যখন বাটীর বাহির হইলাম, তখন বেলা আর বেশি নাই। ঘরে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না। দিনের শেষে কর্ম-অন্তে সবাই বাসায় ফিরিয়াছে—দাঠাকুরের হোটেল তখন নানাবিধি কলহাসে মুখরিত। এই সমস্ত গোলমাল যেন বিষের মত মনে হইতে লাগিল।

একাকী পথে পথে ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ সমস্যার মীমাংসা হইত কি করিয়া? বর্মাদের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কিছু-একটা বাঁধাধরা নিয়ম নাই। বিবাহের ভদ্র অনুষ্ঠানও আছে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মত যে-কোন নর-

নারী তিন দিন একত্রে বাস করিয়া তিন দিন এক পাত্র হইতে ভোজন করিলেও সে বিবাহ। সমাজ তাহাদের অস্থীকার করে না। সে হিসাবে মেয়েটিকে কোন মতেই ছেট করিয়া দেখা যায় না। আবার বাবুটির দিক দিয়া হিন্দু-আইন-কানুনে এটা কিছুই নয়। এই স্ত্রী লইয়া সে দেশে গিয়া বাস করিতে পারে না। হিন্দুসমাজ তাহাদের গ্রহণ নাহয় নাই করিল, কিন্তু আপামরসাধারণ যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, সেও সারা জীবন সহ্য করা কঠিন। হয় চিরকাল প্রবাসে নির্বাসিতের ন্যায় বাস করা, নাহয়, এই দাদাটি ছেট ভাইয়ের যে ব্যবস্থা করিল, তাহাই ঠিক। অথচ ধর্ম কথাটার যদি কোন অর্থ থাকে ত—সে হিন্দুরই হোক, বা আর কোন জাতিরই হোক—এত বড় একটা নৃশংস ব্যাপার যে কি করিয়া ঠিক হইতে পারে সে ত আমার বুদ্ধির অতীত। এই-সকল কথা নাহয় সময়মত চিন্তা করিয়া দেখিব, কিন্তু এই যে কাপুরষটা আজ বিনাদোয়ে এই অনন্যনির্ভর নারীর পরম স্নেহের উপর বেদনার বোৰা চাপাইয়া, তাহাকে মুখ ভ্যাঙ্চাইয়া পলায়ন করিল, এই আক্রোশটাই আমাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল।

পথের একধার দিয়া চলিয়াছি ত চলিয়াছি। বহুদিন পূর্বে একদিন অভয়ার পত্র পড়িবার জন্য যে চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দোকানদারটি বোধ করি, আমাকে চিনতে পারিয়া ডাক দিয়া কহিল, বাবুসাব, আইয়ে।

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙ্গিল দেখিলাম, এ সেই দোকান এবং ওই রোহিণীর বাসা। বিনা বাক্যে তাহার আহ্বানের মর্যাদা রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া এক পেয়ালা চা পান করিয়া বাহির হইলাম। রোহিণীর দরজায় ঘা দিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া ধরিয়া বার-দুই নাড়া দিতেই কবাট খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সম্মুখে অভয়া।

তুমি যে?

অভয়ার চোখ-মুখ রাস্তা হইয়া উঠিল; এবং কোন জবাব না দিয়াই সে চক্ষের নিম্নে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু

ଲଜ୍ଜାର ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକେଓ ତାହାର ମୁଖେର ଉପର ଫୁଟିଆ  
ଉଠିତେ ଦେଖିଲାମ, ତାହାତେ ଜିଙ୍ଗାସା କରିବାର, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆର କିଛୁଇ ରହିଲ  
ନା । ଅଭିଭୂତେର ନ୍ୟାୟ କିଛୁକ୍ଷଣ ଦାଁଡ଼ାଇୟା ଥାକିଯା ନୀରବେ ଫିରିଯା ଯାଇତେଛିଲାମ—  
ଅକସ୍ମାତ ଆମାର ଦୁଇ କାନେର ମଧ୍ୟେ ଯେନ ଦୁ'ରକମ କାନ୍ଦାର ସୁର ଏକଇ ସଙ୍ଗେ ବାଜିଯା  
ଉଠିଲ । ଏକଟା ସେହି ପାପିଚ୍ଛେର, ଅପରଟା ସେହି ବର୍ମା ମେଯେଟିର । ଚଲିଯା ଯାଇତେଛିଲାମ,  
କିନ୍ତୁ ଫିରିଯା ଆସିଯା ତାହାଦେର ପ୍ରାଙ୍ଗନେ ମାବିଧାନେ ଦାଁଡ଼ାଇଲାମ । ମନେ ମନେ  
ବଲିଲାମ, ନା, ଏମନ କରିଯା ଅପମାନ କରିଯା ଆର ଆମାର ଯାଓଯା ହହିବେ ନା । ନାହି,  
ନାହି—ଏମନ ବଲିତେ ନାହି, ଏମନ କରିତେ ନାହି—ଏ ଉଚିତ ନୟ, ଏ ଭାଲ ନୟ—ଏ-  
ସବ ଅଭ୍ୟାସ ମତ ଅନେକ ଶୁଣିଯାଛି, ଅନେକ ଶୁଣାଇଯାଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ନା । କି ଭାଲ,  
କି ମନ୍ଦ, କେନ ଭାଲ, କୋଥାଯ କାହାର କିସେ ମନ୍ଦ—ଏ-ସକଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପାରି ଯଦି ତାହାର  
ନିଜେର ମୁଖେ ଶୁଣିଯା ତାହାରଇ ମୁଖେର ପାନେ ଚାହିୟା ବିଚାର କରିବ; ନା ପାରି ତ ଶୁଧୁ  
ପୁର୍ବିର ଲେଖା ଅକ୍ଷରେର ପ୍ରତି ଚୋଥ ପାତିଯା ମୀମାଂସା କରିବାର ଅଧିକାର ଆମାର ନାହି,  
ତୋମାର ନାହି, ବୋଧ କରି ବା ବିଧାତାରେ ନାହି ।

## দশ

হঠাতে অভয়া দ্বার খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধ-সংক্ষারের ধাক্কাটা প্রথমে সামলাতে পারিনি বলেই পালিয়েছিলাম শ্রীকান্তবাবু, নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা বলে ভাববেন না যেন।

তাহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অভয়া কহিল, আপনার বাসায় ফিরে যেতে আজ একটু দেরি হবে। রোহিণীবাবু এলেন ব'লে। আজ দুজনেই আমরা আপনার আসামী। বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হয়, আমরা তার দণ্ড নেব।

রোহিণীকে ‘বাবু’ বলিতে এই প্রথম শুনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ফিরে এলেন কবে?

অভয়া কহিল, পরশু। কি হয়েছিল, জানতে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে। বলিয়া সে নিজের দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে। বলিল, এমন আরও অনেক আছে, যা আপনাকে দেখাতে পারলুম না।

যে-সকল দৃশ্যে মানুষের পৌরুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে ইহা তাহারই একটা। অভয়া আমার স্তন্ধুকষ্ঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিম্নমেষে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল, এবং এইবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, কিন্তু ফিরে আসার এই আমার একমাত্র কারণ নয় শ্রীকান্তবাবু, আমার সতীধর্মের এ সামান্য একটু পুরস্কার। তিনি যে স্বামী আর আমি যে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, এ তারই একটু চিহ্ন।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় কহিতে লাগিল, আমি যে শ্রী হ'য়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতদূরে এসে তাঁর শান্তিভঙ্গ করেচি,— মেয়েমানুষের এতবড় স্পর্ধা পুরুষমানুষ সহিতে পারে না। এ সেই শান্তি। তিনি

অনেক রকমে ভুলিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে কৈফিযৎ চাইলেন, কেন রোহিণীর সঙ্গে এসেচি। বললুম, স্বামীর ভিটে যে কি, সে আমি আজও জানিনে। আমার বাপ নেই, মা মারা গেছেন—দেশে খেতে-পরতে দেয় এমন কেউ নেই, তোমাকে বার বার চিঠি লিখে জবাব পাইনে—

তিনি একগাছা বেত তুলে নিয়ে বললেন, আজ তার জবাব দিচ্ছি। এই বলিয়া অভয়া তাহার প্রহত দক্ষিণ বাহুটা আর-একবার স্পর্শ করিল।

সেই নিরতিশয় হীন অমানুষ বর্বরটার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অস্তঃকরণটা পুনরায় আলোড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু যে অঙ্গ-সংস্কারের ফল বলিয়া অভয়া আমাকে দেখিবামাত্রই ছুটিয়া লুকাইয়াছিল, সে সংস্কার ত আমারও ছিল!

আমিও ত তাহার অতীত নই! সুতরাং, বেশ করিয়াছ—এ কথাও বলিতে পারিলাম না, অপরাধ করিয়াছ—এমন কথাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। অপরের একান্ত সঙ্কটের কালে যখন নিজের বিবেক ও সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে, তখন উপদেশ দিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অন্তর্ভুক্ত আছে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলাম, চ'লে আসাটা যে অন্যায় এ কথা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু—

অভয়া কহিল, এই কিন্তুটার বিচারই ত আপনার কাছে চাইচি শ্রীকান্তবাবু। তিনি তাঁর বর্মা-স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছিনে, কিন্তু স্বামী যখন সুন্দরমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অঙ্গকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইচি।

আমি কিন্তু চুপ করিয়া রাখিলাম। সে আমার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় কহিল, অধিকার ছাড়া ত কর্তব্য থাকে না শ্রীকান্তবাবু, এটা ত খুব মোটা কথা। তিনিও ত আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু

একটা নিরীক্ষক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে ত এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল,—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়ে মানুষ ব'লে আমারি উপরে? শ্রীকান্তবাবু, আপনি একটা কিন্তু পর্যন্ত ব'লেই থেমে গেলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে চ'লে আসাটা আমার অন্যায় হয়নি, কিন্তু,—এই কিন্তুটার অর্থ কি এই যে, যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেচে তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শিত্ব করতে সারাজীবন জীবন্ত হ'য়ে থাকাই তার নারীজন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একবারে মিথ্যা? এতবড় অন্যায়, এতবড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্কু হওয়া চাই?

এই জন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাত, সব ধর্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেচি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হ'য়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু?

আমাকে মৌন দেখিয়া অভয়া বলিল, জবাব দিন না শ্রীকান্তবাবু?

বলিলাম, আমার জবাবে কি যায় আসে? আমার মতামতের জন্য ত আপনি অপেক্ষা করেন নি?

অভয়া কহিল, কিন্তু তার ত সময় ছিল না।

কহিলাম, তা হবে। কিন্তু আপনি যখন আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন, তখন আমিও চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার ফিরে এলুম কেন জানেন?

না।

ফিরে আসবার কারণ, আজ আমার ভারি মন খারাপ হ'য়ে আছে। আপনাদের চেয়ে তের বেশি নিষ্ঠুর আচরণ একটি মেয়ের উপর হ'তে আজই সকালে দেখেচি। এই বলিয়া জাহাজ-ঘাটের সেই বর্মা-মেয়েটির সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেয়েটির কি উপায় হবে, আপনি ব'লে দিতে পারেন?

অভয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বলতে পারিনে।

কহিলাম, আপনাকে আরও দুটি মেয়ের ইতিহাস আজ শোনাব। একটি আমার অনন্দাদিদি, অপরটির নাম পিয়ারী বাইজী। দুঃখের ইতিহাসে এঁদের কারূর স্থানই আপনার নীচে নয়।

অভয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি অনন্দাদিদির সমস্ত কথা আগাগোড়া বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, অভয়া কাঠের মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া বসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, তার পরে?

বলিলাম, তার পরে আর জানিনে। এইবার পিয়ারী বাইজীর কথা শুনুন। তার নাম যখন রাজলক্ষ্মী ছিল, তখন থেকে একজনকে সে ভালবাসত। কি রকম ভালবাসা জানেন? রোহিণীবাবু আপনাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি। এ আমি স্বচক্ষে দেখে গেছি ব'লেই তুলনা দিতে পারলুম। তার পরে বছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দুজনের দেখা হয়। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নয়, পিয়ারী বাইজী। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে মরেনি, পিয়ারীর মধ্যে চিরদিনের জন্য অমর হ'য়ে ছিল, সেইদিন তার প্রমাণ হ'য়ে যায়।

অভয়া উৎসুক হইয়া বলিল, তার পরে?

পরের ঘটনা একটি একটি করিয়া সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম, তার পরে এমন একদিন এসে পড়ল, যেদিন পিয়ারী তার প্রাণাধিক প্রিয়তমকে নিঃশব্দে দূরে সরিয়ে দিলে।

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে কি হল জানেন?

জানি। তার পরে আর নেই।

অভয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি কি এই বলতে চান যে, আমি একা নই—এমনি দুর্ভাগ্য মেয়েমানুষের অদৃষ্টে চিরদিন ঘটে আসচে, এবং সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব?

আমি কহিলাম, আমি কিছুই বলতে চাইনে। শুধু এইটুকু আপনাকে জানাতে চাই, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ নয়। তাদের আচার-ব্যবহার এক তুলাদণ্ডে ওজন করাও যায় না, গেলেও তাতে সুবিধা হয় না।

কেন হয় না, বলতে পারেন?

না, তাও পারিনে। তা ছাড়া আজ আমার মন এমনি উদ্ভ্রান্ত হয়ে আছে যে, এই-সব জটিল সমস্যার মীমাংসা করবার সাধ্যই নেই। আপনার প্রশ্ন আমি আর একদিন ভেবে দেখব। তবে আজ শুধু আপনাকে এই কথাটি বলে যেতে পারি যে, আমার জীবনে আমি যে-ক'টি বড় নারী-চরিত্র দেখতে পেয়েছি, সবাই তারা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হ'য়ে আছেন। আমার অন্নদাদিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে-আর কিছুই করতে পারতেন না, এ আমি শপথ করেই বলতে পারি। সে ভার অসহ হ'লেও যে তিনি কখনো আপনার পথে পা দিতে পারেন, এ কথা ভাবলেও হয়ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আর সেই রাজলক্ষ্মী! তার ত্যাগের দুঃখ যে কত বড়, সে ত আমি চোখে দেখেই এসেচি। এই দুঃখের জোরেই আজ সে আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে।

অভয়া চমকিয়া কহিল, তবে আপনিই কি তাঁর—

বলিলাম তা না হ'লে সে এত স্বচ্ছন্দে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত  
না, হারাবার ভয়ে প্রাণপণে কাছে টেনে রাখতেই চাইত।

অভয়া বলিল, তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে আপনাকে তার হারাবার ভয়  
নেই।

আমি বলিলাম, শুধু ভয় নয়—রাজলক্ষ্মী জানে আমাকে তার হারাবার জো  
নেই। পাওয়া এবং হারানোর বাহিরে একটা সম্বন্ধ আছে; আমার বিশ্বাস সে তাই  
পেয়েচে ব'লে আমাকেও এখন তার দরকার নেই! দেখুন, আমি নিজেও বড় এ  
জীবনে কম দুঃখ পাইনি।

তার থেকে এই বুঝেচি, দুঃখ জিনিসটা অভাব নয়, শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া  
যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।

অভয়া অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি আপনার  
কথা বুঝেচি শ্রীকান্তবাবু! অনন্দাদিদি, রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল  
পেয়েছেন! কিন্তু আমার তাও হাতে নেই। স্বামীর কাছে পেয়েচি আমি অপমান—  
শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেচি। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে  
বেঁচে থাকতে আপনি বলেন?

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া অভয়া পুনরায় বলিল,  
ঠিক দের সঙ্গে আমার জীবনের কোথাও মিল নেই শ্রীকান্তবাবু। সংসারে সব নর-  
নারীই এক ছাঁচে তৈরি নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়।  
তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই  
চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না। তাই সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত।  
আমার জীবনটাই একবার ভাল ক'রে আগাগোড়া ভেবে দেখুন দেখি। আমাকে  
যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও  
উপায় হ'ল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার

নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠে সার্থক হ'তো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিষ্পত্তির দুঃখটাই সারা জীবন ব'য়ে বেড়ানোই কি আমার নারী-জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিণীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্কু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।

হাত তুলিয়া অভয়া চোখের কোণ-দুটা মুছিয়া ফেলিয়া অবরুদ্ধকষ্টে কহিল, একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েচেন, তিনি কি তাতেই খুশি হবেন? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুশি বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ব'লে রাখলুম।

আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছুই নেই। এ বস্তু থেকে অষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। তা হ'লে তারা একেবারেই অকিঞ্চিত্কর হ'য়ে যাবে।

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এম্নিই বটে! সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব; যেন ইহাদের রক্তমাংস আছে; যেন তার ভিতরে

প্রাণ আছে—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর। মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।

অভয়া সহসা একটা সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিল; কহিল, আপনি নিজে কি আমাদের অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন শ্রীকান্তবাবু? আর আমাদের বাড়িতে আসবেন না?

উত্তর দিতে আমাকে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইল। তার পরে বলিলাম, অন্তর্যামীর কাছে আপনারা হয়ত নিষ্পাপ—তিনি আপনাদের কল্যাণ করবেন। কিন্তু মানুষ ত মানুষের অত্তর দেখতে পায় না—তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব ক'রে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্য আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে ত তাদের সমাজের কাজকর্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙ্গে যায়।

অভয়া কাতর হইয়া কহিল, যে ধর্মে, যে সমাজের মধ্যে আমাদের তুলে নেবার মত উদারতা আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেন? ইহার কি জবাব, ভাবিয়া পাইলাম না।

অভয়া কহিল, আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সঙ্কটের কালে আশ্রয় দিতে পারবেন না, সে আশ্রয় আমাদের ভিক্ষে নিতে হবে পরের কাছে? তাতে কি গৌরব বাঢ়ে শ্রীকান্তবাবু?

প্রত্যুভাবে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকার পরে কহিল, যাক, আপনারা জায়গা নাই দিন, আমার সাম্ভনা এই যে, জগতে আজও একটা বড় জাত আছে, যারা প্রকাশ্যে এবং স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে পারে।

তাহার কথাটায় একটু আহত হইয়া কহিলাম, সকল ক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়াই কি ভাল কাজ ব'লে মেনে নিতে হবে?

অভয়া বলিল, তার প্রমাণ ত হাতে হাতে রয়েছে শ্রীকান্তবাবু। পৃথিবীতে কোন অন্যায়ই বেশি দিন শ্রীবৃন্দি লাভ করে না। এই যদি সত্যি হয়, তাহলে কি তারা অন্যায়টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠছে, আর আপনারা ন্যায়ধর্ম আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন বলতে হবে? আমরা ত এখানে অল্প দিন এসেচি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি দেখেচি, মুসলমানেতে এ দেশটা ছেয়ে যাচ্ছে। শুনেচি এমন গ্রাম নাকি নেই, যেখানে একঘর মুসলমানও বাস করেনি, যেখানে একটা মসজিদও তৈরি হয়নি। আমরা হয়তো চোখে দেখে যেতে পাব না, কিন্তু এমন দিন শীত্র আসবে যেদিন আমাদের দেশের মত এই বর্মা দেশটাও একটা মুসলমান—প্রধান স্থান হয়ে উঠবে। আজ সকালেই জাহাজঘাটে যে অন্যায় দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে আছে, আপনিই বলুন ত, কোন মুসলমান বড় ভাইয়েরই কি ধর্ম এবং সমাজের ভয়ে এই ষড়যন্ত্র, এই হীনতার আশ্রয় নিয়ে এমন একটা আনন্দের সংসার ছারখার করে দিয়ে পালাবার প্রয়োজন হ'তো? বরঞ্চ সে সবাইকে দলে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে অগ্রজের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতো। কোন্টাতে সত্যকার ধর্ম বজায় থাকতো শ্রীকান্তবাবু?

গভীর শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, আপনি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আপনি এত কথা জানলেন কি করে? আমার ত মনে হয় না, এত বড় প্রশ্নস্ত হদয় আমাদের পুরুষমানুষের মধ্যেও বেশি আছে। আপনি যার মা হবেন, তাকে দুর্ভাগ্য ব'লে ভাবতে ত অন্ততঃ আমি কোন মতেই পারবো না।

অভয়া স্নানযুখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটাইয়া বলিল, তা হলে শ্রীকান্তবাবু, আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিলেই কি হিন্দুসমাজ বেশি পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোন দিক দিয়েই সমাজে ক্ষতি পোঁচুবে না?

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় একটু হাসিয়া কহিল, আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাব না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়ে আমি

চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব। আমার একটি সন্তানকেও যদি কোন দিন  
মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি, সেদিন আমার সকল দুঃখ সার্থক হবে,  
এই আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব। সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না  
তার জন্মের হিসাবটাই জগতের বড়, এ আমাকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

## এগার

মনোহর চক্ৰবৰ্তী বলিয়া একটি প্রাঞ্জ ব্যক্তিৰ সহিত আমাৰ আলাপ হইয়াছিল। দাঠাকুৰেৰ হোটেলে একটা হৱি-সংকীর্তনেৰ দল ছিল; তিনি পুণ্যসংঘয়েৰ অভিপ্ৰায়ে মাৰো মাৰো তথায় আসিলেন। কিন্তু কোথায় থাকিলেন, কি কৰিলেন জানিতাম না। এই মাত্ৰ শুনিয়াছিলাম—তাৰ নাকি অনেক টাকা, এবং সকল দিক দিয়াই অত্যন্ত হিসাবী। কেন জানি না, আমাৰ প্ৰতি তিনি নিৱৰ্তিশয় প্ৰসন্ন হইয়া একদিন নিভৃতে কহিলেন, দেখুন শ্ৰীকান্তবাৰু, আপনাৰ বয়স অল্প,—জীবনে যদি উন্নতি লাভ কৰতে চান ত আপনাকে এমন গুটিকয়েক সংপৰামৰ্শ দিতে পাৰি, যাৰ মূল্য লক্ষ টাকা। আমি নিজে যাঁৰ কাছে এই উপদেশ পেয়েছিলাম, তিনি সংসাৱে কিৱৰ উন্নতি লাভ কৰেছিলেন শুনলে হয়ত অবাক হয়ে যাবেন; কিন্তু সত্য। পঞ্চাশটি টাকা মাত্ৰ ত মাহিনা পেতেন; কিন্তু মৱবাৰ সময় বাড়িঘৰ, পুকুৰ-বাগান, জমি-জিৱাত ছাড়া প্ৰায় দুটি হাজাৰ টাকা নগদ রেখে গিয়েছিলেন। বলুন ত, একি সোজা কথা! আপনাৰ বাপ-মাৱেৰ আশীৰ্বাদে আমি নিজেও ত—

কিন্তু নিজেৰ কথাটা এইখানেই চাপিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি মাহিনাপত্ৰ ত মোটাই পান শুনি; কপাল আপনাৰ খুব ভাল—বৰ্মায় এসেই ত এমন কাৱও হয় না; কিন্তু অপব্যয়টা কিৱৰ কৰচেন বলুন দেখি! ভিতৱে ভিতৱে সন্ধান নিয়ে দুঃখে আমাৰ বুক ফেটে যায়। দেখতেই ত পান আমি কোন লোকেৰ কথায় থাকি না; কিন্তু আমাৰ কথা মত, বেশি নয়, দুটো বৎসৰ চলুন দেখি; আমি বলাচ আপনাকে, দেশে ফিরে গিয়ে চাই কি বিবাহ পৰ্যন্ত কৰতে পাৱবেন।

এই সৌভাগ্যেৰ জন্য অন্তৱে আমি এৱৰ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি—এ তথ্য তিনি কি কৱিয়া সংগ্ৰহ কৱিলেন, জানি না; তবে কিনা, তিনি ভিতৱে ভিতৱে

সন্ধান লওয়া ব্যতীত কাহারও কোন কথায় থাকেন না—তাহা নিজেই ব্যক্তি করিয়াছিলেন।

যাই হোক, তাঁহার উন্নতির বীজমন্ত্রস্বরূপ সৎপরামর্শের জন্য লুক্ষ হইয়া উঠিলাম। তিনি কহিলেন, দেখুন, দান-টান করার কথা ছেড়ে দিন—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়—এক কোমর মাটি খুঁড়লেও একটা পয়সা মেলে না। সে কথা বলি না—নিজের মুখে রক্ত-উঠা কঢ়ি—আজকালকার দুনিয়ায় এমন পাগল আর কেই বা আছে! নিজের ছেলেপুলে, পরিবারের জন্য রেখেথুয়ে তবে ত?—সে কথা ছেড়েই দিন, তা নয়; কিন্তু দেখুন,— যার সংসারে দেখবেন টানাটানি, কদাচ তেমন লোককে আমল দেবেন না।

বেশি নয়, দু-চার দিন আসা-যাওয়া করেই নিজে হতেই নিজের সংসারের কষ্টের কথা তুলে দুটাকা চেয়ে বসবে। দিলে ত গেলই, তা ছাড়া বাইরের ঝগড়া ঘরে টেনে আনা। দু-দুটাকার মায়া কিছু আর সত্যই কেউ ছাড়তে পারে না— তাগাদা করতেই হয়। তখন হাঁটাহাঁটি ঝগড়াবাঁটি,—কেন, আমার তাতে আবশ্যিক কি, বলুন দেখি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সত্যই ত!

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, আপনি ভদ্রসন্তান, তাই কথাটা চট করে বুঝলেন; কিন্তু এই ছোটলোক লোহা-কাটা ব্যাটাদের বুঝাও দেখি! হারামজাদা ব্যাটারা সাতজন্মেও বুঝবে না। ব্যাটাদের নিজের এক পয়সা নাই, তবু পরের কাছে কর্জ ক'রে আর একজনকে টাকা এনে দেবে—এই ছোটলোক ব্যাটারা এমনি আহাম্মুক!

একটু চুপ করিয়া কহিলেন, তবেই দেখুন, কদাচ কাকেও টাকা ধার দিতে নাই। বলে, বড় কষ্ট! কষ্ট তা আমার কি বাপু! আর যদি সত্যই কষ্ট ত দু ভরি সোনা এনে রেখে যাও না, দিচ্ছি দশ টাকা ধার! কি বলেন?

বলিলাম, ঠিক ত!

তিনি বললেন, ঠিক নয় আবার! একশ বার ঠিক! আর দেখুন ঝগড়া-বিবাদের স্থানে কখনো যাবেন না। একজন খুন হয়ে গেলেও না। প্রয়োজন কি আমার? ছাড়াতে গেলেও হয়ত দু-এক ঘা নিজের গায়েই লাগবে; তা ছাড়া একপক্ষ সাক্ষী মেনে বসবে। তখন কর ছুটাছুটি আদালতে। বরঞ্চ থেমে গেলে ইচ্ছা হয় একবার ঘুরে এসে দুটো ভালমন্দ পরামর্শ দাও, পাঁচজনের কাছে নাম হবে। কি বলেন?

একটু চুপ করিয়া তিনি পুনশ কহিলেন, আর এই লোকের ব্যামো-স্যামোয়—আমি ত মশাই, পাড়া মাড়াই না; তখনি ব'লে বসবে, দাদা মরি—এ বিপদে দুটাকা দিয়ে সাহায্য কর। মশাই, মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না—তাকে টাকা দেওয়া আর জলে ফেলে দেওয়া এক—বরঞ্চ জলে দেওয়াও ভাল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে না। নাহয় ত বলবে, এসো রাত্রি জাগতে। আচ্ছা মশাই, আমি যাবো তার অসুখে রাত্রি জাগতে, কিন্তু এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আমার কিছু—একটা—মা-শীতলা না করুন, এই নাক-কান মলচি মা! বলিয়া জিভ কাটিয়া তিনি নাকে একবার হাত ঠেকাইয়া নিজের হাতে নিজের দুই কান মলিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমরা সবাই তাঁর চরণেই ত পড়ে আছি—কিন্তু বলুন দেখি, সে বিপদে আমায় দেখে কে?

এবার আমি আর সায় দিতেও পারিলাম না। আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি মনে মনে বোধ করি একটু দ্বিধায় পড়িয়া বলিলেন, দেখুন দেখি সাহেবদের! তারা কখনো ওরূপ স্থানে যায় কি? কখনো না। নিজের একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে বস! হয়ে গেল। তাই তাদের উন্নতিটা একবার চেয়ে দেখুন দেখি! তার পরে ভাল হলে আবার যেমন মেলামেশা, সব তেমনি। মশাই, কারূর ঝাঁঝাটের মধ্যে কখনো যেতে নাই।

অফিসের বেলা হইয়াছে বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এই প্রাজ্ঞের সাধু-পরামর্শের বলে এতটা বয়সে যে খুব বেশি মানসিক উন্নতি হওয়া আমার

সম্ভবপর, তাহা নহে। এমন কি মনের মধ্যে খুব বেশি আন্দোলনও উঠিল না। কারণ, এরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অভাব পল্লীগ্রামেও অনুভব করি নাই; এবং অপরাপর দুর্নাম তাঁহাদের যতই থাকুক, পরামর্শ দিতে কাপর্ণ্য করেন, এ অপবাদও শুনি নাই; এবং এ পরামর্শ যে সুপরামর্শ তা সামাজিক জীবনে তত না হোক, পারিবারিক জীবনে, জীবনযাত্রার কার্যে যে অবিসংবাদী সাধু উপায়, তাহা দেশের লোক মানিয়া লইয়াছে। বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের কোন ছেলে যদি অক্ষরে অক্ষরে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলে তাহাতে বাপ-মা অসন্তুষ্ট হন—বাঙালী পিতামাতার বিরুদ্ধে এত বড় মিথ্যা বদনাম রটনা করিতে পুলিশের সি. আই. ডি.-র লোকেরও বোধ করি বিবেকে বাধে। সে যাই হোক, কিন্তু এই প্রান্ততার ভিতরে যে কত বড় অপরাধ ছিল, সপ্তাহ-দুই গত না হইতেই, ভগবান ইঁহারই সাহায্যে আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিলেন!

সেই অবধি অভয়ার বাড়ির দিকে আর যাই নাই। তাহার সমস্ত অবস্থার সহিত তাহার কথাগুলি মিলাইয়া লইয়া আগাগোড়া জিনিসটা জ্ঞানের দ্বারা একরকম করিয়া দেখিতে পারিতাম—সে কথা সত্য। তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নিভীক সততা, তাহাদের পরস্পরের অপরূপ ও অসাধারণ মেহ আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে নিরস্তর আকর্ষণ করিত, ইহাও ঠিক; কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাঢ়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অনন্দাদিদি এ কাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়াও বরঞ্চ তাঁর বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্তেও—যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই—তাঁহার সহিত ঘর করিতে রাজি হইতেন না।

আমি জানিতাম, তিনি ভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্তব্যের যে

জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন,—সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির মীমাংসার কাছে  
একেবারে ছেলেখেলা?

অভয়ার একটা কথা হঠাতে মনে পড়িল। তখন ভাল করিয়া সেটা তলাইয়া  
বুঝিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন সে কহিয়াছিল, শ্রীকান্তবাবু, দুঃখ-ভোগ  
করার মধ্যে একটা মারাত্মক মোহ আছে। মানুষ বহ্যগের জীবনবাত্রায় এটা  
দেখিয়াছে যে, কোন বড় ফলই বড় রকম দুঃখ-ভোগ ছাড়া পাওয়া যায় না। তার  
জন্মজন্মান্তরের অভিজ্ঞতা আজ এই ভ্রমটাকে একেবারে সত্য বলিয়া জানিয়াছে  
যে, জীবনের মানদণ্ডে একদিকে যত বেশি দুঃখের ভার চাপানো যায়, আর-  
একদিকে তত বড় সুখের বোৰা গাদা হইয়া উঠিতে থাকে। তাই ত মানুষ যখন  
সংসারে সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটুকু স্বেচ্ছায় বর্জন করিয়া, তপস্যা করিতেছে  
মনে করিয়া নিরাহারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যে তাহার জন্য কোথাও না কোথাও  
চতুর্গুণ আহার্য সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—এ বিষয়ে না তাহার নিজের, না আর  
কাহারও মনে তিলার্ধ সংশয় উপ্পিত হয়। এই জন্যই সন্ন্যাসী যখন নিদারণ শীতে  
আকর্ষণ জলমগ্ন হইয়া, এবং ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া  
মাটিতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহার দুঃখ-ভোগের  
কঠোরতা দেখিয়া দর্শকের দল শুধু যে দুঃখই ভোগ করে না, তাহা নয়, একেবারে  
মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার ভবিষ্যৎ আরামের অসম্ভব বৃহৎ হিসাব খতাইয়া প্রলুক্ত  
চিন্ত তাহাদের ঈর্ষাকুল হইয়া উঠে; এবং ওই পা-উঁচু ব্যক্তিটাই যে সংসারে ধন্য,  
এবং নরদেহ ধারণ করিয়া সেই যে সত্যকার কাজ করিতেছে, এবং তাহারা  
কিছুই করিতেছে না, বৃথায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে,—এই বলিয়া নিজেদের  
সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে মন খারাপ করিয়া বাঢ়ি যায়। শ্রীকান্তবাবু, সুখের জন্য  
দুঃখ স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উল্টাইয়া লইয়া  
যেমন করিয়া হোক কতকগুলা দুঃখ-ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিয়া স্ফন্দে  
ভর করে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইহকালেও সত্য নয়, পরকালেও সত্য নয়।

আমি বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য—

অভয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বিধবার আচরণ বলুন,—তার  
সঙ্গে ব্রহ্মের বিন্দুবিসর্গ সম্ভব নাই।

বিধবার চালচলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায়, তাহা আমি মানি না। বস্তুতঃ  
ওটা ত কিছুই নয়। কুমারী-সধবা-বিধবা—যে-কেহ তাহার নিজের নিজের পথে  
ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। বিধবার চালচলনটাই সেজন্য একচেটে করিয়া রাখা হয়  
নাই।

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, বেশ, না হয় ত নাই। তাদের আচরণটাকে  
ব্রহ্মচর্য না হয় নাই বলিলেন। নামে কি আসে যায়?

অভয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিল, নামই ত সব শ্রীকান্তবাবু। কথা ছাড়া আর  
দুনিয়ায় আছে কি? ভুল নামের ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধির, চিন্তার, জ্ঞানের ধারা  
যে কত বড় ভুলের মধ্যে চালনা করা যায়, সে কি আপনি জানেন না? ওই নামের  
ভুলেই ত সকল দেশে সকল যুগে বিধবার চালচলনটাকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে  
ভেবে এসেছে। ইহাই নির্থক ত্যাগের নিষ্ফল মহিমা শ্রীকান্তবাবু—একেবারে ব্যর্থ,  
একেবারে ভুল। মানুষকে ইহ-পরকালে পও ক'রে দেবার এত বড় ছায়াবাজি  
আর নাই।

তখন আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। বস্তুত, তর্ক করিয়া  
পরাস্ত করা তাহাকে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। প্রথম যখন জাহাজে পরিচয় হয়,  
তখন ডাঙ্গারবাবু শুধু তাহার বাহিরটাই দেখিয়া তামাশা করিয়া বলিয়াছিলেন,  
মেয়েটি ভারি forward; কিন্তু, তখন দুজনের কেহই ভাবি নাই—এই forward  
কথাটার অর্থ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে! এই মেয়েটি যে তাহার সমস্ত  
অন্তরটাকে পর্যন্ত কিরণ অরুণিত তেজে বাহিরে টানিয়া আনিয়া সমস্ত পৃথিবীর  
সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে পারে, লোকের মতামত গ্রাহ্যও করে না—তখন তাহার  
ধারণাও আমাদের ছিল না। অভয়া ত শুধু তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ

করিবার জন্যই কথা-কাটাকাটি করিত না—সে তাহার নিজের কাজটাকে সবলে জয়ী করিবার জন্যই যেন যুদ্ধ করিত। তাহার মত একরকম—কাজ আর-একরকম ছিল না বলিয়াই বোধ করি অনেক সময়ে তাহার মুখের উপর জবাব খুঁজিয়া পাইতাম না—কেমন একরকম থতমত খাইয়া যাইতাম; অথচ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, এই ত বেশ উত্তর ছিল! যাই হোক, তাহার সম্বন্ধে আজও যে আমার মনের দ্বিধা ঘুচে নাই, একথা ঠিক। যতই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতাম—এ ছাড়া অভয়ার আর কি গতি ছিল,—ততই মন যেন তাহারই বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত।

যতই নিজেকে বলিতাম, তাহাকে অশুদ্ধা করিবার লেশমাত্র অধিকার আমার নাই,—ততই যেন অব্যক্ত বিত্তঘায় অন্তর ভরিয়া উঠিত। আমার মনে পড়ে, এমনি একটা কৃষ্ণিত অপ্রসন্ন মন লইয়াই আমার দিন কাটিতে ছিল বলিয়া, না পারিতাম তাহার কাছে যাইতে, না পারিতাম তাহাকে একেবারে দূরে ফেলিয়া দিতে।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন শহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল। হায় রে! তাহাকে সমুদ্রপারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ-কোটি যন্ত্র-তন্ত্র, কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতম সতর্কতা—সমস্তই একমুহূর্তে একেবারে ধূলিসাং হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। অথচ শহরের চৌদ্দ আনা লোকই হয় চাকুরিজীবী, নাহয় বাণিজ্যজীবী। একেবারে দূরে পলাইবারও জো নাই—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁচোবাজি ছুঁড়িয়া দিল। ভয়ে এ-পাড়ার মানুষগুলো স্বী-পুত্রের হাত ধরিয়া পোঁটলা-পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া ও-পাড়ায় ছুটিয়া পালায়, আর ও-পাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই-সব লইয়া এ-পাড়ায় ছুটিয়া আসে। ‘ইঁদুর’ বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্বেই লোকে ছুটিতে শুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলো যেন সব গাছের ফলের মত

পেঁগের আবহাওয়ায় এক রাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে,—কাহার যে  
কখন টুপ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

সে দিনটা ছিল শনিবার। কি-একটা সামান্য কাজের জন্য সকালে বাহির  
হইয়াছি। শহরের মধ্যে একটা গলির ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে দ্রুতপদে  
চলিয়াছি, দেখি অত্যন্ত জীর্ণ পুরাতন একটা বাটীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া  
ডাকাডাকি করিতেছেন প্রাঞ্জ মনোহর চক্ৰবৰ্তী।

হাত নাড়িয়া বলিলাম, সময় নাই।

তিনি একান্ত অনুনয়ের সহিত কহিলেন, দু-মিনিটের জন্য একবার উপরে  
আসুন শ্রীকান্তবাবু, আমার বড় বিপদ।

কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপরে উঠিতে হইল। আমি তাই ত মাঝে  
মাঝে ভাবি, মানুষের প্রত্যেক চলাফেরাটি পর্যন্ত কি একেবারে ঠিক করা! নইলে,  
আমার কাজও গুরুতর ছিল না, এ গলিটার মধ্যেও আর কখনো প্রবেশ করি  
নাই। আজ সকালেই বা এখানে আসিয়া হাজির হইলাম কেন?

কাছে গিয়া বলিলাম, অনেক দিন ত আমাদের ওদিকে যাননি—আপনি  
কি এই বাড়িতে থাকেন?

তিনি বলিলেন, না মশাই, আমি দিন বারো-তেরো এসেচি। একে ত  
মাসখানেক থেকে ডিসেন্ট্রিতে ভুগচি, তার ওপর আমাদের পাড়ায় হ'ল প্লেগ। কি  
করি মশাই, উঠতে পারিনে, তবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বলিলাম, বেশ করেচেন!

তিনি বলিলেন, বেশ করলে কি হবে মশাই—আমার combined hand  
ব্যাটা ভয়ানক বজ্জাত। বলে কিনা চলে যাবো। দিন দেখি ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে  
ধরকে।

একটু আশ্চর্য হইলাম। কিন্তু তাহার পূর্বে এই combined hand বস্তুটার  
একটু ব্যাখ্যা আবশ্যিক। কারণ যাঁহাদের জানা নাই যে, পয়সার জন্য হিন্দুস্থানী

জাতটা পারে না এমন কাজই সংসারে নাই, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ইংরাজি কথাটার মানে হইতেছে দুবে, চৌবে, তেওয়ারী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের দল। এখানে যাহারা চৌকার ধারে গেলেও লাফাইয়া উঠে, তাহারাই সেখানে রসুই করে, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজে, তামাক সাজে এবং বাবুদের অফিসে যাইবার সময় জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তা বাবুরা যে জাতই হোক। অবশ্য দুটাকা বেশি মাহিনা দিয়া তবেই ত্রিবেদী-চতুর্বেদী প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে চাকর ও বামুনের function একত্রে combined করিতে হয়। মূর্খ উড়িয়া বা বাঙালী বামুনদের আজিও একাজে রাজি করা যায় নাই, গিয়াছে শুধু ওই উহাদেরই। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, পয়সা পাইলে কুসংস্কার বর্জন করিতে হিন্দুস্থানীর একমুহূর্ত বিলম্ব হয় না। (মুরগি রাঁধাইতে আরও চার আনা, আট আনা মাসে অতিরিক্ত দিতে হয়। কারণ, মূল্যের দ্বারাই সমস্ত পরিশুল্ক হয়, শাস্ত্রের এই বচনার্থের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং এই শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত আস্থা রাখিতে আজ পর্যন্ত যদি কেহ পারিয়া থাকে, ত এই হিন্দুস্থানীরা—এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।)

কিন্তু মনোহরবাবুর combined hand-কে আমি কেন ধরক দিতে যাইব, আর সেই বা কি জন্য আমার ধরক শুনিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। এই হ্যান্ডি মনোহরবাবুর নৃতন। এতকাল তিনি নিজের combined hand নিজেই ছিলেন—শুধু ডিসেন্ট্রির খাতিরে অল্পদিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনোহরবাবু বলিতে লাগিলেন, মশাই আপনি কি সহজ লোক! শহরসুন্দ লোক আপনার কথায় মরে বাঁচে, তা কি আর জানিনে ভাবচেন! বেশি নয়, একটি ছত্র যদি লাটসাহেবকে লিখে দেন ত ওর চৌদ্দ বচ্চর জেল হয়ে যাবে, সে কি আমি শুনিনি? দিন ত ব্যাটাকে বেশ করে শাসিত করে।

কথা শুনিয়া আমি যেন দিশেহারা হইয়া গেলাম। যে লাটসাহেবের নামটা পর্যন্ত শুনি নাই—তাঁহাকে, বেশি নয়, মাত্র একটা ছত্র চিঠি লিখিলেই, একটা

লোকের চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের সন্তান,—আমার এত বড় অদ্ভুত শক্তির কথা এত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া কি যে বলিব, আর কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তথাপি তাঁহার বারংবার অনুযোগ ও পীড়াপীড়িতে অগত্যা সেই হতভাগ্য combined hand-কে শাসন করিতে রান্নাঘরে তুকিয়া দেখি, সে একটা অন্ধকৃপের ন্যায় অন্ধকার।

সে আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রভুর মুখে আমার ক্ষমতার বহর শুনিয়া এখন কাঁদ-কাঁদ হইয়া হাতজোড় করিয়া জানাইল যে, এ বাড়িতে ‘দেও’ আছে, এখানে সে কোনমতেই থাকিতে পারিবে না। কহিল, নানা প্রকারের ‘ছায়া’ রাত্রিদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাবু যদি আর কোন বাড়িতে যান, ত সে অন্যায়ে চাকরি করিতে পারে, কিন্তু এ বাড়িতে—

যে অন্ধকার ঘর তা ‘ছায়া’র আর অপরাধ কি! কিন্তু ছায়ার জন্য নয়, একটা বিশ্বী পচা গন্ধ তুকিয়া পর্যন্তই আমার নাকে লাগিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দুর্গন্ধ কিসের রে?

Combined hand কহিল, কোই চুহা-উহা সড়ল হোগা।

চমকাইয়া উঠিলাম।—চুহা কি রে? এ ঘরে মরে নাকি?

সে হাতটা উল্টাইয়া তাচ্ছিল্যভরে জানাইল যে, প্রত্যহ সকালে অত্ততঃ পাঁচ-ছয়টা করিয়া মরা ইঁদুর সে বাহিরের গলিতে ফেলিয়া দেয়।

কেরোসিনের ডিবা জুলাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পাঁচ ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তবুও আমার গা-টা ছম্ছম্ করিতে লাগিল। এবং কিছুতেই মন খুলিয়া লোকটাকে সদুপদেশ দিতে পারিলাম না যে, পীড়িত বাবুকে একা ফেলিয়া পালান তাহার উচিত নয়।

শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মনোহরবাবু খাটের উপর বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে পাশে বসাইয়া তিনি এ বাড়ির গুণের কথা বলিতে লাগিলেন—এমন অল্প ভাড়ায় শহরের মধ্যে এত ভাল বাড়ি আর নাই;

এমন ভদ্র বাড়িওয়ালাও আর নাই, এবং একুপ প্রতিবেশীও সহজে মিলে না।  
পাশের ঘরে যে চার-পাঁচজন মাদ্রাজী খিস্টান মেস করিয়া বাস করে, তাহারা  
যেমন শিষ্টশান্ত তেমনি অমায়িক। একটু ভাল হইলেই এই বামুন-ব্যাটাকে  
তাড়াইয়া দিবেন, তাহাও জানাইলেন। হঠাৎ বলিলেন, আচ্ছা মশাই, আপনি স্বপ্ন  
বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, না।

তিনি বলিলেন, আমিও না; কিন্তু কি আশ্চর্য মশাই, কাল রাত্রে স্বপ্ন  
দেখলাম, আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। আর জেগে উঠেই দেখি ডান পায়ের  
কুঁচকি ফুলে উঠেচে। সত্যি-মিথ্যে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন না মশাই,  
তাড়সে জ্বর পর্যন্ত হয়েছে।

শুনিয়াই আমার মুখ কালি হইয়া গেল। তার পরে কুঁচকিও দেখিলাম,  
গায়ে হাত দিয়া জ্বরও দেখিলাম।

মিনিটখানেক আচ্ছমের মত বসিয়া থাকিয়া, শেষে বলিলাম, ডাক্তার  
ডাকতে পাঠান নি কেন, শীত্ব পাঠান।

তিনি কহিলেন, মশাই, যে দেশ—এখানে ডাক্তারের ফি ত কম নয়।  
আনলেই ত চার-পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। তা ছাড়া আবার ওষুধ! সেও ধরুন  
প্রায় দু'টাকার ধাক্কা।

বলিলাম, তা হোক, ডাকতে পাঠান।

কে যাবে মশাই? তেওয়ারী বেটা ত চেনেই না। তা ছাড়া ও গেলে  
রাঁধবেই বা কে?

আচ্ছা আমিই যাচ্ছি,—বলিয়া ডাক্তার ডাকিতে নিজেই বাহির হইয়া  
গোলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, ইনি  
আপনার কে?

বলিলাম, কেউ নয়। এবং কি করিয়া আজ সকালে আসিয়া পড়িয়াছি,  
তাহাও খুলিয়া বলিলাম।

ডাঙ্গার প্রশ্ন করিলেন, এঁর কোন আঘাত এখানে আছে?

বলিলাম, জানি না। বোধ হয় কেউ নেই।

ডাঙ্গার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে  
যাচ্ছি। মাথায় বরফ দেওয়াও দরকার; কিন্তু সবচেয়ে দরকার এঁকে প্লেগ  
হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। আপনি থাকবেন না এ ঘরে—আর দেখুন, আমাকে  
ফিস্ দেবার দরকার নেই।

ডাঙ্গার চলিয়া গেলে, আমি বহু সঙ্কোচের পর হাসপাতালের প্রস্তাব  
করিতেই মনোহর কাঁদিতে লাগিলেন। সেখানে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলে, সেখানে  
গেলে কেউ কখনো ফিরে না—এমনি কত কি!

ওষুধ আনিতে পাঠাইবার জন্য তেওয়ারীর সন্ধান করিয়া দেখি,  
combined hand তাহার লোটা-কম্বল লইয়া ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে প্রস্তাব  
করিয়াছে। সে বোধ করি, ডাঙ্গারের সহিত আমার আলোচনা দ্বারের অন্তরাল  
হইতে শুনিতেছিল। হিন্দুস্থানী আর কিছু না বুবুক, ‘পিলেগ’ কথাটা ভারী বুঝে।

তখন আমাকে যাইতে হইল ওষুধ আনিতে। বরফ, আইস-ব্যাগ প্রভৃতি  
যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই কিনিয়া আনিয়া হাজির করিলাম। তাহার পরে  
রাহিলাম, আমি আর তিনি—তিনি আর আমি। একবার আমি দিই তাহার মাথায়  
আইস-ব্যাগ তুলিয়া—একবার সে দেয় আমার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া।  
এইভাবে ধন্তাধন্তি করিয়া বেলা দুটা বাজিয়া গেলে, তবে সে নিস্তেজ হইয়া শয়্যা  
গ্রহণ করিল। মাঝে মাঝে তাহার চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়, আবার মাঝে মাঝে  
সে বেশ জ্ঞানের কথাও বলে। অপরাহ্নের কাছাকাছি সে ক্ষণেকের জন্য  
সচেতনভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আমি আর বাঁচব  
না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন সে বহু চেষ্টায় কোমর হইতে চাবি লইয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, আমার তোরঙ্গের মধ্যে তিন শ গিনি আছে— স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা আমার বাক্স খুঁজলেই পাবেন।

আমার একটা সাহস ছিল, পাশের ‘মেস’টা। তাদের সাড়া-শব্দ, চাপা কর্ষস্বর প্রায়ই শুনিতে পাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর একবার তাহাদের একটু বেশি রকম নড়াচড়ার গোলমাল আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল; কিছুক্ষণ পরেই যেন মনে হইল, তাহারা দরজার তালা বন্ধ করিয়া কোথায় যাইতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তাই বটে—সত্যই দ্বারে তালা ঝুলিতেছে। ঝুঁঝিলাম, তাহারা বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তরুণ কেমন মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

এদিকে আমার ঘরের লোকটি উত্তরোত্তর যে-সকল কাণ্ড করিতে লাগিলেন, সে সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি, তাহা রাত্রে একাকী বসিয়া উপভোগ করিবার মত বস্ত নয়। ওদিকে রাত্রি বারটা বাজিতে চলিল, কিন্তু পাশের ঘর খোলার সাড়াও পাই না, শব্দও পাই না। মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া দেখি, তালা তেমনি ঝুলিতেছে। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল যে, কাঠের দেয়ালের একটা ফুটা দিয়া ও-ঘরের তীব্র আলো এ-ঘরে আসিতেছে; কৌতুহলবশে সেই ছিদ্রপথে চোখ দিয়া তীব্র আলোকের যে হেতুটা দেখিলাম, তাহাতে সর্বাঙ্গের রক্ত হিম হইয়া গেল। সুমুখের খাটের উপর দুইজন যুবা পাশাপাশি বালিশে মাথা দিয়া নিন্দা দিতেছে, আর শিয়রে খাটের বাজুর উপর একসার মোমবাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি পূর্বেই জানিতাম, রোমান ক্যাথোলিকরা মৃত্রের শিয়রে আলো জ্বলিয়া দেয়।

সুতরাং এ দুজনের ঘূম যে হাজার ডাকাডাকিতেও আর ভাসিবে না, এবং এমন হষ্টপুষ্ট সবলকায় লোক দুটির এত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িবার হেতুটা যে কি, সমস্তই একমুহূর্তে ঝুঁঝিতে পারিলাম।

এ ঘরেও আমাদের মনোহরবাবু প্রায় আরও ঘণ্টা-দুই ছটফট করিয়া তবে ঘুমাইলেন। যাক, বাঁচা গেল!

কিন্তু তামাশাটা এই যে, যিনি জানাশুনা লোকের পীড়ার সংবাদে পাড়া মাড়াইতে নাই বলিয়া আমাকে সেদিন বহু উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারই মৃতদেহটা এবং গিনি-পোরা বাক্সটা পাহারা দিবার জন্য ভগবান আমাকেই নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তা যেন দিলেন, কিন্তু বাকি রাত্রিটুকু আমার যেভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার সাধ্যও নাই, প্রবৃত্তিও হয় না। তবে মোটের উপর যে ভাল কাটে নাই, একথা বোধ করি, কোন পাঠকই অবিশ্বাস করিবেন না।

পরদিন death certificate লইতে, পুলিশ ডাকিতে, টেলিগ্রাফ করিতে, গিনির সুব্যবস্থা করিতে এবং মড়া বিদায় করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। যাক, মনোহর ত ঠেলাগাড়ি চড়িয়া বোধ করি বা স্বর্গেই রওনা হইয়া পড়িলেন,—আমিও বাসায় ফিরিলাম। আগের দিন একাদশী করিয়াছি—আজও অপরাহ্ন। বাসায় ফিরিয়া মনে হইল, আমার ডান কানের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে, এবং ব্যথা করিতেছে। কি জানি, সমস্ত রাত্রি নিজেই টিপিয়া টিপিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিলাম, কিংবা সত্যই গিনির হিসাব দিতে স্বর্গে যাইতে হইবে—হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু এটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পরে যাই হোক, সম্প্রতি জ্ঞান থাকিতে থাকিতে নিজের বিলিব্যবস্থাটা নিজেই করিয়া ফেলিতে হইবে। যেহেতু মনোহরের ন্যায় আইস-ব্যাগ লইয়া টানাটানি করাটা সঙ্গত নয়, শোভনও নয়। স্থির করিতে দেরি হইল না। কারণ, চক্ষের পলকে দেখিতে পাইলাম, এতবড় বিশ্রী ব্যামোর ভার কোন পুণ্যাত্মা সাধুলোকের উপর নিষ্কেপ করিতে গেলে নিশ্চয়ই আমার গুরুতর পাপ হইবে। ভাল লোককে বিরুত করা কর্তব্য নহে,—অশাস্ত্রীয়। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই। বরঞ্চ সেই যে রেঙ্গুনের আর এক প্রান্তে অভয়া বলিয়া একটা মহা পাপিষ্ঠা পতিতা নারী আছে,—এতদিন

যাহাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি,—তাহারই কাঁধের উপর এই মারাত্মক পীড়ার  
বিশ্রী বোঝাটা ঘৃণাভরে নামাইয়া দিয়া আসি গে, মরিতে হয় সে মরুক। হয়ত  
তাহাতে কিছু পুণ্যসঞ্চয়ও হইয়া যাইতে পারে। এই বলিয়া চাকরকে গাড়ি  
আনিতে হৃকুম করিয়া দিলাম।

## বার

সেদিন যখন মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে লইয়া অভয়ার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন মরণের চেয়ে মরার লজ্জাই আমাকে বেশি ভয় দেখাইয়াছিল।

অভয়ার মুখ পাঞ্চুর হইয়া গেল; কিন্তু সেই পাংশু ওষ্ঠাধর ফুটিয়া শুধু এই কটি কথা বাহির হইল—তোমার দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশি? দুই চক্ষু আমার জলে ভাসিয়া গেল; তবুও বলিলাম, আমি ত চললুম। পথের কষ্ট আমাকে নিতেই হবে, সে নিবারণ করবার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু যাবার মুখে তোমাদের এই নৃতন ঘর-সংসারের মধ্যে এতবড় একটা বিপদ ঢেলে দিয়ে যেতে আর আমার কিছুতেই মন সরচে না অভয়া। এখনও গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েচে, এখনও জ্ঞান আছে—এখন ভদ্রভাবে প্লেগ হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারি। তুমি শুধু একটি মুহূর্তের জন্য মনটা শক্ত করে বল, আচ্ছা যাও।

অভয়া কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া এইবার নিজের চোখ মুছিল। আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিল, তোমাকে যাও বলতে যদি পারতুম তা হলে নৃতন করে ঘর-সংসার পাততে যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকারের সংসার হ'ল।

কিন্তু খুব সন্তুষ্ট, সে আমার প্লেগ নয়। তাই মরণ আমাকে শুধু একটু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল। দিন-দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু অভয়া আমাকে আর হোটেলে ফিরিতে দিল না।

অফিসে যাইব, কি আরও কিছুদিনের ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একদিন অফিসের পিয়ন আসিয়া চির্টি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম, পিয়ারীর চির্টি। বর্মায় আসার পরে এই তাহার পত্র; আমাকে জবাব না দিলেও, আমি কখনো কখনো তাহাকে চির্টি লিখিতাম। আসিবার সময় এই শর্তই সে আমাকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল। পত্রের প্রথমে সে ইহারই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে, আমি মরিলে তুমি খবর পাইবে। বাঁচিয়া থাকার মধ্যে আমার এমন সংবাদই থাকিতে পারে না যাহা তোমার না জানিলেই নয়, কিন্তু আমার ত তা নয়! আমার সমস্ত প্রাণটা যে ঐ বিদেশেই সারাদিন পড়িয়া থাকে, সে কথা এত বড় সত্য যে, তুমি ও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পার নাই। তাই জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে চির্টি দিয়া তোমাকে বলিতে হয়, যে, তুমি ভাল আছো।

আমি এই মাসের মধ্যেই বঙ্গুর বিবাহ দিতে চাই। তুমি মত দাও। পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জনিলে যে বিবাহ হওয়া উচিত নয়, তোমার এ কথা আমি অস্বীকার করি না। বঙ্গুর সে ক্ষমতা হয় নাই, তথাপি কেন যে তোমার সম্মতি চাহিতেছি, সে আমাকে আর একবার চোখে না দেখিলে তুমি বুঝিবে না। যেমন করিয়া পারো এসো, আমার মাথার দিবি রাখিল।

পত্রের শেষের দিকে অভয়ার কথা ছিল। অভয়া যখন ফিরিয়া আসিয়া কহিয়াছিল, সে যাহাকে ভালবাসে, তাহারই ঘর করিতে একটা পশুকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং এই লইয়াই সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে স্পর্ধার সহিত তর্ক করিয়াছিল, সেদিন আমি এমনই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, পিয়ারীকে অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ তাহারই প্রত্যুত্তরে সে লিখিয়াছে, তোমার মুখে যদি তিনি আমার নাম শুনিয়া থাকেন ত, আমার অনুরোধ একবার দেখা করিয়া বলিও যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহস্র কোটি নমস্কার জানাইয়াছে। তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড় জানি না, জানার আবশ্যকও নাই; তিনি সুন্দরমাত্র তাঁর তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য। আজ আমার

গুরুদেবের শ্রীমুখের কথাগুলি বার বার মনে পড়িতেছে। আমার কাশীর বাড়িতে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হইয়া গেছে, গুরুদেব আসন গ্রহণ করিয়া স্তন্ধ হইয়া কি ভাবিতেছেন, আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ভয়ে আমার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিয়া উঠিল। তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলাম, বাবা, আমি মন্ত্র নেব না। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মাথার উপর তাঁর ডান হাতটি রাখিয়া বলিলেন, কেন মা নেবে না? বলিলাম, আমি মহাপাপিষ্ঠ। তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, তা হলে ত আরও বেশি দরকার মা।

কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, আমি লজ্জায় আমার সত্য পরিচয় দিইনি, দিলে এ বাড়ির যে চৌকাঠও আপনি মাড়াতে চাইতেন না। গুরুদেব স্মিতমুখে বলিলেন, তবুও মাড়াতুম, তবুও দীক্ষা দিতুম। পিয়ারীর বাড়ি না হয় নাই মাড়ালুম; কিন্তু আমার রাজলক্ষ্মী মায়ের বাড়িতে কেন আসবো না মা?

আমি চমকিয়া স্তন্ধ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলাম, কিন্তু আমার মায়ের গুরু যে বলেছিলেন, আমাকে দীক্ষা দিলে পতিত হতে হবে! সে কথা কি সত্য নয়? গুরুদেব হাসিলেন। বলিলেন, সত্য বলেই ত তিনি দিতে পারেন নি মা। কিন্তু সে ভয় ঘার নাই, সে কেন দেবে না? বলিলাম, ভয় নেই কেন?

তিনি পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, একবাড়ির মধ্যে যে রোগের বীজ একজনকে মেরে ফেলে, আর-একজনকে তা স্পর্শ করে না—কেন বলতে পারো? কহিলাম, স্পর্শ হয়ত করে, কিন্তু যে সবল সে কাটিয়া উঠে, যে দুর্বল সেই মারা যায়।

গুরুদেব আমার মাথার উপর আবার তাঁর হাতটা রাখিয়া বলিলেন, এই কথাটি কোন দিন ভুলো না মা। যে অপরাধ একজনকে ভূমিসাং করে দেয়, সেই অপরাধই আর-একজন হয়ত স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। তাই সমস্ত

বিধিনির্মেধই সকলকে এক দড়িতে বাঁধতে পারে না। সঙ্গেচের সহিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, যা অন্যায়, যা অধর্ম, তা কি সবল-দুর্বল উভয়ের কাছেই সমান অন্যায় অধর্ম নয়? না হলে সে কি অবিচার নয়?

গুরুদেব বলিলেন, না মা, বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, তাদের ফল সমান নয়। তা হলে সংসারে সবলে-দুর্বলে কোন প্রভেদ থাকত না। যে বিষ পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিষ যদি একজন ত্রিশ বছরের লোককে মারতে না পারে, ত কাকে দোষ দেবে মা? কিন্তু আজই যদি আমার কথা বুঝতে না পারো ত অন্ততঃ এটি স্মরণ রেখো যে, যাদের ভিতরে আগুন জ্বলছে, আর যাদের শুধু ছাই জমা হয়ে আছে—তাদের কর্মের ওজন এক তুলাদণ্ডে করা যায় না। গেলেও তা ভুল হয়।

শ্রীকান্তদা, তোমার চিঠি পড়িয়া আজ আমার গুরুদেবের সেই অন্তরের আগুনের কথাই মনে পড়িতেছে। অভয়াকে চক্ষে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে—তাঁর ভিতরে যে বহু জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যেও যেন দেখিতে পাইতেছি। তাঁর কর্মের বিচার একটু সাবধানে করিও। আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাটখারা লইয়া তাঁর পাপ-পুণ্যের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া দিয়া বসিয়ো না।

চিঠিখানা অভয়ার হাতে দিয়া বলিলাম, রাজলক্ষ্মী তোমাকে শত-সহস্র নমস্কার জানাইয়াছে—এই নাও।

অভয়া দুই-তিনবার করিয়া লেখাটুকু পড়িয়া কোনমতে তাহা আমার বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সংসারের চক্ষে তাহার যে নারীত্ব আজি লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাহারই উপরে শতযোজন দূর হইতে যে অপরিচিত নারী আজই অযাচিত সম্মানের পুষ্পাঙ্গলি অর্পণ করিয়াছে, তাহারই অপরিসীম আনন্দ-বেদনাকে সে পুরুষের দৃষ্টি হইতে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া লইয়া গেল।

প্রায় আধগঠ পরে অভয়া বেশ করিয়া চোখমুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়াই  
কহিল, শ্রীকান্তদাদা—

বাধা দিয়া বলিলেন, ও আবার কি! দাদা হলুম কবে?

আজ থেকে।

না, না, দাদা নয়—দাদা নয়। সবাই মিলে সব দিক থেকে আমার রাস্তা  
বঙ্গ ক'রো না।

অভয়া হাসিয়া কহিল, মনে মনে বুঝি এই-সব মতলব আঁটা হচ্ছে?  
কেন, আমি কি মানুষ নই?

অভয়া কহিল, বিষম মানুষ দেখি যে! রোহিণীবাবু বেচারা অসুখের সময়  
আশ্রয় দিলেন, এখন ভাল হ'য়ে বুঝি তার এই পুরস্কার ঠিক করেচ? কিন্তু আমার  
ভারি ভুল হয়ে গেছে। সে সময়ে যদি অসুখ ব'লে একটা টেলিগ্রাম করে দিতুম,  
আজ তা হলে তাঁকে দেখতে পেতুম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, আশ্চর্য নয় বটে।

অভয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তুমি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে  
একবার যাও শ্রীকান্তদাদা। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তাঁর বড় দরকার  
পড়েছে। কেমন করিয়া যেন নিজেও এ কথা বুঝিতেছিলাম, আমাকে আজ তাহার  
বড় প্রয়োজন। পরদিনই অফিসে চিঠি লিখিয়া আরও একমাসের ছুটি লইলাম  
এবং আগামী মেলেই যাত্রা করিবার জন্য টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া দিলাম।

যাবার সময় অভয়া নমস্কার করিয়া কহিল, শ্রীকান্তদাদা, একটা কথা  
দাও।

কি কথা দিদি?

সংসারে সকল সমস্যাই পুরুষমানুষে মীমাংসা করে দিতে পারে না। যদি  
কোথাও ঠেকে, চিঠি লিখে আমার মত নেবে বল?

স্বীকার করিয়া জাহাজঘাটের উদ্দেশে গাড়িতে গিয়া বসিলাম। অভয়া  
গাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আর-একবার নমস্কার করিল; বলিল,  
রোহিণীবাবুকে দিয়ে আমি কালই সেখানে টেলিগ্রাম করে দিয়েচি। কিন্তু জাহাজের  
ওপরে কটা দিন শরীরের দিকে একটু নজর রেখো, শ্রীকান্তদাদা, আর তোমার  
কাছে আমি কিছু চাইনে।

আচ্ছা বলিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিলাম, অভয়ার দুটি চক্ষু জলে ভাসিতেছে।

## তের

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়িল। দেখিলাম, জেটির উপর বক্ষু দাঁড়াইয়া আছে। সে সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মা রাস্তার উপর গাড়িতে অপেক্ষা করচেন। আপনি নেমে যান, আমি জিনিসপত্র নিয়ে পরে যাচ্ছি। বাহিরে আসিতেই আর একটা লোক গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, রতন যে! ভাল ত?

রতন একগাল হাসিয়া কহিল, আপনার আশীর্বাদে। আসুন। বলিয়া পথ দেখাইয়া গাড়ির কাছে আনিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, এসো। রতন, তোরা বাবা আর একটা গাড়ি করে পিছনে আসিস—দুটো বাজে, এখনও ওঁর নাওয়া-খাওয়া হয়নি, আমরা বাসায় চলনুম। গাড়োয়ানকে যেতে বলে দে।

আমি উঠিয়া বসিলাম। রতন যে-আজ্ঞে বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে হাঁকিতে ইঙ্গিত করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া পদধূলি লাইয়া কহিল, জাহাজে কষ্ট হয়নি ত?

না।

বড় অসুখ করেছিল নাকি?

অসুখ করেছিল বটে, বড় নয়। কিন্তু তোমাকে ত ভাল দেখাচ্ছে না! বাড়ি থেকে কবে এলে?

পরশু; অভয়ার কাছে আসবার খবর পেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেই আসতেই ত হ'তো—দুদিন আগেই এলুম। এখানে তোমার কত কাজ আছে জানো?

কহিলাম, কাজের কথা পরে শুনবো। কিন্তু তোমাকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছিল?

রাজলক্ষ্মী হাসিল, এই হাসি যে কতদিন দেখি নাই, তাহা এই হাসিটি দেখিয়াই শুধু আজ মনে পড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কতবড় যে একটা অদম্য স্পৃহা নিঃশব্দে দমন করিয়া ফেলিলাম, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ জানিল না। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা তাহাকে লুকাইতে পারিলাম না। সে বিস্মিতের মত ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দেখাচ্ছে আমাকে, রোগা?

সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। রোগা? হাঁ রোগা একটু বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। মনে হইল সে যেন কত দেশ-দেশান্তর পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ-পর্যটন করিয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিল—এমনি ক্লান্ত, এমনি পরিশ্রান্ত! নিজের ভার নিজে বহিবার তাহার আর শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। এখন কেবল নিশ্চিন্ত নির্ভর্যে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার একটু জায়গা অঙ্গেষণ করিতেছে। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, কৈ বললে না যে?

কহিলাম, নাই শুনলে!

রাজলক্ষ্মী ছেলেমানুষের মত মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না বল। লোকে যে বলে আমি একেবারে বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছি। সত্যি?

আমি গভীর হইয়া কহিলাম, সত্যি। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি মানুষকে এমনি অপ্রতিভ করে দাও যে—আচ্ছা, বেশ ত! ভালই ত! শ্রী নিয়ে আমার কি-ই বা হবে! তোমার সঙ্গে আমার সুশ্রী-বিশ্রী দেখাদেখি ত সম্পর্ক নয় যে সেজন্যে আমাকে ভেবে মরতে হবে!

আমি বলিলাম, সে ঠিক, ভেবে মরবার কিছুমাত্র হেতু নেই। কারণ, একে ত লোকে ও কথা বলে না, তা ছাড়া বললেও তুমি বিশ্বাস কর না। মনে মনে জানো যে—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি অন্তর্যামী কিনা, তাই সকলের মনের কথা জেনে নিয়েচো! আমি কখনো ও কথা ভাবিনে। তুমি নিজেই সত্যি

করে বল ত, সেই শিকার করতে গিয়ে আমাকে যেমন দেখেছিলে, তেমনি কি এখনো দেখতে আছি নাকি? তার চেয়ে কত কুচ্ছিত হয়ে গেছি।

আমি কহিলাম, না, বরঞ্চ তার চেয়ে ভাল দেখতে হয়েচ।

রাজলক্ষ্মী চক্ষের নিমিষে জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইয়া বোধ করি তাহার হাসিমুখখানি আমার মুঞ্চদৃষ্টি হইতে সরাইয়া লইল, এবং কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রাখিল। অনেকক্ষণ পরে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন মুখের উপর হইতে অপসৃত করিয়া ফিরিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি জ্বর হয়েছিল? ও দেশের আবহাওয়া কি সহ্য হচ্ছে না?

কহিলাম, না হলে ত উপায় নেই। যেমন করে হোক সহ্য করিয়ে নিতেই হবে।

আমি মনে মনে নিশ্চয় জানিতাম, রাজলক্ষ্মী এ কথার কি জবাব দিবে। কারণ, যে দেশের জল-বাতাস আজও আপনার হইয়া উঠে নাই, কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবার আশায় নির্ভর করিয়া সে যে কিছুতেই আমার প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইবে না, বরঞ্চ ঘোর আপত্তি তুলিয়া বাধা দিবে, ইহাই আমার মনে ছিল। কিন্তু সেরূপ হইল না। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সে সত্যি। তা ছাড়া সেখানে আরো ত কত বাঙালী রয়েছেন। তাঁদের যখন সইচে, তখন তোমারই বা সইবে না কেন? কি বল?

আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার এইপ্রকার উদ্বেগহীনতা আমাকে আঘাত করিল। তাই শুধু একটা ইঙ্গিতে সায় দিয়াই নীরব হইয়া রাখিলাম। একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবিতাম, আমার প্লেগের কাহিনীটা কিভাবে রাজলক্ষ্মীর শ্রতিগোচর করিব। সুদূর প্রবাসে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে যখন দিন কাটিতেছিল, তখনকার সহস্রপ্রকার দুঃখের বিবরণ শুনিতে তাহার বুকের ভিতর কি বড় উঠিবে, দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া কিরূপ অশ্রুধারা ছুটিবে, তাহা কত রসে,

কত রঙে ভরিয়া যে দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।  
এখন সেইটাই

আমাকে সবচেয়ে লজ্জায় বিঁধিল। মনে হইল, ছি ছি—ভাগ্যে কেহ  
কাহারো মনের খবর পায় না। নইলে—কিন্তু থাক গে সে কথা। মনে মনে  
বলিলাম, আর যাহাই করি সেই মরণ-বাঁচনের গল্প আর তাহার কাছে করিতে  
যাইব না।

বৌবাজারের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া দেখাইয়া  
কহিল, এই সিঁড়ি—তোমার ঘর তেলায়। একটু শুয়ে পড় গে। আমি যাচ্ছি।  
বলিয়া সে নিজে রাঙ্গাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতে দেখিলাম, এ ঘর আমার জন্যই বটে। পাটনার বাড়ি হইতে  
আমার বইগুলি, আমার গুড়গুড়িটি পর্যন্ত আনিতে পিয়ারী বিস্মৃত হয় নাই।  
একখানি দামী সূর্যাস্তের ছবি আমার বড় ভাল লাগিত। সেখানি সে নিজের ঘর  
হইতে খুলিয়া আমার শোবার ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। সেই ছবিটি পর্যন্ত সে  
কলিকাতায় সঙ্গে আনিয়াছে এবং ঠিক তেমনি করিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিয়াছে।  
আমার লিখিবার সাজসরঞ্জাম, আমার কাপড়, আমার সেই লাল মখমলের  
চটিজুতাটি পর্যন্ত ঠিক তেমনি সংযতে সাজানো রহিয়াছে। একখানি আরামচৌকি  
আমি সর্বদা সেখানে ব্যবহার করিতাম। সেটি বোধ করি আনা সম্ভব হয় নাই,  
তাই নৃতন একখানি সেইভাবে জানালার ধারে পাতা রহিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহার  
উপরে গিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন ভাঁটার নদীতে আবার  
জোয়ারের জলোচ্ছাসের শব্দ মোহনার কাছে শুনা যাইতেছে।

স্নানাহার সারিয়া ক্লান্তিবশতঃ দুপুরবেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম  
ভঙ্গিতে দেখিলাম, পশ্চিমের জানালা দিয়া অপরাহ্ন-রোদ্ব আমার পায়ের কাছে  
আসিয়া পড়িয়াছে এবং পিয়ারী এক হাতে ভর দিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া

পড়িয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া আমার কপালের, কাঁধের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া  
লইতেছে।

কহিল, ঘামে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে। পশ্চিম খোলা—এ ঘরটা ভারি  
গরম। কাল দোতলায় আমার পাশের ঘরে তোমার বিছানা করে দেব। বলিয়া  
আমার বুকের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া পাথাটা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে  
লাগিল। রতন ঘরে তুকিয়া জিঞ্জাসা করিল, মা, বাবুর চা নিয়ে আসব?

হাঁ, নিয়ে আয় আর বক্ষু বাড়ি থাকে ত একবার পাঠিয়ে দিস।

আমি আবার চোখ বুঁজিলাম। খানিক পরেই বাহিরে চটিজুতার আওয়াজ  
পাওয়া গেল। পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কে বক্ষু? একবার এদিকে আয় দিকি।

তাহার পায়ের শব্দে বুঁজিলাম, সে অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে ঘরে প্রবেশ  
করিল। পিয়ারী তেমনি বাতাস করিতে করিতে বলিল, ওই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে  
একটু ব'স। কি কি আনতে হবে, একটা ফর্দ করে দরোয়ান সঙ্গে করে একবার  
বাজারে যা বাবা। কিছুই নেই।

দেখিলাম এ একটা মন্ত নৃতন ব্যাপার। অসুখের কথা আলাদা, কিন্তু সে  
ছাড়া, সে ইতিপূর্বে কোনদিন আমার বিছানার এত কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস  
পর্যন্ত করে নাই; কিন্তু তা নাহয় একদিন সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু এই  
যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, চাকর-বাকর, এমন কি বক্ষুর সম্মুখে অবধি দর্পভরে  
আপনাকে প্রকাশ করিয়া দিল, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করিয়া  
তুলিল। আমার সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন এই বক্ষুই পাছে কিছু মনে  
করে বলিয়া পাটনার বাটী হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। তাহার সহিত  
আজিকার আচরণে কতই না প্রভেদ।

জিনিসপত্রের ফর্দ করিয়া বক্ষু প্রস্থান করিল। রতনও চা ও তামাক দিয়া  
নীচে চলিয়া গেল। পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া

হঠাতে প্রশ্ন করিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে—আচ্ছা, রোহিণীবাবু আর অভয়ার মধ্যে কে বেশি ভালবাসে বলতে পারো?

হাসিয়া বলিলাম, যে তোমাকে পেয়ে বসেছে—সেই অভয়াই নিশ্চয় বেশি ভালবাসে।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল। কহিল, সে আমাকে পেয়ে বসেছে, তুমি কি করে জানলে?

বলিলাম, যেমন করেই জানি, সত্যি কিনা বল ত?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তা সে যাই হোক, বেশি ভালবাসেন কিন্তু রোহিণীবাবু। বাস্তবিক এত ভালবেসেছিলেন ব'লেই সংসারে এতবড় দুঃখ তিনি মাথা পেতে নিলেন। নইলে এ ত তাঁর অবশ্য-কর্তব্য ছিল না। অথচ সে তুলনায় কতটুকু স্বার্থত্যাগ অভয়াকে করতে হয়েচে বল দেখি?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, বরঞ্চ আমি ত দেখি ঠিক বিপরীত। এবং সে হিসাবে যা-কিছুই ইহার কঠিন দুঃখ, যা-কিছু ত্যাগ, সে অভয়াকে করতে হয়েছে। রোহিণীবাবু যাই কেন করুন না, সমাজের চক্ষে তিনি পুরুষমানুষ—এ অভ্রান্ত সত্যটা ভুলে যাচ্ছে কেন?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কিছুই ভুলিনি। পুরুষমানুষ বলতে তুমি যে সুযোগ এবং সুবিধের ইঙ্গিত করচ, সে ক্ষুদ্র এবং ইতর পুরুষের জন্যে, রোহিণীবাবুর মত মানুষের জন্য নয়। শখ ফুরালে, কিংবা হালে পানি না পেলে ফেলে পালাতে পারে, আবার ঘরে ফিরে মান্যগণ্য ভদ্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে—এই ত বলচ? পারে বটে, কিন্তু সবাই পারে? তুমি পারো? যে পারে না, তার ভারের ওজনটা একবার ভেবে দেখ দিকি! তার নিন্দিত জীবন ঘরের কোণে নিরালায় কাটাবার জো নেই, তাকে সংসারের মাঝখানে দুন্দু যুদ্ধে নেমে আসতে হবে, অবিচার ও অপযশের বোৰা একাকী নিঃশব্দে বইতে হবে, তার একান্ত মেহের পাত্রী, তার ভাবী সন্তানের জননীকে বিরুদ্ধ সমাজের সমস্ত অর্মান্দা ও

অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—সে কি সোজা দুঃখ তুমি মনে কর? আবার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, সে যে অনায়াসে এই দুঃখের বোৰা নামিয়ে দিয়ে সরে যেতে পারে, তার এই সর্বনেশে বিকট প্রলোভন থেকে অহোরাত্রে আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে চলার গুরুত্বারও তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। দুঃখের মানদণ্ডে এই আঘোৎসর্গের সঙ্গে ওজন সমান রাখতে যে প্রেমের দরকার, পূরুষমানুষে আপনার ভিতর থেকে যদি বার করতে না পারে, ত কোন মেয়েমানুষেরই সাধ্য নয় তা পূর্ণ করে দেয়।

কথাটা এদিক হইতে কোনদিন এমন করিয়া ভাবি নাই। রোহিণীর সেই সাদাসিধা চুপচাপ ভাব, তার পরে অভয়া যখন তাহার স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল, তখন তাহার সেই শান্ত মুখের উপর অপরিসীম বেদনা নিঃশব্দে বহন করিবার যে ছবি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহাই চক্ষের পলকে রেখায় রেখায় আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে বলিলাম, চিঠিতে কিন্তু একা অভয়ার উদ্দেশেই পুষ্পাঞ্জলি পাঠিয়েছিলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তাঁর প্রাপ্য আজও তাঁকে দিই। কেননা আমার বিশ্বাস, যা-কিছু পাপ, যা-কিছু অপরাধ সে তাঁর অন্তরের তেজে দঞ্চ হয়ে তাঁকে শুন্দি নির্মল করে দিয়েচে। তা নইলে ত আজ তিনি নিতান্ত সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই তুচ্ছ, হীন হয়ে যেতেন।

ইন কেন?

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ! স্বামী-পরিত্যাগের পাপের কি সীমা আছে নাকি? সে পাপ ধৰংস করবার মত আগুন তাঁর মধ্যে না থাকলে ত আজ তিনি—

কহিলাম, আগুনের কথা থাক। কিন্তু তাঁর স্বামীটি যে কি পদার্থ, সে একবার ভেবে দেখ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ପୁରୁଷମାନୁସ ଚିରକାଳଇ ଉଚ୍ଛ୍ଵେଳ, ଚିରକାଳଇ କିଛୁ କିଛୁ  
ଅତ୍ୟାଚାରୀ; କିନ୍ତୁ ତାଇ ବଲେ ତ ଦ୍ଵୀର ସ୍ଵପକ୍ଷେ ପାଲିଯେ ଯାବାର ଯୁକ୍ତି ଖାଟତେ ପାରେ ନା ।  
ମେଯେମାନୁସକେ ସହ୍ୟ କରତେଇ ହ୍ୟ । ନହିଁଲେ ତ ସଂସାର ଚଲତେ ପାରେ ନା ।

କଥା ଶୁଣିଯା ଆମାର ସମ୍ଭାବନା ଗୋଲମାଲ ହଇଯା ଗେଲ । ମନେ ମନେ କହିଲାମ,  
ମେଯେମାନୁସର ଏ ସେଇ ସନାତନ ଦାସତ୍ତର ସଂକାର ! ଏକଟୁ ଅସହିୟୁଃ ହଇଯା ଜିଜ୍ଞାସା  
କରିଲାମ, ଏତକ୍ଷଣ ତା ହଲେ ତୁମି ଆଗ୍ନ ଆଗ୍ନ କି ବକ୍ରିଲେ ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହାସ୍ୟ ମୁଖେ କହିଲ, କି ବକ୍ରିଲୁମ ଶୁଣବେ ? ଆଜଇ ଘଣ୍ଟା-ଦୁଇ  
ପୂର୍ବେ ପାଟନାର ଠିକାନାୟ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାର ଚିଠି ପେଯେଚି । ଆଗ୍ନଟା କି ଜାନ ? ସେଦିନ  
ପ୍ଲେଗ ବ'ଲେ ସଥନ ତାଁର ସବେ-ପାତା ସୁଖେର ସରକନ୍ଧାର ଦୋରଗୋଡ଼ାୟ ଏସେ  
ଦାଁଡିଯେଛିଲେ, ତଥନ ଯେ ବନ୍ଦୁଟି ନିର୍ଭର୍ଯ୍ୟେ ନିର୍ବିଚାରେ ତୋମାକେ ଭିତରେ ଡେକେ ନିଯେଛିଲୁ,  
ଆମି ତାକେଇ ବଲଟି ତାଁର ଆଗ୍ନ । ତଥନ ସୁଖେର ଖେଯାଳ ଆର ତାତେ ଛିଲ ନା ।  
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ'ଲେ ବୁଝାଲେ ଯେ ତେଜ ମାନୁସକେ ସୁମୁଖେର ଦିକେଇ ଠେଲେ, ଦିଧାୟ ପିଛୁତେ ଦେଯ  
ନା, ଆମି ତାକେଇ ଏତକ୍ଷଣ ଆଗ୍ନ ଆଗ୍ନ ବ'ଲେ ବକେ ମରଛିଲୁମ । ଆଗ୍ନରେ ଏକ  
ନାମ ସର୍ବଭୁକ ଜାନୋ ନା ? ସେ ସୁଖ-ଦୁଃଖ ଦୁଇ-ଇ ଟେନେ ନେଯ—ତାର ବାଚବିଚାର ନେଇ ।  
ତିନି ଆର ଏକଟା କଥା କି ଲିଖେଛେନ ଜାନୋ ? ତିନି ରୋହିଣୀବାବୁକେ ସାର୍ଥକ କରେ  
ତୁଳତେ ଚାନ । କାରଣ, ତାଁର ବିଶ୍ୱାସ, ନିଜେର ଜୀବନେର ସାର୍ଥକତାର ଭିତର ଦିଯାଇ ଶୁଦ୍ଧ  
ସଂସାରେର ଅପରେର ଜୀବନେର ସାର୍ଥକତା ପୌଁଛାତେ ପାରେ । ଆର ବ୍ୟର୍ଥ ହଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟା  
ଜୀବନ ଏକାକୀଇ ବ୍ୟର୍ଥ ହ୍ୟ ନା, ସେ ଆରଓ ଅନେକଙ୍ଗଳୋ ଜୀବନକେ ନାନା ଦିକ ଦିଯେ  
ନିଷ୍ପଳ କରେ ଦିଯେ ତବେ ଯାଯ । ଖୁବ ସତି ନା ? ବଲିଯା ସେ ହଠାଏ ଏକଟା ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ  
ଫେଲିଯା ଚୁପ କରିଲ । ତାର ପରେ ଦୁଜନେ ଅନେକକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ହଇଯା ରହିଲାମ ।  
ବୋଧ କରି, ସେ କଥାର ଅଭାବେଇ ଏଥନ ଆମାର ମାଥାର ମଧ୍ୟେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଦିଯା ରଙ୍ଗ  
ତୁଳଙ୍ଗଳା ନିର୍ବର୍ଧକ ଚିରିଯା ଚିରିଯା ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଯା ତୁଳିତେ ଲାଗିଲ । ତାହାର ଏ  
ଆଚରଣୀ ଏକେବାରେ ନୃତନ । ସହସା କହିଲ, ତିନି ଖୁବ ଶିକ୍ଷିତା, ନା ? ନହିଁଲେ ଏତ  
ତେଜ ହ୍ୟ ନା ।

বলিলাম, হাঁ, যথার্থ-ই তিনি শিক্ষিতা রমণী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু একটা কথা তিনি আমাকে লুকিয়েচেন। তাঁর মা হবার লোভটা কিন্তু চিঠির মধ্যে বরাবর চাপা দিতে গেছেন।

বলিলাম, এ লোভ তাঁর আছে নাকি? কৈ আমি ত শুনিনি?

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, বাঃ, এ লোভ আবার কোন্ মেয়েমানুষের নেই! কিন্তু তাই বলে বুঝি পুরুষমানুষের কাছে বলে বেড়াতে হবে! তুমি ত বেশ!

কহিলাম, তা হলে তোমারও আছে নাকি?

যাও—বলিয়া সে অকস্মাত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সেই আরঙ্গ মুখ লুকাইবার জন্য শয়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন অস্তোনুখ সূর্যরশ্মি পশ্চিমের খোলাজানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আরঙ্গ আভা তাহার মেঘের মত কালো চুলের উপর অপরূপ শোভায় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কানের হীরার দুল-দুটিতে নানাবর্ণের দৃতি বিক্রিক করিয়া খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই সে আত্মসংবরণ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, কেন, আমার কি ছেলেমেয়ে নেই যে লোভ হবে? মেয়েদের বিয়ে দিয়েচি, ছেলের বিয়ে দিতে এসেচি—একটি-দুটি নাতি-নাতনী হবে, তাদের নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব—আমার অভাব কি বল ত?

চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথা লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মী কহিল, বক্ষুর বিয়ে ত এখনো দশ-বারদিন দেরি আছে; চল কাশীতে তোমাকে আমার গুরুদেবকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

হাসিয়া বলিলাম, আমি কি একটা দেখবার জিনিস?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে বিচারের ভার যারা দেখে তাদের, তোমার নয়।

কহিলাম, তাও যদি হয়, কিন্তু এতে আমারই বা লাভ কি, তোমার গুরুদেবেরই বা লাভ কি? রাজলক্ষ্মী গন্তীর হইয়া বলিল, লাভ তোমাদের নয়, লাভ আমার। নাহয় শুধু আমার জন্যেই চল।

সুতরাং সম্মত হইলাম। সম্মুখে একটা দীর্ঘকালব্যাপী অকাল থাকায় এই সময়টায় চারিদিকে যেন বিবাহের বন্যা নামিয়াছিল। যখন-তখন ব্যাণ্ডের কন্টে এবং ব্যাগপাইপের বাঁশি বিবিধ প্রকারের বাদ্যভাগ-সহযোগে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিবার যোগাড় করিয়াছিল। আমাদের স্টেশনযাত্রার পথেও এমনি কয়েকটা উন্মত্ত শব্দের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিয়া গেল। তেজটা একটু কমিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমার মতেই যদি সবাই চলে, তাহলে ত গরীবদের আর বিয়ে করাও হয় না, ঘর-সংসার করাও চলে না; তাহলে সৃষ্টি থাকে কি করে?

তাহার অসামান্য গান্তীর্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, সৃষ্টিরক্ষার জন্যে তোমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার আবশ্যক নেই। কারণ, আমার মতে চলবার লোক পৃথিবীতে বেশি নেই। অন্ততঃ আমাদের এদেশে ত নেই বললেই চলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না থাকাই ত ভাল। বড়লোকেরাই শুধু মানুষ, আর গরীব বলে কি তারা সংসারে ভেসে এসেছে? তাদের ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্নার সাধ-আহ্বাদ নেই?

কহিলাম, সাধ-আহ্বাদ থাকলেই যে তাকে প্রশ্ন দিতে হবে, তার কি কোন অর্থ আছে?

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, কেন নাই আমাকে বুবিয়ে দাও।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, দরিদ্র-নির্বিশেষেই আমার এ মত নয়, আমার মত শুধু দরিদ্র ভদ্রগৃহস্থদের সম্বন্ধেই, তার কারণও তুমি জানো ব'লেই আমার বিশ্বাস।

রাজলক্ষ্মী জিদের স্বরে বলিল, তোমার ও মত ভুল।

আমারও কেমন জিদ চাপিয়া গেল। বলিয়া ফেলিলাম, হাজার ভুল হলেও তোমার মুখে সে কথা শোভা পায় না। বক্ষুর বাপ যখন তোমাদের দু'বোনকেই একসঙ্গে মাত্র বাহাত্তরটি টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, সেদিন এখনো এত পুরানো হয়নি যে তোমার মনে নেই। তবে নাকি সে লোকটার নেহাত পেশা বলেই রক্ষে; নইলে ধর, যদি সে তোমাকে তার ঘরে নিয়ে যেত, তোমার দুটি-একটি ছেলেপুলে হতো—একবার ভেবে দেখ দেখি অবস্থাটা?

রাজলক্ষ্মীর চোখের দৃষ্টিতে কলহ ঘনাইয়া উঠিল, কহিল, ভগবান যাদের পাঠাতেন তাদের তিনিই দেখতেন। তুমি নাস্তিক বলেই কেবল বিশ্বাস কর না।

আমিও জবাব দিলাম, আমি নাস্তিক হই, যা হই, আস্তিকের ভগবানের দরকার কি শুধু এইজন্য?—এই-সব ছেলে মানুষ করতে?

রাজলক্ষ্মী দ্রুতকর্ণে কহিল, নাহয় তিনি নাই দেখতেন। কিন্তু তোমার মত আমি অত ভীতু নই। আমি দোর দোর ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক, বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার চের ভাল হ'তো।

আমি আর তর্ক করিলাম না। আলোচনাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং অপ্রিয় ধারায় নামিয়া আসিয়াছিল বলিয়া জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া নিরুন্তরে বসিয়া রহিলাম।

আমাদের গাড়ি ক্রমশঃ সরকারী এবং বেসরকারী অফিস কোয়ার্টার ছাড়াইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সে দিনটা ছিল শনিবার। বেলা দুটার পর অধিকাংশ অফিসে কেরানী ছুটি পাইয়া আড়াইটার ট্রেন ধরিতে দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছিল। প্রায় সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু খাদ্যসামগ্ৰী। কাহারও হাতে দুইটা বড় চিংড়ী, কাহারও রুমালে বাঁধা একটু পাঁঠার মাংস, কাহারও হাতে পাড়াগাঁয়ের দুষ্প্রাপ্য কিছু কিছু তরিতরকারি এবং ফলমূল। সাতদিনের পরে গৃহে পৌঁছিয়া উৎসুক ছেলেমেয়ের মুখে একটু আনন্দের হাসি দেখিতে প্রায় সকলেই সামর্থ্যমত অঞ্জ-স্বন্ধ মিষ্টান্ন কিনিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া ছুটিতেছে। প্রত্যেকেরই

মুখের উপর আনন্দ ও ট্রেন ধরিবার উৎকর্ষা একসঙ্গে এমনি পরিষ্কৃট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজলক্ষ্মী আমার হাতটা টানিয়া অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করল, হাঁ গা, কেন এঁরা সব এমনভাবে ইস্টিশনের দিকে ছুটচেন? আজ কি?

আমি ফিরিয়া চাহিয়া কহিলাম, আজ শনিবার। এঁরা সব অফিসের কেরানী, রবিবারের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছেন।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ তাই বটে। আর দেখ, সবাই একটা-না-একটা কিছু খাবার জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন। পাড়াগাঁয়ে ত এ-সব পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয় ছেলেমেয়েদের হাতে দেবার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, না?

আমি কহিলাম, হাঁ।

তাহার কল্পনা দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, তাই তৎক্ষণাত কহিল, আঃ—ছেলেমেয়েগুলোর আজ কি স্ফূর্তি—কেউ চেঁচামেচি করবে, কেউ গলা জড়িয়ে বাপের কোলে উঠতে চাইবে, কেউ মাকে খবর দিতে রান্নাঘরে দৌড়বে— বাড়িতে বাড়িতে আজ যেন একটা কাণ্ড বেধে যাবে, না? বলিতে বলিতেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমি সায় দিয়া বলিলাম, খুব সম্ভব বটে।

রাজলক্ষ্মী গাড়ির জানালা দিয়া আবার কিছুক্ষণ তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ফোঁস করিয়া একটা নিশাস ফেলিয়া বলিল, হাঁ গা, এঁদের মাইনে কত?

বলিলাম, কেরানীর মাইনে আর কত হয়, পঁচিশ-ত্রিশ-কুড়ি—এমনি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বাড়িতে ত এঁদের মা আছেন, ভাইবোন আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে—

আমি যোগ করিয়া দিলাম, দুই-একটি বিধবা বোন আছে, কাজকর্ম, লোক-লোকিকতা, ভদ্রতা আছে, কলিকাতার বাসাখরচ আছে, অবিচ্ছিন্ন রোগের খরচ—বাঙালী কেরানীজীবনের সমস্তই নির্ভর করে এই ত্রিশটি টাকার উপর।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଯେନ ଦମ ଆଟକାଇୟା ଆସିତେଛିଲ । ସେ ଏମନି ବ୍ୟାକୁଳ ହଇୟା ବଲିଯା ଉଠିଲ, ତୁମି ଜାନ ନା । ଏଂଦେର ବାଡ଼ିତେ ସବ ବିଷୟ-ଆଶୟ ଆଛେ । ନିଶ୍ଚଯ ଆଛେ ।

ତାହାର ମୁଖ ଦେଖିଯା ତାହାକେ ନିରାଶ କରିତେ ଆମାର ବେଦନାବୋଧ ହଇଲ, ତଥାପି ବଲିଲାମ, ଏଂଦେର ଘରକଳାର ଇତିହାସ ଆମି ଘନିଷ୍ଠଭାବେଇ ଜାନି । ଆମି ନିଃସଂଶୟେ ଜାନି ଏଂଦେର ଚୋଦ୍ଦାନା ଲୋକେର କିଛୁ ନେଇ । ଚାକରି ଗେଲେ ହ୍ୟ ଭିକ୍ଷା, ନା ହ୍ୟ ସମ୍ଭବ ପରିବାରେର ସଙ୍ଗେ ଉପୋସ କରତେ ହ୍ୟ । ଏଂଦେର ଛେଲେମେଯେଦେର କଥା ଶୁଣବେ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅକ୍ଷ୍ୱାଂ ଦୁଇ ହାତ ତୁଲିଯା ଚେଂଚାଇୟା ଉଠିଲ, ନା-ନା, ଶୁନବ ନା, ଶୁନବ ନା—ଆମି ଚାଇନେ ଶୁନତେ ।

ସେ ଯେ ପ୍ରାଣପଣେ ଅନ୍ତର ସଂବରଣ କରିଯା ଆଛେ, ସେ ତାହାର ଚେକ୍ଷେର ପ୍ରତି ଚାହିବାମାତ୍ରଇ ଟେର ପାଇଲାମ, ତାଇ ଆର କିଛୁ ନା ବଲିଯା ପୁନରାୟ ପଥେର ଦିକେ ମୁଖ ଫିରାଇଲାମ । ଅନେକକଷ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ତାହାର ସାଡ଼ାଶବ୍ଦ ପାଇଲାମ ନା । ଏତକ୍ୟଣ ଅବଧି ବୋଧ କରି ସେ ନିଜେର ସଙ୍ଗେ ଓକାଲତି କରିଯା ଶେଷେ ନିଜେର କୌତୁଳେର କାଛେ ପରାଜୟ ମାନିଯା,ଆମାର ଜାମାର ଖୁଟ୍ଟ ଧରିଯା ଟାନିଲ । ଫିରିଯା ଚାହିତେଇ ସେ କରଣକଟେ କହିଲ, ଆଚ୍ଛା, ବଲ ଓଁଦେର ଛେଲେପୁଲେର କଥା । କିନ୍ତୁ ଦୁଟି ପାଯେ ପଡ଼ି, ମିଛିମିଛି ବାଡ଼ିଯେ ବ'ଲୋ ନା । ଦୋହାଇ ତୋମାର!

ତାହାର ମିନତି କରାର ଭଙ୍ଗ ଦେଖିଯା ଆମାର ହାସି ପାଇଲ, କିନ୍ତୁ ହାସିଲାମ ନା; ବରଞ୍ଚ କିମ୍ବିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଗାନ୍ଧୀରେ ସହିତ ବଲିଲାମ, ବାଡ଼ିଯେ ବଲା ତ ଦୂରେର କଥା, ତୁମି ଜିଜ୍ଞାସା କରା ସନ୍ତୋଷ ତୋମାକେ ଶୋନାତାମ ନା, ଯଦି ନା ତୁମି ଏକଟୁ ଆଗେ ନିଜେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଭିକ୍ଷା କ'ରେ ଛେଲେ ମାନୁଷ କରାର କଥା ବଲତେ । ଭଗବାନ ଯାଦେର ପାଠାନ, ତିନିଇ ତାଦେର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାର ନେନ, ଏ ଏକଟା କଥା ବଟେ । ଅସ୍ମୀକାର କରଲେ ନାସ୍ତିକ ବ'ଲେ ହ୍ୟତ ଆବାର ଆମାକେ ଗାଲମନ୍ଦ କରବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନେର ଦାଯିତ୍ବ ବାପ-

মায়ের উপর কতটা, আর ভগবানের উপর কতটা, এ দুই সমস্যার মীমাংসা তুমি  
নিজেই ক'রো— আমি যা জানি তাই শুধু বলব। কেমন?

সে নীরবে আমার দিকে জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিলাম,  
ছেলে জন্মালে তাকে কিছুদিন বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তার মায়ের  
উপরেই থাকে ব'লে আমার মনে হয়। ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি, তাঁর  
দয়ার প্রতিও আমার অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু তবুও মায়ের বদলে তাঁর নিজের এই  
ভারটা নেবার উপায় আছে কিনা—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ চালাকি ক'রো না—  
সে আমি জানি।

জানো? যাক, তা হলে একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হ'ল। কিন্তু ত্রিশ-  
টাকা-ঘরের জননীর দুধের উৎস শুকিয়ে আসতে কেন যে বিলম্ব হয় না, সে  
জানতে হলে কোন ত্রিশ-টাকা-ঘরের প্রসূতির আহারের সময় উপস্থিত থাকা  
আবশ্যক। কিন্তু সে যখন পারবে না, তখন এ ক্ষেত্রে আমার কথাটা নাহয় মেনেই  
নাও!

রাজলক্ষ্মী ম্লানমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, পাড়াগাঁয়ে যে গো-দুঁধের একান্ত অভাব, এ কথাটাও  
তোমাকে মেনে নিতে হবে।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতড়ি কহিল, এ আমি নিজেও জানি। ঘরে গরু থাকে ত  
ভাল, নইলে আজকাল মাথা খুঁড়ে মলেও কোন পল্লীগ্রামে একফোঁটা দুধ পাবার  
জো নেই। গরুই নেই, তার আবার দুধ! বলিলাম, যাক, আরও একটা সমস্যার  
সমাধান হ'ল। তখন ছেলেটার ভাগ্যে রইল স্বদেশী খাঁটি পানাপুরুরের জল, আর  
বিদেশী কৌটাভরা খাঁটি বার্লির গুঁড়ো। কিন্তু তখনও দুর্ভাগ্যাটার অদ্যন্তে হয়ত  
এক-আধ ফোঁটা তার স্বাভাবিক খাদ্যও জোটে, কিন্তু, সে সৌভাগ্য এ-সব ঘরে  
বেশিদিন থাকার আইন নেই। মাস-চারেকের মধ্যেই আর একটি নৃতন আগন্তক

তার আবির্ভাবের নোটিশ দিয়ে দাদার মাতৃদুষ্প্রের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ করে দেয়। এ বোধ করি তুমি—

রাজলক্ষ্মী লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, হাঁ, হাঁ, জানি। এ আর আমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে না! তুমি তারপরে বল।

কহিলাম, তারপর ছেঁড়াটাকে ধরে পেটের রোগে এবং স্বদেশী ম্যালেরিয়া জ্বরে। তখন বাপের দায়িত্ব হচ্ছে বিদেশী কুইনিন ও বার্লিং গুঁড়ো যোগানো, এবং মায়ের ঘাড়ে পড়ে—এ যে বললুম, আঁতুড়ে গিয়ে পুনরায় ভর্তি হবার মূলতুবির ফুরসতে—ঐগুলো খাঁটি দেশী জলে গুলে তাকে গেলানো। তারপরে যথাসময়ে সূতিকাগ্হের হাঙ্গামা মিটিয়ে নবকুমার কোলে করে বেরিয়ে এসে প্রথমটার জন্যে দিন-কতক চ্যাঁচানো।

রাজলক্ষ্মী নীলবর্ণ হইয়া কহিল, চ্যাঁচানো কেন?

বলিলাম, ওটা মায়ের স্বভাব বোলে। এমন কি কেরানীর ঘরেও তার অন্যথা দেখা যায় না, যখন ভগবান তাঁর দায়িত্ব শোধ করতে ছেলেটাকে শ্রীচরণে টেনে নেন!

বাছা রে!

এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়াই কথা কহিতেছিলাম, অকস্মাত দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম, তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু অশ্রূজলে ভাসিতেছে। অতিশয় ক্লেশ বোধ করিলাম। মনে হইল, এ বেচারাকে নিরর্থক দুঃখ দিয়া আমার লাভ কি? অধিকাংশ ধনীর মত ইহারও না হয় জগতের এই বিরাট দুঃখের দিকটা অগোচরেই থাকিত। বাঙ্গলার ক্ষুদ্র চাকুরিজীবী প্রকাণ্ড দরিদ্র গৃহস্থ পরিবার যে শুধু খাদ্যাভাবেই ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া প্রতিদিন শূন্য হইয়া যাইতেছে, অন্যান্য বড়লোকের মত এও না হয় এ কথাটা নাই জানিত। কি এমন তাহাতে বেশি ক্ষতি হইত! ঠিক এমনি সময় রাজলক্ষ্মী চোখ মুছিতে মুছিতে অবরুদ্ধ স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হোক কেরানী, তবু তারা তোমার চেয়ে ত্রে

ভাল। তুমি ত পাষাণ। তোমার নিজের কোন দুঃখ নেই বলে এঁদের দুঃখকষ্ট এমন আহ্বাদ করে বর্ণনা করচ। আমার কিন্তু বুক ফেটে যাচ্ছে। বলিয়া সে অঞ্চলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ তাহাতে লাভ হইত না। বরঞ্চ সবিনয়ে কহিলাম, এঁদের সুখের ভাগটাও ত আমার কপালে জোটে না। বাড়ি পৌঁছতে এঁদের আগ্রহটাও ভেবে দেখবার বিষয়।

রাজলক্ষ্মীর মুখ হাসি ও কানায় মুহূর্তেই দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমি ত তাই বলচি! আজ বাবা আসচে বলে ছেলেপুলেরা সব পথ চেয়ে আছে। কিসের কষ্ট? ওঁদের মাইনে হয়ত কম, তেমনি বাবুয়ানিও নেই। কিন্তু, তাই বলে কি পঁচিশ-ত্রিশ টাকা, এত কম? কখনো নয়। অন্ততঃ—এক শ দেড় শ টাকা, আমি নিশ্চয় বলচি।

বলিলাম, হতেও পারে। আমি হয়ত ঠিক জানিনে।

উৎসাহ পাইয়া রাজলক্ষ্মীর লোভ বাড়িয়া গেল। অতিশয় ক্ষুদ্র কেরানীর জন্যও মাসে দেড় শ টাকা মাহিনা তাহার মনঃপূত হইল না। কহিল, শুধু কি ওই মাইনেটিই ওঁদের ভরসা তুমি মনে কর? সবাই উপরিও কত পান!

কহিলাম, উপরিটা কি? প্যালা?

আর সে কথা কহিল না, মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বাহিরের দিকেই চোখ রাখিয়া বলিল, তোমাকে যতই দেখচি, ততই তোমার ওপর থেকে আমার মন চলে যাচ্ছে। তুমি ছাড়া আর আমার গতি নেই জানো ব'লেই আমাকে তুমি এমন ক'রে বেঁধো।

এতদিনের পরে আজ বোধ করি এই প্রথম তাহার হাত-দুটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন একটা বলিতেও চাহিলাম, কিন্তু গাড়ি আসিয়া স্টেশনের ধারে দাঁড়াইল। একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ থাকা সত্ত্বেও বক্ষু কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া পূর্বাক্তেই আসিয়াছিল। সে রতনকে কোচবাক্সে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলাম; যে কথাটা মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার তাহা নীরবে অন্তরের ভিতরে গিয়া লুকাইল।

আড়াইটার লোকাল ছাড়ে-ছাড়ে। আমাদের ট্রেন পরে। এমন সময়ে একটি প্রৌঢ়গোছের দরিদ্র ভদ্রলোক একহাতে নানাজাতীয় তরিতরকারির পুঁতুলি এবং অন্য হাতে দাঁড়সুন্দ একটি মাটির পাথি লইয়া শুধু প্লাটফরমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দিঘিদিকজ্ঞানশূন্যভাবে ছুটিতে গিয়া রাজলক্ষ্মীর গায়ে আসিয়া পড়িল। মাটির পুতুল মাটিতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল। লোকটা হায় হায় করিয়া বোধ করি কুড়াইতে যাইতেছিল, পাঁড়েজী হৃক্ষার ছাড়িয়া একলঙ্ঘে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিল এবং বক্ষ ছড়ি তুলিয়া বুড়ো কানা ইত্যাদি বলিয়া মারে আর কি! আমি একটু দূরে অন্যমনক্ষ ছিলাম, শশব্যস্তে রণস্থলে আসিয়া পড়িলাম। লোকটি ভয়ে এবং লজ্জায় বার বার বলিতে লাগিল, দেখতে পাইনি মা, আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—

আমি তাড়াতাড়ি ছাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, যা হবার হয়েচে, আপনি শীষ্ট যান, আপনার ট্রেন ছেড়ে দিল বলে।

লোকটি তবুও তাহার পুতুলের টুকরা কয়টা কুড়াইবার জন্য বারকয়েক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দৌড় দিল, কিন্তু অধিক দূর ছুটিতে হইল না, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তখন ফিরিয়া আসিয়া সেই আর একদফা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সেই ভাঙ্গা অংশগুলা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া, আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, ওতে আর কি হবে?

লোকটি কহিল, কিছুই না মশাই। মেয়েটার অসুখ—গেল সোমবারে বাড়ি থেকে আসবার সময় বলে দিলে, আমার জন্যে একটি পাথি-পুতুল কিনে এনো না! কিনতে গেলুম, ব্যাটা গরজ বুঝে দর হাঁকলে কিনা—দু আনা— তার একটি পয়সা কম নয়। তাই সই। মরি-বাঁচি করে আট-আটটা পয়সা ফেলে দিয়ে নিলুম, কিন্তু এমনি অদেষ্ট দেখুন না যে, দোড়গোড়ায় এনে ভেঙ্গে গেল! রোগা মেয়েটার

হাতে দিতে পারলুম না। বেটি কেঁদে বলবে, বাবা আনলে না। যা হোক টুকরোগুলো নিয়ে যাই, দেখিয়ে বলব, মা, এ মাসের মাইনেটা পেলে আগে তোর পুতুল কিনে তবে আমার অন্য কাজ। বলিয়া সমস্তগুলি কুড়াইয়া সংযতে চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া কঠিল, আপনার স্ত্রীর বোধ হয় বড় লেগেচে—আমি দেখতে পাইনি। লোকসানকে লোকসানও হ'লো, গাড়িটাও পেলুম না—পেলে তবুও রোগা মেয়েটাকে আধঘণ্টা আগে গিয়ে দেখতে পেতুম। বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্লাটফরমের দিকে প্রস্থান করিল। বন্ধু পাঁড়েজীকে লইয়া কি-একটা প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া গেল; আমি হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, শ্রাবণের ধারার মত রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রূজলে ভাসিয়া যাইতেছে। ব্যস্ত হইয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খুব লেগেচে না কি? কোথায় লাগল?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিয়া চুপি চুপি কঠিল, হ্যাঁ, খুবই লেগেচে—কিন্তু সে এমন জায়গায় যে, তোমার মত পাষাণের দেখবারও জো নেই, বোবারও জো নেই।

## চৌল

শ্রীমান বঙ্কুকে কেন যে বাধ্য হইয়া আমাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গাড়ি  
রিজার্ভ করিতে হইয়াছিল, এই খবরটা যখন তাহার কাছে আমি লইতেছিলাম,  
তখন রাজলক্ষ্মী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। এখন সে একটু অন্যত্র যাইতে  
রাজলক্ষ্মী নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই আমাকে শুনাইয়া দিল যে, নিজের জন্য বাজে  
খরচ করিতে সে যত নারাজ, ততই তাহার ভাগ্যে এই-সকল বিড়ম্বনা ঘটে। সে  
কহিল, সেকেও ক্লাশ ফাস্ট ক্লাশে গেলেই যদি ওদের তৃষ্ণি হয়, বেশ ত, তাও ত  
আমাদের জন্যে মেয়েদের গাড়ি ছিল? কেন রেল কোম্পানিকে মিছে এতগুলো  
টাকা বেশি দেওয়া?

বঙ্কুর কৈফিয়তের সঙ্গে তাহার মায়ের এই মিতব্যয়-নির্ণায় বিশেষ কোন  
সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সে কথা মেয়েদের বলিতে গেলে কলহ  
বাধে। অতএব চুপ করিয়া শুনিয়া গেলাম; কিছুই বলিলাম না।

প্লাটফরমে একখানি বেঁধের উপর বসিয়া সেই ভদ্রলোকটি ট্রেনের জন্য  
অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখ দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায়  
যাবেন?

লোকটি কহিলেন, বর্ধমান।

একটু অগ্রসর হইতেই রাজলক্ষ্মী আমাকে চুপিচুপি বলিল, তা হলে ত  
উনি অনায়াসে আমাদের গাড়িতে যেতে পারেন? ভাড়াও লাগবে না—তাই কেন  
ওঁকে বল না?

বলিলাম, টিকিট নিশ্চয়ই কেনা হয়ে গেছে—ভাড়ার টাকা ওঁর বাঁচবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক না কেন, ভিড়ের কষ্টটা ত বাঁচবে।

কহিলাম, ওঁদের অভ্যাস আছে, ভিড়ের কষ্ট গ্রাহ্য করেন না।

রাজলক্ষ্মী তখন জিদ করিয়া বলিল, না না, তুমি ওঁকে বল। আমরা তিনজনে কথাবার্তায় এতটা পথ বেশ যেতে পারব।

বুঝিলাম, এক্ষণে সে নিজের ভুলটা টের পাইয়াছে। বঙ্গ এবং নিজের চাকরবাকরদের চোখের উপর আমার সঙ্গে একাকী একটা আলাদা গাড়িতে উঠার দৃষ্টিকুটুতা এখন সে কোনমতে একটুখানি ফিকা করিয়া লইতে চায়। তথাপি ইহাকেই আরও একটু চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার জন্য তাছিল্যের ভাবে কহিলাম, কাজ কি একটা বাজে লোককে গাড়িতে ঢুকিয়ে। তুমি যত পার আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো—বেশ সময় কেটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আমার প্রতি একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, সে আমি জানি। আমাকে জব করবার এতবড় সুযোগ হাতে পেয়ে কি তুমি ছাড়তে পারো! এই বলিয়া সে চুপ করিল।

কিন্তু ট্রেন স্টেশনে লাগিতেই আমি তাঁহাকে গিয়া কহিলাম, আপনি কেন আমাদের গাড়িতেই আসুন না। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, ভিড়ের দুঃখটা আপনার বাঁচবে।

বলা বাহ্য তাঁহাকে রাজি করাইতে ক্লেশ পাইতে হইল না, অনুরোধমাত্রই তিনি তাঁহার পুঁটুলি লইয়া আমাদের গাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

ট্রেন গোটা-দুই স্টেশন পার না হইতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার সহিত চমৎকার কথাবার্তা জুড়িয়া দিল, এবং আরও কয়েকটা স্টেশন উভীর্ণ হইবার মধ্যেই তাঁহার ঘরের খবর, পাড়ার খবর, এমন কি আশপাশের গ্রামগুলার খবর পর্যন্ত সে খুঁটিয়া জানিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর গুরুদেব কাশীতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া বাস করেন, তাঁহাদের জন্য যে কলিকাতা হইতে অনেক জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছিল। বর্ধমানের কাছাকাছি আসিলে তোরঙ্গ খুলিয়া সে তাহারই মধ্যে হইতে বাছিয়া

একখানি সবুজ রঙের রেশমের শাড়ি বাহির করিয়া বলিল, সরলাকে তার পুতুলের বদলে এই কাপড়খানি দেবেন।

ভদ্রলোক প্রথমে অবাক হইলেন। পরে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি কহিলেন, না না, মা, সরলাকে আমি আসচে বারে পুতুল কিনে দেব, আপনি কাপড় রেখে দিন। তা ছাড়া এ যে বড় দামী কাপড় মা!

রাজলক্ষ্মী বন্ধুখানি তাহার পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশি দাম নয়। আর দাম যাই হোক, এখানি তার হাতে দিয়ে বলবেন, তার মাসি তাকে ভাল হ'য়ে পরতে দিয়েচে।

ভদ্রলোকের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। আধঘণ্টার আলাপে একজন অপরিচিত লোকের পীড়িত কন্যাকে এমন একখানি মূল্যবান বন্ধু উপহার দেওয়া জীবনে বোধ করি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কহিলেন, আশীর্বাদ করুন সে ভাল হ'য়ে উঠুক; কিন্তু গরীবের ঘরে এত দামী কাপড় নিয়ে সে কি করবে মা? আপনি তুলে রেখে দিন। বলিয়া তিনি আমার প্রতিও একবার চাহিলেন। আমি কহিলাম, তার মাসি যখন তাকে পরতে দিচ্ছে, তখন নিয়ে গিয়ে আপনার দেওয়াই উচিত। বলিয়া হাসিয়া কহিলাম, সরলার ভাগ্য ভাল। আমাদের এমন একটা মাসি-পিসি থাকলে বেঁচে যেতুম মশাই। এইবার কিন্তু আপনার মেয়েটি চটপট সেরে উঠবে দেখবেন।

ভদ্রলোকের সমস্ত মুখে কৃতজ্ঞতা তখন উচ্ছলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আর আপত্তি না করিয়া কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন। আবার দুজনের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সংসারের কথা, সমাজের কথা, সুখদুঃখের কথা—কত কি। আমি শুধু জানালার বাহিরে চাহিয়া স্তন্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এবং যে প্রশ্ন নিজেকে নিজে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র ঘটনার সূত্র ধরিয়া আবার সেই প্রশ্ন মনে উঠিল, এ যাত্রার সমাপ্তি কোথায়?

একখানা দশ-বারো টাকা মূল্যের বস্ত্র দান করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে কঠিনও নয়, নতুনও নয়। তাহার দাসী-চাকরেরা হয়ত এ কথা লইয়া একবার চিন্তা পর্যন্তও করিত না। কিন্তু আমার চিন্তা আলাদা। এই দেওয়া জিনিসটা যে দান করার হিসাবে তাহার কাছে কিছুই নয়—সে আমিও জানি, এবং কাহারও চেয়ে কম জানি না; কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম, তাহার হৃদয়ের ধারাটা যেদিক লক্ষ্য করিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিতে উদাম হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার অবসান হইবে কোথায় এবং কি করিয়া!

সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস করে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।

রাজলক্ষ্মীকে আমি চিনিয়াছিলাম। তাহার পিয়ারী বাইজী যে তাহার অপরিণত যৌবনের সমস্ত দুর্দাম আক্ষেপ লইয়া প্রতি মুহূর্তেই মরিতেছিল, সে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম। আজ সে নামটা উচ্চারণ করিলেও সে যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকে। আমার সমস্যাও হইয়াছিল ইহাই।

সর্বস্ব দিয়া সংসার উপভোগ করিবার সেই উন্নত আবেগ আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে নাই; আজ সে শান্ত, স্থির। তাহার কামনা-বাসনা আজ তাহারই মধ্যে এমন ডুব মরিয়াছে যে, বাহির হইতে হঠাত সন্দেহ হয় তাহারা আছে, কি নাই। তাহাই এই সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া আমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিল, আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্বিনিদ্রাথিত কুস্তকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা এমন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন পাটনায় তাহার মধ্যে যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুঞ্চ অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মূর্তি স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত

কেবলি মনে হইতে লাগিল, তত বড় আগুনকে ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ একমাত্র বঙ্গুই তাহার কাছে পর্যাপ্ত নয়, আজ দুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখদুঃখই তাহার হস্তয়কে আলোড়িত করিতেছে।

বর্ধমানে ভদ্রলোক নামিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আমি জানালা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কানাটা কার কল্যাণে হ'লো? সরলা, না তার মায়ের?

রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি বুঝি এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলে?

বলিলাম, কাজে কাজেই। মানুষ নিজে কথা না কইলেই পরের কথা তার কানে এসে ঢোকে। সংসারে কম কথার লোকের জন্যে ভগবান এই শাস্তির স্থিতি করে রেখেছেন। ফাঁকি দেবার জো নেই। সে যাক, কিন্তু চোখের জল কার জন্যে বরছিল শুনতে পাইনে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার চোখের জল কার জন্যে ঘরে, সে শুনে তোমার লাভ নেই।

কহিলাম, লাভের আশা করিনে—শুধু লোকসান বাঁচিয়ে চলতে পারলেই বাঁচি। সরলা কিংবা তাহার মায়ের জন্যে যত ইচ্ছে চোখের জল ঘরুক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার বাপের জন্য বারাটা আমি পছন্দ করিনে।

রাজলক্ষ্মী শুধু একটা ‘হ্র’ বলিয়াই জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে করিয়াছিলাম, এমন একটা রসিকতা নিষ্ফল হইবে না, ইহা অনেক নিরুন্দ উৎসের বাধা মুক্ত করিয়া দিবে।

কিন্তু সে ত হইলই না, বরঞ্চ যদি বা সে এতক্ষণ এইদিকেই চাহিয়াছিল, রসিকতা শুনিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

କିନ୍ତୁ ବହୁକ୍ଷଣ ମୌନ ଛିଲାମ, କଥା କହିବାର ଜନ୍ୟ ଭିତରେ ଏକଟି ଆବେଗ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଯାଇଲ; ତାଇ ବେଶିକ୍ଷଣ ଚୁପ କରିଯା ଥାକିତେ ପାରିଲାମ ନା, ଆବାର କଥା କହିଲାମ । ବଲିଲାମ, ବର୍ଧମାନ ଥେକେ କିଛୁ ଖାବାର କିନେ ନିଲେ ହ'ତୋ ।

ରାଜଲଙ୍ଘୀ କୋନ ଉତ୍ତରଇ ଦିଲ ନା, ତେମନି ଚୁପ କରିଯା ରହିଲ ।

ବଲିଲାମ, ପରେର ଶୋକେ ଏତକ୍ଷଣ କେଂଦେ ଭାସିଯେ ଦିଲେ, ଆର ଘରେର ଲୋକେର ଦୁଃଖେ ଯେ କାନଇ ଦାଓ ନା । ଏ ବିଲେତ-ଫେରତେର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ କୋଥାଯା?

ରାଜଲଙ୍ଘୀ ଏବାର ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲ, ବିଲେତ-ଫେରତେର ଉପର ଯେ ତୋମାର ଭାରି ଭକ୍ତି ଦେଖି!

ବଲିଲାମ, ହାଁ, ତାରା ଭକ୍ତିର ପାତ୍ର ଯେ!

କେନ, ତାରା ତୋମାଦେର କରଲେ କି?

ଏଥିନୋ କିଛୁ କରେନି, କିନ୍ତୁ ପାଛେ କିଛୁ କରେ ଏହି ଭୟେଇ ଆଗେ ଥେକେ ଭକ୍ତି କରି ।

ରାଜଲଙ୍ଘୀ କ୍ଷଣକାଳ ଚୁପ କରିଯା ଥାକିଯା ବଲିଲ, ଏ ତୋମାଦେର ଅନ୍ୟାୟ । ତୋମରା ତାଦେର ଦଲ ଥେକେ, ଜାତ ଥେକେ, ସମାଜ ଥେକେ—ସବ ଦିକ ଥେକେଇ ବାର କରେ ଦିଯେଚ । ତବୁ ଯଦି ତାରା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଏତୁକୁଓ କରେ, ତାତେଇ ତୋମାଦେର କୃତଜ୍ଞ ହେତ୍ୟା ଉଚିତ ।

କହିଲାମ, ଆମରା ଦେର ବେଶ କୃତଜ୍ଞ ହତୁମ ଯଦି ତାରା ସେଇ ରାଗେ ପୁରାପୁରି ମୁସଲମାନ କିଂବା ଖିସ୍ଟିନ ହେଁ ଯେତ । ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ନିଜେଦେର ବ୍ରାହ୍ମ ବଲେ, ତାରା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକେ ନଷ୍ଟ କରଛେ, ଯାରା ହିନ୍ଦୁ ବଲେ ମନେ କରେ, ତାହା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକେ ତ୍ୟକ୍ତ କରେ ମାରଛେ । ଓରା ନିଜେରା କି, ଯଦି ତାଇ ଆଗେ ଠିକ କରେ ନିୟେ ପରେର ଜନ୍ୟ କାଂଦେ ତାଦେରଓ ହୟତ ଏକଟୁ ଉପକାର ହ'ତୋ ।

ରାଜଲଙ୍ଘୀ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଆମାର ତ ତା ମନେ ହୟ ନା!

বলিলাম, না হলেও তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু যে জন্যে সম্প্রতি আটকাচ্ছে,  
সে অন্য কথা। কৈ—তার ত কোন জবাব দাও না!

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, ওগো, সে জন্যে আটকাবে না। আগে  
তোমার ক্ষিদে পাক, তারপর চিন্তা করে দেখা যাবে।

বলিলাম, তখন চিন্তা করে যে-কোনও স্টেশন থেকে যা মেলে খাবার  
কিনে গিলতে দেবে—এই ত? কিন্তু সে হবে না, তা বলে রাখচি।

জবাব শুনিয়া সে আমার মুখের প্রতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া  
থাকিয়া আবার একটু হাসিয়া বলিল, এ আমি পারি, তোমার বিশ্বাস হয়?

বলিলাম, বেশ, এতটুকু বিশ্বাসও তোমার উপর থাকবে না?

তা বটে! বলিয়া সে পুনরায় তাহার জানালার বাহিরে চাহিয়া নীরবে  
বসিয়া রহিল।

পরের স্টেশনে রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া খাবারের জায়গাটা চাহিয়া  
লইল এবং তাহাকে তামাক দিতে হুকুম করিয়া, থালায় করিয়া সমস্ত খাদ্যসামগ্রী  
সাজাইয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল। দেখিলাম, এ বিষয়ে একবিন্দু ভুলচুক কোথাও  
নাই; আমি যাহা-কিছু ভালবাসি সমস্ত খুঁটাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

বেঞ্চের উপর রতন বিছানা পাতিয়া দিল। পরিপাঠি ভোজন সমাধা  
করিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া আরামে চোখ বুজিবার উপক্রম করিতেছি,  
রাজলক্ষ্মী কহিল, খাবারগুলো সরিয়ে নিয়ে যা রতন। যা পারিস খেগে যা—আর  
তোদের গাড়িতে অন্য কেউ যদি খায় দিস।

কিন্তু রতনের অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া  
জিজ্ঞাসা করিলাম, কই, তুমি খেলে না?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, ক্ষিদে নেই, যা না রতন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, গাড়ি  
হেঢ়ে দেবে যে।

রতন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কহিল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু, মোচলমান কুলিতে খাবারটা ছুঁয়ে ফেলেচে। কত বলচি, মা ইস্টিশান থেকে কিছু কিনে এনে দিই, কিন্তু কিছুতেই না। বলিয়া সে আমার মুখের প্রতি সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঠিক যেন আমারই অনুমতি ভিক্ষা করিল।

কিন্তু আমার কথা কহিবার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে একটা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই যাবি, না দাঁড়িয়ে তর্ক করবি?

রতন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারের পাত্রটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ট্রেন ছাড়িলে রাজলক্ষ্মী আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। মাথার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, আচ্ছা দেখ—

বাধা দিয়া কহিলাম, পরে দেখব অখন। কিন্তু—

সেও আমাকে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমার ‘কিন্তু’ গেয়ে লেকচার দিতে হবে না, আমি বুঝেচি। আমি মুসলমানকে ঘৃণা করিনে, সে ছুঁলে খাবার নষ্ট হয়ে যায়, তাও মনে করিনে। করলে নিজের হাতে তোমাকে খেতে দিতুম না।

কিন্তু নিজে খেলে না কেন?

মেয়েমানুষের খেতে নেই।

কেন?

কেন আবার কি? মেয়েমানুষের খাওয়া নিষেধ।

কিন্তু পুরুষমানুষের নিষেধ নেই?

রাজলক্ষ্মী আমার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, না। পুরুষমানুষের জন্যে আবার অত বাঁধাবাঁধি আইন-কানুন কিসের জন্যে? তারা যা ইচ্ছে খাক, যা ইচ্ছে পরক, যেমন করে হোক সুখে থাক, আমরা আচার পালন করে গেলেই হ'লো। আমরা শত কষ্ট সহিতে পারি, কিন্তু তোমরা পার কি! এই যে সংক্ষ্য হতে-না-হতেই ক্ষিদেয় অন্ধকার দেখছিলে?

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু কষ্ট সহিতে পারাটা আমাদেরও গৌরবের কথা নয়।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, এতে তোমাদের এতটুকু অগৌরব নেই। তোমরা ত আমাদের মত দাসীর জাত নয় যে, কষ্ট সহ্য করতে যাবে। লজ্জার কথা আমাদেরই—যদি না পারি।

কহিলাম, এ ন্যায়শাস্ত্র তোমাকে শেখালে কে? কাশীর গুরুদেব?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের অত্যন্ত সন্নিকটে ঝুঁকিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার যা-কিছু শিক্ষা সে তোমারই কাছে। তোমার চেয়ে বড় গুরু আর আমার নেই।

বলিলাম, তাহলে গুরুর কাছে ঠিক উলটোটাই শিখে রেখেচ। আমি কোনদিন বলিনে যে, তোমরা দাসীর জাত। বরঞ্চ এই কথাই মনে করি যে, তোমরা তা নও। তোমরা কোন দিক থেকে আমাদের চেয়ে একতিল ছোট নও।

রাজলক্ষ্মীর চোখ-দুটি সহসা ছলছল করিয়া উঠিল। বলিল, সে আমি জানি। আর জানি বলেই ত এ কথা তোমার কাছে শিখতে পেরেচ। তোমার মত সবাই যদি এমনি করে ভাবতে পারতো, তাহলে পৃথিবীসুন্দ সমস্ত মেয়ের মুখেই এ কথা শুনতে পেতে। কে বড় কে ছোট, এ সমস্যাই কখনো উঠত না।

অর্থাৎ এ সত্য নির্বিচারে সবাই মেনে নিত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

আমি তখন হাসিয়া কহিলাম, ভাগ্যে পৃথিবীসুন্দ মেয়েরা তোমার সঙ্গে একমত নয়, তাই রক্ষা। কিন্তু আপনাদের এত হীন মনে করতে তোমার লজ্জা করে নাও?

আমার উপহাস রাজলক্ষ্মী লক্ষ্য করিল কি না সন্দেহ। অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, কিন্তু এর মধ্যে ত কোন হীনতা নেই।

আমি কহিলাম, ত বটে। আমরা প্রভু, তোমরা দাসী, এই সংস্কারটাই এ দেশের মেয়েদের মনে এমনি বদ্ধমূল যে, এর হীনতাটাও আর তোমাদের চোখে পড়ে না। বোধ করি এই পাপেই পৃথিবীর সকল দেশের মেয়ের চেয়ে তোমারই আজ সত্যি সত্যি ছোট হয়ে গেছ।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ শক্ত হইয়া বসিয়া, দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়। তোমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের ছোট মনে ক'রে ছোট হয়ে যায়নি, তোমরাই তাদের ছোট মনে ক'রে ছোট করে দিয়েচ, নিজেরাও ছোট হয়ে গেছ। এই সত্যি কথা।

কথাটা অকস্মাত যেন নৃতন করিয়া বাজিল। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি ঘেটুকু ছিল, তাহা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই অনেকখানি সত্য ইহাতে লুকাইয়া আছে, যাহা আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি সেই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে তামাশা করেছিল। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে, সে ত জানো না?

জানি না, তাহা স্বীকার করতেই সে কহিতে লাগিল, জানো না তার কারণ আছে। কোন জিনিস জানবার জন্যে যতক্ষণ না মানুষের বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যাকুলতা ওঠে, ততক্ষণ সবই তার চোখে ঝাঙ্গা হয়ে থাকে। এতদিন তোমার মুখে শুনে ভাবতুম, সত্যিই যদি আমাদের দেশের লোকের দুঃখ এত বেশি, সত্যিই যদি আমাদের সমাজ এমন ভয়ানক অঙ্গ, তবে তার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকেই বা কি করে, তাকে মেনে চলেই বা কি করে।

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছি দেখিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, আর তুমিই বা এত বুবাবে কি করে? কখনো এদের মধ্যে থাকোনি, কখনো এদের সুখ-দুঃখ ভোগ করোনি; তাই বাইরে থেকে বাইরের সমাজের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভাবতে, এদের বুঝি কষ্টের আর অবধি নেই। যে বড়লোক জমিদার পোলাও খেয়ে থাকে,

সে তার কোন দরিদ্র প্রজাকে পান্তা ভাত খেতে দেখে যদি ভাবে, এর দুঃখের আর সীমা নেই—তার যেমন ভুল হয়, তোমারও তেমনি ভুল হয়েচে।

বলিলাম, তোমার তকটা যদিচ ন্যায়শাস্ত্রের আইনে হচ্ছে না, তবুও জিজ্ঞাসা করি কি করে জানলে দেশের সম্বন্ধে আমার এর চেয়ে বেশি জ্ঞান নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কি করে থাকবে? তোমার মত স্বার্থপর লোক আর সংসারে আছে নাকি? যে কেবল নিজের আরামের জন্যে পালিয়ে বেড়ায়, সে ঘরের খবর জানবে কোথা থেকে! তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশি নিন্দে করে বেড়ায় যারা সমাজের কোন ধারই ধারে না। তোমরা না জানো ভাল ক'রে পরের সমাজ, না জানো ভালো ক'রে নিজেদের সমাজ।

বলিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, তার পরে এই যেমন বাইরে থেকে বাইরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে মরে যাও, আমাদের মেয়েরা বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনরাত কাজ করে ব'লে তাদের মত দুঃখী, তাদের মত পীড়িত, তাদের মত হীন আর বুঝি কোন দেশের মেয়ে নেই। কিন্তু দিনকতক আমাদের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের চিন্তা কর দেখি! নিজেদের একটু উঁচু করবার চেষ্টা করো—যদি কোথাও কিছু সত্যিকার গলদ থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে—কিন্তু তার আগে নয়।

কহিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, তুমি আমাকে তামাশা করচ, তা জানি। কিন্তু তামাশা করবার কথা আমি বলিনি। বাড়ির গিন্তু সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়! অনেক সময়ে চাকরের চেয়েও। অনেক সময় চাকরদের চেয়েও বেশি খাটতে হয়। কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে আমাদের বরঞ্চ অমনি দাসীর মতই থাকতে দাও, কিন্তু অন্য দেশের রানী ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রো না, আমি এই কথাটাই তোমাকে বলচি।

বলিলাম, তর্কশাস্ত্রের মাথায় পা দিয়ে ডোবাবার জো করে তুলেচ বটে,  
কিন্তু আমিও যে শাস্ত্রমতে তর্ক করবার ঠিক বাগ পাচিনে, তা মানচি।

সে কহিল, তর্ক করবার কিছু নেই।

বলিলাম, থাকলেও সে শক্তি নেই, ভয়ানক ঘূম পাচে। কিন্তু তোমার  
কথাটা একরকম বুবাতে পেরেচি।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাদের দেশে যে  
জন্যেই হোক ছোট-বড় উঁচু-নিচু সকলের মধ্যেই টাকার লোভটা ভয়ানক বেড়ে  
গেছে। কেউ আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানে না—চায়ও না। এতে যে কত অনিষ্ট  
হয়েচে সে আমিই টের পেয়েচি।

কহিলাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু তুমি টের পেলে কেমন করে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, টাকার লোভেই ত আমার এই দশা। কিন্তু আগেকার  
কালে বোধ হয় এত লোভ ছিল না।

বলিলাম, এ ইতিহাসটা ঠিক জানিনে।

সে কহিতে লাগিল, কখ্খনো ছিল না। সেখানে কখ্খনো মায়ে টাকার  
লোভে মেয়েকে এ পথে পাঠাতো না। তখন ধর্মভয় ছিল। আজ ত আমার টাকার  
অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ আছে? পথের ভিক্ষুক যে সেও  
বোধ হয় আজ আমার চেয়ে তের তের বেশি সুখী।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, তোমার কি  
সত্যিই এত কষ্ট?

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আঁচল দিয়া চোখদুটি একবার মুছিয়া  
লইয়া বলিল, আমার কথা আমার অন্তর্যামীই জানেন।

অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। গাঢ়ির গতি মন্দীভূত হইয়া  
ক্রমশঃ একটা ছোট স্টেশনে আসিয়া থামিল। খানিক পরে আবার চলিতে শুরু

করিলে বলিলাম, কি করলে তোমার বাকি জীবনটা সুখে কাটে, আমাকে বলতে পারো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ভেবে দেখেচি। আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোন রকমে চলে যায়, কিছু না থাকে—একেবারে নিরাশ্য, তা হলেই—

আবার দুজনে নিষ্ঠক হইয়া রহিলাম। তাহার কথাটা এতই স্পষ্ট যে, সবাই বুঝিতে পারে, আমারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কথা তোমার কবে থেকে মনে হয়েচে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেদিন অভয়ার কথা শুনেচি, সেই দিন থেকে।

বলিলাম, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা ত এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতে তারা যে কত দুঃখ পেতে পারে, এ ত তুমি জানো না।

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, জানিনে সত্যি; কিন্তু যত দুঃখই তারা পাক, আমার মত দুঃখ যে তারা কোনদিন পাবে না, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্মত ত্যাগ করি কি ক'রে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কি তোমাকে তাই বলচি? আর সম্মতই ত মানুষের আসল জিনিস। সেই যদি ত্যাগ করতে পারো না, তবে ত্যাগের কথা মুখে আনচো কেন? তোমাকে ত আমি কিছুই ত্যাগ করতে বলিনি!

বলিলাম, বলনি বটে, কিন্তু পারি। সম্মত যাওয়ার পরে পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু সেই সম্মত ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জন দিতে পারি।

রাজলক্ষ্মী সহসা হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, আমার জন্যে তোমাকে কিছুই বিসর্জন দিতে হবে না। কিন্তু, তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদেরই সম্মত আছে, আমাদের নেই?

আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্যেই  
কত শত-সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধূলোর মত ফেলে দিয়েচে, সে কথা তুমি  
জানো না বটে, কিন্তু আমি জানি।

আমি কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে আমাকে থামাইয়া দিয়া  
বলিল, থাক, আর কথায় কাজ নেই। তোমাকে আমি এতদিন যা ভেবেছিলুম তা  
ভুল। তুমি ঘুমোও—এ সমন্বে আর আমিও কোনদিন কথা কইব না, তুমিও কয়ে  
না। বলিয়া সে উঠিয়া তাহার নিজের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

পরদিন যথাসময়ে কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম এবং পিয়ারীর বাটীতেই  
আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উপরের দুইখানি ঘর ভিন্ন প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা  
বয়সের বিধবা স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ।

পিয়ারী কহিল, এরা সব আমার ভাড়াটে—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু  
হাসিল।

বলিলাম, হাসলে যে? ভাড়া আদায় হয় না বুঝি?

পিয়ারী কহিল, না। বরঞ্চ কিছু কিছু দিতে হয়।

তার মানে?

পিয়ারী এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তার মানে ভবিষ্যতের আশায়  
আমাকেই খাওয়াপরা দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়; বেঁচে থাকলে তবে ত  
পরে দেবে। এটা আর বুঝতে পারো না?

আমিও হাসিয়া বলিলাম, পারি বৈ কি। এমনিধারা ভবিষ্যতের আশায়  
কত লোককেই যে তোমাকে নিঃশব্দে অন্ধবন্ধ ঘোগাতে হয়, আমি তাই শুধু ভাবি!

তা ছাড়া দু-একজন আমার কুটুম্বও আছেন।

তাই নাকি? কিন্তু জানলে কি ক'রে?

পিয়ারী একটুখানি শুক্ষ হাসি হাসিয়া কহিল, মায়ের সঙ্গে এসে এই  
কাশীতেই যে আমার মরণ হয়েছিল, সে বুঝি তোমার মনে নেই? তখন অসময়ে

যাঁরা আমার সদ্গতি করেছিলেন, তাঁদের সে উপকার ত প্রাণ থাকতে ভোলা যায় না কিনা!

চুপ করিয়া রহিলাম। পিয়ারী বলিতে লাগিল, বড় দয়ার শরীর এঁদের। তাই কাছে এনে একটু কড়া নজরে রেখেচি যাতে লোকের আর বেশি উপকার করবার সুযোগ না পান।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমার বুকের ভেতরটায় কি আছে আমার মাঝে মাঝে চিরে দেখতে ইচ্ছা করে রাজলক্ষ্মী!

মলে দেখো! আচ্ছা, ঘরে গিয়ে একটুখানি শোও গে যাও। আমার খাবার তৈরি হলে তোমাকে তুলব অখন। বলিয়া সে হাত দিয়া ঘরটা দেখাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আমি অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার হাদয়ের আজ যে বিশেষ কোন নৃতন পরিচয় পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু আমার নিজের হাদয়ে এই সামান্য কাহিনীটা একটা নৃতন আবর্তের সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল।

রাত্রে পিয়ারী কহিল, তোমাকে বৃথা কষ্ট দিয়ে এতদূর নিয়ে এলুম। গুরুদেব তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে তোমাকে দেখাতে পারলুম না।

বলিলাম, সে জন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। আবার কলকাতায় ফিরে যাবে ত?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

কহিলাম, আমার সঙ্গে যাবার কি কোন আবশ্যক আছে? না থাকে ত আমি আর একটু পশ্চিম থেকে ঘুরে আসতে চাই।

পিয়ারী বলিল, বক্ষুর বিয়ের ত এখনো কিছু দেরি আছে, চল না, আমিও প্রয়াগে একবার স্নান করে আসি।

একটু মুক্ষিলে পড়িলাম। আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক খুড়া সেখানে কর্মেপলক্ষে বাস করিতেন, মনে করিয়াছিলাম, তাঁর বাসায় গিয়াই উঠিব। তা ছাড়া আরও কয়েকটি পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও সেইখানেই থাকিতেন।

পিয়ারী চক্ষের নিমেষে আমার মনের ভাব উপলক্ষ্মি করিয়া বলিল, আমি সঙ্গে থাকলে হয়ত কেউ দেখে ফেলতেও পারে, না?

অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, বাস্তবিক দুর্নাম জিনিসটা এমনি যে, লোকে মিথ্যে দুর্নামের ভয় না ক'রে পারে না।

পিয়ারী জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তা বটে। আর বছর আরাতে ত তোমাকে একরকম কোলে নিয়েই আমার দিন-রাত কাটল। ভাগিয়স সে অবস্থাটা কেউ দেখে ফেলেনি। সেখানে বুঝি তোমার কেউ চেনাশুনা বন্ধু-ট্র্যু ছিল না!

অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, আমাকে খোঁটা দেওয়া বৃথা, মানুষ-হিসাবে তোমার চেয়ে যে আমি অনেক ছোট, সে কথা ত অস্বীকার করিনে।

পিয়ারী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, খোঁটা! তোমাকে খোঁটা দিতে পারবো বলেই বুঝি তখন গিয়েছিলুম? দ্যাখো, মানুষকে ব্যথা দেবার একটা সীমা আছে—সেটা ডিসিয়ে যেও না।

এক মুহূর্ত স্তন্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিল, কলক্ষই বটে! কিন্তু আমি হ'লে এ কলক্ষ মাথায় নিয়ে লোককে বরঞ্চ ডেকে দেখাতুম, কিন্তু এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারতুম না।

বলিলাম, তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ—কিন্তু আমি যে অত্যন্ত ছোটমানুষ রাজলক্ষ্মী, তোমার সঙ্গে যে আমার তুলনাই হয় না।

রাজলক্ষ্মী দৃঢ়প্রস্তরে কহিল, প্রাণ যদি দিয়ে থাকি ত সে নিজের গরজে দিয়েচি, তোমার গরজে দিইনি। সেজন্য তোমাকে একবিন্দু কৃতজ্ঞ হতে হবে না। কিন্তু ছোটমানুষ ব'লে যে তোমাকে ভাবতে পারিনি। তা হলে ত বাঁচতুম, গলায়

দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়েতে পারতুম। বলিয়া সে প্রত্যন্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী চা দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলাম, কথাবার্তা বন্ধ নাকি?

সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, কিছু বলবে?

বলিলাম, চল প্রয়াগ থেকে একবার ঘুরে আসি গে।

বেশ ত, যাও না।

তুমিও চল।

অনুগ্রহ নাকি?

চাও না?

না। যদি সময় হয় চেয়ে নেব, এখন না।—বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়া শুধু একটা মস্ত নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না।

দুপুরবেলা খাবার সময় হাসিয়া কহিলাম, আচ্ছা লক্ষ্মী, আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে কি তুমি থাকতে পারো যে, এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করচ!

রাজলক্ষ্মী শান্ত-গভীর মুখে বলিল, সামনে থাকলে কেউ পারে না, আমিও পারব না। তা ছাড়া, সে আমার ইচ্ছেও নয়।

তবে ইচ্ছেটা কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কাল থেকেই ভাবচি, এই টানা-হেঁচড়া আর না থামালেই নয়। তুমিও একরকম স্পষ্টই জানিয়েচ, আমিও একরকম করে তা বুঝোচি। ভুল আমারই হয়েচে, সে নিজের কাছেও আমি স্বীকার করচি। কিন্তু—  
তাহাকে সহসা থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কি?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, କିନ୍ତୁ କିଛୁଇ ନା । କି ସେ ନିର୍ଜ ବାଚାଲେର ମତ ସେଚେ ସେଚେ ତୋମାର ପିଛନେ ପିଛନେ ସୁରେ ମରଚି,— ବଲିଆ ସେ ହଠାତ୍ ମୁଖଖାନା ଯେନ ସୃଗ୍ଣାୟ କୁଞ୍ଚିତ କରିଯା କହିଲ, ଛେଲେଇ ବା କି ଭାବଚେ, ଚାକର-ବାକରେରାଇ ବା କି ମନେ କରଚେ! ଛିଃ ଛିଃ, ଏ ଯେନ ଏକଟା ହାସିର ବ୍ୟାପାର କରେ ତୁଳେଚି ।

ଏକଟୁଥାନି ଥାମିଆ ବଲିଲ, ବୁଡ୍ଡୋବଯସେ ଏ-ସବ କି ଆମାୟ ସାଜେ! ତୁମି ଏଲାହାବାଦେ ସେତେ ଚାଇଛିଲେ, ତାଇ ଯାଓ । ତବେ ପାରୋ ଯଦି, ବର୍ମା ଯାବାର ଆଗେ ଏକବାର ଦେଖା କ'ରେ ଯେଯୋ । ବଲିଆ ସେ ଚଲିଆ ଗେଲ ।

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମାର କ୍ଷୁଧାରଓ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହଇଲ । ତାହାର ମୁଖ ଦେଖିଯା ଆଜ ଆମାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ହଇଲ, ଏ-ସବ ମାନ-ଅଭିମାନେର ବ୍ୟାପାର ନୟ । ସେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟି କି-ଏକଟା ଭାବିଆ ହିଁ କରିଯାଛେ ।

ବିକାଲବେଳାଯ ଆଜ ହିନ୍ଦୁଷ୍ଟାନୀ ଦାସୀ ଜଳଖାବାର ପ୍ରଭୃତି ଲଇଯା ଆସିଲେ ଏକଟୁ ଆଶର୍ଯ୍ୟ ହଇଯାଇ ପିଯାରୀର ସଂବାଦ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ଅଧିକତର ବିଶ୍ଵିତ ହଇଯା ଅବଗତ ହଇଲାମ, ପିଯାରୀ ବାଡ଼ି ନାଇ, ସାଜସଜ୍ଜା କରିଯା, ଜୁଡ଼ିଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯା କୋଥାଯ ଗିଯାଛେ । ଜୁଡ଼ିଗାଡ଼ିଇ ବା କୋଥା ହଇତେ ଆସିଲ, ବେଶଭୂଷା କରିଯାଇ ବା ତାହାର କୋଥାଯ ଯାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହଇଲ, କିଛୁଇ ବୁଝିଲାମ ନା—ତବେ ତାହାର ନିଜେର ମୁଖେର କଥାଟାଇ ମନେ ପଡ଼ିଲ ବଟେ ଯେ, ସେ ଏହି କାଶିତେଇ ଏକଦିନ ମରିଯାଇଛିଲ ।

କିଛୁଇ ବୁଝିଲାମ ନା ସତ୍ୟ, ତବୁଓ ସମ୍ମତ ମନଟାଇ ଯେନ ଏହି ସଂବାଦେ ବିଶ୍ଵାଦ ହଇଯା ଗେଲ ।

ସନ୍ଧ୍ୟା ହଇଲ, ଘରେ ଆଲୋ ଜୁଲିଲ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫିରିଲ ନା ।

ଚାଦର କାଁଧେ ଫେଲିଯା ଏକଟୁ ବେଡ଼ାଇବାର ଜନ୍ୟ ବାହିର ହଇଯା ପଡ଼ିଲାମ । ପଥେ ପଥେ ଘୁରିଯା କତ କି ଦେଖିଯା ଶୁଣିଯା ରାତ୍ରି ଦଶଟାର ପର ବାଡ଼ି ଆସିଯା ଶୁଣିଲାମ, ପିଯାରୀ ତଥନ୍ତର ଫିରେ ନାଇ । ବ୍ୟାପାର କି? କେମନ ଯେନ ଏକଟା ଭୟ କରିତେ ଲାଗିଲ । ରତନକେ ଡାକିଯା ସମ୍ମତ ସଙ୍କୋଚ ବିସର୍ଜନ ଦିଯା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତତ୍ତ୍ଵ ଲଇବ କି ନା

ভাবিতেছি, একটা ভারি জুড়ির শব্দে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি প্রকাণ ফিটন  
আমাদের বাড়ির সম্মুখেই থামিয়াছে।

পিয়ারী নামিয়া আসিল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার সর্বাঙ্গের জড়োয়া  
অলঙ্কার ঝক্কঝক্ক করিয়া উঠিল। যে দুইজন ভদ্রলোক গাড়িতে বসিয়াছিলেন,  
তাঁহারা মৃদুকণ্ঠে বোধ করি

পিয়ারীকে সম্ভাষণ করিয়া থাকিবেন—শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা  
বঙ্গালী কি বিহারী তাহাও চিনিতে পারিলাম না—চাবুক খাইয়া জুড়ি ঘোড়া চক্ষের  
পলকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

## পনর

রাজলক্ষ্মী আমার তত্ত্ব লইতে সেই সাজেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া থিয়েটারী গলায় কহিলাম, ওরে পাষণ্ড রোহিণি! তুই গোবিন্দলালকে চিনিস না? আহা! আজ যদি আমার একটা পিস্তল থাকিত! কিংবা একখানা তলোয়ার!

রাজলক্ষ্মী শুক্রকগ্নে কহিল, তা হলে কি করতে?—খুন?

হাসিয়া বলিলাম, না ভাই পিয়ারী, আমার অত বড় নবাবী শখ নেই। তা ছাড়া এই বিংশ-শতাব্দীতে এমন নিষ্ঠুর নরাধম কে আছে যে, সংসারের এই এত বড় একটা আনন্দের খনি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেবে? বরঞ্চ আশীর্বাদ করি, হে বাইজীকুলরাণি! তুমি দীর্ঘজীবিনী হও, তোমার রূপ ত্রিলোকজয়ী হোক, তোমার কষ্ট বীণানিন্দিত এবং ঐ দুটি চরণকমলের নৃত্য উর্বশী তিলোত্মার গর্ব খর্ব করুক—আমি দূর হইতে তোমার জয়গান করিয়া ধন্য হই!

পিয়ারী কহিল, এ-সকল কথার অর্থ?

বলিলাম, অর্থমনর্থম্। সে যাক আমি এই একটার ট্রেনে বিদায় হলুম। সম্প্রতি প্রয়াগ, পরে বাঙ্গালীর পরম তীর্থ চাকরিস্থান—অর্থাৎ বর্মা। যদি সময় এবং সুযোগ হয়, দেখা ক'রে যাবো।

আমি কোথায় গিয়েছিলুম, তাও শোনা তুমি আবশ্যক মনে কর না?

কিছু না, কিছু না।

এই ছুতো পেয়ে কি তুমি একেবারে চলে যাচ্ছো?

বলিলাম, পাপমুখে এখনও বলতে পারিনে। এ গোলকধাঁধা যদি পার হতে পারি তবেই।

পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমার  
ওপর যা ইচ্ছে তাই অত্যাচার করতে পারো?

কহিলাম, যা ইচ্ছে? একেবারেই না। বরঞ্চ জ্ঞানে-অজ্ঞানে অত্যাচার যদি  
বিন্দুমাত্রও কখনো করে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

তার মানে আজ রাত্রেই তুমি চলে যাবে?

হাঁ।

আমাকে বিনা-অপরাধে শাস্তি দেবার তোমার অধিকার আছে?

না, তিলমাত্র নেই। আমার যাওয়াকেই যদি শাস্তি দেওয়া মনে কর, তা  
হলে অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

পিয়ারী হঠাৎ জবাব দিল না। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া  
থাকিয়া কহিল, আমি কোথায় গিয়েছিলুম, শুনবে না?

না। আমার মত নিয়ে যাওনি যে, ফিরে এসে তার কাহিনী শোনাবে। তা  
ছাড়া আমার সে সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পিয়ারী আহত ফণিনীর ন্যায় সহসা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, আমারও  
শোনাবার প্রবৃত্তি নেই। আমি কারও কেনা বাঁদী নই যে, কোথায় যাবো, না যাবো,  
তারও অনুমতি নিতে হবে! যাবে যাও—বলিয়া রূপ ও অলঙ্কারের একটা তরঙ্গ  
তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক পরে সদর-দরজায় একখানা গাড়ি  
থামিবার আওয়াজ পাইয়া ব্যাগটা হাতে লইতে যাইতেছি, পিয়ারী আসিয়া পিছনে  
দাঁড়াইল।

কহিল, এ কি তুমি ছেলেখেলা মনে কর? আমাকে একলা ফেলে রেখে  
চলে যাবে চাকর-বাকরেরাই বা কি ভাববে? তুমি কি এদের কাছেও আমার মুখ  
রাখবে না?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, তোমার চাকরদের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া  
ক'রো—আমার সঙ্গে তার সমন্বন্ধ নেই।

তা না হয় হ'লো, কিন্তু ফিরে বন্ধুকেই বা আমি কি জবাব দেব?

এই জবাব দেবে যে তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।

এ কি কখনো বিশ্বাস করে?

যাতে বিশ্বাস করে সেই রকম কিছু একটা বানিয়ে ব'লো।

পিয়ারী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, যদি অন্যায়ই একটা করে থাক,  
তার কি মাপ নেই? তুমি ক্ষমা না করলে আমাকে আর কে করবে?

বলিলাম, পিয়ারী, এগুলো যে দাসীবাঁদীদের মত কথা হচ্ছে। তোমার  
মুখে ত মানচে না!

এই বিদ্রূপের কোন উত্তর পিয়ারী সহসা দিতে পারিল না, আরত্মুখে  
চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে প্রাণপণে আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা  
করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বাহির হইতে গাড়োয়ান উচ্চেঃস্বরে  
বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই  
এবার পিয়ারী ধপ্ করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া রূদ্ধকণ্ঠে বলিয়া  
উঠিল, আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনো করতেই পারিনে, তা জেনেও যদি  
শাস্তি দিতে চাও, নিজ হাতে দাও, কিন্তু এই একবাড়ি লোকের কাছে আমার  
মাথা হেঁট করে দিও না। আজ এমন করে তুমি চলে গেলে আমি কারও কাছে  
আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবো না।

হাতের ব্যাগটা রাখিয়া দিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলাম,  
আচ্ছা আজ তোমার-আমার একটা শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাব। তোমার আজকের  
আচরণ আমি মাপ করলুম। কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেছি, দুজনের দেখা-  
সাক্ষাৎ হওয়া আর চলবে না।

পিয়ারী তাহার একান্ত উৎকর্ষিত মুখ আমার মুখের প্রতি তুলিয়া সভয়ে  
প্রশ্ন করিল, কেন?

কহিলাম, অপ্রিয় সত্য সহ্য করতে পারবে?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া অঙ্গুটে বলিল, পারবো।

কিন্তু ব্যথা একজন সহিতে স্বীকার করিলেই কিছু ব্যথা দেওয়ার কাজটা  
সহজ হইয়া উঠে না। আমাকে অনেকক্ষণ স্তৰ্ণ হইয়া বসিয়া ভাবিতে হইল। কিন্তু  
আজ যে কোনমতেই আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না, তাহা স্থির করিয়াছিলাম। তাই  
অবশ্যে ধীরে ধীরে বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার আজকের ব্যবহার ক্ষমা করা যত  
কঠিনই হোক, আমি করলুম। কিন্তু নিজে তুমি এ লোভ কিছুতেই ত্যাগ করতে  
পারবে না। তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ-গুণ। অনেকের ওপর তোমার  
অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিস আর নেই। তুমি আমাকে  
ভালবাসতে পারো, শুন্দা করতে পারো, আমার জন্যে অনেক দুঃখ সহিতেও পারো,  
কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী মৃদুকষ্টে কহিল, অর্থাৎ এরকম কাজ আমি মাঝে মাঝে করবই?

প্রত্যন্তে আমি শুধু মৌন হইয়া রহিলাম। সে নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে  
থাকিয়া বলিল, তার পরে?

কহিলাম, তার পরে একদিন খেলাঘরের মত সমস্ত ভেঙ্গে পড়বে। সে  
দিনের সেই হীনতা থেকে আজ তুমি আমাকে চিরদিনের মত রেহাই দাও—  
তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

পিয়ারী বহুক্ষণ নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ  
তুলিল, দেখিলাম, তাহার দু'চোখ বহিয়া জল পড়িতেছে। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া  
জিঙ্গাসা করিল, তোমাকে কি কখনো কোন ছোট কাজে আমি প্রবৃত্তি দিয়েছি?

এই বিগলিত অশ্রুধারা আমার সংযমের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল;  
কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইতে দিলাম না। শান্ত ও দৃঢ়তার সহিত

বলিলাম, না, কোন দিন নয়। তুমি নিজে ছোট নও, ছোট কাজ তুমি নিজেও কখনো করতে পারো না, অপরকেও করতে দিতে পারো না।

একটু থামিয়া কহিলাম, কিন্তু লোকে ত মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীটিকে চিনবে না, তারা চিনবে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হ'য়ে যাবো, সে কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না? সে তুমি কেমন করে বাধা দেবে বল ত?

রাজলক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ছোট হওয়া বলে না!

বলিলাম, ভগবানের চক্ষে না হতে পারে, কিন্তু সংসারের চক্ষুও ত উপেক্ষা করবার বস্তু নয় লক্ষ্মী!

রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু তাঁর চক্ষুকেই ত সকলের আগে মানা উচিত।

কহিলাম, এক হিসাবে সে কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর চক্ষু ত সর্বদা দেখা যায় না! যে দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি রাজলক্ষ্মী! তাকেও ত অস্বীকার করা অন্যায়।

সেই ভয়ে আমাকে তুমি জন্মের মত ত্যাগ করে চলে যাবে?

কহিলাম, আবার দেখা হবে। তুমি যেখানই থাকো না কেন, বর্মা যাবার পূর্বে আমি আর একবার দেখা করে যাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া অশ্রুবিকৃতকর্ত্তে বলিয়া উঠিল, যাবে যাও। কিন্তু তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকেই ত্যাগ করে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম, একথা আমি কখনো মানবো না। বলিয়া দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘাড়ি খুলিয়া দেখিলাম, এখনো সময় আছে, এখনো হয়ত একটার ট্রেন ধরিতে পারি। নিঃশব্দে ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া গাড়িতে গিয়া বসিলাম।

বকশিশের লোভে গাড়ি প্রাণপণে ছুটিয়া স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই পশ্চিমের ট্রেন প্ল্যাটফরম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। খবর লইয়া জানিলাম, আধঘণ্টা পরেই একটা ট্রেন কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবে। ভাবিলাম, সেই ভাল, গ্রামের মুখ বহুদিন দেখি নাই—সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়াই বাকি দিন-কয়টা কাটাইয়া দিব।

সুতরাং পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বের টিকিট কিনিয়াই আধঘণ্টা পরে এক বিপরীতগামী বাষ্পীয় শকটে উঠিয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া গেলাম।

বহুকাল পরে আবার একদিন অপরাহ্নবেলায় গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। আমার বাড়িটা তখন আমাদের আত্মীয়-আত্মীয়া ও তাঁহাদের আত্মীয়-আত্মীয়ায় পরিপূর্ণ। সমস্ত ঘরদুয়ার জুড়িয়া তাঁহারা আরামে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, ছুঁচটি রাখিবার স্থান নাই।

আমার আকস্মিক আগমনে ও বাস করিবার সকল শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে মুখ কালি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! এ ত সুখের কথা, আহুদের কথা! এইবার একটি বিয়ে-থা করে সংসারী হ শ্রীকান্ত! আমরা দেখে চক্ষু জুড়েই।

বলিলাম, সেই জন্যেই ত এসেচি। এখন আপাততঃ আমার মায়ের ঘরটা ছেড়ে দাও, আমি হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুই।

আমার বাবার এক মাতুল-কন্যা তথায় স্বামী-পুত্র লইয়া কিছুদিন হইতে বাস করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন, তাই ত!

বলিলাম, আচ্ছা আচ্ছা, আমি বাহিরের ঘরেই নাহয় থাকব—ঘরে ঢুকিয়া দেখি এককোণে চুন এবং এককোণে সুরকি গাদা করা আছে। তাহারও মালিক বলিলেন, তাই ত। এগুলো দেখেশুনে কোথাও এখন সরাতে হবে দেখচি। এ ঘরটা ত ছোট নয়—ততক্ষণ না হয় এই ধারে একটা তত্ত্বাপোশ পেতে—কি বলিস্ শ্রীকান্ত!

বলিলাম, আচ্ছা, রাত্রির মত নাহয় তাই হোক।

বন্ধুতঃ এমনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে হোক একটু শুইতে পাইলেই যেন বাঁচি, এমনি মনে হইতেছিল। বর্মায় সেই অসুখ হইতে শরীর আমার কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে নাই, ভিতরে ভিতরে একটা গ্লানি প্রায়ই অনুভব করিতাম। তাই সন্ধ্যার পর হইতে মাথাটা টিপ্পিপ করিতে লাগিল, তখন বিশেষ আশ্চর্য হইলাম না।

রাঙাদিদি আসিয়া বলিলেন, ওটা গরম। ভাত খেয়ে ঘুমোলেই সেরে যাবে।

তথাক্ত। তাই হইল। গুরুজনের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া গরম কাটাইতে অন্ন আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। সকালে ঘুম ভঙ্গিল—বেশ একটু জ্বর লাইয়া।

রাঙাদিদি আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, কিছুই না, ওটা ম্যালোয়ারী। ওতে ভাত খাওয়া চলে।

কিন্তু আজ আর সায় দিতে পারিলাম না। বলিলাম, না, রাঙাদি, আমি এখনো তোমাদের ম্যালোয়ারী রাজার প্রজা নই। তাঁর দোহাই পেড়ে অত্যাচার হয়ত আমার সইবে না। আজ আমার একাদশী।

সমস্ত দিন-রাত্রি গেল, পরদিন গেল, তাহার পরের দিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। গোবিন্দভাঙ্গার এ-বেলা ও-বেলা আসিতে লাগিলেন, নাড়ি টিপিয়া, জিব দেখিয়া, পেট ঠুকিয়া ভাল ভাল মুখরোচক সুস্মাদু ঔষধ যোগাইয়া মাত্র ‘কেনা দাম’টুকু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন করিয়া সপ্তাহ গড়াইয়া গেল। বাবার মাতুল—আমার ঠাকুরদাদা আসিয়া বলিলেন, তাই ত ভায়া, আমি বলি কি, সেখানে খবর দেওয়া যাক—তোমার পিসিমা আসুক। জ্বরটা কেমন যেন।

কথাটা সম্পূর্ণ না করিলেও বুঝিলাম, ঠাকুরদাদা একটু মুক্ষিলে পড়িয়াছেন। এমনিভাবে আরও চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু জুরের কিছুই হইল না। সেদিন সকালে গোবিন্দভাঙ্গার আসিয়া যথারীতি ওষধ দিয়া তিনি দিনের বাকি কেনা দামটুকু প্রার্থনা করিলেন। শ্যে হইতে কোনমতে হাত বাড়াইয়া ব্যাগ খুলিলাম—মনিব্যাগ নাই। শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ব্যাগ উপুড় করিয়া ফেলিয়া তন্ম তন্ম করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু যাহা নাই, তাহা পাওয়া গেল না।

গোবিন্দভাঙ্গার ব্যাপারটা অনুমান করিয়া ব্যস্ত হইয়া বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিছু গিয়াছে কি না।

বলিলাম, আজ্ঞে না, যায়নি কিছুই।

কিন্তু তাঁহার ওষধের মূল্য যখন দিতে পারিলাম না, তখন তিনি সমস্তই বুঝিয়া লইলেন। স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিল কত?

যৎসামান্য।

চাবিটা একটু সাবধানে রাখতে হয় বাবাজী। যাক, তুমি আমার পর নও, দামের জন্যে ভেবো না, ভাল হও, তার পরে যখন সুবিধে হবে পাঠিয়ে দিয়ো, চিকিৎসার ক্রটি হবে না। এই বলিয়া ডাঙ্গারবাবু পর হইয়াও পরমাত্মায়ের অধিক সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বলিলাম, একথা কেউ যেন না শোনে।

ডাঙ্গারবাবু বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, সে বোঝা যাবে।

পাড়াগাঁয়ে বিশ্বাসের উপর টাকা ধার দেওয়া প্রথা নাই। টাকা কেন, শুধু হাতে একটা সিকি ধার চাহিলেও সবাই বুবিবে, লোকটা নিছক তামাশা করিতেছে। কারণ, সংসারে এমন নির্বোধও কেহ আছে, শুধু হাতে ধার চায়, একথা পাড়াগাঁয়ের লোক ভাবিতেই পারে না; সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করিলাম

না। প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম এ কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাইব না। একটু সুস্থ হইলেই যাহা হয় করিব—সম্ভবতঃ অভয়াকে লিখিয়া টাকা আনাইব, মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সে সময় মিলিল না। সহসা যত্নের সুর তারা হইতে উদারায় নামিয়া পড়িতেই বুঝিলাম, যেমন করিয়াই হোক, আমার বিপদটা বাটীর ভিতরে আর অবিদিত নাই।

অবস্থাটা সংক্ষেপে জানাইয়া রাজলক্ষ্মীকে একখানা চিঠি লিখিলাম বটে, কিন্তু নিজেকে এত হীন, এত অপমানিত মনে হইতে লাগিল যে, কোনমতেই পাঠাইতে পারিলাম না, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। পরদিন এমনি কাটিল। কিন্তু তাহার পরে আর কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। সেদিন কোনদিকে চাহিয়া আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে একপ্রকার মরিয়া হইয়াই কিছু টাকার জন্য রাজলক্ষ্মীকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া খান-দুই পত্র লিখিয়া পাটনা ও কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

সে যে টাকা পাঠাইবেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তথাপি সেদিন সকাল হইতেই কেমন যেন উৎকর্ষিত সংশয়ে ডাকপিয়নের অপেক্ষায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া পথের উপর দৃষ্টি পাতিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

সময় বহিয়া গেল। আজ আর তাহার আশা নাই মনে করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে দূরে একখানা গাড়ির শব্দে চকিত হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ি আসিয়া ঠিক সুমুখেই থামিল। দেখি, কোচমানের পাশে বসিয়া রতন। সে নীচে নামিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিতেই যাহা চোখে পড়িল, তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করা কঠিন।

প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই গ্রামের পথের উপর রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তার অতীত।

রতন কহিল, ঐ যে বাবু!

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଦ୍ଧ ଏକବାର ଆମାର ଦିକେ ଚାହିୟା ଦେଖିଲ ମାତ୍ର । ଗାଡ଼ୋଯାନ କହିଲ, ମା, ଦେଇ ହବେ ତ? ଘୋଡ଼ା ଖୁଲେ ଦିଇ?

ଏକଟୁ ଦାଁଡ଼ାଓ, ବଲିଯା ସେ ଅବିଚଳିତ ସୀର ପଦକ୍ଷେପେଇ ଆମାର ଘରେ ଆସିଯା ପ୍ରବେଶ କରିଲ । ପ୍ରଗାମ କରିଯା ପାଯେର ଧୂଳା ମାଥାଯ ଲାଇୟା ହାତ ଦିଯା ଆମାର କପାଲେର, ବୁକେର ଉତ୍ତାପ ଅନୁଭବ କରିଯା ବଲିଲ, ଏଥନ ଆର ଜୁର ନାହିଁ । ଓ-ବେଲାଯ ସାତଟାର ଗାଡ଼ିତେ ଯାଓୟା ଚଲବେ କି? ଘୋଡ଼ା ଖୁଲେ ଦିତେ ବଲବ?

ଆମି ଅଭିଭୂତେର ନ୍ୟାୟ ତାହାର ମୁଖେର ପାନେ ଚାହିୟାଇ ଛିଲାମ । କହିଲାମ, ଏଇ ଦୁଦିନ ଜୁରଟା ବନ୍ଧ ହେୟଚେ । କିନ୍ତୁ ଆମାକେ କି ଆଜଇ ନିଯେ ସେତେ ଚାଓ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ନାହଯ ଆଜ ଥାକ । ରାତ୍ରିରେ ଆର ଗିଯେ କାଜ ନେଇ; ହିମ ଲାଗତେ ପାରେ, କାଳ ସକାଲେଇ ଯାବେ ।

ଏତକ୍ଷଣେ ଯେନ ଆମାର ଚୈତନ୍ୟ ଫିରିଯା ଆସିଲ । ବଲିଲାମ, ଏ ଗ୍ରାମେ, ଏ ପାଡ଼ାର ମଧ୍ୟେ ତୁମି ତୁକଲେ କୋନ୍ ସାହସେ? ତୁମି କି ମନେ କର ତୋମାକେ କେଉ ଚିନିତେ ପାରବେ ନା?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହଜେଇ କହିଲ, ବେଶ ଯା ହୋକ! ଏଇଥାନେଇ ମାନୁଷ ହଲାମ, ଆର ଏଥାନେ ଆମାକେ ଚିନିତେ ପାରବେ ନା? ସେ ଦେଖବେ ସେଇ ତ ଚିନବେ ।

ତବେ?

କି କରବ ବଲ? ଆମାର କପାଲ, ନହିଲେ ତୁମି ଏସେ ଏଥାନେ ଅସୁଖେ ପଡ଼ିବେ କେନ?

ଏଲେ କେନ? ଟାକା ଚେଯେଛିଲାମ, ଟାକା ପାଠିଯେ ଦିଲେଇ ତ ହ'ତୋ ।

ତା କି କଥନ୍ ଓ ହୟ? ଏତ ଅସୁଖ ଶୁନେ କି ଶୁଦ୍ଧ ଟାକା ପାଠିଯେଇ ହିଂର ଥାକତେ ପାରି?

ବଲିଲାମ, ତୁମି ନାହଯ ହିଂର ହଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମାକେ ସେ ଭୟାନକ ଅଛିର କରେ ତୁଲଲେ । ଏଥନି ସବାଇ ଏସେ ପଡ଼ିବେ, ତଥନ ତୁମିଇ ବା ମୁଖେ ଦେଖାବେ କି କରେ, ଆର ଆମିଇ ବା ଜବାବ ଦେବ କି!

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে শুধু আর-একবার ললাট স্পর্শ করিয়া কহিল, জবাব  
আর কি দেবে—আমার অদৃষ্ট!

তাহার উপেক্ষা এবং উদাসীন্যে নিতান্ত অসহিষ্ণুও হইয়া বলিলাম, অদৃষ্টই  
বটে! কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছো? এখানে মুখ  
দেখাতেও তোমার বাধলো না?

রাজলক্ষ্মী তেমনি উদাসকগ্রে উত্তর দিল, লজ্জা-সরম আমার যা কিছু  
এখন সব তুমি।

ইহার পরে আবার বলিবই বা কি, শুনিবই বা কি! চোখ বুজিয়া চুপ  
করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা কহিলাম, বক্ষুর বিয়ে নির্বিশ্লে হয়ে গেছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

এখন কোথা থেকে আসচো? কলকাতা থেকে?

না, পাটনা থেকে। সেইখানেই তোমার চিঠি পেয়েচি।

আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়?—পাটনায়?

রাজলক্ষ্মী একটু ভাবিয়া কহিল, একবার সেখানে ত তোমাকে যেতেই  
হবে। আগে কলকাতায় যাই চল, সেখানে দেখিয়ে শুনিয়ে ভাল হলে—তারপরে—

প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু তার পরেই বা আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন  
শুনি!

রাজলক্ষ্মী কহিল, দানপত্র ত সেখানেই রেজেস্ট্রী করতে হবে। লেখাপড়া  
সব একরকম ক'রে রেখেই এসেচি বটে, কিন্তু তোমার ভুকুম ছাড়া ত হতে  
পারবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের দানপত্র? কাকে কি  
দিলে?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ବାଡ଼ି-ଦୁଟୋ ତ ବନ୍ଧୁକେଇ ଦିଯେଚି । ଶୁଦ୍ଧ କାଶୀର ବାଡ଼ିଟି ଗୁରୁଦେବକେ ଦେବ ଭେବେଚି । ଆର କୋମ୍ପାନିର କାଗଜ, ଗୟନା-ଟ୍ୟନାଗୁଲୋ ତ ଆମାର ବୁଦ୍ଧି-ବିବେଚନାମତ ଏକରକମ ଭାଗ କରେ ଏସେଚି, ଏଥନ ଶୁଦ୍ଧ ତୁମି ବଲଲେଇ—

ବିଶ୍ୱଯେର ଆର ଅବଧି ରହିଲ ନା । କହିଲାମ, ତା ହଲେ ତୋମାର ନିଜେର ରଇଲ କି? ବନ୍ଧୁ ଯଦି ତୋମାର ଭାର ନା ନେଯ? ଏଥନ ତାର ନିଜେର ସଂସାର ହ'ଲୋ, ଯଦି ସେ ଶେଷେ ତୋମାକେଇ ଖେତେ ନା ଦେଯ?

ଆମି କି ତାଇ ଚାଇଚି ନାକି? ନିଜେର ସମସ୍ତ ଦାନ କ'ରେ କି ଅବଶେଷେ ତାରଇ ହାତ-ତୋଳା ଖେଯେ ଥାକବୋ? ତୁମି ତ ବେଶ!

ଅଧିର୍ୟ ଆର ସଂବରଣ କରିତେ ନା ପାରିଯା ଉଠିଯା ବସିଯା କ୍ରୁଦ୍ଧସ୍ଵରେ ବଲିଯା ଉଠିଲାମ, ହରିଶନ୍ଦ୍ରେର ମତ ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ତୋମାକେ ଦିଲେ କେ? ଖାବେ କି? ବୁଡ୍ଢୋ ବସେ କାର ଗଲଗ୍ରହ ହତେ ଯାବେ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ତୋମାକେ ରାଗ କରତେ ହବେ ନା, ତୁମି ଶୋଓ । ଆମାକେ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଦିଯେଚେ, ସେଇ ଆମାକେ ଖେତେ ଦେବେ । ଆମି ହାଜାର ବୁଡ୍ଢୋ ହଲେଓ ସେ କଥନଓ ଆମାକେ ଗଲଗ୍ରହ ଭାବବେ ନା । ତୁମି ମିଥ୍ୟେ ମାଥା ଗରମ କ'ରୋ ନା—ସ୍ଥିର ହୟେ ଶୋଓ ।

ସ୍ଥିର ହଇଯାଇ ଶୁଇଯା ପଡ଼ିଲାମ । ସମ୍ମୁଖେର ଖୋଲା ଜାନାଲା ଦିଯା ଅଞ୍ଚେନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକରରଙ୍ଗିତ ବିଚିତ୍ର ଆକାଶ ଚୋଖେ ପଡ଼ିଲ । ସ୍ଵପ୍ନାବିଷ୍ଟେର ମତ ନିର୍ନ୍ମିଷ-ଦୃଷ୍ଟିତେ ସେଇ ଦିକେ ଚାହିୟା ମନେ ହଇତେ ଲାଗିଲ—ଏମନି ଅପରାପ ଶୋଭାଯ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟେ ଯେନ ବିଶ୍ଵଭୂବନ ଭାସିଯା ଯାଇତେଛେ । ତ୍ରିସଂସାରେର ମଧ୍ୟେ ରୋଗ-ଶୋକ, ଅଭାବ-ଅଭିଯୋଗ, ହିଂସା-ଦ୍ରେଷ କୋଥାଓ ଯେନ ଆର କିଛୁ ନେଇ ।

ଏଇ ନିର୍ବାକ ନିଷ୍ଠକ୍ରତାୟ ମଘ ହଇଯା ଯେ ଉଭ୍ୟେର କତକ୍ଷଣ କାଟିଯାଛିଲ ବୋଧ କରି କେହି ହିସାବ କରି ନାହିଁ, ସହସା ଦ୍ୱାରେର ବାହିରେ ମାନୁଷେର ଗଲା ଶୁନିଯା ଦୁଜନେଇ ଚମକିଯା ଉଠିଲାମ । ଏବଂ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୟା ଛାଡ଼ିଯା ଉଠିବାର ପୂର୍ବେଇ ଡାଙ୍ଗାରବାବୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଠକୁରଦାକେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇଯା ପ୍ରବେଶ କରିଲେନ ।

কিন্তু সহসা তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরদা যখন দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, তখন খবরটা তাঁহার কানে গিয়াছিল বটে, কে একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে গাড়ি করিয়া আমার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক হইতে পারে, তাহা বোধ করি কাহারও কল্পনায়ও আসে নাই। সেই জন্যই বোধ হয় এখন পর্যন্ত বাড়ির মেয়েরা কেহ বাহিরে আসে নাই।

ঠাকুরদা অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাজলক্ষ্মীর আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে।

ডাঙ্গারবাবুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, ছোটখুড়ো, আমারও যেন মনে হচ্ছে এঁকে কোথায় দেখেছি।

আমি আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। সেই নিমেষেই কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলিয়া উঠিল, শ্রীকান্ত, এই সর্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমার জন্যেই এই দুঃখ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

একবার আমার সর্বদেহ কষ্টকিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, আমার সত্যে কাজ নাই, আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব। এবং পরক্ষণেই তাহার হাতের উপর একটি চাপ দিয়া কহিলাম, তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী! ঠাকুরদা, ডাঙ্গারবাবু এঁদের প্রণাম কর।

পলকের জন্য দুজনের চোখাচোখি হইল, তাহার পরে সে উঠিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

## তৃতীয় পর্ব

### এক

একদিন যে ভ্রমণকাহিনীর মাঝখানে অকস্মাত যবনিকা টানিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছিলাম, আবার একদিন তাহাকেই নিজের হাতে উদ্ঘাটিত করিবার আর আমার প্রবৃত্তি ছিল না। আমার সেই পল্লীগ্রামের যিনি ঠাকুরদাদা তিনি যখন আমার সেই নাটকীয় উক্তির প্রত্যুভৱে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন এবং রাজলক্ষ্মীর ভূমিষ্ঠ প্রণামের প্রত্যুভৱে শুধু যেভাবে শশব্যস্তে দুই পা হটিয়া গিয়া বলিলেন, তাই নাকি? আহা, বেশ বেশ—বেঁচেবর্তে থাকো! বলিয়া সকৌতুকে ডাক্তারটিকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন রাজলক্ষ্মীর মুখের যে ছবি দেখিয়াছিলাম সে ভুলিবার বস্ত নয়, ভুলিও নাই; কিন্তু ভাবিয়াছিলাম সে আমারই একান্ত আমার—বহির্জগতে তাহার যেন কোন প্রকাশ কোনদিনই না থাকে—কিন্তু এখন ভাবিতেছি, এ ভালই হইল যে, সেই বহুদিবসের বক্ষ দুয়ার আবার আমাকে আসিয়াই খুলিতে হইল। যে অজানা রহস্যের উদ্দেশে বাহিরের ক্রুদ্ধ সংশয় অবিচারের রূপ ধরিয়া নিরস্তর ধাক্কা দিতেছে—এ ভালই হইল যে, সেই অবরুদ্ধ দ্বার নিজের হাতেই অর্গলমুক্ত করিবার অবকাশ পাইলাম।

ঠাকুরদাদা চলিয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল স্তন্ধুভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া একটুখানি নিষ্ফল হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, পায়ের ধূলা নিতে গিয়ে আমি তাঁকে ছুঁয়ে ফেলতুম না; কিন্তু কেন তুমি ও কথা বলতে গেলে? তার ত কোন দরকার ছিল না! এ শুধু—

বাস্তবিক এ শুধুই কেবল আপনাদের আপনি অপমান করিলাম। ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাজারের বাইজী অপেক্ষা বিধবা-বিবাহের পত্নী যে ইঁহাদের কাছে কত উচ্চ আসন পায় না—সুতরাং নীচেই নামিলাম, কাহাকেও

এতটুকু তুলিতে পারিলাম না, এই কথাটাই বলিতে গিয়া রাজলক্ষ্মী আর শেষ করিতে পারিল না।

সমস্তই বুঝিলাম। আর এই অবমানিতার সম্মুখে বড় কথার আস্ফালন করিয়া কথা বাঢ়াইতে প্রযুক্তি হইল না। যেমন নিঃশব্দে পড়িয়াছিলাম, তেমনি নীরবেই পড়িয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর একটা কথাও কহিল না, ঠিক যেন আপনার ভাবনার মধ্যে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল; তার পরে সহসা অত্যন্ত কাছে কোথাও ডাক শুনিয়া যেন চমক ভাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রতনকে ডাকিয়া কহিল, গাড়িটা শীগ়গির ঠিক করতে বলে দে রতন, নইলে সেই রাত্রি এগারটার ট্রেনে আবার যেতে হবে। কিন্তু সে হলে কিছুতেই চলবে না—ভারি হিম লাগবে।

মিনিট-দশেকের মধ্যেই রতন আমার ব্যাগটা লইয়া গাড়ির মাথার তুলিয়া দিল এবং আমার শোবার বিছানাটা বাঁধিয়া লইবার ইঙ্গিত জানাইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে আর আমি একটা কথাও কহি নাই, এখনও কোন প্রশ্ন করিলাম না। কোথা যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়া বসিলাম।

দিনকয়েক পূর্বেই এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আজ আবার তেমনি এক সায়াহ্বেলায় নীরবে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলাম। সেদিনও কেহ আদর করিয়া গ্রহণ করে নাই, আজিও কেহ সন্ধে বিদায় দিতে অগ্রসর হইয়া আসিল না। সেদিনও এমনিই ঘরে ঘরে তখন শাঁখ বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমনিই বসুমঞ্জিকদের গোপাল-মন্দির হইতে আরতির কাঁসরঘণ্টার রব অস্পষ্ট হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। তথাপি সেদিনের সঙ্গে আজিকার প্রভেদটা যে কত বড়, সে কেবল আকাশের দেবতারাই দেখিতে লাগিলেন।

বাঙ্গলার এক নগণ্য পল্লীর জীর্ণ ভগ্ন গৃহের প্রতি মমতা আমার কোনকালেই ছিল না, ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়াকেও ইতিপূর্বে আমি ক্ষতিকর বলিয়া কোনদিনই বিবেচনা করি নাই; কিন্তু আজ যখন নিতান্ত অনাদরের মধ্য দিয়াই এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, কোনদিন কোন ছলে ইহাতে আবার কখনো প্রবেশ করিব তাহার কল্পনা পর্যন্ত যখন মনে স্থান দিতে পারিলাম না, তখনই এই অস্বাস্থ্যকর সামান্য গ্রামখানি একেবারে সকল দিক দিয়া আমার চোখের উপর অসামান্য হইয়া দেখা দিল; এবং যে গৃহ হইতে এইমাত্র নির্বাসিত হইয়া আসিলাম, আমার সেই পিতৃ-পিতামহের জীর্ণ মলিন আবাসখানির প্রতি আজ যেন আর লোভের অবধি রাখিল না।

রাজলক্ষ্মী নীরবে প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখের আসনটি গ্রহণ করিল এবং বোধ হয় কদাচিৎ কোন পরিচিত পথিকের অশোভন কৌতুহল হইতে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিতেই গাড়ির এককোণে মাথা রাখিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রেলস্টেশনের উদ্দেশে আমরা যখন যাত্রা করিলাম তখন সূর্যদেব বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথের দুই ধারে যদৃচ্ছা-বর্ধিত বঁচি, শিয়াকুল এবং বেতবন সঙ্কীর্ণ পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করিয়াছে এবং মাথার উপর আম-কাঁঠালের ঘন সারি শাখা মিলাইয়া স্থানে স্থানে সন্ধ্যার আঁধার যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া গাড়ি যখন অত্যন্ত সাবধানে অত্যন্ত মন্ত্রের গমনে চলিতে লাগিল, আমি তখন দু'চক্ষু মেলিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া কত কি যেন দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই পথের উপর দিয়াই পিতামহ একদিন আমার পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেদিন এই পথই বরঘাত্রীদের কোলাহল ও পায়ে-পায়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার একদিন যখন তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই প্রতিবেশীরা তাঁহাদের মৃতদেহ নদীতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়াই মা-

আমার একদিন বধূবেশে গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং আবার একদিন যখন তাঁহার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, তখন ধূলাবালির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা-গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম। তখনও এই পথ এমন নির্জন এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে জলাশয়ে এত পক্ষ, এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল—তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই।

দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, গাড়ির চাকা হইতে কতকটা ধূলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাথিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ-পিতামহের সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, হাসি-কান্ধায় ভরা ধূলাবালির পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, মা জন্মভূমি! তোমার বহুকোটি অকৃতী সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালবাসি নাই—আর কোনদিন তোমার সেবায়, তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া আসিব কি না জানি না, কিন্তু আজ এই নির্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্তি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনো ভুলিব না।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী তেমনি স্থির হইয়া আছে। আঁধার কোণের মধ্যে তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু অনুভব করিলাম সে চোখ মুদিয়া যেন চিন্তার মধ্যে মগ্ন হইয়া গেছে। মনে মনে বলিলাম, তাই যাক। আজি হইতে নিজের চিন্তা-তরণীর হালখানা যখন তাহারই হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন এই অজানা নদীর কোথায় ঘূর্ণী, কোথায় চড়া, সে-ই খুঁজিয়া বাহির করুক!

এ জীবনে নিজের মনটাকে আমি নানা দিকে নানা অবস্থায় যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। ইহার ধাতটা আমি চিনি। অত্যন্ত কিছুই ইহার সহে না। অত্যন্ত সুখ,

অত্যন্ত স্বাস্থ্য, অত্যন্ত ভাল থাকা ইহাকে চিরদিন পীড়িত করে। কেহ অত্যন্ত ভালবাসিতেছে জানিবামাত্রই যে মন অহরহ পালাই পালাই করে, সে মন যে আজ কত দুঃখে হাল ছাড়িয়াছে, তাহা এ মনের সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কে জানিবে!

বাহিরের কালো আকাশের প্রতি একবার দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম, ভিতরের অদৃশ্যপ্রায় নিশ্চল প্রতিমার দিকেও একবার চক্ষু ফিরাইলাম, তাহার পরে জোড়হাতে আবার যে কাহাকে নমস্কার করিলাম জানি না, কিন্তু মনে মনে বলিলাম, ইহার আকর্ষণের দুঃসহ বেগ আমার নিশ্চাস রুক্ষ করিয়া আনিয়াছে— বহুবার বহু পথে পলাইয়াছি, কিন্তু গোলকধাঁধার মত সকল পথই যখন বারংবার আমাকে ইহারই হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন আর আমি বিদ্রোহ করিব না— এইবার আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিলাম। এতকাল জীবনটাকে নিজের হাতে রাখিয়াই বা কি পাইয়াছি? কতটুকু সার্থক করিয়াছি? তবে, আজ যদি সে এমন হাতেই পড়িয়া থাকে, যে নিজের জীবনটাকে এমন আকর্ষ-মঞ্চ পক্ষ হইতে টানিয়া তুলিতে পারিয়াছে, সে কিছুতেই আর একটা জীবনকে তাহারই মধ্যে আবার ঢুবাইয়া দিবে না।

কিন্তু এ-সকল ত গেল আমার নিজের পক্ষ হইতে; কিন্তু অন্য পক্ষের আচরণ ঠিক আবার সেই পূর্বেকার মত শুরু হইল। সমস্ত পথের মধ্যে একটাও কথা হইল না, এমন কি স্টেশনে পৌঁছিয়াও কেহ আমাকে কোন প্রশ্ন করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। অল্প সময়েই কলিকাতা যাইবার গাড়ির ঘণ্টা পড়িল, কিন্তু রতন টিকিট-কেনার কাজ ফেলিয়া যাত্রিশালার ক্ষুদ্র এককোণে আমার জন্য শয্যারচনায় প্রবৃত্ত হইল। অতএব বুবা গেল এদিকে নয়, আমাদিগকে সেই ভোরের ট্রেনে পশ্চিমে রওনা হইতে হইবে। কিন্তু সেটা পাটনায় কিংবা কাশীতে কিংবা আর কোথাও, তাহা জানা না গেলেও এটা বেশ বুবা গেল, এ-বিষয়ে আমার মতামত একবারেই অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী অন্যত্র চাহিয়া অন্যমনক্ষের মত দাঁড়াইয়া ছিল। রতন হাতের কাজ শেষ করিয়া কাছে আসিয়া কহিল, মা, খবর পেলাম একটু এগিয়ে গেলে ভাল খবার সব রকমই পাওয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী অঞ্চলের গ্রন্থি খুলিয়া কয়েকটা টাকা তাহার হাতে দিয়া কহিল, বেশ ত, তাই যা না। কিন্তু দুধটা একটু দেখেশুনে নিস্, বাসী-টাসি আনিস নে যেন।

রতন কহিল, মা, তোমার নিজের জন্যে কিছু—  
না, আমার জন্যে চাইনে।

এই ‘না’ যে কিরূপ তাহা আমরা সবাই জানি, এবং সকলের চেয়ে বেশি জানে বোধ হয় রতন নিজে। তবুও সে বার-দুই পা ঘষিয়া আস্তে আস্তে বলিল,  
কাল থেকেই ত একরকম—

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুভৱে কহিল, তুই কি শুনতে পাস্নে রতন? কালা হয়েচিস্?  
?

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রতন চলিয়া গেল। কারণ, ইহার পরেও তর্ক করিতে পারে এমন প্রবল পক্ষ ত আমি কাহাকেও দেখি না। আর প্রয়োজনই বা কি? রাজলক্ষ্মী মুখে স্বীকার না করিলেও আমি জানি রেলগাড়িতে বা রেলের সম্পর্কিত কাহারও হাতে কিছু খাইতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। নির্থক কঠোর উপবাস করিতে ইহার জোড়া কোথাও দেখি নাই বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। কতদিন কত জিনিস ইহার বাটীতে আসিতে দেখিয়াছি, দাসী-চাকরে খাইয়াছে, দরিদ্র প্রতিবেশীর ঘরে বিতরিত হইয়াছে, পচিয়া নষ্ট হইয়া ফেলা দিয়াছে; কিন্তু এ-সকল যাহার জন্য সে মুখেও দিত না। জিজ্ঞাসা করিলে, তামাশা করিলে, হাসিয়া বলিত, হাঁ আমার আবার আচার! আমার আবার খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার! আমি ত সব খাই!

আচ্ছা, চোখের সামনে তার পরীক্ষা দাও?

পরীক্ষা? এখন? ওরে বাস রে! তা হলে আর বাঁচতে হবে! এই বলিয়া সে না-বাঁচিবার কোন কারণ না দেখাইয়াই অত্যন্ত জরুরি গৃহকর্মের অছিলায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। সে মাছ-মাংস দুধ-ঘি খায় না আমি ক্রমশঃ জানিয়াছিলাম, কিন্তু এই না-খাওয়াটাই তাহার পক্ষে এত অশোভন এত লজ্জার যে, ইহার উল্লেখেই সে যে লজ্জায় কোথায় পলাইবে খুঁজিয়া পাইত না। তাই সহজে আর খাওয়া লইয়া অনুরোধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। রতন স্লানমুখে চলিয়া গেল, তখনও কথা কহিলাম না; খানিক পরে ঘটিতে গরম দুধ এবং ঠোঙ্গায় মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী আমার জন্য দুধ ও কিছু খাবার রাখিয়া রতনের হাতেই যখন সমস্তটা তুলিয়া দিল, তখনও কিছু বলিলাম না, এবং রতনের করণ চক্ষের নীরব মিনতিও স্পষ্ট বুঝিয়া তেমনই নির্বাক রহিলাম।

আজ কারণে-অকারণে কথায় কথায় তাহার না-খাওয়াটাই আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। কিন্তু একদিন ঠিক এরূপ ছিল না। তখন উপহাস পরিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া কঠিন কটাক্ষণ কম করি নাই। কিন্তু যত দিন গিয়াছে, ইহার আর একটা দিকও ভাবিয়া দেখিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছি। রতন চলিয়া গেলে আমার সেই কথাগুলাই আবার মনে পড়িতে লাগিল।

কবে, এবং কি ভাবিয়া যে সে এই কৃচ্ছসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল আমি জানি না। তখনও আমি ইহার জীবনের মধ্যে আসিয়া পড়ি নাই।

কিন্তু প্রথম যখন সে অপর্যাপ্ত আহার্য-বস্তুর মাঝখানে বসিয়া স্বেচ্ছায় দিনের পর দিন গোপনে নিঃশব্দে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছিল, সে কত কঠিন! কিরূপ দুঃসাধ্য! কলুষ ও সর্ববিধ আবিলতার কেন্দ্র হইতে আপনাকে এই তপস্যার পথে অগ্রসর করিতে কতই না সে নীরবে সহিয়াছে! আজ এ বস্তু তাহার পক্ষে এমন সহজ এমন স্বাভাবিক যে, আমাদের চক্ষে পর্যন্ত ইহার গুরুত্ব নাই, বিশেষত্ব নাই—ইহার মূল্য যে কি তাহাও ঠিক জানি না, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে, তাহার এই কঠিন সাধনার সবটুকুই কি একেবারে বিফল,

একেবারে পওশ্বম হইয়া গেছে? আপনাকে বঞ্চিত করিবার এই যে শিক্ষা, এই যে অভ্যাস, এই যে পাইয়া ত্যাগ করিবার শক্তি, এ যদি না জীবনের মধ্যে তাহার অলঙ্ক্ষে সঞ্চিত হইয়া উঠিতে পাইত, আজ কি এমনি স্বচ্ছন্দে, এমনি অবলীলাক্রমে সে আপনাকে সর্বপ্রকারে ভোগ হইতে বিছিন্ন করিয়া লইতে পারিত? কোথাও কি কোন বন্ধনেই টান ধরিত না? সে ভালবাসিয়াছে। এমন কত লোকেই ত ভালবাসে, কিন্তু সর্বত্যাগের দ্বারা তাহাকে এমন নিষ্পাপ, এমন একান্ত করিয়া লওয়া কি সংসারে এতই সুলভ?

যাত্রিশালায় আর কোন লোক ছিল না, রতনও বোধ করি কোথাও একটু অন্তরাল খুঁজিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। দেখিলাম, একটা মিটমিটে আলোর নীচে রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিতেই সে চমকিয়া মুখ তুলিল; কহিল, তুমি ঘুমোও নি?

না, কিন্তু এই ধুলোবালির উপর একলাটি চুপচাপ না থেকে আমার বিছানায় গিয়ে বসবে চল। এই বলিয়া তাহাকে আপত্তি করিবার অবসর না দিয়াই হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলাম; কিন্তু নিজের কাছে আনিয়া আর কথা খুঁজিয়া পাইলাম না, কেবল আস্তে আস্তে তাহার একটা হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এমনি গেল। আমার সন্দেহ যে অমূলক নয়, সে কেবল হঠাৎ তাহার চোখের কোণে হাত দিয়া অনুভব করিলাম। ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিয়া কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেই রাজলক্ষ্মী আমার প্রসারিত পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চাপিয়া রাখিল, কোনমতেই তাহাকে একান্ত সন্ধিকটে আনিতে পারিলাম না।

আবার তেমনি নীরবে সময় কাটিতে লাগিল। সহসা একসময় বলিয়া উঠিলাম, একটা কথা এখনো তোমাকে জানানো হয়নি লক্ষ্মী!

সে চুপিচুপি কহিল, কি কথা?

ইহাই বলিতে গিয়া সংক্ষারবশে প্রথমটা একটু বাধিল, কিন্তু থামিলাম না; কহিলাম, আজ থেকে নিজেকে তোমার হাতে একবারে সঁপে দিলাম, এর ভাল-মন্দর ভার এখন সম্পূর্ণ তোমার।

বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সেই শিখিত আলোকে সে আমার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া আছে। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমাকে নিয়ে আমি কি করব? তুমি বাঁয়া-তবলা বাজাতে পারবে না, সারেঙ্গী বাজাতেও পারবে না। আর—

বলিলাম, আরটা কি? পান-তামাক ঘোগান? না, সেটা কিছুতেই পেরে উঠব না।

কিন্তু আগের দুটো?

বলিলাম, ভরসা দিলে পারতেও পারি। বলিয়া নিজেও একটু হাসিলাম।

হঠাতে রাজলক্ষ্মী উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি পারো?

বলিলাম, আশা করতে ত দোষ নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। তার পরে নিঃশব্দ-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্নিমিত্তে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, দ্যাখ, মাঝে মাঝে তাই যেন আমার মনে হত; আবার ভাবতাম, যে মানুষ নিষ্ঠুরের মত বন্দুক নিয়ে কেবল জানোয়ার মেরে বেড়াতেই ভালবাসে, সে এর কি ধার ধারে? এর ভেতরের এতবড় বেদনাকে অনুভব করাই কি তার সাধ্য! বরঞ্চ শিকার করার মত আঘাত দিতে পারাতেই যেন তার বড় আনন্দ। তোমার দেওয়া অনেক দুঃখই কেবল এই ভেবে আমি সইতে পেরেছি।

এবার চুপ করিয়া থাকার পালা আমার। তাহার অভিযোগের মূলে যুক্তি লইয়া বিচার চলিতেও পারিত, সাফাই দিবার নজিরেরও হয়ত অভাব হইত না, কিন্তু সমস্ত বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইল। তাহার সত্য-অনুভূতির কাছে মনে মনে আমাকে হার মানিতে হইল। কথাটাকে সে ঠিকমত বলিতেও পারে নাই, কিন্তু

সঙ্গীতের যে অন্তরতম মূর্তিটি কেবল ব্যথার ভিতর দিয়াই কদাচিং আত্মপ্রকাশ করে, সেই করণায় অভিনিষ্ঠিত সদাজাগ্রত চৈতন্যই যেন রাজলক্ষ্মীর ঐ দুটো কথার ইঙ্গিতে রূপ ধরিয়া দেখা দিল, এবং তাহার সংযম, তাহার ত্যাগ, তাহার হৃদয়ের শুচিতা আবার একবার যেন আমার চোখে আঙুল দিয়া তাহাকেই স্মরণ করাইয়া দিল।

তথাপি একটা কথা তাহাকে বলিতেও পারিতাম। বলিতে পারিতাম, মানুষের একান্ত বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলো যে কি করিয়া একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে সে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। না হইলে আমি স্বহস্তে জীবহত্যা করিতে পারি, এত বড় পরমাশ্চর্য নিজের কাছে আর আমার কি আছে? যে একটা পিপীলিকার মৃত্যু পর্যন্ত সহিতে পারে না, রক্তমাখা ঘূপকাছ্টের চেহারা যাহার আহার-নিন্দা কিছুদিনের মত ঘুচাইয়া দিতে পারে, যে পাড়ার অনাথ আশ্রয়হীন কুকুর-বেড়ালের জন্য ছেলেবেলায় কতদিন নিঃশব্দে উপবাস করিয়াছে—তাহার বনের পশ্চ, গাছের পাখির প্রতি লক্ষ্য যে কি করিয়া স্থির হয়, এ ত কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। আর, এ কি শুধু কেবল আমিই এমনি? যে রাজলক্ষ্মীর অন্তর-বাহির আমার কাছে আজ আলোর ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেছে, সে কেমন করিয়া এতদিন বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়া পিয়ারীর জীবন যাপন করিতে পারিল!

এই কথাটাই মনে আনিয়াও মুখে আনিতে পারিলাম না। কেবল তাহাকে ব্যথা দিব না বলিয়াই নয়, ভাবিলাম কি হইবে বলিয়া? দেব ও দানবে অনুক্ষণ কাঁধ মিলাইয়া মানুষকে যে কোথায় কোন্ ঠিকানায় অবিশ্রাম বহিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কি আমি জানি? কি করিয়া যে ভোগী একদিনে ত্যাগী হইয়া বাহির হইয়া যায়, নির্মম নিষ্ঠুর একমুহূর্তে করণায় গলিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে, এ রহস্যের কতটুকু সন্ধান পাই! কোন্ নিভৃত কন্দরে যে মানবাত্মার গোপন সাধনা অকস্মাত একদিন সিদ্ধিতে ফুটিয়া উঠে তাহার কি সংবাদ রাখি? ক্ষীণ আলোকে রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে

উদ্দেশ করিয়া মনে মনে কহিলাম, এ যদি আমার ব্যথা দিবার শক্তিটাকেই কেবল  
দেখিতে পাইয়া থাকে এবং ব্যথা গ্রহণ করিবার অক্ষমতাকে মেহের প্রশ্নে  
এতদিন ক্ষমা করিয়াই চলিয়া থাকে ত অভিমান করিবার আমার কি-ই বা আছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

বলিলাম, তবু ত এ নিষ্ঠুরের জন্যই সর্বত্যাগ করলে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, সর্বত্যাগ আর কই? নিজেকে ত তুমি নিঃস্বত্ব হয়েই  
আজ আমাকে দিয়ে দিলে, সে ত আর চাইনে বলে ত্যাগ করতে পারলাম না।

বলিলাম, হাঁ, নিঃস্বত্ব হয়েই দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে ত তুমি আপনি  
দেখতে পাবে না—তাই, সে উল্লেখ আমি করবো না।

## ଦୁଇ

ବାঙ୍ଗଲାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆମାକେ ଯେ ବେଶ ଶକ୍ତ କରିଯାଇ ଧରିଯାଛିଲ ତାହା ପଶିମର ଶହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପୂର୍ବେହି ବୁଝା ଗେଲ । ପାଟନା ସ୍ଟେଶନ ହିତେ ରାଜଲଙ୍ଘୀର ବାଡ଼ିତେ ଆମି ଅନେକଟା ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାତେଇ ନୀତ ହଇଲାମ । ଇହାର ପରେର ମାସଟା ଆମାକେ ଜୁର, ଡାକ୍ତାର ଏବଂ ରାଜଲଙ୍ଘୀ ପ୍ରାୟ ଅନୁକ୍ଷଣ ଘେରିଯା ରହିଲ ।

ଜୁର ସଖନ ଛାଡ଼ିଲ, ତଥନ ଡାକ୍ତାରବାବୁ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଯାଇ ଗୃହସ୍ଵାମିନୀକେ ଜାନାଇଯା ଦିଲେନ ଯେ, ଯଦିଓ ଏହି ଶତରଟା ପଶିମରେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୟକର ବଲିଯାଓ ଖ୍ୟାତି ଆଛେ, ତଥାପି ତାହାର ପରାମର୍ଶ ଏହି ଯେ, ରୋଗୀକେ ଅଚିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆବାର ଏକବାର ବାଁଧା-ଛାଁଦା ଶୁରୁ ହଇଯା ଗେଲ, କିନ୍ତୁ ଏବାର କିଛୁ ଘଟା କରିଯା । ରତନକେ ଏକଳା ପାଇୟା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, ଏବାର କୋଥାଯ ଯାଓଯା ହବେ ରତନ?

ଦେଖିଲାମ, ଏହି ନବ-ଅଭିଯାନେର ସେ ଏକେବାରେଇ ବିରଂଦ୍ରେ । ସେ ଖୋଲା ଦରଜାର ପ୍ରତି ନଜର ରାଖିଯା ଆଭାସେ ଇଞ୍ଜିଟେ ଏବଂ ଫିସଫିସ କରିଯା ଯାହା କହିଲ ତାହାତେ ଆମି ଯେନ ଦମିଯା ଗେଲାମ । ରତନ କହିଲ, ବୀରଭୂମ ଜେଲାର ଏହି ଛୋଟ ଗ୍ରାମଖାନିର ନାମ ଗଞ୍ଜମାଟି । ଇହାର ପତ୍ରନି ସଖନ କେନା ହୟ ତଥନ ସେ ଏକବାର ମାତ୍ର ମୋକ୍ତାରଜୀ କିଷଣଲାଲେର ସହିତ ସେଥାନେ ଗିଯାଛିଲ । ମା ନିଜେ କଥନେ ଯାନ ନାହିଁ— ଏକବାର ଗେଲେ ପଲାଇୟା ଆସିତେ ପଥ ପାଇବେନ ନା । ଗ୍ରାମେ ଭଦ୍ରପରିବାର ନାହିଁ ବଲଲେଇ ହୟ,—କେବଳ ଛୋଟ ଜାତେ ଭରା,—ତାଦେର ନା ଛୋଁଯା ଯାଯ, ନା ଆସେ ତାରା କୋନ କାଜେ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କେନ ଯେ ଏହି-ସବ ଛୋଟଜାତିର ମଧ୍ୟେ ଗିଯା ବାସ କରିତେ ଚାହିତେଛେ, ତାହାର ହେତୁ ଯେଣ କତକଟା ବୁଝିଲାମ । ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, ଗଞ୍ଜାମାଟି ବୀରଭୂମେର କୋଥାଯା?

ରତନ ଜାନାଇଲ, ସାଁଠିଥିଯା ନା କି ଏମନି ଏକଟା ଇସ୍ଟିସାନ ହିତେ ପ୍ରାୟ ଦଶ-ବାରୋ କ୍ରୋଶ ଗରନ୍ତର ଗାଡ଼ିତେ ଯାଇତେ ହ୍ୟ । ପଥ ଯେମନ ଦୁର୍ଗମ, ତେମନି ଭୟାନକ । ଚାରିଦିକେ ମାଠ ଆର ମାଠ । ତାତେ ନା ହ୍ୟ ଫସଲ, ନା ଆଛେ ଏକଫୋଁଟା ଜଳ । କାଁକୁରେ ମାଟି, କୋଥାଓ ରାଙ୍ଗା, ଆବାର କୋଥାଓ ଯେଣ ପୁଡ଼ିଯା କାଲୋ ହଇଯା ଆଛେ । ଏହି ବଲିଯା ମେ ଏକଟୁଖାନି ଥାମିଯା ଆମାକେଇ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ପୁନର୍ଶ କହିଲ, ବାବୁ, ମାନୁଷେ ଯେ ସେଥାନେ କି ସୁଖେ ଥାକେ ଆମି ତ ଭେବେ ପାଇନେ । ଆର ଯାରା ଏହି-ସବ ସୋନାର ଜାଯଗା ଛେଡ଼େ ସେ-ଦେଶେ ଯେତେ ଚାଯ ତାଦେର ଆର କି ବଲବୋ!

ମନେ ମନେ ଏକଟା ଦୀର୍ଘନିଶ୍ଚାସ ଫେଲିଯା ମୌନ ହଇଯା ରହିଲାମ । ଏହି-ସକଳ ସୋନାର ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିଯା କେନ ଯେ ସେଇ ମରଭୂମିର ମଧ୍ୟେ ନିର୍ବାନ୍ଧ ଛୋଟଲୋକେର ଦେଶେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମାକେ ଲହିଯା ଚଲିଯାଛେ, ତାହା ଇହାକେ ବଲାଓ ଯାଯ ନା, ବୁଝାନ୍ତ ଚଲେ ନା ।

ଶେଷେ ବଲିଲାମ, ବୋଧ ହ୍ୟ ଆମାର ଅସୁଖେର ଜନ୍ୟାଇ ଯେତେ ହଚ୍ଛେ ରତନ । ଏଥାନେ ଥାକଲେ ଭାଲ ହବାର ଆଶା କମ, ଏ ଭୟ ସବ ଡାଙ୍କାରେଇ ଦେଖାଚେନ ।

ରତନ ବଲିଲ, କିନ୍ତୁ ଅସୁଖ କି କାରାଓ ହ୍ୟ ନା ବାବୁ? ସାରାବାର ଜନ୍ୟେ କି ତାଦେର ସବ ଐ ଗଞ୍ଜାମାଟିତେଇ ଯେତେ ହ୍ୟ?

ମନେ ମନେ ବଲିଲାମ, ଜାନି ନା ତାହାଦେର ସବ କୋନ୍ ମାଟିତେ ଯାଇତେ ହ୍ୟ । ହ୍ୟତ ତାହାଦେର ପୀଡ଼ା ସୋଜା, ହ୍ୟତ ତାହାଦେର ସାଧାରଣ ମାଟିର ଉପରେଇ ସାରେ । କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ବ୍ୟାଧି ସହଜେ ନଯ; ସାଧାରଣେ ନଯ, ଇହାର ଜନ୍ୟ ହ୍ୟତ ଓଇ ଗଞ୍ଜାମାଟିରିଇ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୋଜନ ।

ରତନ କହିତେ ଲାଗିଲ, ମାଯେର ଖରଚେର ହିସାବପତ୍ରରେ ଆମରା କୋନଦିନ ଭେବେ ପେଲାମ ନା । ସେଥାନେ ନା ଆଛେ ସରଦୋର, ନା ଆଛେ କିଛୁ । ଏକଜନ ଗୋମଞ୍ଜା ଆଛେ,

তার কাছে হাজার-দুই টাকা পাঠানো হয়েছে একটা মেটে বাড়ি তৈরি করবার জন্য। দেখুন দেখি বাবু, এ কি-সব অনাছিষ্টি কাওকারখানা! চাকর বলে যেন আর আমরা কেউ মানুষ নয়!

তাহার ক্ষেত্রে এবং বিরক্তি দেখিয়া বলিলাম, নাই গেলে রতন অমন জায়গায়! জোর করে ত তোমাকে কেউ কোথাও নিয়ে যেতে পারে না!

আমার কথায় রতন কোন সাঙ্গনা লাভ করিল না। কহিল, মা পারেন। কি জানি বাবু কি জাদুমন্ত্র জানেন, যদি বলেন, তোমাদের সব যমের বাড়ি যেতে হবে, এতগুলো লোকের মধ্যে আমাদের এমন সাহস কারও নেই যে বলে, না। বলিয়া সে মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেল।

কথাটা রতন নিতান্তই রাগ করিয়া বলিয়া গেল, কিন্তু আমাকে সে যেন অকস্মাত একটা নৃতন তথ্যের সংবাদ দিয়া গেল। কেবল আমিই নয়, সকলেই ই এক দশা! ওই জাদুমন্ত্রের কথাটাই ভাবিতে লাগলাম। মন্ত্রতন্ত্রে যে সত্যই বিশ্বাস করি তাহা নয়, কিন্তু এক-বাড়ি লোকের মধ্যে কাহারও যখন এতটুকু শক্তি নাই যে যমের বাড়ি যাইবার আদেশটাকে পর্যন্ত অবহেলা করে, তখন সে বস্তুটাই বা কি!

ইহার সমস্ত সংস্কৰণ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আমি কি না করিয়াছি! বিবাদ করিয়া বিদায় লইয়াছি, সন্ধ্যাসী হইয়া দেখিয়াছি, এমন কি দেশত্যাগ করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেছি—জীবনে আর না দেখা হয়; কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই একটা গোল বস্তুর উপর সরলরেখা টানিবার মত বারংবার কেবল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া নিজের দুর্বলতার কাছেই পরাজিত হইলাম, এই কথাটা মনে করিয়া অবশেষে যখন আত্মসমর্পণ করিলাম, তখন রতন আসিয়া আজ আমাকে এই খবরটা দিয়া গেল—রাজলক্ষ্মী জাদুমন্ত্র জানে!

তাই বটে! অথচ, এই রতনকেই জেরা করিলে জানা যাইবে, সে নিজেও ইহা বিশ্বাস করে না।

হঠাতে দেখি মন্ত একটা পাথরের বাটিতে কি কতকগুলো লইয়া এই পথেই রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া নীচে চলিয়াছে। ডাকিয়া কহিলাম, শোন, সবাই বলে তুমি নাকি জাদুমন্ত্র জান?

সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই হ্র কুণ্ডিত করিয়া কহিল, কি জানি?  
বলিলাম, জাদুমন্ত্র!

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, হাঁ জানি। বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাতে আমার গায়ের জামাটা ঠাওর করিয়া দেখিয়া উদ্বিধকঠে প্রশ্ন করিল, ওটা কালকের সেই বাসী জামাটা না?

নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, হাঁ সেইটাই বটে; কিন্তু থাক, বেশ ফর্সা আছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ফর্সার কথা নয়, পরিষ্কারের কথা বলছি। তার পরে একটুখানি হাসিয়া বলিল, বাহিরের ওই দেখান ফরসাটা নিয়েই চিরকাল গেলে। ওটা তাছিল্য করতেও আমি বলিনে, কিন্তু যে ভেতরটা ঘামে-ঘামে নোংরা হয়ে ওঠে সেটা দেখতে শিখবে কবে? বলিয়া সে রতনকে ডাক দিল। কেহই জবাব দিল না। কারণ কর্ণীর এইপ্রকার উচ্চ মধুর আহ্বানের সাড়া দেওয়া এ বাড়ির বিধি নয়; বরঞ্চ মিনিট পাঁচ-ছয় গা-তাকা দিয়া থাকাই নিয়ম।

রাজলক্ষ্মী তখন হাতের পাত্রটা নামাইয়া রাখিয়া পাশের ঘর হইতে একটা কাচা জামা আনিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, তোমার মন্ত্রী রতনকে বোলো, যতক্ষণ সে জাদুমন্ত্র না শিখচে ততক্ষণ যেন এই দরকারী কাজগুলো হাত দিয়েই করে। এই বলিয়া সে পাথরের বাটিটা তুলিয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেল।

জামাটা বদলাইতে গিয়া দেখিলাম তাহার ভিতরটা যথার্থই মলিন হইয়া গেছে। হইবার কথা, এবং আমিও যে আর কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহাও

নয়, কিন্তু আমার মনটা ছিল নাকি ভাবিবার দিকেই, তাই অতি তুচ্ছ খোলসটার অন্তর-বাহিরের বৈসাদৃশ্যই আমাকে আবার নৃতন আঘাত দিল।

রাজলক্ষ্মীর শুচিবায়ুগ্রস্ততা অনেক সময়েই আমাদের কাছে নির্থক, পীড়াদায়ক, এমন কি অত্যাচার বলিয়াও ঠেকিয়াছে, এবং এখনই যে তাহার সমস্তটাই এক মুহূর্তে মন হইতে ধুইয়া মুছিয়া গেল, তাহাও সত্য নয়, কিন্তু এই শেষ শ্লেষটুকুর মধ্যে যে বস্তু আমি এতদিন মন দিয়া দেখি নাই তাহাই দেখিতে পাইলাম। যেখানে এই অঙ্গুত মানুষটির ব্যক্ত ও অব্যক্ত জীবনের ধারা দুটা একান্ত প্রতিকূলে বহিয়া চলিয়াছে, ঠিক সেই স্থানটাতেই আজ গিয়া আমার চক্ষু পড়িল। একদিন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম, শৈশবে রাজলক্ষ্মী যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকেই পিয়ারী তাহার উন্মত যৌবনের কোন্ অতৃপ্ত লালসার পক্ষ হইতে এমন করিয়া অতি সহজে সহস্রদল-বিকশিত পদ্মের মত চক্ষের নিমিষে বাহির করিয়া দিল? আজ মনে হইল সে ত পিয়ারী নয়—সে রাজলক্ষ্মীই বটে! রাজলক্ষ্মী ও পিয়ারী এই দুটি নামের মধ্যে যে তাহার নারী-জীবনের কত বড় ইঙ্গিত গোপন ছিল, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই বলিয়াই মাঝে মাঝে সংশয়ে ভাবিয়াছি, একের মধ্যে আর একজন এতকাল কেমন করিয়া বাঁচিয়া ছিল! কিন্তু মানুষ যে এমনিই! তাই ত সে মানুষ!

পিয়ারীর সমগ্র ইতিহাস আমি জানিও না, জানিতেও ইচ্ছা করি না। রাজলক্ষ্মীরই যে সমস্ত ইতিবৃত্ত জানি তাও নয়; শুধু এইটুকুই জানি, দু'জনের মর্মে ও কর্মে চিরদিন কোন মিল কোন সামঞ্জস্যই ছিল না, চিরদিনই উভয়ে পরস্পরের উলটা প্রোতে বহিয়া গেছে। তাই একের নিঃস্তুত সরসীতে যখন শুন্দি সুন্দর প্রেমের কমল ধীরে ধীরে অনুক্ষণ দলের পর

দল মেলিয়াছে তখন অপরের দুর্দান্ত জীবনের ঘূর্ণিবায়ু সেখানে ব্যাঘাত করিবে কি, প্রবেশের পথই পায় নাই। তাই ত তাহার একটি পাপড়িও খসে নাই, এতটুকু ধূলাবালিও উড়িয়া গিয়া আজও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

শীতের সন্ধ্যা অচিরে গাঢ় হইয়া আসিল, আমি কিন্তু সেইখানে বসিয়া ভাবিতেই লাগিলাম। মনে মনে বলিলাম, মানুষ ত কেবল তাহার দেহটাই নয়! পিয়ারী নাই, সে মরিয়াছে। কিন্তু একদিন যদি সে তার ওই দেহটার গায়ে কিছু কালি দিয়াই থাকে ত সেইটুকুই কি কেবল বড় করিয়া দেখিব, আর রাজলক্ষ্মী যে তাহার সহস্র-কোটি দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা পার হইয়া আজ তাহার অকলক্ষ শুভ্রতায় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে মুখ ফিরাইয়া বিদায় দিব! মানুষের মধ্যে যে পশ্চ আছে, কেবল তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুলভাস্তি দিয়া মানুষের বিচার করিব; আর যে দেবতা সকল দুঃখ, সকল ব্যথা, সকল অপমান নিঃশব্দে বহন করিয়াও আজ সম্মিত মুখে তাহারই মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তাঁহাকে বসিতে দিবার কোথাও আসন পাতিয়া দিব না?

সেই কি মানুষের সত্যকার বিচার হইবে? আমার মন যেন আজ তাহার সকল শক্তি দিয়া বলিতে লাগিল, না না, কখনই না, এ কখনই না! এমন যে হইতেই পারে না।

সে বেশিদিন নয়—নিজেকে দুর্বল, শ্রান্ত ও পরাজিত ভাবিয়া রাজলক্ষ্মীর হাতে একদিন আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন সেই পরাভূতের আত্মত্যাগের মধ্যে বড় একটা দীনতা ছিল। আমার মন যেন ইহা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু আজ আমার সেই মন যেন সহসা সবলে এই কথাটাই বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, ও দান দানই নয়, ও ফাঁকি। যে পিয়ারীকে তুমি জানিতে না, সে তোমার জানার বাহিরেই পড়িয়া থাক। কিন্তু যে রাজলক্ষ্মী একদিন তোমারই ছিল, আজ তাহাকে তুমি সকল চিন্ত দিয়া গ্রহণ কর,

এবং যাঁহার হাত দিয়া সংসারের সকল সার্থকতা নিরন্তর ঝরিতেছে, ইহারও  
শেষ সার্থকতা তাঁহারই হাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও।

নৃতন চাকরটা আলো আনিতেছিল, তাহাকে বিদায় দিয়া অন্ধকারেই  
বসিয়া রহিলাম, এবং মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীর সকল ভাল-মন্দের সহিত  
আজ তাহাকে নিলাম। এইটুকুই আমি পারি, কেবল এইটুকুই আমার হাতে। কিন্তু  
ইহার অতিরিক্ত যাঁহার হাতে সেই অতিরিক্তের বোৰা তাঁহাকেই দিলাম। বলিয়া  
সেই অন্ধকারেই খাটের বাজুর উপর নীরবে মাথা রাখিলাম।

পূর্বের মত পরদিনও যথারীতি আয়োজন চলিল, এবং তাহার পরের  
দিনও সারাদিন-ব্যাপী উদ্যমের অবধি রহিল না। সেদিন দুপুরবেলায় প্রকাণ্ড  
একটা সিন্দুকে থালা-ঘটি-বাটি, গাড়ু-গেলাস, বক্নো-পিলসুজ অপর্যাপ্ত ভরা  
হইতেছিল। আমি ঘরের মধ্যে থাকিয়া ও-সমস্ত দেখিতেছিলাম। একসময়ে  
ইশারায় কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ-সব হচ্ছে কি? তুমি কি আর ফিরে  
আসতে চাও না নাকি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, ফিরে কোথায় আসব শুনি?

আমার মনে পড়িল, এ-বাড়ি সে বক্ষুকে দান করিয়াছে। কহিলাম, কিন্তু  
ধর যদি সে-জায়গা তোমার বেশিদিন ভাল না লাগে?

রাজলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার জন্যে তোমার মন খারাপ  
করবার দরকার নেই। তোমার ভাল না লাগলে চলে এসো, আমি তাতে বাধা  
দেব না।

তাহার কথার ভঙ্গিতে আমি আঘাত পাইয়া চুপ করিলাম। এটা আমি  
বল্বার দেখিয়াছি, সে আমার এই ধরনের কোন প্রশ্নই যেন সরলচিন্তে গ্রহণ  
করিতে পারে না। আমিও যে তাহাকে অকপটে ভালবাসিতে পারি, কিংবা তাহার  
সংস্কৰে স্থির হইয়া বাস করিতে পারি, ইহা কিছুতেই যেন তাহার মনের সঙ্গে  
গাঁথিয়া এক হইয়া উঠিতে চাহে না। সংশয়ের আলোড়নে অবিশ্বাস এক মুহূর্তেই

এমন উগ্র হইয়া বাহিরে আসে যে, তাহার জুলা বহুক্ষণ অবধি উভয়ের মনেই  
রি-রি করিয়া জুলিতে থাকে। এই অবিশ্বাসের আগুন যে কবে নিবিবে এবং  
কেমন করিয়া নিবিবে, আমি তাহার কোন কিনারাই ভাবিয়া পাই না। সেও ইহারই  
সন্ধানে অবিশ্বাস ঘুরিতেছে—এবং গঙ্গামাটি এ সমস্যার শেষ মীমাংসা করিয়া  
দিবে কি না, সে তথ্য যাঁহার হাতে তিনি অলক্ষ্যে চুপ করিয়াই আছেন।

সর্ববিধ আয়োজনে আরও দিন-চারেক কাটিল এবং আরও দিন-দুই গেল  
শুভক্ষণের প্রতীক্ষায়। তার পরে একদিন সকালে অপরিচিত গঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে  
আমরা সত্য সত্যই যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথটা আমার ভাল  
কাটিল না—মনে কিছুমাত্র সুখ ছিল না। আর সকলের চেয়ে খারাপ কাটিল বোধ  
করি রতনের। সে মুখখানা অসম্ভব ভারী করিয়া গাড়ির এককোণে চুপচাপ বসিয়া  
রহিল; স্টেশনের পর স্টেশন গেল, কোন কাজে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না।  
কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কথা। স্থানটা জানা কি অজানা, ভাল কি  
মন্দ, স্বাস্থ্যকর কি ম্যালেরিয়ায় ভরা, সেদিকে আমার খেয়ালই ছিল না; আমি  
ভাবিতেছিলাম, যদিচ জীবনটা আমার এতদিন নিরূপদ্রবে কাটে নাই, ইহার মধ্যে  
অনেক গলদ, অনেক ভুলচুক, অনেক দুঃখ-দৈন্যই গিয়াছে, তবুও সে-সব আমার  
অত্যন্ত পরিচিত। এই দীর্ঘ দিনে তাহাদের সহিত মোকাবিলা ত বটেই, বরঞ্চ  
এক প্রকারের স্নেহই জনিয়া গেছে। তাহাদের জন্য আমিও কাহাকে দোষ দিই  
না, আমাকেও আর বড় কেহ দোষ দিয়া সময় নষ্ট করে না। কিন্তু এই যে কোথায়  
কি-একটা নৃতন্ত্রের মধ্যে নিশ্চিত চলিয়াছি, এই নিশ্চয়তাই আমাকে বিকল  
করিয়াছে।

আজ নয় কাল বলিয়া আর দেরি করিবার রাস্তা নাই। অথচ ইহার না  
জানি ভাল, না জানি মন্দ। তাই ইহার ভাল-মন্দ কোনটাই আজ আর কোনমতই  
ভাল লাগে না। গাড়ি যতই দ্রুতবেগে গত্বয় স্থানের নিকটবর্তী হইতে চলিয়াছে  
ততই এই অজ্ঞাত রহস্যের বোৰা আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে, কত

কি যে মনে হইতে লাগিল তাহার অবধি নাই। মনে হইল, অচির ভবিষ্যতে হয়ত আমাকেই কেন্দ্র করিয়া একটা বিশ্রী দল গড়িয়া উঠিবে, তাহাদের না পারিব লইতে, না পারিব ফেলিতে। তখন কি যে হইবে, আর কি যে হইবে না, ভবিতেও সমস্ত মনটা যেন হিম হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী জানালার বাহিরে দু'চক্ষু মেলিয়া নীরবে বসিয়া আছে। সহসা মনে হইল, ইহাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নাই। তবু ইহাকে আমার ভালবাসিতেই হইবে; কোথাও কোনদিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এত বড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে! অথচ একটা দিন পূর্বেও এই দ্বিধার যাঁতাকল হইতে আত্মরক্ষা করিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। তখন মনে মনে সবলে বলিয়াছিলাম, তোমার সকল ভাল-মন্দের সঙ্গেই তোমাকে নিলাম লক্ষ্মী। অথচ আজ আমার মন এমন বিক্ষিপ্ত, এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! তাই ভাবি, সংসারে করিব বলায় এবং সত্যকার করায় কত বড়ই না ব্যবধান!

## তিনি

সাঁইথিয়া স্টেশনে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছে। রাজলক্ষ্মীর গোমন্তা কাশীরাম স্বয়ং স্টেশনে আসিতে পারেন নাই—সেদিকের ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু জন-দুই লোক পাঠাইয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহার রোকায় অবগত হওয়া গেল যে, সিশ্রেষ্ঠায় ‘অত্ৰ’ অর্থাৎ তিনি এবং তাঁহার গঙ্গামাটির সমন্ত কুশল। আদেশমত বাহিরে খানচারেক গো-যান অপেক্ষা করিতেছে—তাহার দুইখানি খোলা এবং দুইখানি ছই-দেওয়া। একখানিতে পুরু করিয়া খড়, আর খেজুরপাতার চাটাই বিছান—সেখানি স্বয়ং কঢ়ীঠাকুরানীর। অপরখানিতে সামান্য কিছু খড় আছে বটে, কিন্তু চাটাই নাই। সেখানে ভৃত্যাদি অনুচরগণের জন্য। খোলা দুইখানিতে মালপত্র বোৰাই হইবে। এবং যদ্যপি স্থানসকুলান না হয় ত পাইকদিগকে ভুকুম করিলে বাজার হইতে আরও একটা যোগাড় করিয়া আনিবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, আহারাদি সমাপনপূর্বক সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রা করাই বিধেয়। কারণ অন্যথা কঢ়ীঠাকুরানীর সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এবং এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত করাইতেছেন যে, পথে ভয়াদি কিছু নাই—স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারেন।

কঢ়ীঠাকুরানী রোকা পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন মাত্র, এবং যে ইহা দিল তাহাকে ভয়াদির কোন প্রশ্ন না করিয়া কেবল প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বাবা, কাছাকাছি একটা পুকুর-টুকুর আছে দেখিয়ে দিতে পার, একটা ডুব দিয়ে আসি?

আছে বৈ কি মাঠান्। উই যে হোথাকে—

তা হলে চল ত বাবা দেখিয়ে দেবে; বলিয়া সে তাহাকে এবং রতনকে সঙ্গে লইয়া কোথাকার কোন্ অজানা পুকুরে স্নানাত্ত্ব করিতে চলিয়া গেল। অসুখ প্রভৃতির ভয় দেখান নির্থক বলিয়া আমি প্রতিবাদও করিলাম না।

বিশেষতঃ ইহাতেই যদি বা সে কিছু খায়, বাধা দিলে সেটাও তাহার আজিকার  
মত বন্ধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু আজ সে মিনিট-দশেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। গরুর গাড়িতে  
জিনিসপত্র বোঝাই চলিতেছিল, সামান্য দুই-একটা বিছানা খুলিয়া গাড়িতে পাতা  
হইতেছে। আমাকে সে কহিল, তুমি কেন এইবেলা কিছু খেয়ে নাও না? সমস্তই  
ত আনা হয়েচে।

বলিলাম, দাও।

গাছতলায় আসন পাতিয়া একটা কলাপাতে সে সমস্ত গুছাইয়া দিতেছে,  
আমি নিষ্পৃহচিত্তে কেবলমাত্র তাহার প্রতি চাহিয়া আছি, এমন সময় এক মূর্তি  
আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, নারায়ণ!

রাজলক্ষ্মী তাহার বুঁটি-করা ভিজে চুলের উপর বাঁ হাতের পিছন দিয়া  
আঁচলটা আর একটুখানি টানিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আসুন।

অকস্মাত এই নিঃসঙ্কোচ নিমন্ত্রণের শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম এক  
সাধু দাঁড়াইয়া। অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তাহার বয়স বেশি নয়, বোধ হয় কুড়ি-  
একশের মধ্যে, কিন্তু যেমন সুকুমার তেমনি সুশ্রী। চেহারাটা কৃতার দিকেই—  
হয়ত একটু দীর্ঘকায় বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু রঙ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। চোখ,  
মুখ, জ্ব ও কপালের গঠন নিখুঁত বলিলেই হয়। বাস্তবিক, পুরুষের এত রূপ আর  
আমি কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

তাহার পরিধানে গেরুয়া বস্ত্রখানি স্থানে স্থানে ছিন—গাঁথিবাঁধা। গায়ের  
গেরুয়া পাঞ্জাবীরও যেমন জীর্ণ দশা, পায়ের পাঞ্জাবী জুতাজোড়াটিও প্রায় তদ্ধপ;  
হারাইলে দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু নাই। রাজলক্ষ্মী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া আসন  
পাতিয়া দিল। মুখ তুলিয়া কহিল, আমি ততক্ষণ খাবার ঠিক করি, আপনাকে  
মুখ-হাত ধোবার জল দিক?

সাধু কহিলেন, তা দিক, কিন্তু আপনার কাছে আমি অন্য প্রয়োজনে  
এসেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আচ্ছা, আপনি খেতে বসুন, সে পরে হবে এখন। বাড়ি  
ফেরবার টিকিট চাই ত? সে আমি কিনে দেব। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া হাসি  
গোপন করিল।

সাধুজী গভীরভাবে জবাব দিলেন, না, সে প্রয়োজন নেই। আমি খবর  
নিয়েচি আপনারা গঙ্গামাটি যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে একটা ভারী বাক্স আছে, সেটা  
যদি কতকটা পথ আপনাদের গাড়িতে তুলে নেন। আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আর বেশি কথা কি! কিন্তু আপনি নিজে?

আমি হেঁটেই যেতে পারব। বেশি দূর নয়, ক্রোশ ছয়-সাত হবে।

রাজলক্ষ্মী আর কিছু না বলিয়া রতনকে ডাকিয়া জল দিতে বলিল, এবং  
নিজে পরিপাটি করিয়া সাধুজীর খাবার সাজাইতে নিযুক্ত হইল। এই কাজটি  
রাজলক্ষ্মীর নিজস্ব বস্তু, ইহাতে তাহার জোড়া পাওয়া ভার।

সাধু খাইতে বসিলেন, আমিও বসিলাম। রাজলক্ষ্মী খাবারের হাঁড়ি লইয়া  
পাশেই রহিল। মিনিট-দুই পরে রাজলক্ষ্মী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, সাধুজী,  
আপনার নামটি?

সাধু খাইতে খাইতে কহিলেন, বজ্জ্বানন্দ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাপ্‌ রে বাপ্‌! ডাকনামটি?

তাহার কথার ধরনে চাহিয়া দেখিলাম তাহার সমস্ত মুখখানি চাপা হাসির  
ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে হাসিল না, আমিও আহারে মন দিলাম।  
সাধুজী বলিলেন, সে নামের সঙ্গে আর ত কোন সম্বন্ধ নেই—নিজেরও না,  
পরেরও না।

রাজলক্ষ্মী সহজেই সায় দিয়া কহিল, তা বটে! কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই  
প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সাধুজী, আপনি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন কত দিন?

প্রশ়িটি অত্যন্ত অভদ্র। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর মুখে হাসি নাই বটে, কিন্তু যে পিয়ারীর মুখখানি আমি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এখন রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমিষে আবার তাহাকেই মনে পড়িয়া গেল। সেই পুরানো দিনের সমস্ত সরসতা তাহার চোখে-মুখে কর্তৃস্বরে যেন সজীব হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

সাধু একটা ঢেক গিলিয়া কহিলেন, আপনার এ কৌতুহল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র ক্ষুঁশ হইল না, ভালমানুষটির মত মাথা নাড়িয়া কহিল, তা সত্য। তবে একবার নাকি ভারি ভুগতে হয়েছে তাই—এই বলিয়া সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, হাঁ গা, বল ত তোমার সেই উট আর টাট্টুঘোড়ার গল্পটি? সাধুজীকে একবার শুনিয়ে দাও ত—আহা হা! ঘাট্ ঘাট্! কে বুঝি বাড়িতে নাম করচে।

সাধুজী বোধ হয় হাসি চাপিতে গিয়াই একটা বিষম খাইলেন। এতক্ষণ আমার সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই, কর্তৃঠাকুরানীর আড়ালে কতকটা অনুচরের মতই ছিলাম। এখন সাধুজী বিষম সামলাইয়া যথাসম্ভব গান্ধীর্যের সহিত আমাকে প্রশ়ি করিলেন, আপনি বুঝি তা হলে একবার সন্ধ্যাসী—

আমার মুখে লুচি ছিল, বেশি কথার জো ছিল না, তাই ডান হাতের চারটা আঙুল তুলিয়া ধরিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম—উহুঁ হুঁ—একবার নয়, একবার নয়—

এবার সাধুজীর গান্ধীর্য আর বজায় রহিল না, সে এবং রাজলক্ষ্মী দু'জনেই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে সাধু কহিলেন, ফিরলেন কেন?

লুচির ডেলাটা তখনও গিলিতে পারি নাই, শুধু রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া দিলাম।

রাজলক্ষ্মী তর্জন করিয়া উঠিল, বলিল, তাই বৈ কি! আচ্ছা, একবার নাহয় আমারি জন্যে—তাও ঠিক সত্য নয়—আসলে ভয়ানক অসুখে পড়েই—কিন্তু আর তিনবার?

কহিলাম, সেও প্রায় কাছাকাছি—মশার কামড়ে। ওটা কিছুতেই চামড়ায় সইল না। আচ্ছা—

সাধু হাসিয়া কহিলেন, আমাকে আপনি বজ্রানন্দ বলেই ডাকবেন। আপনার নামটি—

আমার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী জবাব দিল। কহিল, ওঁর নামে কি হবে? উনি বয়সে অনেক বড়, ওঁকে দাদা বলেই ডাকবেন। আর আমাকেও বৌদিদি বলে ডাকলে রাগ করব না। আর আমি কোন না বয়সে তোমার বছর-পাঁচকের বড় হব!

সাধুজীর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমিও এতটা প্রত্যাশা করি নাই। বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম—এ সেই পিয়ারী। সেই স্বচ্ছ, সহজ মেহাতুরা আনন্দময়ী! সেই যে আমাকে কোনমতেই শুশানে যাইতে দিতে চাহে নাই, এবং কিছুতেই রাজসংসর্গে টিকিতে দিল না—এ সেই। এই যে ছেলেটি তাহার কোথাকার মেহেরে বাঁধন ছিন করিয়া আসিয়াছে—সেখানকার সমস্ত অজানা বেদনা রাজলক্ষ্মীর বুক জুড়িয়া টান ধরিয়াছে। কোনমতে ইহাকে সে আবার গৃহে ফিরাইয়া আনিতে চায়।

সাধু বেচারা লজ্জার ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া কহিল, দেখুন, দাদা বলতে আমার তত আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসীদের ও-সব বলে ডাকতে নেই।

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র অপ্রতিভ হইল না। কহিল, নেই কেন? দাদার বৌকে সন্ন্যাসীরা কিছু মাসি বলেও ডাকে না, পিসি বলেও ডাকে না—ও ছাড়া আমাকে তুমি আর কি বলে ডাকবে শুনি?

ছেলেটি নিরপায় হইয়া শেষে সলজ্জ হাসিমুখে কহিল, আচ্ছা বেশ। ছ-সাত ঘণ্টা আরও আছি আপনার সঙ্গে। এর মধ্যে যদি দরকার হয় ত তাই বলেই ডাকব। রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হলে ডাক না একবার!

সাধু হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দরকার হলে ডাকব বলেটি—মিছিমিছি ডাকাডাকি উচিত নয়।

রাজলক্ষ্মী তাহার পাতে আরও গোটা-চারেক সন্দেশ ও বরফি দিয়া কহিল, বেশ, তা হলেই আমার হবে। কিন্তু নিজের দরকারে যে কি বলে তোমাকে ডাকবো ঠাউরে পাচিনে। আমাকে দেখাইয়া কহিল, ওঁকে ত ডাকতুম সন্ধ্যাসীঠাকুর বলে। সে আর হয় না, ঘুলিয়ে যাবে। তোমাকে নাহয় ডাকবো সাধুঠাকুরপো বলে, কি বল?

সাধুজী আর তর্ক করিলেন না, অতিশয় গান্ধীর্যের সহিত কহিলেন, বেশ তাই ভাল।

তিনি এদিকে যাই হোন, দেখিলাম আহারাদির ব্যাপারে তাঁহার রসবোধ আছে। পশ্চিমের উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের তিনি কদর বুঝেন এবং কোনটির কিছুমাত্র অর্প্যাদা করিলেন না। একজন স্যত্ত্বে পরম স্নেহে একটির পর একটি দিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আর একজন নিঃশব্দে নিঃসঙ্কোচে গলাধঃকরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি কিন্তু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

মনে মনে বুঝিলাম সাধুজী পূর্বে যাহাই করুন, সম্পত্তি এরূপ উপাদেয় ভোজ্য এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে সেবা করিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী ক্রটি একটা বেলার মধ্যে সংশোধন করিবার প্রয়াস করিতে দেখিলে দর্শকের পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং রাজলক্ষ্মী আরও গোটা-কয়েক পেঁড়া এবং বরফি সাধুজীর পাতে দিতেই অজ্ঞাতসারে আমার নাক এবং মুখ দিয়া একসঙ্গে এতবড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, রাজলক্ষ্মী এবং তাহার নৃতন কুটুম্ব দু'জনেই চকিত হইয়া উঠিলেন।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি রোগা মানুষ,  
তুমি উঠে হাত-মুখ ধোও গে না। আমাদের সঙ্গে বসে থাকবার দরকার কি?

সাধুজী একবার আমার প্রতি, একবার রাজলক্ষ্মীর প্রতি এবং তাহার  
পরে হাঁড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন, দীর্ঘশ্বাস পড়বার কথাই  
বটে, কিছুই যে আর রইল না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আরও অনেক আছে। বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধদৃষ্টি  
নিষ্কেপ করিল।

ঠিক এমনি সময় রতন পিছনে আসিয়া বলিল, মা চিঁড়ে ত তের পাওয়া  
যায়, কিন্তু দুধ কি দই কিছুই তোমার জন্যে পাওয়া গেল না।

সাধু বেচারা অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, আপনাদের আতিথ্যের  
উপর ভয়ানক অত্যাচার করলুম, বলিয়া সহসা উঠিবার উপক্রম করিতেই  
রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, আমার মাথা খাবে ঠাকুরপো যদি ওঠো!  
মাইরি বলচি আমি সমস্ত ছড়িয়ে ফেলে দেব।

সাধু ক্ষণকাল বিস্ময়ে বোধ হয় ইহাই চিন্তা করিলেন যে, এ কেমন  
স্বীলোক যে একদণ্ডের পরিচয়েই এত বড় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল! রাজলক্ষ্মীর  
পিয়ারীর ইতিহাসটা না জানিলে বিস্ময়ের কথাই বটে। তার পরে তিনি একটুখানি  
হাসিয়া বলিলেন, আমি সন্ধ্যাসী মানুষ, খেতে আমার কিছুই বাধে না, কিন্তু  
আপনারও ত কিছু খাওয়া চাই। আমার মাথা খেয়ে ত আর সত্যি সত্যি পেট  
ভরবে না।

রাজলক্ষ্মী জিভ কাটিয়া গন্তীর হইয়া কহিল, ছি, ছি, অমন কথা  
মেয়েমানুষকে বলতে নেই ভাই, আমি এ-সব খাইনে, আমার সহ্য হয় না।  
চাকরদের খাবার তের আছে। আজ রাতটা বৈ ত নয়, যা হোক একমুঠো চিঁড়ে-  
টিঁড়ে খেয়ে একটু জল খেলেই আমার চলে যাবে। কিন্তু ক্ষিদে থাকতে তুমি যদি

উঠে যাও, তা হলে তাও আমার খাওয়া হবে না ঠাকুরপো। বিশ্বাস না হয় ওঁকে  
জিজ্ঞেস কর। বলিয়া সে আমাকে আপীল করিল।

কাজেই এতক্ষণে আমাকে কথা কহিতে হইল। বলিলাম, এ যে সত্যি সে  
আমি হলফ নিয়ে বলতে রাজী আছি সাধুজী। মিথ্যে তর্ক করে লাভ নেই ভায়া,  
পার হাঁড়িটা উপুড় না হওয়া পর্যন্ত সেবাটা যেমন চলচে চলুক, নইলে ও আর  
কোন কাজেই আসবে না। খাবারটা ট্রেনে এসেচে, সুতরাং অনাহারে মারা গেলেও  
ওঁকে তার একবিন্দু খাওয়ান যাবে না। এটা ঠিক কথা।

সাধু কহিলেন, কিন্তু এ-সব খাবার ত গাড়িতে ছেঁয়া যায় না!

আমি বলিলাম, সে মীমাংসা আমি এতদিনে শেষ করে উঠতে পারলাম  
না ভায়া, আর তুমি কি এক আসনেই নিষ্পত্তি করতে পারবে? তার চেয়ে বরঞ্চ  
কাজ সেরে উঠে পড়, নইলে সৃষ্য ডুব দিলে হয়ত চিঁড়ে-জলও গলা দিয়ে গলবার  
পথ পাবে না। বলি, ঘণ্টাকয়েক আরও ত তুমি সঙ্গে আছ, শান্ত্রের বিচার পার  
ত পথে যেতে যেতেই বুঝিয়ো, তাতে কাজ না হোক অন্ততঃ অকাজ বাঢ়বে না।  
এখন যা হচ্ছে তাই চলুক।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে সমস্ত দিনই উনি কিছুই খাননি?

বলিলাম, না। তা ছাড়া কালও কি নাকি একটা ছিল, শুন্চি, দুটো ফলমূল  
ছাড়া কালও আর কিছু ওঁর মুখে যায়নি।

রতন পিছনেই ছিল, ঘাড় নাড়িয়া কি যেন একটা বলিতে গিয়া—বোধ  
হয় মনিবের গোপন চোখের ইঙ্গিতে—হঠাত থামিয়া গেল।

সাধু রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, এতে আপনার কষ্ট হয় না?

প্রত্যন্তরে সে শুধু হাসিল; কিন্তু আমি কহিলাম, সেটা প্রত্যক্ষ এবং  
অনুমান কোনটাতেই জানা যাবে না। তবে চোখে যা দেখেছি তাতে আরও দু-  
একটা দিন বোধ হয় যোগ করা যেতে পারে।

রাজলক্ষ্মী প্রতিবাদ করিয়া কহিল, তুমি দেখেচ চোখে? কখখনো না।

ইহার আমিও জবাব দিলাম না, সাধুজীও আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।  
বেলার দিকে লক্ষ্য করিয়া নীরবে ভোজন শেষ করিয়া গাত্রোথান করিলেন।

রতন এবং সঙ্গের দু'জনের আহার সমাধা হইতে বেলা গেল। রাজলক্ষ্মী  
নিজের ব্যবস্থা কি করিল সেই জানে।

আমরা গঙ্গামাটির উদ্দেশে যখন যাত্রা করিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে।  
অয়োদ্ধীর চাঁদ তখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, কিন্তু অন্ধকারও কোথাও কিছু  
ছিল না। মালবোঝাই গাড়ি দুইটা সকলের পিছনে, রাজলক্ষ্মীর গাড়ি মাঝখানে ও  
আমার গাড়িটা ভাল বলিয়া সকলের অগ্রে। সাধুজীকে ডাকিয়া কহিলাম, ভায়া,  
হাঁটার ত আর কমতি নেই, আজকের মত না হয় আমার এটাতেই পদার্পণ কর  
না?

সাধু কহিলেন, সঙ্গেই ত রইলেন, না পারলে না হয় উঠেই বসব—কিন্তু  
এখন একটু হাঁটি।

রাজলক্ষ্মী মুখ বাড়াইয়া বলিল, তা হলে আমার বডিগার্ড হয়ে চল  
ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে কইতে যাই। এই বলিয়া সে সাধুজীকে  
নিজের গাড়ির কাছে ডাকিয়া লইল।

সম্মুখেই আমি। মাঝে মাঝে গাড়ি, গরু ও গাঢ়োয়ানের সম্মিলিত  
উপদ্রবে তাঁহাদের আলাপের কিছু কিছু অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেও অধিকাংশই  
শুনিতে শুনিতে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি তোমার এদিকে নয়, আমাদের দেশের দিকেই  
সে তোমার কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। কিন্তু আজ কোথায় চলেচ সত্তি বল ত  
ভাই?

সাধু কহিলেন, গোপালপুরে।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের গঙ্গামাটি থেকে সেটা কতদূর?

সাধু জবাব দিলেন, আপনার গঙ্গামাটি ও জানিনে, আমার গোপালপুরও চিনিনে, তবে সম্ভবতঃ ও দুটো কাছাকাছিই হবে। অন্ততঃ তাই ত শুনলাম।

তা হলে এতরাত্রে গ্রামই বা কি করে ঠাওরাবে, যাঁর ওখানে যাচ তাঁর বাড়িই বা কি করে খুঁজে পাবে?

সাধুজী একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, গ্রামটা ঠাওরান শক্ত হবে না, কারণ পথের উপরেই নাকি একটা শুক্নো পুকুর আছে, তার দক্ষিণ দিকে ক্রোশখানেক হাঁটলেই পাওয়া যাবে। আর বাড়ি খোঁজবার দুঃখ পোহাতে হবে না, কারণ সমস্তই অচেনা। তবে গাছতলা একটা পাওয়া যাবেই এ আশা আছে।

রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিল, এই শীতের রাত্রে গাছতলায়? ওই সামান্য কম্বলটা মাত্র অবলম্বন করে? সে আমি কিছুতেই সহিতে পারব না ঠাকুরপো।

তাহার উদ্বেগ আমাকে পর্যন্ত আঘাত করিল। সাধু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আন্তে আন্তে বলিলেন, কিন্তু আমাদের ত ঘরবাড়ি নেই, আমরা ত গাছতলাতেই থাকি দিদি।

এবার রাজলক্ষ্মীও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে দিদির চোখের সামনে নয়। রাত্রে ভাইকে আমরা নিরাশয়ের মধ্যে পাঠাই নে। আজ আমার সঙ্গে চল, কাল তোমাকে আমি নিজে উদ্যোগ করে পাঠিয়ে দেব।

সাধু চুপ করিয়া রহিলেন। রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, তাহাকে না জানাইয়া যেন কোন জিনিস গাঢ়ি হইতে স্থানান্তরিত না করা হয়। অর্থাৎ সন্ধ্যাসীঠাকুরের বাস্ত্রটা আজ রাত্রির মত আটক করা হইল।

আমি বলিলাম, তা হলে ঠাণ্ডায় আর কষ্ট নাই করলে ভায়া, এসো না আমার গাড়িতে।

সাধু একটু ভাবিয়া কহিলেন, থাক এখন। দিদির সঙ্গে একটু কথা কইতে কইতে যাই।

আমিও ভাবিলাম, তা বটে! নৃতন সম্বন্ধটা অঙ্গীকারের দিকেই সাধুজীর মনে মনে লড়াই চলিতেছিল আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তবুও শেষরক্ষা হইল না। হঠাৎ একসময়ে যখন তিনি অঙ্গীকার করিয়াই লইলেন, তখন অনেকবার মনে হইল একটু সাবধান করিয়া দিয়া বলি, ঠাকুর পালালেই কিন্তু ভাল করতে—শেষে আমার দশা না হয়! অথচ চুপ করিয়া রহিলাম।

দু'জনের কথাবার্তা অবাধে চলিতে লাগিল। গরুর গাড়ির ঝাঁকানিতে এবং তন্দ্রার ঝোঁকে মাঝে মাঝে তাঁহাদের আলাপের সূত্র হারাইতে থাকিলেও কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া চলিতে আমারও সময়টা মন্দ কাটিল না।

বোধ করি একটু তন্দ্রামন্থই হইয়াছিলাম, সহসা শুনিলাম—প্রশ্ন হইল, হাঁ আনন্দ, তোমার ঐ বাস্তিতে কি আছে ভাই?

উত্তর আসিল, গোটা-কয়েক বই আর ওষুধপত্র আছে দিদি।

ওষুধ কেন? তুমি কি ডাঙ্কার?

আমি সন্ন্যাসী। আচ্ছা, আপনি কি শোনেন নি দিদি, আপনাদের ওদিকে কি রকম কলেরা হচ্ছে?

কৈ না! সে কথা ত আমাদের গোমন্তা আমাকে জানান নি। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি কলেরা সারাতে পার?

সাধুজী একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, সারাবার মালিক ত আমরা নই দিদি, আমরা শুধু ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এও দরকার, এও তাঁরই হৃকুম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ন্যাসীতেও ওষুধ দেয় বটে, কিন্তু ওষুধ দেবার জন্যেই ত সন্ন্যাসী হতে হয় না। আচ্ছা আনন্দ, তুমি কি কেবল এইজন্যই সন্ন্যাসী হয়েছ ভাই?

সাধু কহিলেন, সে ঠিক জানিনে দিদি। তবে দেশের সেবা করাও আমাদের একটা ব্রত বটে।

আমাদের? তবে বুঝি তোমাদের একটা দল আছে ঠাকুরগো?  
সাধু জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজলক্ষ্মী পুনশ্চ কহিল, কিন্তু সেবা করার জন্য ত সন্ন্যাসী হবার দরকার  
হয় না ভাই। তোমাকে এ মতি-বুদ্ধি কে দিলে বল ত?

সাধু এ প্রশ্নেরও বোধ হয় উত্তর দিলেন না, কারণ কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন  
কথাই কাহারও শুনিতে পাইলাম না। মিনিট-দশেক পরে কানে গেল সাধু  
কহিতেছেন, দিদি, আমি ছেউ সন্ন্যাসী, আমাকে ও-নাম না দিলেও চলে। কেবল  
নিজের কতকগুলো ভার ফেলে দিয়ে তার জায়গায় অপরের বোৰা তুলে নিয়েছি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল না। সাধু বলিতে লাগিলেন, আমি প্রথম থেকেই  
দেখতে পেয়েচি, আপনি আমাকে ক্রমাগত ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করচেন। কেন  
জানিনে, বোধ হয় দিদি বলেই। কিন্তু যাদের ভার নিতে আমরা ঘর ছেড়ে  
বেরিয়েচি, এরা যে কত দুর্বল, কত রুশ্ব, কিরূপ নিরূপায় এবং সংখ্যায় কত, এ  
যদি একবার জানেন ত ও-কথা আর মনেও আনতে পারবেন না।

ইহারও রাজলক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না। কিন্তু আমি বুঝিলাম, যে প্রসঙ্গ  
উঠিল এইবার উভয়ের মন এবং মতের মিল হইতে বিলম্ব হইবে না। সাধুজীও  
ঠিক জায়গাতেই আঘাত করিলেন। দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, ইহার সুখ, ইহার  
দুঃখ, ইহার অভাব আমি নিজেও নিতান্ত কম জানি না; কিন্তু এই সন্ন্যাসীটি যেই  
হোন, তিনি এই বয়সেই আমার চেয়ে ঢের বেশি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছেন এবং  
তের বড় হন্দয় দিয়া তাহাদিগকে নিজের করিয়া লইয়াছেন। শুনিতে শুনিতে  
চেথের ঘূম জলে পরিবর্তিত হইয়া উঠিল এবং বুকের ভিতরটা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে  
দুঃখে ব্যথায় যেন মথিত হইয়া যাইতে লাগিল। ও-গাড়ির অন্দরকার কোণে একাকী  
বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা প্রশ্নও করিল না, একটা কথাতেও কথা যোগ করিল না।  
তাহার নীরবতায় সাধুজী কি ভাবিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু এই একান্ত  
স্তুতার পরিপূর্ণ অর্থ আমার কাছে গোপন রহিল না।

দেশ বলিতে যেথায় দেশের চৌদ্দ-আনা নরনারী বাস করেন, সেই পল্লীগ্রামের কাহিনীই সাধু বিবৃত করিতে লাগিলেন। দেশে জল নাই, প্রাণ নাই, স্বাস্থ্য নাই—জঙ্গের আবর্জনায় যেথায় মুক্ত আলো ও বায়ুর পথ রূপ, যেথায় জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, ধর্ম যেথায় বিকৃত, পথভ্রষ্ট, মৃতকল্প, জন্মভূমির সেই দুঃখের বিবরণ ছাপার অক্ষরেও পড়িয়াছি, নিজের চোখেও দেখিয়াছি; কিন্তু এই না-থাকা যে কত বড় না-থাকা, মনে হইল আজিকার পূর্বে তাহা যেন জানিতামই না। দেশের এই দৈন্য যে কিরণ ভয়ঙ্কর দীনতা, আজিকার পূর্বে তাহার ধারণাই যেন আমার ছিল না।

শুক্র শূন্য বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। পথের ধূলা শিশিরে ভিজিয়া ভারী হইয়াছে; তাহারই উপর দিয়া গাড়ির চাকা এবং গরুর শুরের শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়, আকাশে জ্যোৎস্না পাওয়া হইয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারই ভিতর দিয়া শীতের এই স্তুক্র নিশ্চীতে আমরা অজানার দিকে ধীর মন্ত্ররগতিতে অবিশ্রাম চলিয়াছি।

অনুচরদিগের মধ্যে কে জাগিয়া, আর কে নাই, জানা গেল না,—সবাই শীতবস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নীরব। কেবল একা সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গ লইয়াছে এবং পরিপূর্ণ স্তুক্রতার মাঝে তাহারই মুখ দিয়া কেবল দেশের অজ্ঞাত ভাই-ভগিনীর অসহ বেদনার ইতিহাস যেন ঝলকে ঝলকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুক্র, এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমস্ত সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল।

সহসা সাধু রাজলক্ষ্মীকে সম্মোধন করিয়া কহিলেন, মনে হয় তোমাকে  
যেন আমি চিনতে পেরেচি দিদি। মনে হয় তোমাদের মত মেয়েদের নিয়ে গিয়ে  
একবার তোমাদেরই ভাইবোনদের নিজের চোখে দেখাই।

রাজলক্ষ্মী প্রথমে কথা বলিতে পারিল না; তার পরে ভাঙ্গা গলায় কহিল,  
আমার কি সে সুযোগ হতে পারে আনন্দ! আমি যে মেয়েমানুষ, এ কথা কি করে  
ভুলব ভাই!

সাধু কহিলেন, কেন হতে পারে না দিদি? আর তুমি মেয়েমানুষ, এই  
কথাটাই যদি ভোলো ত কষ্ট করে তোমাকে ও-সব দেখিয়ে আমার কি লাভ  
হবে?

## চার

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, গঙ্গামাটি কি তোমাদের জমিদারি দিদি?

রাজলক্ষ্মী একটু হাসিয়া কহিল, দেখচ কি ভাই, আমরা একটা মস্ত জমিদার।

এবার উত্তর দিতে গিয়ে সাধুও একটুখানি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, মস্ত জমিদারি কিন্তু মস্ত সৌভাগ্য নয়, দিদি! তাঁহার কথায়, তাঁহার পার্থিব অবস্থা সম্পন্নে আমার এক প্রকার সন্দেহ জনিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী সে দিক দিয়া গেল না। সে সরলভাবে তৎক্ষণাত স্বীকার করিয়া লইয়া কহিল, সে কথা সত্যি আনন্দ। ও-সব যত দূর হয়ে যায় ততই ভাল।

আচ্ছা দিদি, উনি ভাল হয়ে গেলেই তোমরা আবার শহরে ফিরে যাবে?

ফিরে যাব? কিন্তু আজ সে ত অনেক দূরের কথা ভাই!

সাধু কহিলেন, পার ত আর ফিরো না দিদি। এই-সব দরিদ্র দুর্ভাগ্যলোকে তোমরা ফেলে চলে গেছ বলেই এদের দুঃখ-কষ্ট এমন চতুর্ণণ হয়ে উঠেচে। যখন কাছে ছিলে তখনও যে এদের কষ্ট তোমরা দাওনি তা নয়, কিন্তু দূরে থেকে এমন নির্মম দুঃখ তাদের দিতে পারনি। তখন দুঃখ যেমন দিয়েচ, দুঃখের ভাগও তেমনি নিয়েচ। দিদি, দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে, দেশের দুঃখ-দৈন্য বোধ করি এমন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে ওঠে না। আর এই কানায় কানায় বলতে যে কি বোঝায় তোমাদের শহরবাসের সর্বপ্রকার আহার-বিহারের যোগান দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ মেলে দেখতে

পার দিদি—

হাঁ আনন্দ, বাড়ির জন্য মন তোমার কেমন করে না?

সাধু সংক্ষেপে কহিলেন, না। সে বেচারা বুঝিল না, কিন্তু আমি বুঝিলাম  
রাজলক্ষ্মী প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিল, কেবল সহিতে পারিতেছিল না বলিয়াই।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যথিতোকগ্রে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে  
তোমার কে কে আছেন?

সাধু কহিলেন, কিন্তু বাড়ি ত এখন আর আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী আবার অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, আচ্ছা আনন্দ, এই  
বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে কি তুমি শান্তি পেয়েচ?

সাধু হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাস্ রে! সন্ন্যাসীর অত লোভ! না দিদি,  
আমি কেবল পরের দুঃখের ভার নিতে একটু চেয়েচি, তাই শুধু পেয়েচি।

রাজলক্ষ্মী আবার নীরব হইয়া রহিল। সাধু কহিলেন, উনি বোধ করি  
ঘূমিয়ে পড়েচেন, কিন্তু এইবার একটু তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসি গে। আচ্ছা দিদি,  
কখনো দু-চারদিন যদি তোমাদের অতিথি হই, উনি কি রাগ করবেন?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, উনিটি কে? তোমার দাদা?

সাধুজীও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, না হয় তাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আর আমি রাগ করব কি না জিজ্ঞেসা করলে না? আচ্ছা  
চল ত একবার গঙ্গামাটিতে, তারপর তার বিচার হবে।

সাধুজী কি বলিলেন শুনিতে পাইলাম না, বোধ করি কিছুই বলিলেন না।  
ক্ষণেক পরে আমার গাড়িতে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, দাদা, আপনি  
কি জেগে আছেন?

আমি জাগিয়াই ছিলাম, কিন্তু সাড়া দিলাম না। তখন আমারই পাশে  
সাধুজী একটুখানি স্থান করিয়া লইয়া তাঁহার ছেঁড়া কম্বলখানি গায়ে দিয়া শুইয়া  
পড়লেন। একবার ইচ্ছা হইল একটুখানি সরিয়া গিয়া বেচারীকে আর একটু  
জায়গা দিই, কিন্তু পাছে নড়াচড়া করিতে গেলে তাঁহার সন্দেহ জন্মে আমি জাগিয়া  
আছি, কিংবা আমার ঘুম ভাঙিয়া গেছে, এবং এই গভীর নিশ্চিখে আর একদফা

দেশের সুগভীর সমস্যা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই ভয়ে করুণা-প্রকাশের চেষ্টা  
মাত্র করিলাম না।

গঙ্গামাটিতে গাড়ি কখন প্রবেশ করিল আমি জানিতে পারি নাই, জানিলাম  
যখন গাড়ি আসিয়া থামিল আমাদের নৃতন বাটীর দ্বারপ্রান্তে। তখন সকাল  
হইয়াছে। গোটা-চারেক গো-যানের বিবিধ এবং বিচিত্র কোলাহলে চতুর্পার্শ্বে ভিড়  
বড় কম জমে নাই। রতনের কল্যাণে পূর্বাহ্নেই শুনিয়াছিলাম এটা নাকি মুখ্যতঃ  
ছোটজাতির গ্রাম। দেখিলাম, রাগ করিয়া কথাটা সে নিতান্ত মিথ্যা কহে নাই।  
এই শীতের ভোরেও পঞ্চশ-ষাটটি নানা বয়সের ছেলে-মেয়ে উলঙ্গ এবং অর্ধ-  
উলঙ্গ অবস্থায় বোধ করি এইমাত্র ঘূম ভাঙিয়া তামাশা দেখিতে জমা হইয়াছে।  
পশ্চাতে বাপ-মায়ের দলও যথাযোগ্যভাবে উঁকিবুঁকি মারিতেছে। ইহাদের আকৃতি  
ও পোশাক-পরিচ্ছদে ইহাদের কৌলীন্য সম্বন্ধে আর যাহার মনে যাহাই থাক,  
রতনের মনের মধ্যে বোধ হয় সংশয়ের বাস্পও রহিল না। তাহার ঘূমভাঙ্গা মুখ  
এক নিমিষেই বিরক্তি ও ক্রোধে ভীমরূপের চাকের মতন ভীষণ হইয়া উঠিল।  
কঢ়ীকে দর্শন করিবার অতি-ব্যগ্রতায় গোটাকয়েক ছেলেমেয়ে কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত  
হইয়া ঘেঁষিয়া আসিয়াছিল, রতন এমন একটা বিকট ভঙ্গি করিয়া তাহাদের তাড়া  
করিল যে, গাড়োয়ান দু'জন সুমুখে না থাকিলে সেইখানেই একটা রক্তারক্তি কাণু  
ঘটিত। রতন কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিল না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, যত  
সব ছোটজেতের মরণ! দেখচেন বাবু, ছোটলোক ব্যাটাদের আস্পর্ধা—যেন রথ-  
দোল দেখতে এসেচে! আমাদের মত সব ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারে  
বাবু! এখনি সব ছেঁয়াচুঁয়ি করে একাকার করে দেবে।

‘ছেঁয়াচুঁয়ি’ কথাটা সর্বাগ্রে কানে গেল রাজলক্ষ্মীর। তাহার মুখখানি যেন  
অপ্রসম্ভ হইয়া উঠিল।

সাধুজী নিজের বাক্স নামাইতে ব্যস্ত ছিলেন। কাজটা সমাধা করিয়া তিনি  
একটা লোটা বাহির করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং কাছাকাছি যে

হেলেটিকে পাইলেন অকস্মাত তাহারই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, ওরে ছেলে, যা ত ভাই, এখানে কোথা ভাল পুরু-টুরুর আছে—একঘটি জল নিয়ে আয়—চা খেতে হবে। বলিয়া পাত্রটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া, সম্মুখের একজন প্রৌঢ়গোছের লোককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মোড়লের পো, কাছাকাছি কার গরু আছে দেখিয়ে দাও ত দাদা, একছটাক দুধ চেয়ে আনি।

গাঁয়ের টাটকা খাঁটি জিনিস—চায়ের রঙটা যা দাঁড়াবে দিদি, বলিয়া তিনি একবার আমার ও একবার তাঁহার দিদির মুখের প্রতি দৃষ্টি নিষ্কেপ করিলেন। দিদি কিন্তু এ উৎসাহে কিছুমাত্র যোগ দিলেন না। অপ্রসন্নমুখে একটু হাসিয়া কহিলেন, রতন, যা ত বাবা, ঘটিটা মেজে একটু জল নিয়ে আয়।

রতনের মেজাজের খবরটা ইতিপূর্বে দিয়াছি। তার উপর এই শীতের সকালে যখন কে-একটা অচেনা সাধুর জন্য কোথাকার একটা নিরুদ্দেশ জলাশয় উদ্দেশ করিয়া জল আনিবার ভার পড়িল, তখন আর সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। একমুহূর্তেই তাহার সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল তাহার চেয়েও ছেট সেই হতভাগ্য বালকটার উপর। তাহাকে সে একটা প্রচণ্ড ধরক দিয়া কহিয়া উঠিল, নচ্ছার পাজি ব্যাটা! ঘটি ছুলি কেন তুই? চল হারামজাদা, ঘটি মেজে জলে চুবিয়ে দিবি। বলিয়া সে কেবল চোখ-মুখের ভঙ্গিতেই ছেলেটাকে যেন গলাধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া লইয়া গেল।

তাহার কাণ দেখিয়া সাধু হাসিলেন, আমিও হাসিলাম। রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু সলজ্জ হাসি কহিল, গ্রামটা যে তোলপাড় করে তুললে আনন্দ! সাধুদের বুঝি রাত না পোয়াত্তেই চা চাই।

সাধু বলিলেন, গৃহীদের রাত পোহায় নি বলে বুঝি আমাদেরও পোহাবে না? বেশ ত! কিন্তু দুধের যোগাড় যে করা চাই। আচ্ছা, বাড়িটার মধ্যে তুকে দেখা যাক কাঠকুটো উনুন-টুনুন আছে কি না। ওহে কর্তা, চল না দাদা, কার ঘরে গরু

আছে একটু দেখিয়ে দেবে। দিদি, কালকের সেই হাড়িটায় বরফি কিছু ছিল না? না, গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে তাকে শেষ করেচেন?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। পাড়ার যে দু-চারজন মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল তাহারাও মুখ ফিরাইল।

এমন সময় গোমস্তা কাশীরাম কুশারীমহাশয় হন্তদন্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার তিন-চারজন লোক, কাহারো মাথায় ঝুড়িভরা শাকসবজি ও তরিতরকারি, কাহারো হাতে ঘটিভরা দুধ, কাহারো হাতে দধির ভাণ্ড, কাহারো হাতে একটা বৃহদ্যায়তন রোহিত- মৎস্য। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে এই সামান্য একটু বিলম্বের জন্য বহুবিধ কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন। লোকটিকে আমার ভাল বলিয়াই মনে হইল। বয়স পঞ্চাশের উপর গিয়াছে। কিছু কৃশ, দাঢ়িগোঁফ কামানো—রঙটি ফরসার দিকেই আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনিও প্রতি-নমস্কার করিলেন। কিন্তু সাধুজী এ-সকল প্রচলিত ভদ্রতার ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি তরকারির ঝুড়িটা স্বহস্তে নামাইয়া লইয়া তাহাদের পুর্খানুপুর্খরপে বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন; দুধ যে খাঁটি সে বিষয়ে নিঃসংশয়ে মত দিলেন, এবং মৎস্যটির ওজন কত তাহা অনুমান করিয়া ইহার আস্বাদ-সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকেই আশান্তিত করিয়া তুলিলেন।

এই সাধুমহারাজের শুভাগমন-সম্বন্ধে গোমস্তা মহাশয় পূর্বাহ্নে কোন সংবাদ পান নাই; তিনি কৌতুহলী হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী কহিল, সন্ধ্যাসী দেখে ভয় পাবেন না কুশারীমশাই, ওটি আমার ভাই। একটু হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর বার বার গেরুয়া ছাড়ানো যেন আমার একটা কাজ হয়ে উঠেচে।

কথাটা সাধুজীর কানে গেল। কহিলেন, এ কাজটা তত সহজে হবে না দিদি। বলিয়া আমার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া তিনি একটুখানি হাসিলেন। ইহার অর্থ

আমি বুবিলাম, রাজলক্ষ্মীও বুঝিল। সে কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে দেখা যাবে।

বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, কুশারীমহাশয় বন্দোবস্ত বড় মন্দ করেন নাই। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া তিনি নিজে সরিয়া গিয়া পুরাতন কাছারি-গৃহটিকেই কিছু কিছু সংস্কার এবং পরিবর্তন করিয়া দিব্য বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। ভিতরে রান্না এবং তাঁড়ারঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। ঘরগুলি মাটির, খড় দিয়া ছাওয়া, কিন্তু বেশ উঁচু এবং বড়। বাহিরে বসিবার ঘরখানিও চমৎকার পরিপাটি। প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, পরিষ্কার এবং মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা। একধারে একটি ছোট কৃপ এবং তাহারই অদূরে গোটা দুই-তিন টগর ও শেফালি বৃক্ষ। আর একদিকে অনেকগুলি ছোট-বড় তুলসীগাছের সারি এবং গোটা-চারেক যুঁই ও মল্লিকা ফুলের ঝাড়। সবসুন্দর জায়গাটা দেখিয়া যেন তৃষ্ণিবোধ হইল।

সকলের চেয়ে উৎসাহ দেখা গেল সন্ধ্যাসীভায়ার। যাহা কিছু তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতেই উচ্চকগ্ঠে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন এমন আর কখনও দেখেন নাই। আমি কলরব না তুলিলেও মনে মনে খুশিই হইয়াছিলাম। রাজলক্ষ্মী তাহার ভাইয়ের জন্য রান্নাঘরে চা তৈরি করিতেছিল, অতএব মুখের ভাব তাহার চোখে দেখা গেল না বটে, কিন্তু মনের ভাব তাহার কাহারও কাছে অবিদিত ছিল না। কেবল দলে ভিড়িল না রতন। সে মুখখানা তেমনি ভারী করিয়াই একটা খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

চা প্রস্তুত হইল। সাধুজী কল্যকার অবশিষ্ট মিষ্টান্নযোগে পেয়ালা-দুই চা নিঃশব্দে পান করিয়া উঠিলেন এবং আমাকে কহিলেন, চলুন না, গ্রামখানা একবার দেখে আসা যাক। বাঁধটাও দূরে নয়, অমনি স্নানটাও সেরে আসা যাবে। দিদি, আসুন না জমিদারি পরিদর্শন করে আসবেন। বোধ হয় ভদ্রলোক বড় কেউ নেই—লজ্জা করবার বিশেষ আবশ্যক হবে না। সম্পত্তি ভাল, দেখে লোভ হচ্ছে।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସିଯା କହିଲ, ତା ଜାନି । ସନ୍ଧ୍ୟସୀଦେର ସ୍ଵଭାବରୁ ଓହି ।

ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ପାଚକ ବ୍ରାକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆରା ଏକଜନ ଚାକର ଆସିଯାଛିଲ, ତାହାରା ରନ୍ଧନେର ଆୟୋଜନ କରିତେଛିଲ । ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ନା ମହାରାଜ, ଅମନ ଟାଟ୍ କା ମାଛେର ମୁଡ୍ଗୋ ତୋମାକେ ଦିଯେ ଭରସା ହୁଏ ନା, ନେଯେ ଏସେ ରାନ୍ଧାଟା ଆମିଇ ଚଢ଼ିଯେ ଦେବ । ଏହି ବଲିଯା ସେ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଯାଇବାର ଉଦ୍ୟୋଗ କରିତେ ଲାଗିଲ ।

ଏତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତନ କୋନ କଥାଯ ବା କାଜେ ଯୋଗଦାନ କରେ ନାହିଁ । ଆମରା ବାହିର ହଇତେଛି, ଏମନ ସମୟେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଗନ୍ଧୀରମ୍ବରେ କହିଲ, ମା, ଏ ଯେ ବାଁଧ ନା ପୁରୁଷ କି ଏକଟା ପୋଡ଼ାଦେଶେର ଲୋକେ ବଲେ, ଓତେ ଯେନ ଆପଣି ନାମବେଳେ ନା । ଭୟାନକ ଜୋକ ଆଛେ, ଏକ-ଏକଟା ନାକି ଏକ ହାତ କରେ ।

ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ମୁଖ ଭଯେ ପାଞ୍ଚୁର ହଇଯା ଗେଲ—ବଲିସ କି ରତନ, ଏଦିକେ କି ବଡ଼ ଜୋକ ନାକି?

ରତନ ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଯା କହିଲ, ଆଜେ ହାଁ, ତାହିତ ଶୁଣେ ଏଲୁମ ।

ସାଧୁ ତାଡ଼ା ଦିଯା ଉଠିଲେନ, ଆଜେ ହାଁ ଶୁଣେ ଏଲେ ବୈ କି! ବ୍ୟାଟା ନାପିତେ ଭେବେ ଭେବେ ଆଚଛା ଫନ୍ଦି ବାର କରେଚେ! ଇହାର ମନେର ଭାବ ଏବଂ ଜାତିର ପରିଚୟ ସାଧୁ ପୂର୍ବାହ୍ଲେଷେ ସଂଗ୍ରହ କରିଯାଛିଲେନ, ହାସିଯା କହିଲେନ, ଦିଦି, ଓର କଥା ଶୁଣବେଳେ ନା, ଆସୁନ । ଜୋକ ଆଛେ କି ନା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ନାହଯ ଆମାଦେର ଦିଯେଇ ହୁଏ ଯାବେ ।

ତାହାର ଦିଦି କିନ୍ତୁ ଆର ଏକ ପା ଅଗସର ହଇଲେନ ନା, ଜୋକେର ନାମେ ଏକେବାରେ ଅଚଳ ହଇଯା କହିଲେନ, ଆମି ବଲି ଆଜ ନାହଯ ଥାକ ଆନନ୍ଦ । ନତୁନ ଜାୟଗା, ବେଶ ନା ଜେନେଶ୍ବନେ ଅମନ ଦୁଃସାହସ କରା ଭାଲ ହବେ ନା । ରତନ, ତୁଇ ନାହଯ ଓଠ ବାବା, ଏଇଥାନେଇ ଦୁ ଘାଡ଼ା ଜଳ କୁଯୋ ଥେକେ ତୁଲେ ଦେ । ଆମାକେ ଆଦେଶ ହଇଲ—ତୁମି ରୋଗାମାନୁଷ, ତୁମି ଯେନ ଆର କୋଥାକାର କୋନ ଜଲେ ନେଯେ ଏସ ନା । ବାଡ଼ିତେଇ ଦୁ ଘଟି ଜଳ ମାଥାଯ ଦିଯେ ଆଜକେର ମତ ନିର୍ଣ୍ଣତ ହୁଏ ।

ସାଧୁ ହାସିଯା ବଲିଲେନ, ଆର ଆମିଇ କି ଏତ ଅବହେଲାର ଦିଦି, ଯେ ଆମାକେଇ କେବଳ ସେଇ ଜୋକେର ପୁରୁଷ ପାଠିଯେ ଦିଚେନ?

କଥାଟା ବେଶ କିଛୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଏହିକୁଠେଇ ରାଜଲଙ୍ଘର ଦୁଇ ଚକ୍ର ଯେନ ହଠାତ୍ ଛଲଛଳ କରିଯା ଆସିଲ । ସେ କ୍ଷଣକାଳ ନୀରବେ ମିଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତାହାକେ ଯେନ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଯା କହିଲ, ତୁମ ଯେ ଭାଇ ମାନୁଷେର ହାତେର ବାଇରେ । ଯେ ବାପ-ମାୟେର କଥା ଶୋନେନି, ସେ କି ଏକଟା କୋଥାକାର ଅଜାନା-ଅଚେନା ବୋନେରଇ କଥା ରାଖିବେ?

ସାଧୁ ପ୍ରସ୍ତାନ କରିତେ ଉଦ୍ୟତ ହଇଯା ସହସା ଏକଟୁ ଥାମିଯା କହିଲେନ, ଏହି ଅଜାନା-ଅଚେନା କଥାଟି ବଲବେନ ନା ଦିଦି । ଆପନାଦେର ସବାଇକେ ଚିନବ ବଲେଇ ତ ଘର ଛେଡ଼େ ଆସା, ନଇଲେ ଆମାର କି ଦରକାର ଛିଲ ବଲୁନ ତ? ଏହି ବଲିଯା ତିନି ଏକଟୁ ଦ୍ରତ୍ତପଦେଇ ବାହିର ହଇଯା ଗେଲେନ, ଏବଂ ଆମିଓ ପିଛୁପିଛୁ ତାଁହାର ସଙ୍ଗ ଲାଇଲାମ ।

ଦୁଇଜନେ ଏହିବାର ବେଶ କରିଯା ଘୁରିଯା ଫିରିଯା ଗ୍ରାମଖାନିକେ ଦେଖିଯା ଲାଇଲାମ । ଗ୍ରାମଖାନି ଛୋଟ ଏବଂ ଆମରା ଯାହାଦେର ଛୋଟଜାତ ବଲି ତାହାଦେରଇ । ବସ୍ତୁ, ଘର-ଦୁଇ ବାରୁଜୀବୀ ଏବଂ ଏକ ଘର କର୍ମକାର ବ୍ୟତୀତ ଗଞ୍ଜାମାଟିତେ ଜଳାଚରଣୀୟ କେହ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଇ ଡୋମ ଏବଂ ବାଉରିଦେର ବାସ । ବାଉରିରା ବେତେର କାଜ ଏବଂ ମଜୁରି କରେ ଏବଂ ଡୋମେରା ଚାଙ୍ଗାରି, କୁଳା, ଚୁପଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଯା ପୋଡ଼ାମାଟି ଗ୍ରାମେ ବିକ୍ରି କରିଯା ଜୀବିକାନିର୍ବାହ କରେ । ଗ୍ରାମେର ଉତ୍ତର ଦିକେ ଯେ ଜଳ ନିକାଶେର ବଡ଼ ନାଲା ଆଛେ, ତାହାରଇ ଓପାରେ ପୋଡ଼ାମାଟି । ଶୋନା ଗେଲ, ଓ ଗ୍ରାମଖାନା ବଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତାତେ ଅନେକ ଘର ବ୍ରାନ୍ତି, କାଯନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ବାସ ଆଛେ । ଆମାଦେର କୁଶାରୀମହାଶୟେର ବାଟିଓ ଓହି ପୋଡ଼ାମାଟିତେଇ । କିନ୍ତୁ ପରେର କଥା ପରେ ହଇବେ, ଆପାତତଃ ନିଜେଦେର ଗ୍ରାମେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଚୋଖେ ଦେଖା ଗେଲ ତାହାତେ ଦୃଷ୍ଟି ଜଲେ ବାପସା ହଇଯା ଆସିଲ । ବେଚାରୀରା ଘରଗୁଲିକେ ପ୍ରାଣପଣେ ଛୋଟ କରିତେ କ୍ରଟି କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୃହୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଖଡ଼ ଦିଯା ଛାଇବାର ମତ ଖଡ଼ ଏହି ସୋନାର ବାଙ୍ଗଲାଦେଶେ ତାହାଦେର ଭାଗ୍ୟେ ଜୁଟେ ନାହିଁ । ଏକଛଟାକ ଜମିଜାଯଗା ପ୍ରାୟ କାହାରେ ନାହିଁ, କେବଲମାତ୍ର ଚାଙ୍ଗାରି ଚୁପଡ଼ି ହାତେ ବୁନିଯା ଏବଂ ଜଲେର ଦାମେ ଗ୍ରାମାନ୍ତରେ ସଂଗ୍ରହିତେର ଦ୍ୱାରେ ବିକ୍ରି କରିଯା କି କରିଯା ଯେ ଇହାଦେର ଦିନପାତ ହ୍ୟ ଆମି ତ

ভাবিযা পাইলাম না। তবুও এমন করিযাই এই অঙ্গটি অস্পৃশ্যদের দিন চলিতেছে এবং হয়ত এমনি করিযাই ইহাদের চিরদিন চলিযা গেছে কিন্তু কোনদিন কেহ খেয়ালমাত্র করে নাই।

পথের কুকুর যেন জন্মিযা গোটা-কয়েক বৎসর যেমন-তেমনভাবে জীবিত থাকিযা কোথায় কি করিযা মরে তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে একবিন্দু দাবিদাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনায় কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।

কিন্তু সাধু যে আমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন আমি জানিতাম না। তিনি হঠাৎ কহিলেন, দাদা, এই হচ্ছে দেশের সত্যিকার ছবি। কিন্তু মন খারাপ করবার দরকার নেই। আপনি ভাবছেন এ-সব বুঝি এদের অহরহ দুঃখ দেয়, কিন্তু তা মোটেই নয়।

আমি শ্বুরু এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, এটা কিরকম কথা হ'ল সাধুজী?

সাধুজী বলিলেন, আমাদের মত যদি সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন দাদা, তাহলে বুঝতেন আমি প্রায় সত্যি কথাটাই বলেচি। দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করে দাদা? মন ত? কিন্তু সে বালাই কি আমরা আর এদের রেখেচি? বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিঙড়ে বার করে দিয়েচি। এর বেশি চাওয়াকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্ধা বলে মনে করে। বাঃ রে বাঃ! কি কলই না আমাদের বাপ-পিতামহরা ভেবে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন! এই বলিযা সাধু নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতই হাঃ হাঃ করিযা হাসিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিলাম না, এবং তাঁহার কথাটারও ঠিক অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিযা মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিলাম।

এ বৎসর ফসল ভাল হয় নাই, জলের অভাবে হেমন্তের ধানটা প্রায় আট-আনা রকম শুকাইয়া গিয়া ইতিমধ্যেই অভাবের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল। সাধু কহিলেন, দাদা, যে ছলেই হোক ভগবান যখন আপনাকে আপনার প্রজাদের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েচেন, তখন হঠাৎ আর পালাবেন না, অন্ততঃ এ বছরটা কাটিয়ে যাবেন। বিশেষ কিছু যে করতে পারবেন তা ভাবিনে, তবে চোখ দিয়েও প্রজার দুঃখের ভাগ নেওয়া ভাল, তাতে জমিদারি করার পাপের বোঝাটা কতক হাঙ্কা হয়।

আমি মনে মনে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম জমিদারি এবং প্রজা আমারই বটে! কিন্তু পূর্বেও যেমন জবাব দিই নাই, এবারও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। ক্ষুদ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গেছে। কাল অপরাহ্নের মত আজও আমাদের উভয়কে খাইতে দিয়া রাজলক্ষ্মী একপাশে বসিল। সমস্ত রান্না সে নিজে রাঁধিয়াছে, সুতরাং মাছের মুড়া ও দধির সর সাধুর পাতেই পড়িল। সাধুজী বৈরাগী মানুষ, কিন্তু সান্ত্বিক, এবং অসান্ত্বিক, নিরামিষ এবং আমিষ কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ দেখা গেল না, বরঞ্চ একেবারে উদাম অনুরাগের পরিচয় দিলেন যাহা ঘোর সাংসারিকের পক্ষেও দুর্লভ। রান্নার ভাল-মন্দের সমবদ্ধার ব্যক্তি বলিয়াও যেমন আমার খ্যাতি ছিল না, আমাকে বুঝাইবার দিকেও রাঁধুনীর কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ পাইল না।

সাধুর তাড়া নাই, অত্যন্ত ধীরে সুস্থে আহার করিতে লাগিলেন। চর্বণ করিতে করিতে কহিলেন, দিদি, সম্পত্তি সত্যিই ভাল, ছেড়ে যেতে মায়া হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ছেড়ে যেতে ত তোমাকে আমরা সাধচি নে ভাই?

সাধু হাসিয়া কহিলেন, সন্ধ্যাসী-ফকিরকে কখনো এত প্রশ্নয় দেবেন না দিদি, ঠকবেন। তা সে যাই হোক, গ্রামটি বেশ, কোথাও একজন এমন চোখে

পড়ল না যার জল ছোঁয়া যায়। এমন একটা ঘর দেখলাম না যার চালে এক আঁটি আস্ত খড় আছে—যেন ঝিষিদের আশ্রম।

আশ্রমের সহিত অস্পৃশ্য গৃহগুলির একদিক দিয়া যে উৎকট সাদৃশ্য ছিল, সেই কথা মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া আমাকে বলিল, শুনলুম সত্যিই নাকি এ গাঁয়ে কেবল ছোটজাতের বাস,—একঘটি জলের প্রত্যাশাও কারও কাছে নেই। বেশিদিন দেখচি থাকা চলবে না।

সাধু একটু হাসিলেন, আমি কিন্তু নীরব হইয়া রহিলাম। কারণ, রাজলক্ষ্মীর মত করুণাময়ীও কোন্ সংস্কারের মধ্য দিয়া এতবড় লজ্জার কথা উচ্চারণ করিতে পারিল আমি তাহা জানিতাম। সাধুর হাসি আমাকে স্পর্শ করিল কিন্তু বিদ্ব করিল না। তাই, কথা কহিলাম না সত্য, তথাপি আমার মন এই রাজলক্ষ্মীকেই উদ্দেশ করিয়া ভিতরে ভিতরে বলিতে লাগিল, লক্ষ্মী, মানুষের কর্মই কেবল অস্পৃশ্য ও অঙ্গুষ্ঠি হয়, মানুষ হয় না। না হইলে পিয়ারী কিছুতেই আজ আবার লক্ষ্মীর আসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিতে পারিত না। আর সে কেবল সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, মানুষকে কেবলমাত্র মানুষের দেহ বলিয়া কোনদিন ভুল করি নাই। সে পরীক্ষা আমার ছেলেবেলা হইতে বহুবার হইয়া গিয়াছে। অথচ, এ-সকল কথা মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলিবারও জো নাই—বলিবার প্রবৃত্তিও আর আমার নাই।

উভয়ে আহার সমাধা করিয়া উঠিলাম। রাজলক্ষ্মী আমাদের পান দিয়া বোধ করি নিজেও কিছু খাইতে গেল। কিন্তু আন্দাজ ঘটাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে নিজেও যেমন সাধুজীকে দেখিয়া আকাশ হইতে পড়িল, আমিও তেমনি বিস্মিত হইলাম। দেখি, ইতিমধ্যে কখন তিনি বাহিরে গিয়া একটি লোক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং উষধের সেই ভারী বাক্সটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া নিজেও প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কাল এই কথাই ছিল বটে, কিন্তু আজ তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়াছিলাম। মনেও করি নাই, এই প্রবাসে রাজলক্ষ্মীর এত আদর-যত্ন উপেক্ষা করিয়া সাধুজী অনিশ্চয় অন্যত্রের জন্য এমন সত্ত্বর উন্মুখ হইয়া উঠিবেন। মেহের শৃঙ্খল এত সহজে কাটিবার নয়, রাজলক্ষ্মীর নিভৃত মনের মধ্যে বোধ হয় এই আশাই ছিল, সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি কি যাচ্ছ নাকি আনন্দ?

সাধু বলিলেন, হাঁ দিদি, যাই। এখন না বেরংলে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

সেখানে কোথায় খাবে, কোথায় শোবে? আপনার লোক যে সেখানে কেউ নেই!

আগে ত গিয়ে পৌঁছই দিদি!

কবে ফিরবে?

সে ত এখন বলা যায় না। কাজের ভিড়ে যদি না এগিয়ে যাই ত একদিন ফিরতেও পারি।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, তার পরে সে মাথার একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া রঞ্জকগঢ়ে বলিয়া উঠিল, একদিন ফিরতেও পার? না, সে কিছুতেই হবে না।

কি হবে না তাহা বুঝা গেল,—তাই সাধু প্রত্যন্তে শুধু একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, যাবার হেতু ত আপনাকে বলেচি দিদি।

বলেচ? আচ্ছা, তবে যাও। এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া সবেগে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত সাধুজী স্তন্ধ হইয়া গেলেন। তার পরে আমার প্রতি চাহিয়া লজ্জিতমুখে কহিলেন, আমার যাওয়া বড় দরকার।

আমি ঘাড় নাড়িয়া কেবলমাত্র বলিলাম, জানি। ইহার অধিক আর কিছু বলিবার ছিল না। কারণ, আমি অনেক দেখিয়া জানিয়াছি মেহের গভীরতা

কিছুতেই কালের স্বল্পতা দিয়া মাপা যায় না; এবং এই বস্তু কাব্যের জন্য কবিরা কেবল শূন্য কল্পনাই করেন নাই—সংসারে ইহা যথার্থই ঘটে। তাই, একের যাওয়ার প্রয়োজনও যতখানি সত্য, অপরের আকুল কঠের একান্ত নিষেধটাও ঠিক ততখানি সত্য কি না, এ লইয়া আমার মনের মধ্যে বিন্দু-পরিমাণও সংশয়ের উদয় হইল না। আমি অত্যন্ত সহজেই বুঝিলাম, এই লইয়া রাজলক্ষ্মীকে হয়ত অনেক ব্যথাই ভোগ করিতে হইবে।

সাধুজী কহিলেন, আমি চললাম। ওদিকের কাজ যদি মেটে ত হয়ত আবার আসব, কিন্তু এখন এ কথা জানাবার আবশ্যক নেই।

আমি স্বীকার করিয়া বলিলাম, তাই হবে।

সাধুজী কি একটা বলিতে গিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিলেন; তার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আশ্চর্য দেশ এই বাঙলা দেশটা। এর পথেঘাটে মা-বোন, সাধ্য কি এঁদের এড়িয়ে যাই। এই বলিয়া তিনি আন্তে আন্তে বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা শুনিয়া আমারও দীর্ঘনিশ্চাস পড়িল। মনে হইল, তাই বটে। দেশের সমস্ত মা-বোনের বেদনা যাহাকে টান দিয়া ঘরের বাহির করিয়াছে, তাহাকে একটি মাত্র ভগিনীর ম্বেহ, দধির সর এবং মাছের মুড়ো দিয়া ধরিয়া রাখিবে কি করিয়া?

## পাঁচ

সাধুজী ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিরহব্যথাটা রতনের কিরণে  
বাজিল অবশ্য জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, সম্ভবতঃ মারাত্মক তেমন কিছু হইবে না;  
কিন্তু একজন ত দেখিলাম কাঁদিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি রহিলাম  
আমি। লোকটার সহিত পুরাপুরি চরিশ ঘণ্টাও ঘনিষ্ঠিতা হইতে পায় নাই; তথাপি  
আমারও মনে হইতে লাগিল, আমাদের এই অনারঙ্গ সংসারের মাঝখানে তিনি  
যেন মন্ত বড় একটা ছিদ্র করিয়া দিয়া গেলেন। এই অনিষ্টটি আপনা হইতেই  
সারিয়া উঠিবে কিংবা নিজেই তিনি আবার একদিন অকস্মাত তাঁহার প্রচন্ড  
উষধের বাক্সটা ঘাড়ে করিয়া ইহা মেরামত করিতে সশরীরে ফিরিয়া আসিবেন,  
বিদায়কালে কিছুই বলিয়া গেলেন না। অথচ আমার নিজের খুব যে বেশি উদ্বেগ  
ছিল তাও নয়। নানা কারণে এবং বিশেষ করিয়া কিছুকাল হইতে জ্বরে ভুগিয়া  
দেহ ও মনের এমনই একটা নিষ্ঠেজ নিরালম্ব ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল যে,  
একমাত্র রাজলক্ষ্মীর হাতেই সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয়  
ভাল-মন্দর দায় হইতে অব্যাহতি লইয়াছিলাম। সুতরাং কিছুর জন্যই স্বতন্ত্রভাবে  
চিন্তা করিবার আমার আবশ্যকও ছিল না, শক্তিও ছিল না। তবুও মানুষের মনের  
চঞ্চলতার যেন বিরাম নাই। বাহিরের ঘরে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া একাকী  
বসিয়া আছি, কত কি যে এলোমেলো ভাবনা আনাগোনা করিতেছে তাহার সংখ্যা  
নাই, সম্মুখের প্রাঙ্গণতলে আলোর দীপ্তি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসন্ন রাত্রির  
ইঙ্গিতে অন্যমনক্ষ মনটাকে মাঝে মাঝে এক-একটা চমক দিয়া যাইতেছে, মনে  
হইতেছে এ জীবনে যত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে তাহাদের সহিত আজিকার এই  
অনাগত নিশার অপরিজ্ঞাত মূর্তি যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব নারীর অবগুর্ণিতা মুখের  
মত রহস্যময়। অথচ, এই অপরিচিতার কেমন প্রকৃতি কেমন প্রথা কিছুই না

জানিয়া একেবারে ইহার শেষ পর্যন্ত পৌঁছিতেই হইবে, মধ্যপথে আর ইহার কোন বিচারই চলিবে না। আবার পরক্ষণেই যেন অক্ষম চিন্তার সমস্ত শৃঙ্খলই এক নিমিয়ে ভাঙিয়া বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে। এমনি যখন মনের অবস্থা, সেই সময় পাশের দ্বারটা খুলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। তাহার চোখ-দুটো সামান্য একটু রাঙ্গা, একটু যেন ফুলা-ফুলা। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কহিলাম, আশ্চর্য কি! যে ভার, যে শ্রান্তি তুমি বয়ে বেড়াচ, আর কেউ হলে ত ভেঙ্গেই পড়ত, আর আমি হলে ত দিনরাতের মধ্যে চোখ খুলতেই পারতুম না, কুষ্টকর্ণের নিন্দা দিতুম।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, কিন্তু কুষ্টকর্ণের ম্যালেরিয়া ছিল না। যাই হোক তুমি ত দিনের বেলায় ঘুমোও নি?

বলিলাম, না, কিন্তু এখন ঘুম পাচ্চে, হয়ত একটু ঘুমোব। কারণ, কুষ্টকর্ণের যে ম্যালেরিয়া ছিল না এমন কথাও বাল্মীকি মুনি কোথাও লিখে যাননি।

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, ঘুমোবে এই অবেলায়! রক্ষে কর তুমি, জ্বর কি তা হলে আর কোথাও বাকি থাকবে? সে-সব হবে না,—আচ্ছা, যাবার সময় আনন্দ কি আর কিছু তোমাকে বলে গেল?

প্রশ্ন করিলাম, কি রকম কথা তুমি আশা কর?

রাজলক্ষ্মী কহিল, এই যেমন কোথায় কোথায় যাবে; কিংবা—

এই কিংবাটাই আসল প্রশ্ন। কহিলাম, কোথায় কোথায় যাবেন তার একপ্রকার আভাস দিয়ে গেছেন, কিন্তু এই কিংবাটার সম্বন্ধে কিছুই বলে যাননি। আমি ত তাঁর ফিরে আসার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখিনে।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚୁପ କରିଯା ରହିଲ, କିନ୍ତୁ ଆମି କୌତୁଳ ସଂବରଣ କରିତେ  
ପାରିଲାମ ନା । ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, ଆଚ୍ଛା ଏହି ଲୋକଟିକେ କି ତୁମି ବାସ୍ତବିକ ଚିନ୍ମେଚ?  
ଆମାକେ ଯେମନ ଏକଦିନ ଚିନତେ ପେରେଛିଲେ?

ସେ ଆମାର ମୁଖେର ପାନେ କ୍ଷଣକାଳ ଚୁପ କରିଯା ଥାକିଯା କହିଲ, ନା ।

କହିଲାମ, ସତି ବଲ, କଥନୋ କୋନଦିନ କି ଦେଖନି?

ଏବାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସିମୁଖେ ବଲିଲ, ତୋମାର କାହେ ଆମି ସତ୍ୟ କରତେ ପାରିବ  
ନା । ଅନେକ ସମୟ ଆମାର ବଡ଼ ଭୁଲ ହୟ । ତଥନ ଅପରିଚିତ ଲୋକକେଇ ମନେ ହୟ  
କୋଥାଯ ଯେନ ତାକେ ଦେଖେଚି, ତାର ମୁଖ ଯେନ ଆମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚେନା, କେବଳ କୋଥାଯ  
ଦେଖେଚି ସେଇଟିଇ ମନେ କରତେ ପାରିନେ । ଆନନ୍ଦକେଓ ହୟତ କଥନୋ ଦେଖେ ଥାକବ ।

କିଛୁକ୍ଷଣ ନିଃଶବ୍ଦେ ବସିଯା ଥାକିଯା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଲିଲ, ଆଜ ଆନନ୍ଦ ଚଲେ  
ଗେଲ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କଥନୋ ଫିରେ ଆସେ ତ ତାର ବାପ-ମାୟେର କାହେ ଆବାର  
ଏକଦିନ ତାକେ ଫିରିଯେ ଦେବ ଏ ତୋମାକେ ଆମି ନିଶ୍ଚୟ ବଲାଚି ।

ଆମି ବଲିଲାମ, ତାତେ ତୋମାର ଗରଜ କି?

ସେ କହିଲ, ଅମନ ଛେଲେ ଚିରଦିନ ଭେସେ ବେଡ଼ାବେ ଏକଥା ଭାବଲେଓ ଯେନ  
ଆମାର ବୁକେ ଶୂଳ ବେଁଧେ । ଆଚ୍ଛା, ତୁମି ନିଜେଓ ତ ସଂସାର ଛେଡ଼େଛିଲେ—ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ  
ହେଉୟାର ମଧ୍ୟେ କି ସତିକାର ଆନନ୍ଦ କିଛୁ ଆହେ?

କହିଲାମ, ଆମି ସତିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ହଇନି, ତାଇ ଓର ଭେତରକାର ସତି  
ଖବରଟି ତୋମାକେ ଦିତେ ପାରିବ ନା । ଯଦି କୋନଦିନ ସେ ଫିରେ ଆସେ ଏ ସଂବାଦ  
ତାକେଇ ଜିଜ୍ଞାସା କୋରୋ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲ, ଆଚ୍ଛା, ବାଡ଼ିତେ ଥେକେ କି ଧର୍ମଲାଭ ହୟ ନା? ସଂସାର  
ନା ଛାଡ଼ିଲେ କି ଭଗବାନ ପାଓୟା ଯାଯ ନା?

ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଯା ଆମି କରଜୋଡ଼େ ବଲିଲାମ, ଏର କୋନଟାର ଜନ୍ୟେଇ ଆମି ବ୍ୟାକୁଲ  
ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ-ସବ ଘୋରତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମାକେ ତୁମି କୋରୋ ନା, ଆବାର ଆମାର ଜ୍ଵର  
ଆସତେ ପାରେ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସିଲ, ତାରପର କରଣକଟେ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ମନେ ହ୍ୟ ସଂସାରେ ଆନନ୍ଦର ତ ସମତ୍ତି ଆଛେ, ତବୁ ସେ ଧର୍ମେର ଜନ୍ୟ ଏହି ବୟସେଇ ସବ ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ଏସେଚେ; କିନ୍ତୁ ତୁମି ତ ତା ପାରନି?

ବଲିଲାମ, ନା, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେଓ ପାରବ ମନେ ହ୍ୟ ନା।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, କେନ ମନେ ହ୍ୟ ନା?

କହିଲାମ, ତାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଯାକେ ଛାଡ଼ିତେ ହବେ ସେଇ ସଂସାରଟା ଯେ ଆମାର କୋଥାଯ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ତା ଆମାର ଜାନା ନେଇ, ଏବଂ ଯାର ଜନ୍ୟ ଛାଡ଼ିତେ ହବେ ସେଇ ପରମାଘାର ପ୍ରତିଓ ଆମାର ଲେଶମାତ୍ର ଲୋଭ ନେଇ। ଏତଦିନ ତାଁର ଅଭାବେଇ କେଟେ ଗେହେ ଏବଂ ବାକି କ'ଟା ଦିନଓ ଅଚଳ ହ୍ୟେ ଥାକବେ ନା ଏହି ଆମାର ଭରସା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ତୋମାର ଏଇ ଆନନ୍ଦଭାଯାଟିଓ ଗେରଙ୍ଗ୍ୟା ସତ୍ତ୍ଵେଓ ଯେ ଈଶ୍ୱରପ୍ରାଣିର ଜନ୍ୟେଇ ବେରିଯେ ଏସେଚେନ ଆମାର ତା ବିଶ୍ୱାସ ନଯ। ତାର କାରଣ, ଆମିଓ ବାରକଯେକ ସାଧୁ-ସଙ୍ଗ କରେଚି, ତାଁଦେର କେଉ ଆଜଓ ଓସୁଧେର ବାକ୍ଷ ଘାଡ଼େ କରେ ବେଡ଼ାନକେ ଭଗବନ୍ତାଭେର ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ଦେନନି। ତା ଛାଡ଼ା ତାଁର ଖାଓୟା-ଦାଓୟାର ବ୍ୟାପାରଟାଓ ତ ଚୋଖେ ଦେଖଲେ!

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକାଳ ମୌନ ଥାକିଯା ବଲିଲ, ତବେ କି ମେ ମିଛାମିଛିଇ ସରସଂସାର ଛେଡ଼େ ଏହି କଷ୍ଟ କରତେ ବାର ହ୍ୟେଚେ? ସବାଇ କି ତୋମାର ମତଇ ମନେ କର?

ବଲିଲାମ, ନା, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭେଦ ଆଛେ। ମେ ଭଗବାନେର ସନ୍ଧାନେ ବାର ନା ହଲେଓ ମନେ ହ୍ୟ, ଯାର ଜନ୍ୟ ପଥେ ବେରିଯେଚେ ସେ ତାରଇ କାହାକାହି, ଅର୍ଥାଏ ଆପନାର ଦେଶ। ତାଇ ତାର ସରବାଡ଼ି ଛେଡ଼େ ଆସାଟା ଠିକ ସଂସାର ଛେଡ଼େ ଆସା ନଯ—ସାଧୁଜୀ କେବଳମାତ୍ର କୁନ୍ଦ ଏକଟି ସଂସାର ଛେଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସାରେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରେଚେନ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମାର ମୁଖେର ପ୍ରତି ଚାହିୟା ରହିଲ, ବୋଧ ହ୍ୟ ଠିକ ବୁଝିତେ ପାରିଲ ନା, ତାର ପରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ଯାବାର ସମୟ ସେ କି ତୋମାକେ କିଛୁ ବଲେ ଗେଲ?

ଆମି ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଯା କହିଲାମ, ନା, ତେମନ କିଛୁ ନଯ।

কেন যে একটুখানি সত্য গোপন করিলাম তাহা নিজেও জানি না। কিন্তু বিদায়কালে সাধুজীর শেষ কথাটা তখন পর্যন্ত আমার কানে তেমনি বাজিতেছিল। যাবার সময় সেই যে একটা নিঃশ্঵াস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, বিচিত্র দেশ এই বাঙলা দেশটা! এর পথেঘাটে মা-বোন—সাধ্য কি তাদের ফাঁকি দিয়ে যাই!

ম্লানমুখে রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, আমারও মনের মধ্যে অনেক দিনের অনেক ভুলে-যাওয়া ঘটনা ধীরে ধীরে উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, তাই বটে! তাই বটে! সাধুজী, তুমি যেই হও, এই অঙ্গ বয়সেই আমার এই কাঞ্চল দেশটিকে তুমি ভাল করিয়াই দেখিয়াছ। না হইলে ইহার যথার্থ রূপটির খবর আজ এমন সহজেই এই কয়টি কথায় দিতে পারিতে না। জানি, অনেক দিনের অনেক ত্রুটি অনেক বিচুতি আমার মাতৃভূমির সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পক্ষ লেপিয়াছে, তবুও, এ সত্য যাচাই করিবার যাহার সুযোগ মিলিয়াছে, সে-ই জানে ইহা কত বড় সত্য!

এইভাবে নীরবে মিনিট দশ-পনের কাটিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, এই উদ্দেশ্যই যদি তার মনে থাকে, একদিন আবার তাকে ঘরে ফিরতেই হবে আমি বলে দিচ্ছি। এদেশে নিছক পরের ভাল করতে যাওয়ার যে দুর্গতি হয়তো সে আজও জানে না। এর স্বাদ কতক আমি জানি। আমারই মত একদিন যখন সংশয়ে, বাধায়, কটু কথায় তার সমস্ত মন তিক্তরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সে পালিয়ে আসার পথ পাবে না।

আমি সায় দিয়া কহিলাম, অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ-সব দুঃখের কথা যেন সে বেশ জানে।

রাজলক্ষ্মী বারংবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, কখ্খনো না, কখ্খনো না। জানলে সে পথে কেউ যাবে না আমি বলচি।

এ কথার আর জবাব ছিল না। বক্ষুর মুখে শুনিয়াছিলাম, একদিন ইহার অনেক সাধুসকল, অনেক পুণ্যকর্ম তাহার শুণুরবাড়ির দেশে অত্যন্ত অপমানিত

হইয়াছিল। সেই নিষ্কাম পরোপকারের ব্যথা অনেকদিন ইহার মনে লাগিয়াছিল। যদিচ, আরও একটা দিক দেখিবার ছিল, কিন্তু সেই অবলুপ্ত বেদনার স্থানটা চিহ্নিত করিয়া তুলিতেও আর প্রবৃত্তি হইল না, তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অথচ রাজলক্ষ্মী যাহা বলিতেছিল তাহা মিথ্যা নয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এমন হয়? কেন একের শুভচেষ্টা অপরে এমন সন্দেহের চক্ষে দেখে? কেন এগুলি বিফল করিয়া দিয়া মানুষ সংসারের দুঃখের ভার লয় করিতে দেয় না? মনে হইল, সাধুজী যদি থাকিতেন, কিংবা যদি কখনো ফিরিয়া আসেন, এই জটিল সমস্যার মীমাংসার ভার তাঁকেই দিব।

সেদিন সকাল হইতে নিকটেই কোথা হইতে মাঝে মাঝে সানাইয়ের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল, এই সময়ে জনকয়েক লোক রতনকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। রতন সম্মুখে আসিয়া কহিল, মা, এরা আপনাকে রাজবরণ দিতে এসেছে,—এসো না হে, দিয়ে যাও না। বলিয়া সে একজন প্রৌঢ়গোছের লোককে ইঙ্গিত করিল। লোকটির পরিধানে হরিদ্বারশে ছোপান একটি কাপড়, গলায় নৃতন কাঠের মালা। অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত অগ্সর হইয়া আসিয়া বারান্দার নীচে হইতেই নৃতন শালপাতায় একটি টাকা ও একটি সুপারি রাজলক্ষ্মীর পদতলের উদ্দেশে রাখিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং কহিল, মাঠাকরুন, আজ আমার মেয়ের বিয়ে।

রাজলক্ষ্মী উঠিয়া আসিয়া তাহা গ্রহণ করিল এবং পুলকিতচিত্তে কহিল, মেয়ের বিয়েতে এই বুঝি দিতে হয়!

রতন কহিল, না মা, তা নয়, যার যেমন সাধ্য সে তেমনি জমিদারকে দেয়, এরা ছোটজাত ডোম, এর বেশী আর কোথায় কি পাবে বলুন, এই কত কষ্টে—

কিন্তু নিবেদন সমাপ্ত হইবার পূর্বেই টাকাটা ডোমের শুনিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, তবে থাক থাক এ-ও দিতে হবে না—তোমরা এমনিই মেয়ের বিয়ে দাও গে—

এই প্রত্যাখানে কন্যার পিতা এবং ততোধিক রতন নিজে বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠিল; সে নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, এই রাজবরণের সম্মানটা গ্রহণ না করিলে কোনমতেই চলিবে না। রাজলক্ষ্মী কেন যে এই সুপারিশুন্দৰ টাকাটা লইতে কিছুতেই চাহে না, ঘরের ভিতরে বসিয়া আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম এবং রতনই বা কি জন্য যে সন্দৰ্ভ অনুরোধ করিতেছিল তাহাও আমার অবিদিত ছিল না। খুব সম্ভব দেয় টাকাটা আরও বেশি, এবং গোমস্তা কুশারীমহাশয়ের হাত হইতে নিষ্ঠার পাইবার জন্যই ইহারা এই কৌশল করিয়াছে; এবং রতন ‘ভজুর’ ইত্যাদি সম্ভাষণের পরিবর্তে তাহাদের মুখপাত্র হইয়া আর্জি পেশ করিতে আসিয়াছে। সে যে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াই আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তাহার এই সঙ্কট অবশ্যে আমিই মোচন করিলাম। উঠিয়া আসিয়া টাকাটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম, আমি নিলাম, তোমরা বাড়ি গিয়ে বিয়ের উদ্যোগ করো গে।

রতনের মুখ গর্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং রাজলক্ষ্মী অস্পৃশ্যের প্রতিগ্রহের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল। খুশি হইয়া কহিল, এ ভালই হ'ল যে, যাঁর মান্য তিনি স্বহস্তে নিলেন, এই বলিয়া সে হাসিল।

মধু ডোম কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, ভজুর, পহর রেতের মধ্যেই লগন, একবার যদি পায়ের ধুলো দেন! এই বলিয়া সে একবার আমার ও একবার রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি করঞ্চ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

আমি সম্মত হইলাম, রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু হাসিয়া সানাইয়ের শব্দটা আন্দাজ করিয়া বলিল, ওই বুঝি তোমার বাড়ি মধু? আচ্ছা, যদি সময় পাই ত আমিও গিয়ে একবার দেখে আসব। রতনের প্রতি চাহিয়া কহিল, বড় তোরঙ্গটা

খুলে দেখ ত রে, আমার নতুন শাড়িগুলো আনা হয়েচে কি না। যা মেয়েটিকে একখানা দিয়ে আয়। মিষ্টি বুঝি এদেশে কিছু পাওয়া যায় না? বাতাসা মেলে? আচ্ছা, তাই বেশ। অমনি তাও কিছু কিনে দিয়ে আসিস রতন। হাঁ মধু, তোমার মেয়ের বয়স কত? পান্তরের বাড়ি কোথায়? লোক কতগুলি খাবে? এ গাঁয়ে ক'ঘর তোমরা আছ?

জমিদারগৃহীনীর একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে মধু সসন্ত্বমে এবং সবিনয়ে যাহা কহিল তাহাতে বুঝা গেল তাহার কন্যার বয়স বছর-নয়েকের মধ্যেই, পাত্র যুবাপুরুষ—ত্রিশ-চাল্লিশের বেশি হইবে না—বাড়ি ক্রোশ-পাঁচেক উত্তরে কি একটা গ্রামে—সে একটা তাহাদের বড় সমাজ, সেখানে জাতীয় ব্যবসা কেহ করে না—সকলেরই চাষবাস পেশা—মেয়ে বেশ সুখেই থাকিবে, তবে ভয় শুধু এই রাত্রিটার জন্য। কারণ বরযাত্রীর সংখ্যা কত হইবে এবং তাহারা কোথায় কি ফ্যাসাদ বাধাইয়া দিবে, তাহা আজ প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত কোনমতেই অনুমান করিবার জো নাই। তাহারা সকলেই সমৃদ্ধ ব্যক্তি; কি করিয়া যে মানমর্যাদা বজায় রাখিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন হইবে এই ভয়েই মধু কাঁটা হইয়া আছে। এই-সকল সবিস্তারে নিবেদন করিয়া সে পরিশেষে সকাতরে জানাইল যে, তাহার চিঁড়া গুড় এবং দধি সংগ্রহ হইয়াছে, এমন কি শেষকালে খান-দুই করিয়া বড় বাতাসাও পাতে দিতে পারিবে; কিন্তু তথাপি যদি কোন গোলযোগ হয় ত তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী সকৌতুকে ভরসা দিয়া কহিল, গোলযোগ কিছু হবে না মধু, তোমার মেয়ের বিয়ে নির্বিষ্ণে হবে, আমি আশীর্বাদ করচি। খাবার জিনিস এত জোগাড় করেচ, তোমার বেয়াইয়ের দল খেয়ে খুশি হয়ে বাড়ি যাবে।

মধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সঙ্গের লোক-দুইটিকে লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আশীর্বচনের উপর বরাত দিয়া সে

বিশেষ কোন সান্ত্বনা লাভ করিল না; আজ রাত্রির জন্য কন্যার পিতার মনের  
মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ জাগিয়া রহিল।

শুভকর্মে পায়ের ধূলা দিব বলিয়া মধুকে আশা দিয়াছিলাম, কিন্তু সত্য  
সত্যই যাইতে হইবে এরূপ সন্তানবন্ন বোধ করি আমাদের কাহারও মনে ছিল না।  
সন্ধ্যার কিছু পরে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার আয়-ব্যয়ের একটা  
খসড়া পড়িয়া শুনাইতেছিল, আমি বিছানায় শুইয়া মুদ্রিতনেত্রে কতক বা  
শুনিতেছিলাম, কতক বা শুনিতেছিলাম না, কিন্তু অদূরে বিবাহ বাটীর কলরোল  
কিছুক্ষণ হইতে যেন কিঞ্চিৎ অসাধারণ রকমের প্রথর হইয়া কানে বাজিতেছিল।  
সহসা রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া সহাস্যে কহিল, ডোমের বাড়ির বিয়ে, মারামারি এর  
একটা অঙ্গ নয় ত?

বলিলাম, উঁচুজাতের নকল যদি করে থাকে ত বিচিত্র নয়। সে-সব কথা  
তোমার মনে আছে ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, ছঁ। তারপর ক্ষণকাল কান খাড়া করিয়া থাকিয়া একটা  
নিশ্চাস ফেলিয়া বলিল, বাস্তবিক, এ পোড়া দেশে যা ক'রে আমরা মেয়েদের  
বিলিয়ে দিই, তাতে ইতর-ভদ্র সবাই সমান। ওরা চলে গেলে আমি খোঁজ নিয়ে  
শুনলাম, ওই যে কাল সকালে ঐ ন'বছরের মেয়েটাকে কোন্ অপরিচিত সংসারে  
টেনে নিয়ে যাবে, আর কখনও হয়ত আসতে পর্যন্ত দেবে না। এদের নিয়মই  
এই। বাপ ছ'গণ্ডা টাকায় মেয়েটাকে আজ বিক্রি করে দেবে। ‘একবার পাঠ্যে  
দাও’ এ কথা মুখে আনবারও জো থাকবে না। আহা! মেয়েটা সেখানে কতই না  
কাঁদবে—বিয়ের সে কি জানে বল?

এ-সকল দুর্ঘটনা ত জন্মকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, একরকম  
সহিয়াও গিয়াছে, আর ক্ষেত্র প্রকাশ করিতে প্রযুক্তি হয় না। সুতরাং প্রত্যন্তে  
কেবল মৌল হইয়াই রহিলাম।

জবাব না পাইয়া সে কহিল, আমাদের দেশে ছোট-বড় সব জাতের মধ্যেই  
বিয়েটা কেবল বিয়েই নয়—এটা ধর্ম, তাই যা, নইলে—

ভাবিলাম বলি, একে যদি ধর্ম বলিয়াই বুঝিয়াছ ত এত নালিশ কিসের?  
আর যে ধর্মকর্মে মন প্রসন্ন না হইয়া গ্লানির ভাবে অন্তর কালো হইয়া উঠিতে  
থাকে তাহাকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করাই যায় বা কিরূপে?

কিন্তু আমার বলিবার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী নিজেই পুনশ্চ কহিল, কিন্তু এ-  
সব বিধিব্যবস্থা করে গেছেন যাঁরা তাঁরা ছিলেন ত্রিকালদর্শী খৰি; শাস্ত্রবাক্য  
মিথ্যাও নয়, অমঙ্গলেরও নয়, আমরা কি-ই বা জানি, আর কতটুকুই বা বুঝি!

ব্যস! যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা আর বলা হইল না। এ সংসারে  
যাহা কিছু ভাবিবার বস্তু ছিল, সমস্তই ত্রিকালজ্ঞ খৰিরা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ  
এই তিনি কালের জন্য বহুপূর্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, দুনিয়ায়  
নৃতন করিয়া চিন্তা করিবার কোথাও কিছু বাকি নাই। এ কথা রাজলক্ষ্মীর মুখে  
এই নৃতন শুনিলাম না, আরও অনেকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি এবং বরাবরই  
চুপ করিয়া গিয়াছি। আমি জানি ইহার জবাব দিতে গেলেই আলোচনাটা প্রথমে  
উষ্ণ এবং পরক্ষণেই ব্যক্তিগত কলতে নিরতিশয় তিক্ত হইয়া উঠে।  
ত্রিকালদর্শীদের আমি তাচ্ছিল্য করিতেছি না, রাজলক্ষ্মীর মত আমিও তাঁহাদের  
অতিশয় ভক্তি করি; শুধু এই কথাটাই ভাবি, তাঁহারা দয়া করিয়া যদি শুধু কেবল  
আমাদের এই ইংরাজী-আমলটার জন্য ভাবিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও  
অনেক দুরহ চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন, আমরাও হয়ত সত্য সত্যই  
আজ বাঁচিতে পারিতাম।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথাগুলো যেন দর্পণের  
মত স্পষ্ট দেখিতে পাইত। কেমন করিয়া পাইত জানি না, কিন্তু এখন এই অস্পষ্ট  
দীপালোকে আমার মুখের চেহারাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, তবুও যেন আমার  
নিভৃত চিন্তার ঠিক দ্বারপ্রান্তেই আঘাত করিল। কহিল, তুমি ভাবচ এটা নিতান্তই

বাড়াবাড়ি—ভবিষ্যতের বিধিব্যবস্থা কেউ পূর্বাহেই নির্দেশ করে দিতে পারে না। কিন্তু আমি বলচি, পারে। আমার গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেচি, এ কাজ তাঁরা না পারলে সজীব মন্ত্রগুলোকেও কখনো দেখতে পেতেন না। বলি, এটা ত মানো, আমাদের শাস্ত্রীয় মন্ত্রগুলির প্রাণ আছে? তারা জীবন্ত?

বলিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি না মানতে পার, কিন্তু তবুও এ সত্য। তা নইলে আমাদের দেশের এই পুতুলখেলার বিয়েই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ-বন্ধন হতে পারত না। এ-সমস্তই ত ওই সজীব মন্ত্রের জোরে! সেই ঋষিদের কৃপায়! অবশ্য, অনাচার আর পাপ কোথায় নেই? সে সর্বত্রই আছে। কিন্তু আমাদের এ দেশের মত সতীত্বই কি তুমি আর কোথাও দেখাতে পারো?

বলিলাম, না। কারণ, এ তাহার যুক্তি নয়—বিশ্বাস।

ইতিহাসের প্রশ্ন হইলে তাহাকে দেখাইতে পারিতাম, এই পৃথিবীতে সজীব মন্ত্রহীন আরও দেশ আছে যেখায় সতীত্বের আদর্শ আজও এমনিই উচ্চ। অভয়ার উল্লেখ করিয়া বলিতে পারিতাম, এই যদি, তবে তোমাদের জীবন্ত মন্ত্র নর-নারী উভয়কেই এক আদর্শে বাঁধিতে পারে না কেন? কিন্তু এ-সকলের প্রয়োজন ছিল না। আমি জানিতাম তাহার চিত্তের ধারাটা কিছুদিন হইতেই কোন্‌ দিক দিয়া বহিতেছে।

দুষ্কৃতির বেদনা সে ভাল করিয়াই জানে। যাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে কল্যাণিত না করিয়া কেমন করিয়া যে সে এ জীবনে লাভ করিবে তাহার কিছুই সে ভাবিয়া পায় না। তাহার দুর্বশ হৃদয় ও প্রবৃদ্ধ ধর্মবৃত্তি— এই দুই প্রতিকূলগামী প্রচণ্ড প্রবাহ যে কেমন করিয়া কোন্‌ সঙ্গমে সম্মিলিত হইয়া এই দুঃখের জীবনে তাহার তীর্থের মত সুপুর্বি হইয়া উঠিবে সে তাহার কোন কিনারাই দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি পাই। নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া পর্যন্ত অপরের গোপন আক্ষেপ প্রতিনিয়তই আমার চোখে পড়ে। বেশ

স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু যেন দেখিতে পাই তাহার যে দুর্মদ কামনা এতদিন অত্যুগ্র  
নেশার মত তাহার সমস্ত মনটাকে উতলা-উন্মত করিয়া রাখিয়াছিল, সে যেন  
আজ স্থির হইয়া তাহার সৌভাগ্যের, তাহার প্রাণিটার হিসাব দেখিতে চাহিতেছে।  
এই হিসাবের অঙ্কগুলায় কি আছে জানিনা, কিন্তু শূন্য ছাড়া যদি আর কিছুই আজ  
আর সে না দেখিতে পায় ত, কেমন করিয়া কোথায় গিয়া যে আবার আমি নিজের  
এই শতচিন্ম জীবন-জালের গ্রন্থি বাঁধিতে বসিব, এ চিন্তা আমার মধ্যে বহুবার  
আনাগোনা করিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া কিছুই পাই নাই, কেবল এই কথাটাই নিশ্চয়  
জানিয়া আছি যে, চিরদিন যে পথে চলিয়াছি, প্রয়োজন হয় ত আবার সেই পথেই  
যাত্রা শুরু করিব। নিজের সুখ ও সুবিধা লইয়া কাহারও সমস্যা জটিল করিয়া  
তুলিব না।

কিন্তু পরমাশৰ্য এই যে, যে মন্ত্রের সজীবতার আলোচনায় আমাদের মধ্যে  
একমুহূর্তে বিপ্লব বহিয়া গেল, তাহার প্রসঙ্গ লইয়া পাশের বাড়িতেই যে তখন  
মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল, এ সংবাদ দু'জনের কেহই জানিতাম না।

অকস্মাত পাঁচ-সাতজন গোটা-দুই আলো লইয়া অত্যন্ত সোরগোল করিয়া  
একেবারে প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যাকুলকণ্ঠে ডাক দিল,  
হজুর! বাবুমশায়!

আমি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম, রাজলক্ষ্মীও সবিস্ময়ে উঠিয়া আমার  
পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। নালিশটা তাহারা সকলেই একসঙ্গে এবং সমস্তে  
করিতে চায়। রতনের পুনঃ পুনঃ বকুনি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত কেহই চুপ করিতে  
পারিল না। যাহা হউক, ব্যাপারটা বুঝা গেল। কন্যাসম্পদান বন্ধ হইয়া আছে,  
কারণ মন্ত্র ভুল হইতেছে বলিয়া বরপক্ষীয় পুরোহিত কন্যাপক্ষীয় পুরোহিতের  
ফুল-জল প্রভৃতি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে।  
বাস্তবিক, এ কি অত্যাচার! পুরোহিতসম্পদায় অনেক কীর্তিই করিয়া থাকে, কিন্তু  
তাই বলিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া জোর করিয়া আর একজন সমব্যবসায়ীর

ফুল-জল প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া, এবং শারীরিক বলপ্রয়োগে তাহার মুখ চাপিয়া স্বাধীন ও সজীব মন্ত্রোচ্চারণের বাধা দেওয়া—এমন অত্যাচার ত কখনও শুনি নাই।

রাজলক্ষ্মী কি যে বলিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না; কিন্তু রতন ঘরের মধ্যে কি করিতেছিল, সে বাহিরে আসিয়া মস্ত একটা ধরক দিয়া কহিল, তোদের আবার পুরুত কি রে? এখানে, অর্থাৎ জমিদারিতে আসিয়া পর্যন্ত সে ‘তুমি’ বলিবার যোগ্য কাহাকেও পায় নাই, কহিল, ডোম-ডোকালির আবার বিয়ে, তাদের আবার পুরুত! এ কি আমাদের বামুন-কায়েত-নবশাক পেয়েচিস যে বিয়ে দিতে আসবে বামুনঠাকুর? এই বলিয়া সে বারবার আমার ও রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি সগর্বে চাহিতে লাগিল। এখানে মনে করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে রতন জাতিতে নাপিত।

মধু ডোম নিজে আসিতে পারে নাই, কন্যাসম্প্রদানে বসিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধী আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি যাহা বলিতে লাগিল তাহাতে যদিচ বুবা গেল ইহাদের ব্রাক্ষণ নাই, নিজেরা নিজেদের পুরোহিত, তথাপি রাখাল পণ্ডিত তাহাদের ব্রাক্ষণেরই সামিল। কারণ, তাহার গলায় পৈতা আছে এবং সে তাহাদের দশকর্ম করায়। এমন কি, সে তাহাদের ছেঁয়া জল পর্যন্ত খায় না। সুতরাং এত বড় সাত্ত্বিকতার পরেও আর প্রতিবাদ চলে না। অতএব, আসল ও খাঁটি ব্রাক্ষণের সহিত অতঃপর যদি কোন প্রভেদ থাকে ত সে নিতান্তই অকিঞ্চিত্কর।

সে যাহা হউক, ইহাদের ব্যাকুলতায় ও অদূরে বিবাহবাটীর প্রবল চিৎকারণদে আমাকে যাইতে হইল। রাজলক্ষ্মীকে কহিলাম, তুমিও চল না, বাড়িতে একলা কি করবে!

রাজলক্ষ্মী প্রথমে মাথা নাড়িল, কিন্তু শেষে কৌতুহল নিবারণ করিতে পারিল না। চল, বলিয়া আমার সঙ্গ লইল। আসিয়া দেখিলাম, মধুর সম্বন্ধী অত্যুক্তি করে নাই। বিবাদ তুমুল হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। একদিকে বরপক্ষীয়

প্রায় ত্রিশ-বত্রিশজন এবং অন্যদিকে কন্যাপক্ষীয়ও প্রায় ততগুলি। মাঝখানে প্রবল ও স্তুলকায় শিবু পণ্ডিত দুর্বল ও ক্ষীণজীবী রাখাল পণ্ডিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

আমরা সসম্মানে একটা মাদুরের উপর আসন গ্রহণ করিয়া শিবু পণ্ডিতকে এই অতর্কিতে আক্রমণের হেতু জিঙ্গাসা করায় সে কহিল, হজুর, মন্তরের ‘ম’ জানে না এই ব্যাটা, আবার নিজেকে বলে পণ্ডিত! বিবাহটাই আজ ভেষ্টে দিত।

রাখাল মুখ ভ্যাঙাইয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, হাঁ দিত। পাঁচখানা গাঁয়ে ছান্দ, বিয়ে নিত্য দিচ্ছি, আর আমি জানিনে মন্তর!

মনে ভাবিলাম, এখানেও সেই মন্ত্র! কিন্তু বাটীতে রাজলক্ষ্মীর কাছে না হয় মৌন থাকিয়াই তর্কের জবাব দিয়াছি, কিন্তু এখানে যদি যথার্থ-ই মধ্যস্থতা করিতে হয় ত বিপদে পড়িতে হইবে। অবশ্যে বহু বাদবিতঙ্গয় স্থির হইল যে, রাখালই মন্ত্র পাঠ করাইবে, কিন্তু ভুল যদি কোথাও হয় ত শিবুকে আসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। রাখাল রাজি হইয়া পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিল এবং কন্যার পিতার হাতে কয়েকটা ফুল এবং বর-কন্যার দুই হাত একত্র করিয়া দিয়া যে বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিল তাহা আমার আজও মনে আছে। এগুলি সজীব কিনা জানি না, এবং মন্ত্র-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ হয়, বেদে ঠিক এই কথাগুলিই ঋষিরা সৃষ্টি করিয়া যান নাই।

রাখাল পণ্ডিত বরকে বলিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

রাখাল কন্যাকে বলিলেন, বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় নমঃ।

বালিকা কন্যার উচ্চারণে পাছে ত্রুটি হয় এইজন্য মধু তাহার হইয়া উচ্চারণ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শিবু পণ্ডিত দু হাত তুলিয়া বজ্রগর্জনে সকলকে চমকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, ও মন্ত্ররই নয়। বিয়েই হ'ল না।

পিছনে একটা টান পাইয়া ফিরিয়া দেখি রাজলক্ষ্মী মুখের মধ্যে আঁচল গুঁজিয়া প্রাণপণে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং উপস্থিত সমস্ত লোকই একান্ত উদ্গীব হইয়া উঠিয়াছে।

রাখাল পণ্ডিত লজ্জিতমুখে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার কথা কেহ কানেই লইল না; সকলেই সমস্তেরে শিবুকে অনুনয় করিতে লাগিল, পণ্ডিতমশাই, মন্ত্ররটি আপনিই বলিয়ে দিন, নইলে এ বিয়েই হবে না—সব নষ্ট হয়ে যাবে। সিকি দক্ষিণে ওঁকে দিয়ে আপনিই বারো আনা নেবেন পণ্ডিতমশাই।

শিবু পণ্ডিত তখন ঔদ্যৰ্ঘ দেখাইয়া কহিলেন, রাখালের দোষ নেই, আসল মন্ত্র আমি ছাড়া এ অঞ্চলে আর কেউ জানেই না। বেশি দক্ষিণে আমি চাইনে; আমি এইখানে থেকেই মন্ত্রপাঠ করচি, রাখাল ওদের পড়াক। এই বলিয়া সেই শান্ত্রজ্ঞ পুরোহিত মন্ত্রচারণ করিতে লাগিলেন এবং পরাজিত রাখাল নিরীহ ভালমানুষটির মত বর-কন্যাকে আবৃত্তি করাইতে লাগিল।

শিবু কহিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

শিবু কহিলেন, মধু, এবার তুমি বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ।

সকন্যা মধু ইহাই আবৃত্তি করিল। সকলেই নীরব, স্থির। ভাবে বোধ হইল শিবুর মত শান্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে পদার্পণ করে নাই।

শিবু বরের হাতে ফুল দিয়া কহিলেন, বিপিন, তুমি বল, যতদিন জীবনং ততদিন ভাত-কাপড় প্রদানং স্বাহা।

বিপিন থামিয়া থামিয়া বহু দুঃখে বহু সময়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিল।

শিবু কহিলেন, বর-কন্যা দু'জনেই বল, যুগল মিলনং নমঃ।

বর এবং কন্যার হইয়া মধু ইহা আবৃত্তি করিল। ইহার পরে বিরাট হরিধ্বনিসহকারে বর-কন্যাকে বাটীর মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

আমাৰ চতুৰ্পাঞ্চে একটা গুঞ্জনৱোল উঠিল—সকলেই একবাক্যে স্বীকাৰ কৱিতে  
লাগিল যে, হাঁ, একজন শান্তজ্ঞানা লোক বটে! মতৰ পড়ালে বটে! রাখাল পণ্ডিত  
এতকাল আমাদেৱ কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

সমন্তক্ষণ আমি গন্তীৰ হইয়াই ছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত এই অসীম গান্তীৰ  
বজায় রাখিয়াই রাজলক্ষ্মীৰ হাত ধৱিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। ওখানে কি কৱিয়া  
যে সে আপনাকে সংবৰণ কৱিয়া বসিয়াছিল আমি জানি না, কিন্তু ঘৰে আসিয়া  
হাসিৰ প্ৰবাহে তাহার যেন দম বন্ধ হইবাৰ জো হইল। বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া  
সে কেবলই বলিতে লাগিল, হাঁ, একজন মহামহোপাধ্যায় বটে! রাখাল এতদিন  
এদেৱ কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

প্ৰথমটা আমিও হাসি রাখিতে পাৱিলাম না; তাহার পৱে কহিলাম,  
মহামহোপাধ্যায় দু'জনেই। অথচ, এমনি কৱেই ত এতকাল এদেৱ মেয়েৰ মা  
এবং মেয়েৰ ঠাকুৱামার বিয়ে হয়েচে। রাখালেৰ যাই হোক, শিৰু পণ্ডিতেৰ  
মন্ত্ৰগুলোও ঠিক ঝুঁঝিবাচ বলে মনে হল না, কিন্তু তবু ত এদেৱ কোন মন্ত্ৰই  
বিফল হয়নি। এদেৱ বিবাহ-বন্ধন ত আজও তেমনি দৃঢ় তেমনি অটুট আছে!

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া সহসা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং একদৃষ্টে  
চুপ কৱিয়া আমাৰ মুখেৰ পানে চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল।

## ছয়

সকালে উঠিয়া শুনিলাম কুশারীমহাশয় মধ্যাহ-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া  
গিয়াছেন। ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি একা  
নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, না, আমিও আছি।

যাবে?

যাব বৈ কি।

তাহার এই নিঃসঙ্গে উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। খাওয়া বস্তুটা  
যে হিন্দু ধর্মের কি, এবং সমাজের কতখানি ইহার উপর নির্ভর করে, রাজলক্ষ্মী  
তাহা জানে—এবং কত বড় নিষ্ঠার সহিত ইহাকে মানিয়া চলে আমিও তাহা জানি,  
অথচ এই তাহার জবাব। কুশারীমহাশয় সম্বন্ধে বেশি-কিছু জানি না, তবে বাহির  
হইতে তাঁহাকে যতটা দেখা গিয়াছে, মনে হইয়াছে তিনি আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ;  
এবং ইহাও নিশ্চিত যে, রাজলক্ষ্মীর ইতিহাস তিনি অবগত নহেন, কেবল মনিব  
বলিয়াই আমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে আজ সেখানে গিয়া, কি  
করিয়া কি করিবে আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না। অথচ, আমার প্রশ্নাটা বুঝিয়াও  
সে যখন কিছুই কহিল না, তখন ইহারই নিহিত-কুণ্ঠা আমাকেও নির্বাক করিয়া  
রাখিল।

যথাসময়ে গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি প্রস্তুত হইয়া বাহিরে  
আসিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া।

কহিলাম, যাবে না?

সে কহিল, যাবার জন্যেই ত দাঁড়িয়ে আছি। এই বলিয়া সে গাড়ির  
ভিতরে গিয়া বসিল।

রতন সঙ্গে যাইবে, সে আমার পিছনে ছিল। ঠাকুরানীর সাজসজ্জা দেখিয়া সে যে নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিলাম। আমিও আশ্চর্য হইয়াছিলাম; কিন্তু সেও যেমন প্রকাশ করিল না, আমিও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। বাড়িতে সে কোনকালেই বেশি গহনা পরে না, কিছুদিন হইতে তাহাও কমিতেছিল। কিন্তু আজ দেখা গেল, গায়ে তাহার কিছুই প্রায় নাই। যে হারটা সচরাচর তাহার গলায় থাকে সেইটি এবং হাতে একজোড়া বালা। ঠিক মনে নাই, তবুও যেন মনে হইল, কাল রাত্রি পর্যন্ত যে চুড়ি-কয়গাছি দেখিয়াছিলাম সেগুলিও যেন সে আজ ইচ্ছা করিয়াই খুলিয়া ফেলিয়াছে। পরনের কাপড়খানিও নিতান্ত সাধারণ, বোধ হয় সকালে স্নান করিয়া যাহা পরিয়াছিল তাহাই।

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে বলিলাম, একে একে যে সমস্তই ছাড়লে দেখচি। কেবল আমিই বাকি রয়ে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, এমন ত হতে পারে, এই একটার মধ্যেই সমস্ত রয়ে গেছে। তাই যেগুলো বাড়ি ছিল সেইগুলো একে একে বরে যাচ্ছে। এই বলিয়া সে পিছনে একবার চাহিয়া দেখিল, রতন কাছাকাছি আছে কি না; তার পরে গাড়োয়ানটাও না শুনিতে পায় এমনি অত্যন্ত মৃদুকষ্টে কহিল, বেশ ত, সে আশীর্বাদই কর না তুমি। তোমার বড় আর ত আমার কিছুই নেই, তোমাকেও যার বদলে আনায়াসে দিতে পারি আমাকে সেই আশীর্বাদই তুমি কর।

চুপ করিয়া রহিলাম। কথাটা এমন একদিকে চলিয়া গেল যাহার জবাব দিবার কোন সাধ্যই আমার ছিল না। সেও আর কিছু না বলিয়া মোটা বালিশটা টানিয়া লইয়া গুটিসুটি হইয়া আমার পায়ের কাছে শুইয়া পড়িল।

আমাদের গঙ্গামাটি হইতে পোড়ামাটিতে যাইবার একটা অত্যন্ত সোজা পথ আছে। সম্মুখের শুক্ষ-জল খাদটার উপরে যে সঞ্চীর্ণ বাঁশের সাঁকো আছে, তাহার উপর দিয়া গেলে মিনিট-দশকের মধ্যেই যাওয়া যায়, কিন্তু গরুর গাড়িতে

অনেকখানি রাস্তা ঘুরিয়া ঘণ্টা-দুই বিলম্বে পৌঁছিতে হয়। এই দীর্ঘ পথটায় দু'জনের মধ্যে আর কোন কথাই হইল না। সে কেবল আমার হাতখানা তাহার গলার কাছে টানিয়া লইয়া ঘুমানোর ছল করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রাখিল।

কুশারীমহাশয়ের দ্বারে আসিয়া যখন গো-যান থামিল তখন বেলা দ্বিতীয় উভ্রূপ হইয়া গেছে। কর্তা এবং গৃহিণী উভয়েই একসঙ্গে বাহির হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং অতিশয় সম্মানিত অতিথি বলিয়াই বোধ হয় সদরে না বসাইয়া একেবারে ভিতরে লইয়া গেলেন। তা ছাড়া, অন্তিমিলম্বেই বুঝা গেল, শহর হইতে দূরবর্তী এই-সকল সামান্য পল্লীঅঞ্চলে অবরোধের সেরূপ কঠোর শাসন প্রচলিত নাই। কারণ আমাদের শুভাগমন প্রচারিত হইতে না হইতেই প্রতিবেশীদের অনেকেই যাহারা খুড়ো, জ্যাঠা, মাসিমা ইত্যাদি প্রীতি ও আত্মীয় সম্মোধনে কুশারী ও তাঁহার গৃহিণীকে আপ্যায়িত করিয়া একে-একে দুইয়ে-দুইয়ে প্রবেশ করিয়া তামাশা দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলেই অবলা নহেন।

রাজলক্ষ্মীর ঘোমটা দিবার অভ্যাস ছিল না, সেও আমারই মত সম্মুখের বারান্দায় একখানি আসনের উপর বসিয়াছিল। এই অপরিচিত রমণীর সাক্ষাতেও এই অনাহতের দল বিশেষ কোন সঙ্কেচ অনুভব করিলেন না। তবে সৌভাগ্য এইটুকু যে, আলাপ করিবার ঔৎসুক্যটা নিতান্তই তাহার প্রতি না হইয়া আমার প্রতিই প্রদর্শিত হইতে লাগিল। কর্তা অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহার ব্রাক্ষণীও তেমনি, কেবল বাড়ির বিধবা মেয়েটিই রাজলক্ষ্মীর পাশে স্থির হইয়া বসিয়া একটা তালপাথা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিল। আর, আমি কেমন আছি, কি অসুখ, কতদিন থাকিব, জায়গাটা ভাল মনে হইতেছে কি না, জমিদারি নিজে না দেখিলে চুরি হয় কি না, ইহার নৃতন কোন বন্দেবস্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি কি না, ইত্যাদি অর্থ ও ব্যর্থ নানাবিধ প্রশ্নোত্তরমালার ফাঁকে ফাঁকে কুশারীমহাশয়ের সাংসারিক অবস্থাটা একটু পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বাটিতে অনেকগুলি ঘর এবং সেগুলির মাটির; তথাপি মনে হইল  
কাশীনাথ কুশারীর অবস্থা সচ্ছল ত বটেই, বোধ হয় একটু বিশেষ রকমই ভাল।  
প্রবেশ করিবার সময় বাহিরে চান্দীমণ্ডপের একধারে একটা ধানের মরাই লক্ষ্য  
করিয়া আসিয়াছিলাম, ভিতরের প্রাঙ্গণেও দেখিলাম তেমনি আরও গোটা-দুই  
রহিয়াছে। ঠিক সম্মুখেই বোধ করি ওটা রান্নাঘরই হইবে, তাহারই উত্তরে একটা  
চালার মধ্যে পাশাপাশি গোটা-দুই টেঁকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্বেই যেন  
তাহার কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। একটা বাতাবী-বৃক্ষতলে ধান সিদ্ধ করিবার  
কয়েকটা চুল্লি নিকান-মুছান ঝরবার করিতেছে এবং সেই পরিস্কৃত স্থানটুকুর  
উপরে ছায়াতলে দুটি পরিপূর্ণ গো-বৎস ঘাড় কাঁও করিয়া আরামে নিন্দা দিতেছে।  
তাহাদের মাঝেরা কোথায় বাঁধা আছে চোখে পড়িল না সত্য, কিন্তু এটা বুঝা গেল  
কুশারী পরিবারের অন্মের মত দুঞ্চিরও বিশেষ কোন অনটন নাই।

দক্ষিণের বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষিয়া ছয়-সাতটা বড় বড় মাটির কলসী  
বিড়ার উপর বসান আছে। হয়ত গুড় আছে, কি কি আছে জানি না, কিন্তু যত্ন  
দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহারা শূন্যগর্ভ কিংবা অবহেলার বস্ত। কয়েকটা খুঁটির  
গায়েই দেখিলাম তেরো- সমেত পাট এবং শনের গোছা বাঁধা রহিয়াছে; সুতরাং  
বাটিতে যে বিস্তর দড়িদড়ার আবশ্যক হয় তাহা অনুমান করা অসঙ্গত জ্ঞান  
করিলাম না।

কুশারীগৃহিণী খুব সম্ভব আমাদের অভ্যর্থনার কাজেই অন্যত্র নিযুক্তা,  
কর্তাটিও একবারমাত্র দেখা দিয়াই অন্তর্ধান করিয়াছিলেন; তিনি অকস্মাতঃ  
ব্যস্তসমস্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া অনুপস্থিতির  
কৈফিয়ত আর একপ্রকারে দিয়া কহিলেন, মা, এইবার যাই, আহিকটা সেরে  
এসে একেবারে বসি। বছর পনর-ঘোলর একটি সুন্দর সবলকায় ছেলে উঠানের  
একধারে দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সহিত আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন,  
কুশারীমহাশয়ের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, বাবা হরিপদ,

নারায়ণের অম্ব বোধ করি এতক্ষণে প্রস্তুত হল, একবার ভোগটি দিয়ে এসো গে বাবা। আহিংকের বাকিটুকু শেষ করতে আর আমার দেরি হবে না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আজ মিছাই আপনাকে কষ্ট দিলাম—বড় দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া আমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আর দেরি না করিয়া চক্ষের পলকে নিজেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এইবার যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পরে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠাঁই করার খবর পৌঁছিল। বাঁচা গেল। কেবল অতিরিক্ত বেলার জন্যে নয়, এইবার আগন্তকগনের প্রশংসাগে বিরতি অনুভব করিয়াই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে শুনিয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অব্যাহতি দিয়া যে যাঁহার বাড়ি চলিয়া গেলেন। কিন্তু খাইতে বসিলাম কেবল আমি একা। কুশারীমহাশয় সঙ্গে বসিলেন না, কিন্তু সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। হেতুটা তিনি সবিনয়ে এবং সগৌরবে নিজেই ব্যক্ত করিলেন। উপবীত-ধারণের দিন হইতে ভোজনকালে সেই যে মৌনী হইয়াছিলেন, সে ব্রত আজও ভঙ্গ করেন নাই; সুতরাং একাকী নির্জন গৃহে এই কাজটা তিনি এখনও সম্পন্ন করেন। আপনি করিলাম না, আশ্চর্য হইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে যখন শুনিলাম, আজ তাহারও নাকি কি একটা ব্রত আছে—পরাম গ্রহণ করিবে না, তখনই আশ্চর্য হইলাম। এই ছলনায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম এবং ইহার কি যে প্রয়োজন ছিল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথা চক্ষের পলকে ঝুঁঝিয়া লইয়া কহিল, তার জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না, ভাল করে খাও। আমি যে আজ খাব না, এঁরা সবাই জানতেন।

বলিলাম, অথচ আমি জানতাম না। কিন্তু এই যদি, কষ্ট স্বীকার করে আসার কি আবশ্যক ছিল?

ইহার উত্তর রাজলক্ষ্মী দিল না, দিলেন কুশারীগৃহিণী। কহিলেন, এ কষ্ট আমিই স্বীকার করিয়েচি বাবা। মা যে এখানে খাবেন না তা জানতাম; তবু আমরা

ঠাঁদের দয়ায় দুটি অন্ন পাই, ঠাঁদের পায়ের ধুলো বাড়িতে পড়বে এ লোভ  
সামলাতে পারলাম না। কি বল মা? এই বলিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি  
চাহিলেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এর জবাব আজ নয় মা, আর একদিন আপনাকে দেব।  
এই বলিয়া সে হাসিল।

আমি কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কুশারীগৃহিণীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া  
চাহিলাম। পল্লীগ্রামে, বিশেষ এইরূপ সুন্দর পল্লীতে ঠিক এমনি সহজ সুন্দর  
কথাগুলি যেন কোন রমণীর মুখেই শুনিবার কল্পনা করি নাই; কিন্তু এখনও যে  
এই পল্লী অঞ্চলেই আরও একটি তের বেশি আশ্চর্য নারীর পরিচয় পাইতে বাকি  
ছিল, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার পরিবেশনের ভার বিধবা কন্যার উপর অর্পণ  
করিয়া কুশারীগৃহিণী তালপাখা হাতে আমার সুমুখে বসিয়াছিলেন। বোধ হয়,  
বয়সে আমার অনেক বড় হইবেন বলিয়াই মাথার উপর অঞ্চলখানি ছাড়া মুখে  
কোন আবরণ ছিল না। তাহা সুন্দর কিংবা অসুন্দর মনেই হইল না। কেবল  
এইটুকুই মনে হইল, ইহা সাধারণ বাঙালী মায়ের মতই মেহ ও করঞ্চায় পরিপূর্ণ।  
দ্বারের কাছে কর্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া ছিলেন; বাহির হইতে তাঁহার মেয়ে ডাকিয়া  
কহিল, বাবা, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে। বেলা অনেক হইয়াছিল এবং এই  
খবরটুকুর জন্যই বোধ হয় তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন; তথাপি একবার  
বাহিরে ও একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখন একটু থাক মা,  
বাবুর খাওয়াটা—

গৃহিণী তৎক্ষণাত বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না তুমি যাও, মিথ্যে সময়  
নষ্ট কোরো না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তোমার খাওয়া হয় না আমি জানি।

কুশারী সঙ্কেচ বোধ করিতেছিলেন; কহিলেন, নষ্ট আর কি হবে, বাবুর  
খাওয়াটা হয়েই যাক না।

গৃহিণী কহিলেন, আমি থাকতেও যদি খাওয়ার ক্রটি হয় ত তোমার দাঁড়িয়ে থাকলেও সারবে না। তুমি যাও—কি বল বাবা? এই বলিয়া তিনি আমার প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। আমিও হাসিয়া বলিলাম, হয়ত বা ক্রটি বাড়বে। আপনি যান কুশারীমশায়, অমন অভুক্ত চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কোন পক্ষেই সুবিধা হবে না। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু মনে হইল সম্মানিত অতিথির আহারের স্থানে উপস্থিত না থাকিবার সঙ্কোচটা সঙ্গে লইয়াই গেলেন। কিন্তু এইটাই যে আমার মস্ত ভুল হইয়াছিল তাহা কিছুক্ষণ পরেই আর অবিদিত রহিল না। তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, নিরামিষ আলো চালের ভাত খান; জুরিয়ে গেলে আর খাওয়াই হয় না, তাই জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাও বলি বাবা, যাঁরা অনন্দাতা তাঁদের পূর্বে নিজের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করাও কঠিন।

কথাটায় মনে মনে আমার লজ্জা করিতে লাগিল, বলিলাম অনন্দাতা আমি নই; কিন্তু তাও যদি সত্য হয়, সেটুকু এত কম যে, এটুকু বাদ গেলে বোধ করি আপনারা টেরও পেতেন না।

কুশারীগৃহিণী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহার মুখখানি ধীরে ধীরে যেন অতিশয় ম্লান হইয়া উঠিল। তার পরে কহিলেন, তোমার কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয় বাবা, ভগবান আমাদের কিছু কম দেননি; কিন্তু এখন মনে হয় এত যদি তিনি নাই দিতেন, হয়ত এর চেয়ে তাঁর বেশি দয়াই প্রকাশ পেত। বাড়িতে ওই ত কেবল একটা বিধবা মেয়ে—কি হবে আমাদের গোলাভরা ধানে, কড়াভরা দুধে, আর কলসী কলসী গুড় নিয়ে? এ-সব ভোগ করবার যারা ছিল তারা ত আমাদের ত্যাগ করেই চলে গেছে।

কথাটা বিশেষ কিছুই নয়, কিন্তু বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল এবং ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, অনেক গভীর বেদনাই এই কয়টি কথার মধ্যে নিহিত আছে। ভাবিলাম, হয়ত তাঁহার কোন

উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এবং ওই যে ছেলেটিকে ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, তাহাকে অবলম্বন করিয়া হতাশাস পিতামাতা আর কোন সান্ত্বনাই পাইতেছেন না। আমি নীরব হইয়া রহিলাম, রাজলক্ষ্মীও কোন কথা না কহিয়া কেবল তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আমারই মত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কিন্তু আমাদের ভুল ভঙ্গিল তাঁহার পরের কথায়। তিনি আপনাকে আপনি সংবরণ করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমাদের মত তাদেরও ত তোমরাই অন্ধদাতা। কর্তাকে বললাম, মনিবকে দুঃখের কথা জানাতে লজ্জা নেই, আমাদের মাকে-বাবাকে নিমন্ত্রণের ছল করে একবার ধরে আন, আমি তাঁদের কাছে কেঁদেকেটে দেখি যদি তাঁরা এর কোন বিহিত করে দিতে পারেন। এই বলিয়া এইবার তিনি অঞ্চল তুলিয়া নিজের অশ্বজল মোচন করিলেন। সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, সেও আমারই মত সংশয়ে পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্বের মত এখনও দু'জনে মৌন হইয়া রহিলাম।

কুশারীগৃহিণী এইবার তাঁদের দুঃখের ইতিহাস ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত শুনিয়া বহুক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা বাহির হইল না; কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ রহিল না যে, একথা বিবৃত করিয়া বলিতে ঠিক এতখানি ভূমিকারই প্রয়োজন ছিল। রাজলক্ষ্মী পরাম্পরাগ্রহণ করিবে না শুনিয়াও এই মধ্যাহ-ভোজনের নিমন্ত্রণ হইতে শুরু করিয়া কর্তাটিকে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা পর্যন্ত কিছুই বাদ দেওয়া চলিত না। কিন্তু সে যাই হোক কুশারীগৃহিণী তাঁহার চক্ষের জল ও অস্ফুট বাক্যের ভিতর দিয়া ঠিক কতখানি যে ব্যক্ত করিলেন, তাহা জানি না এবং ইহার কতখানি যে সত্য তাহাও একপক্ষ শুনিয়া নিশ্চয় করা কঠিন; কিন্তু আমাদের মধ্যস্থতায় যে সমস্যা তাঁহারা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে সন্ির্বন্ধ আবেদন করিলেন, তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মধুর ও তেমনি কঠোর।

କୁଶାରୀଗୃହିଣୀ ଯେ ଦୁଃଖେର ଇତିହାସଟା ବିବୃତ କରିଲେନ ତାହାର ମୋଟ କଥାଟା  
ଏହି ଯେ, ଗ୍ରେ ତାହାଦେର ଖାଓୟା-ପରାର ଯଥେଷ୍ଟ ସଚ୍ଛଳତା ଥାକା ସତ୍ତ୍ଵେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ କେବଳ  
ସଂସାରଟାଇ ତାହାଦେର ବିଷ ହଇଯା ଗିଯାଛେ ତାଇ ନଯ, ସମ୍ମତ ପୃଥିବୀର କାହେ ତାହାରା  
ଲଜ୍ଜାଯ ମୁଖ ଦେଖାଇତେ ପାରିତେଛେ ନା ଏବଂ ସମ୍ମତ ଦୁଃଖେର ମୂଳ ହଇତେଛେ ତାହାର  
ଏକମାତ୍ର ଛୋଟ ଜା ସୁନନ୍ଦା; ଏବଂ ଯଦିଚ ତାହାର ଦେବର ଯଦୁନାଥ ନ୍ୟାୟରତ୍ନାଓ ତାହାଦେର  
କମ ଶକ୍ରତା କରେନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସଲ ଅଭିଯୋଗଟା ତାହାର ସେଇ ସୁନନ୍ଦାର ବିରଳଦ୍ଵେ ।  
ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ସୁନନ୍ଦା ଓ ତାହାର ସ୍ଵାମୀ ଯଥନ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମାଦେରଇ ପ୍ରଜା, ତଥନ ଯେମନ  
କରିଯାଇ ହୋକ ଇହାଦେର ବଶ କରିତେ ହଇବେ । ସଟନାଟା ସଂକ୍ଷେପେ ଏହିରପ । ତାହାର  
ଶୁଦ୍ଧର-ଶାଶ୍ଵତ ଯଥନ ସ୍ଵର୍ଗଗତ ହନ ତଥନ ତିନି ଏ ବାଡ଼ିର ବଧୁ । ଯଦୁ କେବଳ ଛୟ-ସାତ  
ବହୁରେର ବାଲକ । ଏ ବାଲକକେ ମାନୁଷ କରିଯା ତୁଳିବାର ଭାର ତାହାରଇ ଉପରେ ପଡ଼େ  
ଏବଂ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭାର ତିନି ବହନ କରିଯାଇ ଆସିଯାଛେ । ପୈତୃକ ବିଷୟେର  
ମଧ୍ୟେ ଏକଥାନି ମାଟିର ଘର, ବିଘା ଦୁଇ-ତିନ ବ୍ରକ୍ଷୋତ୍ତର ଜମି ଏବଂ ଘରକୟେକ ଯଜମାନ ।  
ମାତ୍ର ଏହିଟୁକୁର ଉପର ନିର୍ଭର କରିଯାଇ ତାହାର ସ୍ଵାମୀକେ ସଂସାର-ସମୁଦ୍ରେ ଭାସିତେ ହେଁ ।  
ଆଜ ଏହି ଯେ ପ୍ରାଚୁର୍ୟ, ଏହି ଯେ ସଚ୍ଛଳତା, ଏ-ସକଳ ସମ୍ମତି ତାହାର ସ୍ଵର୍କୃତ ଉପାର୍ଜନେର  
ଫଳ ।

ଠାକୁରପୋ କୋନ ସାହାଯ୍ୟଇ କରେନ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କଥନାଓ ତାହାର କାହେ  
ପ୍ରାର୍ଥନାଓ କରା ହେଁ ନାହିଁ ।

ଆମି କହିଲାମ, ଏଥନ ବୁଝି ତିନି ଅନେକ ଦାବି କରାଛେନ?

କୁଶାରୀଗୃହିଣୀ ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଯା କହିଲେନ, ଦାବି କିମେର ବାବା, ଏ ତ ସମ୍ମତି  
ତାର । ସମ୍ମତି ସେ ନିତ, ସୁନନ୍ଦା ଯଦି ନା ମାରେ ପଡ଼େ ଆମାର ସୋନାର ସଂସାର ଛାରଖାର  
କରେ ଦିତ ।

ଆମି କଥାଟା ଠିକମତ ବୁଝିତେ ନା ପାରିଯା ଆଶ୍ର୍ୟ ହଇଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ,  
କିନ୍ତୁ ଆପନାର ଏହି ଛେଳେଟି?

তিনিও প্রথমটা বুঝিতে পারিলেন না, পরে বুঝিয়া বলিলেন, ওই বিজয়ের  
কথা বলচ?

ও ত আমাদের ছেলে নয় বাবা, ও একটি ছাত্র। ঠাকুরপোর টোলে পড়ত,  
এখনও তার কাছেই পড়ে, শুধু আমার কাছে থাকে। এই বলিয়াই তিনি বিজয়  
সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিয়া কহিতে লাগিলেন, কত দুঃখে যে  
ঠাকুরপোকে মানুষ করি সে শুধু ভগবান জানেন

এবং পাড়ার লোকেও কিছু কিছু জানে। কিন্তু নিজে সে আজ সমস্ত  
ভুলেচে, শুধু আমরাই ভুলতে পারিনি। এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা হাত  
দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সে-সব যাক বাবা, সে অনেক কথা। আমি  
ঠাকুরপোর পৈতৈ দিলাম, কর্তা তাকে পড়ার জন্যে মিহিরপুরে শিবু তর্কালঙ্ঘারের  
টোলে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা, ছেলেটাকে ছেড়ে থাকতে পারিনি বলে আমি নিজে  
কতদিন গিয়ে মিহিরপুরে বাস করে এসেছি, সেও আজ তার মনে পড়ে না।  
যাক—এমন করে কত বছরই না কেটে গেল। ঠাকুরপোর পড়া সাঙ্গ হল, কর্তা  
তাকে সংসারী করবার জন্যে মেয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। এমন সময়ে বলা  
নেই কথা নেই, হঠাৎ একদিন শিবু তর্কালঙ্ঘারের মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করে  
এনে উপস্থিতি। আমাকে নাই বলুক বাবা, অমন দাদার পর্যন্ত একটা মত নিলে  
না।

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, মত না নেওয়ার কি বিশেষ কারণ  
ছিল?

গৃহিণী কহিলেন, ছিল বৈ কি। ওরা আমাদের ঠিক স্ব-ঘরও নয়, কুলে  
শীলে মানেও তের ছোট কর্তা রাগ করলেন, দুঃখে লজ্জায় বোধ করি এমন  
যাসখানেক কারও সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত কইলেন না; কিন্তু আমি রাগ করিনি।  
সুনন্দার মুখখানি দেখে প্রথম থেকেই যেন গলে গেলাম। তার উপর যখন শুনতে  
পেলাম, তার মা মারা গেছে, বাপ ঠাকুরপোর

হাতে তাকে সঁপে দিয়ে সন্ধ্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন, তখন ওই ছোট মেয়েটিকে পেয়ে আমার কি যে হ'ল তা তোমাকে বুবিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু সে যে একদিন তার এমন শোধ দেবে, এ কথা তখন কে ভেবেছিল! এই বলিয়া তিনি হঠাতে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বুবিলাম, এইখানে ব্যথাটা অতিশয় তীব্র, কিন্তু নীরবে রহিলাম।  
রাজলক্ষ্মীও এতক্ষণ

কোন কথা কহে নাই; সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাঁরা কোথায়?

প্রত্যুভৱে তিনি ঘাড় নাড়িয়া যাহা ব্যক্ত করিলেন তাহাতে বুবা গেল ইঁহারা আজও এই গ্রামেই আছেন। ইহার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা কহিলেন না, তাঁহার সুস্থ হইতে একটু বেশি সময় গেল। কিন্তু আসল বস্তু এখন পর্যন্ত ভাল করিয়া বুবাই গেল না। এদিকে আমার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কারণ কানাকাটি সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিঘ্ন ঘটে নাই।

সহসা তিনি চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং আমার থালার দিকে চাহিয়া অনুত্পন্নকষ্টে বলিয়া উঠিলেন, থাক বাবা, সমস্ত দুঃখের কাহিনী বলতে গেলে শেষও হবে না, তোমাদের ধৈর্য থাকবে না। আমার সোনার সংসার যারা চোখে দেখেচে, কেবল তারাই জানে, ছোটবো আমার কি সর্বনাশ করে গেছে। কেবল সেই লঙ্কাকাণ্ডাই তোমাদের সংক্ষেপে বলব।

যে সম্পত্তির উপর আমাদের সমস্ত নির্ভর, সেটা এক সময়ে একজন তাঁতির ছিল। বছরখানেক পূর্বে হঠাতে একদিন সকালে তার বিধবা স্ত্রী নাবালক ছেলেটিকে সঙ্গে করে বাড়িতে এসে উপস্থিত। রাগ করে কত কি যে ব'লে গেল তার ঠিকানা নেই, হয়ত তার কিছুই সত্য নয়, হয়ত তার সমস্তই মিথ্যে। ছোটবো মান করে যাচ্ছিল রান্নাঘরে সে যেন সেই- সব শুনে একেবারে পাথর হয়ে গেল। তারা চলে গেলেও তার সে ভাব আর ঘুচতে চাইল না। আমি ডেকে বললাম,

সুনন্দা, দাঁড়িয়ে রইলি, বেলা হয়ে যাচ্ছে না? কিন্তু জবাবের জন্য তার মুখের পানে চেয়ে আমার ভয় হ'ল। তার চোখের চাহনিতে কিসের যেন একটা আলো ঠিকরে পড়চে, কিন্তু শ্যামবর্ণ মুখখানি একেবারে ফ্যাকাশে—বিবর্ণ। তাঁতিবৌয়ের প্রত্যেক কথাটি যেন বিন্দু বিন্দু করে তার সর্বাঙ্গ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে গেছে। সে তখ্খনি আমার জবাব দিলে না, কিন্তু আস্তে আস্তে কাছে এসে বললে, দিদি, তাঁতিবৌকে তার স্বামীর বিষয় তোমরা ফিরিয়ে দেবে না! তার ঐটুকু নাবালক ছেলেকে তোমরা সর্বস্ব বঞ্চিত করে সারাজীবন পথের ভিথারী করে রাখবে?

আশ্চর্য হয়ে বললাম, শোন কথা একবার! কানাই বসাকের সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেলে ইনি কিনে নিয়েচেন। নিজের কেনা বিষয় কে কবে পরকে ছেড়ে দেয় ছোটবৌ?

ছোটবৌ বললে, কিন্তু বট্ঠাকুর এত টাকা পেলেন কোথায়?

রাগ করে জবাব দিলাম, সে কথা জিজ্ঞেস কর্ব গে যা তোর বট্ঠাকুরকে—বিষয় যে কিনেচে। এই বলে আহিংক করতে চলে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সত্যিই ত। যে বিষয় নীলাম হয়ে গেছে তা ফিরিয়ে দিতেই বা ছোটবৌ বলে কি করে?

কুশারীগৃহিণী কহিলেন, বল ত বাছা! কিন্তু এ কথা বলা সত্ত্বেও তাঁহার মুখের উপর লজ্জার যেন একটা কালো ছায়া পড়ল। কহিলেন, তবে ঠিক নিলাম হয়েই ত বিক্রি হয়নি কিনা তাই। আমরা হলাম তাদের পুরুত-বংশ। কানাই বসাক মৃত্যুকালে এঁর উপরেই সমস্ত ভার দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন ত আর ইনি জানতেন না, সেই সঙ্গে একরাশ দেনাও রেখে গিয়েছিল!

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমি উভয়েই কেমন যেন স্তন্ধ হইয়া গেলাম। কি যেন একটা নোংরা জিনিস আমার মনের ভিতরটা একমুহূর্তেই একেবারে মলিন করিয়া দিয়া গেল। কুশারীগৃহিণী বোধ করি ইহা লক্ষ্য করিলেন

না। বলিলেন, জপ-আহিক সমস্ত সেরে ঘণ্টা-দুই পরে ফিরে এসে দেখি সুনন্দা  
সেইখানে ঠিক তেমনি স্থির হয়ে বসে আছে, কোথাও একটা পা পর্যন্ত বাড়ায়  
নি। কর্তা কাছারি সেরে এখনি এসে পড়বেন; ঠাকুরপো বিনুকে নিয়ে খামার  
দেখতে গেছে, তারও ফিরতে দেরি নেই। বিজয় নাইতে গেছে, এখনি এসে  
ঠাকুরপুজোয় বসবে। রাগের পরিসীমা রইল না; বললাম, তুই কি রান্নাঘরে আজ  
চুকবি নে? ওই বজ্জাত তাঁতিবেটীর ছেঁড়া কথা নিয়েই সারাদিন বসে থাকবি?

সুনন্দা মুখ তুলে বললে, না দিদি, যে বিষয় আমাদের নয়, সে যদি  
তোমরা ফিরিয়ে না দাও ত আমি রান্নাঘরে চুকব না। ওই নাবালক ছেলেটার  
মুখের থাস কেড়ে নিয়ে আমার স্বামী-পুত্রকে খাওয়াতে পারব না, ঠাকুরের ভোগ  
রেঁধেও দিতে পারব না। এই বলে সে তার নিজের ঘরে চলে গেল। সুনন্দাকে  
আমি চিনতাম। সে যে মিথ্যা কথা বলে না, সে যে তার অধ্যাপক সন্ন্যাসী বাপের  
কাছে ছেলেবেলা থেকে অনেক শাস্ত্র পড়েচে, তাও জানতাম; কিন্তু সে যে  
মেয়েমানুষ হয়েও এমন পাষাণ-কঠিন হতে পারবে তাই কেবল তখনো জানতাম  
না। আমি তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধতে গেলাম। পুরুষেরা সব বাড়ি ফিরে এলেন।  
কর্তার খাবার সময় সুনন্দা দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। আমি দূর থেকে হাত  
জোড় করে বললাম, সুনন্দা, একটু ক্ষমা দে, ওঁর খাওয়াটা হয়ে যাক। সে এটুকু  
অনুরোধও রাখলে না। গঙ্গৃষ্ম করে খেতে বসছিলেন, জিজেস করলে, তাঁতিদের  
সম্পত্তি কি আপনি টাকা দিয়ে নিয়েছিলেন? ঠাকুর ত কিছুই রেখে যাননি, এ ত  
আপনাদের মুখেই অনেকবার শুনেচি। তবে এত টাকা পেলেন কোথায়?

যে কখনো কথা কয় না তার মুখে এই প্রশ্ন শুনে কর্তা প্রথমে একেবারে  
হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, তার পর বললেন, এ-সব কথার মানে কি বৌমা?

সুনন্দা উত্তর দিলে, এর মানে যদি কেউ জানে ত সে আপনি। আজ  
তাঁতিবৌ তার ছেলে নিয়ে এসেছিল। তার সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি করা আপনার  
কাছে বাহ্য্য—কিছুই আপনার অজানা নেই। এ বিষয় যার তাকে যদি ফিরিয়ে

না দেন ত আমি বেঁচে থেকে এই মহাপাপের একটা অন্নও আমার স্বামী-পুত্রকে থেতে দিতে পারব না।

আমার মনে হ'ল বাবা, হয় আমি স্বপ্ন দেখছি, নাহয় সুনন্দাকে ভূতে পেয়েছে। যে ভাণ্ডরকে সে দেবতার বেশি ভক্তি করে তাঁকেই এই কথা! উনিও খানিকক্ষণ বজ্রাহতের মত বসে রইলেন; তার পরে জ্বলে উঠে বললেন, বিষয় পাপের হোক, পুণ্যের হোক, সে আমার—তোমার স্বামী-পুত্রের নয়। তোমাদের না পোষায় তোমরা আর কোথাও যেতে পার। কিন্তু বৌমা, তোমাকে আমি এতকাল সর্বগুণময়ী বলেই জানতাম, কখনো এমন ভাবিনি। এই বলে তিনি আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। সেদিন সমস্তদিন আর কারও মুখে ভাত-জল গেল না। কেঁদে গিয়ে ঠাকুরপোর কাছে পড়লাম, বললাম, ঠাকুরপো, তোমাকে যে আমি কোলে করে মানুষ করেছি—তার এই প্রতিফল! ঠাকুরপোর চোখ-দুটো জলে ভরে গেল, বললে, বৌঠান, তুমি আমার মা, দাদাও আমার পিতৃতুল্য। কিন্তু তোমাদের বড় যে, সে ধর্ম। আমারও বিশ্বাস সুনন্দা একটা কথাও অন্যায় বলেনি। শুণুরমহাশয় সন্ধ্যাস-গ্রহণের দিন তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, মা, ধর্মকে যদি সত্যিই চাও, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি বৌঠান, সে কখনো ভুল করেনি।

হায়রে পোড়া কপাল! তাকেও যে পোড়ারমুখী ভেতরে ভেতরে এত বশ করে রেখেছিল, আজ আমার তায় চোখ খুলল। সেদিন ভাদ্রসংক্রান্তি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—থেকে থেকে ঝরণার করে জল পড়চে, কিন্তু হতভাগী একটা রাঙ্গিরের জন্যেও আমাদের মুখ রাখলে না, ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার শুণুরের কালের একঘর প্রজা মরেহেজে বছর-দুই হ'ল চলে গেছে, তাদেরই ভাঙ্গা ঘর একখানি তখনও কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিল; শিয়াল-কুকুর-সাপ-ব্যাঙের সঙ্গে তাতেই গিয়ে সেই দুর্দিনে আশ্রয় নিলে। উঠোনের জল-কাদা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলাম, সর্বনাশী, এই যদি তোর মনে

ছিল, এ সংসারে দুকেছিলি কেন? বিনুকে পর্যন্ত যে নিয়ে চললি, তুই কি শুশুরকুলের নামটা পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকতে দিবিনে প্রতিজ্ঞা করেচিস? কিন্তু কোন উত্তর দিলে না। বললাম, খাবি কি? জবাব দিলে, ঠাকুর যে তিনি বিষে ব্ৰহ্মোত্তৰ রেখে গেচেন, তার অৰ্ধেকটাও ত আমাদেৱ। কথা শুনে মাথা খুঁড়ে মৰতে ইচ্ছে হ'ল। বললাম, হতভাগী, তাতে যে একটা দিনও চলবে না। তোৱা নাহয় না খেয়ে মৰতে পারিস, কিন্তু আমাৰ বিনু? বললে, একবাৰ কানাই বসাকেৱে ছেলেৰ কথা ভেবে দেখ দিদি। তার মত একবেলা এক সন্তোষ খেয়েও যদি বিনু বাঁচে, ত সেই দেৱ।

তারা চলে গেল। সমস্ত বাড়িটা যেন হাহাকার কৱে কাঁদতে লাগল। সে রাত্রিতে আলো জুলল না, হাঁড়ি চড়ল না। কৰ্তা অনেক রাত্ৰে ফিৰে এসে সমস্ত রাত ওই খুঁটিটা ঠেস দিয়ে বসে কাটালেন। হয়ত বিনু আমাৰ ঘুমোয় নি, হয়ত বাঢ়া আমাৰ ক্ষিদেৱ জ্বালায় ছটফট কৱচে। ভোৱ না হতেই রাখালকে দিয়ে গৱৰ-বাচুৱ পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু রাক্ষুসী ফিৰিয়ে দিয়ে তাৰই হাতে বলে পাঠালে, বিনুকে আমি দুধ খাওয়াতে চাইনে, দুধ না খেয়ে বেঁচে থাকবাৰ শিক্ষা দিতে চাই।

ৱাজলক্ষ্মীৰ মুখ দিয়া কেবল একটা সুগভীৰ নিশ্চাস পড়িল; গৃহিণীৰ সেই দিনেৰ সমস্ত বেদনা ও অপমানেৰ স্মৃতি উদ্বেল হইয়া তাঁহার কণ্ঠৰোধ কৱিয়া দিল, এবং আমাৰ হাতেৰ ডাল-ভাত শুকাইয়া একেবাৱে চামড়া হইয়া উঠিল।

কৰ্তাৰ খড়মেৰ শব্দ শুনা গেল, তাঁহার মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা হইয়াছে। আশা কৱি তাঁহার মৌনৰত অক্ষুণ্ণ-অটুট থাকিয়া তাঁহার সান্ত্বিক আহাৱেৱ আজ কোন বিষ্ণ ঘটায় নাই, কিন্তু এদিকেৱ ব্যাপারটা জানিতেন বলিয়াই বোধ কৱি আমাৰ তত্ত্ব লইতে আৱ আসিলেন না। গৃহিণী চোখ মুছিয়া, নাক ঝাড়িয়া, গলা পৱিষ্ঠার কৱিয়া কহিলেন, তার পৱ গ্ৰামে গ্ৰামে পাড়ায় পাড়ায় লোকেৱ মুখে মুখে কি দুৰ্নাম, কি কেলেক্ষারি বাবা—সে আৱ তোমাদেৱ কি বলব! কৰ্তা বললেন,

দু'দিন যাক, দুঃখের জ্বালায় তারা আপনিই ফিরবে। আমি বললাম, তাকে চেনো না, সে ভাঙবে কিন্তু নুইবে না। আর তাই হ'ল। একটার পর একটা করে আজ আট মাস কেটে গেল, কিন্তু তাকে হেঁট করতে পারলে না। কর্তা ভেবে ভেবে আর আড়ালে কেঁদে কেঁদে যেন কাঠ হয়ে উঠতে লাগলেন। ছেলেটা ছিল তাঁর প্রাণ, আর ঠাকুরপোকে ভালবাসতেন ছেলের চেয়ে বেশি। আর সহ্য করতে না পেরে লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, তাঁতিদের যাতে কষ্ট না হয় তিনি করবেন; কিন্তু সর্বনাশী জবাব দিলে, যা তাদের ন্যায্য পাওনা সমস্ত মিটিয়ে দিলেই তবে ঘরে ফিরব। তার এক ছটাক কোথাও বাকি থাকতে যাব না। অর্থাৎ তার মানে, নিজেদের অবধারিত মৃত্যু।

আমি গেলাসের জলে হাতখানা একবার ডুবাইয়া লইয়া জিঞ্জাসা করিলাম, এখন তাঁদের কি করে চলে?

কুশারীগৃহিণী কাতর হইয়া বলিলেন, এর জবাব আর আমাকে দিতে ব'লো না বাবা। এ আলোচনা কেউ করতে এলে আমি কানে আঙ্গুল দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাই,—মনে হয় বুঝিবা আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই আট মাস এ-বাড়িতে মাছ আসে না, দুধ-ঘির কড়া চড়ে না। সমস্ত বাড়িটার ওপর কে যেন এক মর্মান্তিক অভিশাপ রেখে চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তিনজনেই আমরা স্তন্ধ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

ঘটাখানেক পরে আমরা আবার যখন গাড়িতে গিয়া বসিলাম, কুশারীগৃহিণী সজলকগ্নে রাজলক্ষ্মীর কানে বলিলেন, মা, তারা তোমারই প্রজা। আমার শুশ্রের দরত্ন যে জমিটুকুর ওপর তাদের নির্ভর সেটুকু তোমার গঙ্গামাটিতেই।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

গাড়ি ছাড়িয়া দিতে তিনি পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, মা, তোমার বাড়ি খেকেই চোখে পড়ে। নালার এ-দিকে যে ভাঙা পোড়ো ঘরটা দেখা যায়, সেইটে।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତେମନି ନାଥା ନାଡ଼ିଆ ଜାନାଇଲ, ଆଚ୍ଛା ।

ଗାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରଗତିତେ ଅଗସର ହଇଲ । ଅନେକକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମି କୋନ କଥାଇ କହିଲାମ ନା । ଚାହିୟା ଦେଖିଲାମ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ୟମନକ୍ଷ ହଇଯା କି ଭାବିତେଛେ । ତାହାର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିଯା କହିଲାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାର ଲୋଭ ନେଇ, ଯେ ଚାଯ ନା, ତାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ଯାଓଯାର ମତ ବିଡ଼ସ୍ବନା ଆର ନେଇ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମାର ମୁଖେର ପ୍ରତି ଚାହିୟା ଅନ୍ଧ ଏକଟୁଖାନି ହାସିଯା ବଲିଲ, ସେ ଆମି ଜାନି । ତୋମାର କାହେ ଆମାର ଆର କିଛୁଇ ନା ହୋକ ଏ ଶିକ୍ଷା ହେଯେଚେ!

## সাত

আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, যে কয়টি নারী-চরিত্র আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি সেই কুশারীমহাশয়ের বিদ্রোহী ভাতৃজায়া। এই সুদীর্ঘ জীবনে সুনন্দাকে আমি আজও ভুলি নাই। মানুষকে এত শীত্র এবং এত সহজে রাজলক্ষ্মী আপনার করিয়া লইতে পারে যে, সুনন্দা যে একদিন আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। না হইলে এই আশৰ্য মেয়েটিকে জানিবার সুযোগ আমার কখনও ঘটিত না। অধ্যাপক যদু তর্কালক্ষ্মারের ভাঙ্গাচোরা দু-তিনখানা ঘর আমাদের বাড়ির পশ্চিমে মাঠের এক প্রান্তে চাহিলেই সোজা চোখে পড়ে—এখানে আসিয়া পর্যন্তই পড়িয়াছে, কেবল এক বিদ্রোহিণী যে ওইখানে তার স্বামী-পুত্র লাইয়া বাসা বাঁধিয়াছে ইহাই জানিতাম না। বাঁশের পুল পার হইয়া একটা কঠিন অনুর্বর মাঠের উপর দিয়া মিনিট-দশেকের পথ; মাঝখানে গাছপালা প্রায় কিছুই নাই, অনেকদূর পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আজ সকালে ঘূম ভাঙিয়া উঠিয়া জানালার মধ্য দিয়া যখন ওই জীর্ণ শ্রীহীন ঘরগুলি চোখে পড়িল তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত একপ্রকার অভূতপূর্ব ব্যথা ও আগ্রহের সহিত চাহিয়া রহিলাম; এবং যে বস্ত অনেকদিন অনেক উপলক্ষে দেখিয়াও বার বার ভুলিয়াছি, সেই কথাই মনে পড়িল যে, সংসারে কোন-কিছুরই কেবলমাত্র বাহিরটা দেখিয়া কিছুই বলিবার জো নাই। কে বলিবে ওই পোড়ো বাড়িটা শিয়াল-কুকুরের আশ্রয়স্থল নহে! কে অনুমান করিবে ওই কয়খানা ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে কুমার-রঘু-শকুন্তলা-মেঘদূতের অধ্যাপনা চলে; হয়ত স্মৃতি ও ন্যায়ের মীমাংসা ও বিচার লইয়া ছাত্র-পরিবৃত এক নবীন অধ্যাপক মগ্ন হইয়া থাকেন। কে জানিবে উহারই মধ্যে এই বাঙ্গলাদেশের

এক তরুণী নারী ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদা রাখিতে স্বেচ্ছায় অশেষ দুঃখ বহন করিতেছে !

দক্ষিণের জানালা দিয়া বাটীর মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় মনে হইল উঠানের উপর কি যেন একটা হইতেছে—রতন আপত্তি করিতেছে এবং রাজলক্ষ্মী তাহা খণ্ডন করিতেছে, সুতরাং কর্তৃস্বরটা তাহারই কিছু প্রবল। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে কিছু অপ্রতিভ হইয়া গেল; কহিল, ঘুম ভেঙ্গে গেল বুবি? যাবেই ত। রতন, তুই গলাটা একটু খাটো কর বাবা, নইলে আমি ত আর পারিনে।

এই প্রকার অনুযোগ এবং অভিযোগে কেবল রতনই একা নয়, বাড়িসুন্দর সকলেই আমরা অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছিলাম। অতএব সেও চুপ করিয়া রহিল, আমিও তেমনি কথা কহিলাম না।

দেখিলাম একটা বড় চাঙ্গারিতে চাল-ডাল-ঘি-তেল প্রভৃতি এবং আর-একটা ছোট পাত্রে এতজ্ঞাতীয় নানাবিধ ভোজ্যবস্তু সজ্জিত হইয়াছে। মনে হইল, এইগুলির পরিমাণ ও তাহাদিগকে বহন করিবার শক্তিসামর্থ্য-প্রসঙ্গেই রতন প্রতিবাদ করিতেছিল। ঠিক তাই। রাজলক্ষ্মী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, শোন এর কথা! এই ক'টা চাল-ডাল বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না! এ যে আমি নিয়ে যেতে পারি রতন। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া স্বচ্ছন্দে বড় ঝুড়িটা তুলিয়া ধরিল।

বাস্তবিক ভার হিসাবে মানুষের পক্ষে, এমন কি রতনের পক্ষেও এগুলি বহিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু কঠিন ছিল আর একটা কাজ। ইহাতে তাহার মর্যাদাহানি হইবে। কিন্তু মনিবের কাছে লজ্জায় এই কথাটাই সে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া অত্যন্ত সহজেই এ কথাটা বুঝিতে পারিলাম। হাসিয়া কহিলাম, তোমার যথেষ্ট লোকজন আছে, প্রজারও অভাব নেই—তাদের কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, রতন না হয় খালি হাতে সঙ্গে যাক।

রতন অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী একবার আমার ও একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হতভাগা আধঘণ্টা ধরে ঝগড়া করলে, তবু বললে না যে, ও-সব ছোট কাজ রতনবাবুর নয়। যা, কাউকে ডেকে আন্গে।

সে চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সকালে উঠেই এ-সব যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মানুষের খাবার জিনিস সকালে পাঠাতে হয়।

কিন্তু কোথায় পাঠান হচ্ছে? এবং তার হেতু?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হেতু মানুষ খাবে এবং যাচ্ছে বামুনবাড়িতে।

কহিলাম, বামুনটি কে?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় ভাবিল নামটা বলিবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, দিয়ে বলতে নেই, পুণ্যি কমে যায়। যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এস, তোমার চা তৈরি হয়ে গেছে।

আমি আর কোন প্রশ্ন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

বেলা বোধ হয় তখন দশটা, বাহিরের ঘরে তক্তাপোশের উপর বসিয়া কাজের অভাবে একখানা পুরানো সান্তানিক কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম, একটা অচেনা কঢ়স্বরের সন্তানে মুখ তুলিয়া দেখিলাম—আগন্তুক অপরিচিতই বটে। কহিলেন, নমস্কার বাবুমশায়।

আমিও হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম, বসুন।

ব্রাহ্মণের অতিশয় দীন বেশ—পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মলিন উন্নরীয়। পরিধানের বস্ত্রখানি তেমনি মলিন, উপরন্তু দু-তিন স্থানে গ্রান্থি বাঁধা। পল্লীগ্রামের ভদ্রব্যক্তির আচ্ছাদনের দীনতা বিস্ময়ের বস্তুও নয়। কেবলমাত্র ইহার উপরেই তাঁহার সাংসারিক অবস্থা অনুমান করাও চলে না। তিনি সম্মুখে বাঁশের মোড়াটার উপরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, আমি আপনার একজন দরিদ্র প্রজা, ইতিপূর্বেই আমার আসা কর্তব্য ছিল, ভারি ক্রটি হয়ে গেছে।

আমাকে জমিদার মনে করিয়া কেহ আলাপ করিতে আসিলে আমি মনে মনে যেমন লজ্জিত হইতাম, তেমনি বিরক্ত হইতাম; বিশেষতঃ ইহারা যে-সকল নিবেদন ও আবেদন লইয়া উপস্থিত হইত এবং যে-সকল বদ্ধমূল উৎপাত ও অত্যাচারের প্রতিবিধান প্রার্থনা করিত তাহাতে আমার কোন হাতই ছিল না। ইঁহার প্রতিও প্রসন্ন হইতে পারিলাম না; কহিলাম, বিলম্বে আসার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, কারণ একেবারে না এলেও আমি ক্রটি নিতাম না—ও-রকম আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আপনার প্রয়োজন?

ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, অসময়ে এসে আপনার কাজে হয়ত ব্যাঘাত করলাম, আমি আর একদিন আসব। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন বলুন?

আমার বিরক্তিটা তিনি আনায়াসে লক্ষ্য করিলেন। একটু মৌন থাকিয়া শান্তভাবে বলিলেন, আমি সামান্য ব্যক্তি, প্রয়োজনও যৎসামান্য। মাঠাকরুণ আমাকে স্মরণ করেচেন, হয়ত তাঁর আবশ্যক থাকতে পারে—আমার কিছু নেই।

জবাবটা কঠোর কিন্তু সত্য, এবং আমার প্রশ্নের তুলনায় অসঙ্গতও নয়। কিন্তু এখানে আসিয়া পর্যন্ত নাকি এরূপ জবাব শুনাইবার লোক ছিল না, তাই ব্রাহ্মণের প্রত্যওরে কেবল বিস্ময়াপন্ন নয়, সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। অথচ মেজাজ আমার স্বভাবতঃ রূক্ষও নয়, অন্যত্র কোথাও এ কথায় কিছু মনেও হইত না; কিন্তু ঐশ্বর্যের ক্ষমতা জিনিসটা এতই বিশ্রী যে, সেটা পরের ধার করা হইলেও তাহার অপব্যবহারের প্রলোভন মানুষে সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারে না। অতএব অপেক্ষাকৃত চের বেশি রুঢ় উত্তরই হঠাত মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঝাঁঝটা তার উৎক্ষিপ্ত হইবার পূর্বেই দেখিলাম পাশের দরজাটা খুলিয়া গেল এবং রাজলক্ষ্মী তাঁহার পূজার আসন হইতে অসমাপ্ত আক্রিক ফেলিয়া রাখিয়াই উঠিয়া আসিল। দূর হইতে সসন্দেহে প্রণাম করিয়া কহিল, এরই মধ্যে উঠবেন না, আপনি বসুন। আপনার কাছে আমার অনেক কথা আছে।

ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁନରାୟ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ବଲିଲେନ, ମା, ଆପଣି ତ ଆମାର ସଂସାରେର ଅନେକଦିନେର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର କରେ ଦିଲେନ, ଏତେ ପ୍ରାୟ ଆମାଦେର ପନର ଦିନେର ଖାଓୟା ଚଲେ ଯାବେ । କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅକାଳ ଚଲଚେ, ବ୍ରତ-ନିୟମ କିଛୁରଇ ଦିନ ନେଇ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଁ ତାଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛିଲେନ—ରାଜଲଙ୍ଘୀ ସହାସ୍ୟ କହିଲି, ଆପନାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କେବଳ ବାରବ୍ରତେର ଦିନକ୍ଷଣଗୁଲୋଇ ଶିଖେ ରେଖେଚେନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବେଶୀର ତତ୍ତ୍ଵ ନେବାର କାଳାକାଳ ବିଚାରଟା ଆମାର କାହେ ଶିଖେ ଯେତେ ବଲେ ଦେବେନ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେନ, ଏତ ବଡ଼ ସିଧେଟା କି ତା ହଲେ ମା—

ପ୍ରଥମଟା ତିନି ଶେଷ କରିତେ ପାରିଲେନ ନା, ଅଥବା ଇଚ୍ଛା କରିଯାଇ କରିଲେନ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମି ଏଇ ଦାସ୍ତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ଅନୁଭ୍ଵ ବାକ୍ୟେର ମର୍ମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଲାମ । କିନ୍ତୁ ଭୟ ହଇଲ ଆମାରଇ ମତ ନା ବୁଝିଯା ରାଜଲଙ୍ଘୀ ହ୍ୟାତ ଏକଟା ଶକ୍ତ କଥା ଶୁଣିବେ । ଲୋକଟିର ଏକଦିକେର ପରିଚୟ ଏଖନେ ଅଜ୍ଞାତ ଥାକିଲେଓ ଆର ଏକଦିକେର ପରିଚୟ ଇତିପୂର୍ବେହି ପାଇୟାଛିଲାମ; ସୁତରାଂ ଏମନ ଇଚ୍ଛା ହଇଲ ନା ଯେ, ଆମାରଇ ସମ୍ମୁଖେ ଆବାର ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟେ । ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟା ସାହସ ଏଇ ଛିଲ ଯେ, କେହ କୋନଦିନ ମୁଖୋମୁଖୀ ରାଜଲଙ୍ଘୀକେ ନିରହ୍ତର କରିଯା ଦିତେ ପାରିତ ନା । ଠିକ ତାହାଇ ହଇଲ । ଏଇ ବିଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମଟାକେଓ ମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜେ ପାଶ କାଟାଇୟା ଗିଯା ହାସିଯା ବଲିଲ, ତର୍କାଳଙ୍କାରମଶାଇ, ଶୁନେଚି ଆପନାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭାରୀ ରାଗୀ ମାନୁଷ—ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣେ ଗିଯେ ପଡ଼ିଲେ ହ୍ୟାତ ଚଟେ ଯାବେନ, ନାହଲେ ଏ କଥାର ଜବାବ ତାଁକେଇ ଦିଯେ ଆସତାମ ।

ଏତକ୍ଷଣେ ବୁଝିଲାମ ଇନିଇ ଯଦୁନାଥ କୁଶାରୀ । ଅଧ୍ୟାପକ ମାନୁଷ, ପ୍ରିୟତମାର ମେଜାଜେର ଉଲ୍ଲେଖେ ନିଜେର ମେଜାଜ ହାରାଇୟା ଫେଲିଲେନ; ହାଃ ହାଃ କରିଯା ଉଚ୍ଚହାସ୍ୟ ସର ଭରିଯା ପ୍ରସମ୍ଭାଚିତ୍ତେ ବଲିଲେନ, ନା ମା, ରାଗୀ ହବେ କେନ, ନିତାନ୍ତଇ ସୋଜା ମାନୁଷ । ଆମରା ଦରିଦ୍ର, ଆପଣି ଗେଲେ ତ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ କରତେ ପାରବ ନା, ତିନିଇ ଆସବେନ । ଏକଟୁ ସମୟ ପେଲେ ଆମିଇ ତାଁକେ ସଙ୍ଗେ କରେ ନିଯେ ଆସବ ।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, তর্কালঙ্ঘারমশাই, আপনার ছাত্র ক'টি?  
কুশারী বলিলেন, পাঁচটি। এদেশে বেশি ছাত্র ত পাবার জো নেই—  
অধ্যাপনা কেবল নামমাত্র।

সব ক'টিকেই খেতে-পরতে দিতে হয়?

না। বিজয় ত দাদার ওখানে থাকে, একটির বাড়ি গ্রামের মধ্যেই, কেবল  
তিনটি ছাত্র আমার কাছে থাকে।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অপূর্ব স্মিন্দকগ্রে বলিল, এই  
দুঃসময়ে এ ত সহজ নয় তর্কালঙ্ঘারমশাই!

ঠিক এই কর্তৃস্বরের প্রয়োজন ছিল। না হইলে অভিমানী অধ্যাপকের  
উত্তপ্ত হইয়া উঠার কিছুমাত্র বাধা ছিল না। অথচ এবার তাঁহার মনটা একেবারে  
ও-দিক দিয়াই গেল না! অতি সহজেই গৃহের দুঃখ-দৈন্য স্বীকার করিয়া  
ফেলিলেন; বলিলেন, কি করে যে চলে সে কেবল আমরা দুটি প্রাণীই জানি।  
কিন্তু তবু ত ভগবানের উদয়াস্ত আটকে থাকে না মা! তা ছাড়া উপায়ই বা কি?  
অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ত ব্রাহ্মণেরই কাজ। আচার্যদেবের কাছে যা পেয়েছি, সে ত  
কেবল ন্যস্ত ধন—আর একদিন সে ত ফিরিয়ে দিতেই হবে মা! একটু স্থির  
থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, একদিন এই ভার ছিল দেশের ভূস্মামীর উপর, কিন্তু  
এখন দিন কাল সমস্তই বদলে গেছে। সে অধিকারও তাঁদের নেই, সে দায়িত্বও  
গেছে। প্রজার রক্তশোষণ করা ছাড়া আর তাঁদের কোন করণীয় নেই। তাঁদের  
ভূস্মামী বলে মনে করতেই এখন ঘৃণা বোধ হয়। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, কিন্তু  
ওদের মধ্যে কেউ যদি কোন প্রায়শিক্ষণ করতে চায় তাতে যেন আবার বাধা  
দেবেন না।

কুশারী লজ্জা পাইয়া নিজেও হাসিলেন; কহিলেন, বিমনা হয়ে আপনার  
কথাটা আমি মনেই করিনি। কিন্তু বাধা দেব কেন? সত্যিই ত এ আপনাদেরই  
কর্তব্য।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ଆମରା ପୁଜୋ-ଆଚା କରି, କିନ୍ତୁ ଏକଟା ମନ୍ତ୍ରରେ ହୟତ  
ଶୁଦ୍ଧ ଆବୃତ୍ତି କରତେ ପାରିନେ—ଏତେ କିନ୍ତୁ ଆପନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତା ସ୍ମରଣ କରିଯେ ଦିଚ୍ଛି ।

କୁଶାରୀ ହାସିଯା ବଲିଲେନ, ତାଇ ହବେ ମା! ଏହି ବଲିଯା ତିନି ବେଳାର ଦିକେ  
ଚାହିୟା ଉଠିଯା ପଡ଼ିଲେନ । ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଗାମ କରିଲ, ଯାଇବାର ସମୟ  
ଆମି କୋନମତେ ଏକଟା ନମକ୍ଷାର ସାରିଯା ଲଇଲାମ ।

ତିନି ଚଲିଯା ଗେଲେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ଆଜ ତୋମାକେ ଏକଟୁ ସକାଳ ସକାଳ  
ନାଓଯା ଖାଓଯା ଦେଇ ନିତେ ହବେ ।

କେନ ବଲ ତ?

ଦୁପୁରବେଳା ଏକବାର ସୁନନ୍ଦାର ବାଡ଼ିତେ ଯେତେ ହବେ ।

ଏକଟୁ ବିଶିତ ହଇଯା କହିଲାମ, କିନ୍ତୁ ଆମାକେ କେନ? ତୋମାର ବାହନ ରତନ  
ଆଛେ ତ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଥା ନାଡ଼ିଯା ବଲିଲ, ଓ ବାହନେ ଆର କୁଳୋବେ ନା, ତୋମାକେ  
ସଙ୍ଗେ ନା ନିଯେ ଆର କୋଥାଓ ଆମି ଏକପାଓ ନଡ଼ିଛି ନେ ।

ବଲିଲାମ, ଆଚା, ତାଇ ହବେ ।

## আট

পূর্বেই বলিয়াছি, একদিন সুনন্দা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তাহাকে পরমাত্মায়ের মত কাছে পাইয়াছিলাম। ইহার সমস্ত বিবরণ বিস্তৃত করিয়া না বলিলেও কথাটাকে প্রত্যয় না করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। কিন্তু আমাদের প্রথম পরিচয়ের ইতিহাসটা বিশ্বাস করান শক্ত হইবে হয়ত। অনেকেই মনে করিবেন ইহা অঙ্গুত; হয়ত, অনেকেই মাথা নাড়িয়া কহিবেন, এ-সকল কেবল গল্পেই চলে। তাঁহারা বলিবেন, আমরাও বাঙ্গলী, বাঙ্গলাদেশেরই মানুষ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থদেরে এমন হয় তাহা ত কখনো দেখি নাই! তা বটে। কিন্তু প্রত্যুভূতে শুধু ইহাই বলিতে পারি, আমিও এ দেশেরই মানুষ এবং একটির অধিক সুনন্দা এ দেশে আমারও চোখে পড়ে নাই। তত্রাচ ইহা সত্য।

রাজলক্ষ্মী ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি তাহাদের ভাঙ্গা প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া কোথায় একটু ছায়া আছে খোঁজ করিতেছি, একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছোকরা আসিয়া কঠিল, আসুন, ভেতরে আসুন।

তর্কালঙ্ঘারমশাই কোথায়? বিশ্রাম করচেন বোধ হয়?

আজ্ঞে না, তিনি হাটে গেছেন। মা আছেন, আসুন। বলিয়া সে অগ্রবর্তী হইল, এবং যথেষ্ট দ্বিধাভরেই আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। একদা কোনকালে হয়ত এ বাটীর সদর দরজা কোথাও ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত। অতএব ভূতপূর্ব একটা টেকিশালার পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় নিশ্চয়ই ইহার মর্যাদা লজ্যন করি নাই। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সুনন্দাকে দেখিলাম। উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে এই বাড়িটির মতই একেবারে আভরণবর্জিত। সম্মুখের অপরিসর বারান্দার একধারে মুড়ি ভাজিতেছিল,—বোধ হয় রাজলক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া,—

আমাকে জীর্ণ একখানি কম্বলের আসন পাতিয়া দিয়া নমস্কার করিল। কহিল,  
বসুন। ছেলেটিকে বলিল, অজয়, উনুনে আগুন আছে, একটু তামাক সেজে দাও  
বাবা। রাজলক্ষ্মী বিনা আসনে পূর্বে উপবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ  
সলঙ্গ হাস্যে কহিল, আপনাকে কিন্তু পান দিতে পারব না, পান আমাদের বাড়িতে  
নেই।

আমরা কে, অজয় বোধ হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সে তাহার  
গুরুপত্নীর কথায় সহসা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, নেই? তাহলে পান  
বুঝি আজ হঠাত ফুরিয়ে গেছে মা?

সুনন্দা তাহার মুখের দিকে একমুহূর্ত মুখ টিপিয়া চাহিয়া থাকিয়া, কহিল,  
ওটা হঠাত আজ ফুরিয়ে গেছে, না কেবল হঠাত একদিনই ছিল অজয়? এই বলিয়া  
সহসা খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, ও- রবিবারে ছেট  
মোহন্তোকুরের আসবার কথায় এক পয়সার পান কেনা হয়েছিল—সে প্রায় দিন  
দশকের কথা। এই! এতেই আমার অজয় একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছে, পান  
হঠাত ফুরাল কি করে? এই বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। অজয় মহা  
অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, বাঃ—এই বুঝি! তা বেশ ত, হলই বা ফুরোলই  
বা—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে সদয়কঠে কহিল, তা সত্যিই ত ভাই, ও পুরুষমানুষ,  
ও কি করে জানবে কি তোমার সংসারে ফুরিয়েছে!

অজয় একজনকেও তাহার অনুকূলে পাইয়া কহিতে লাগিল, দেখুন ত!  
দেখুন ত! অথচ মা ভাবেন—

সুনন্দা তেমনি সহাস্যে বলিল, হাঁ, মা ভাবেন বৈ কি! না দিদি, আমার  
অজয়ই হল বাড়ির গিন্নী—ও সব জানে। কেবল এখানে যে কোন কষ্ট আছে,  
মায় বাবুগিরি পর্যন্ত—এইটেই ও স্বীকার করতে পারে না।

কেন পারব না! বাঃ—বাবুগিরি কি ভাল! ও ত আমাদের—, বলিতে  
বলিতে কথাটা আর শেষ না করিয়াই সে বোধ করি আমার জন্য তামাক  
সাজিতেই বাহিরে প্রস্থান করিল।

সুনন্দা কহিল, বামুন-পঞ্চিতের ঘরে হত্তুকীই যথেষ্ট, খুঁজলে এক-আধটা  
সুপুরিও হয়ত পাওয়া যেতে পারে—আচ্ছা, আমি দেখচি,—এই বলিয়া সেও  
যাইবার উদ্যোগ করিতেই রাজলক্ষ্মী সহসা তাহার আঁচল ধরিয়া কহিল, হত্তুকী  
আমার সইবে না ভাই, সুপুরিতেও কাজ নেই। তুমি একটুখানি আমার কাছে স্থির  
হয়ে বোসো, দুটো কথা কই। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে  
পাশ্বে বসাইল।

আতিথ্যের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই নীরব  
রহিল। এই অবকাশে আমি আর—একবার নৃতন করিয়া সুনন্দাকে দেখিয়া  
লইলাম। প্রথমেই মনে হইল, বস্তুৎ: এই দারিদ্র জিনিসটা সংসারে কতই না  
অর্থহীন, একজন যদি তাহাকে স্বীকার না করে। এই যে আমাদের সাধারণ  
বাঙালী-ঘরের সামান্য একটি মেয়ে, বাহির হইতে যাহার কোন বিশেষত্ব নাই—  
না আছে রূপ, না আছে বস্ত্র-অলঙ্কার; এই ভগ্নগ্রহের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর,  
কেবল অভাব-অন্টনের ছায়া—কিন্তু তরুণ সে যে ওই ছায়ামাত্রই, তার বেশি  
কিছু নয়, সে কথাও যেন সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িতে বাকী থাকে না। অভাবের  
দৃঃখ্টাকে এই মেয়েটি কেবলমাত্র যেন চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দূরে  
রাখিয়াছে—জোর করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করে, এতবড় সাহস তাহার নাই।  
অথচ মাসকয়েক পূর্বেও ইহার সমস্তই ছিল—ঘরবাড়ি, লোকজন, আত্মীয়-বন্ধু—  
সচ্ছল সংসার, কোন বস্তুরই অভাব ছিল না—শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের  
ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে একখণ্ড জীর্ণবন্ধু  
ত্যাগ করার মত—মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ, কোথাও  
কোন অঙ্গে ইহার কঠোরতার কোন চিহ্ন নাই।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଠାତ୍ ଆମାକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା କହିଲ, ଆମି ଭେବେଛିଲୁମ ସୁନନ୍ଦାର  
ବୁଝି ବୟସ ହେଁଥେ । ଓ ହରି! ଏକେବାରେ ଛେଳେମାନୁଷ ।

ଅଜୟ ବୋଧ ହୟ ତାହାର ଗୁରୁଦେବେର ହଁକାତେଇ ତାମାକ ସାଜିଯା  
ଆନିତେଛିଲ; ସୁନନ୍ଦା ତାହାକେ ବଲିଲ, ଛେଳେମାନୁଷ କିରକମ! ଓଇ ଅତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛେଲେ  
ଯାର, ତାର ବୟସ ବୁଝି କମ! ଏଇ ବଲିଯା ସେ ହାସିତେ ଲାଗିଲ । ଚମର୍କାର ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ  
ସରଲ ହାସି । ଅଜୟ ନିଜେଇ ଉନ୍ନନ ହଇତେ ଆଗୁନ ଲହିବେ କି ନା ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯା  
ପରିହାସ କରିଯା କହିଲ, କି ଜାନି କି ଜାତେର ଛେଲେ ବାବା ତୁମି, କାଜ ନେଇ ତୋମାର  
ଉନ୍ନନ ଛୁଁଯେ । ଆସଲ କଥା, ଜୁଲାତ ଅଙ୍ଗାର ଚାଲ୍ଲୀ ହଇତେ ଉଠାନୋ ଶକ୍ତ ବଲିଯା ସେ ଆପଣି  
ଗିଯା ଆଗୁନ ତୁଲିଯା କଲିକାଟାର ଉପରେ ରାଖିଯା ଦିଯା ଅଜୟେର ହାତେ ଦିଲ, ଏବଂ  
ହାସିମୁଖେ ଫିରିଯା ଆସିଯା ସ୍ଵଦ୍ଵାନେ ଉପବେଶନ କରିଲ । ସାଧାରଣ ପଞ୍ଜୀରମଣି-ସୁଲଭ  
ହାସି-ତାମାଶା ହଇତେ ଆରଭ୍ର କରିଯା କଥାଯବାର୍ତ୍ତାଯ ଆଚରଣେ କୋନଖାନେ କୋନ  
ବିଶେଷତ୍ତ ଧରିବାର ଜୋ ନାଇ, ଅର୍ଥଚ, ଇତିମଧ୍ୟେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟଟୁକୁ ତାହାର  
ପାଇୟାଛି ତାହା କତହି ନା ଅସାମାନ୍ୟ! ଏଇ ଅସାଧାରଣତାର ହେତୁଟା ପରକ୍ଷଣେଇ  
ଆମାଦେର ଦୁ'ଜନେର କାହେଇ ପରିସ୍କୁଟ ହଇଯା ଉଠିଲ ।

ଅଜୟ ଆମାର ହାତେ ହଁକାଟା ଦିଯା ବଲିଲ, ମା ଓଟା ତାହଲେ ତୁଲେ ରେଖେ ଦି'?

ସୁନନ୍ଦା ଇଞ୍ଜିତେ ସାଯ ଦେଓଯାଯ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସରଣ କରିଯା ଦେଖିଲାମ,  
ଆମାରଇ ଅଦୂରେ ଏକଖଣ୍ଡ କାଠେର ପିଁଡ଼ାର ଉପର ମନ୍ତ ମୋଟା ଏକଟା ପୁଁଥି  
ଏଲୋମେଲୋଭାବେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଯା ଆଛେ । ଏତକ୍ଷଣ କେହି ଉହା ଦେଖେ ନାଇ । ଅଜୟ  
ତାହାର ପାତାଗୁଲି ଗୁଛାଇଯା ତୁଲିତେ ତୁଲିତେ କୁଣ୍ଡସ୍ଵରେ କହିଲ, ମା, 'ଉପତ୍ତି-  
ପ୍ରକରଣ'ଟା ତ ଆଜୋ ଶେ ହ'ଲ ନା, କବେ ଆର ହବେ! ଓ ଆର ହବେଇ ନା ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ଓଟା କିସେର ପୁଁଥି ଅଜୟ?

ଯୋଗବାଶିଷ୍ଟ ।

ତୋମାର ମା ମୁଡ଼ି ଭାଜଛିଲେନ ଆର ତୁମି ଶୋନାଛିଲେ?

ନା, ଆମି ମାର କାହେ ପଡ଼ି ।

অজয়ের এই সরল ও সংক্ষিপ্ত উত্তরে সুনন্দা হঠাতে যেন লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি কহিল, পড়াবার মত বিদ্যে ত ওর মায়ের ছাই আছে! না দিদি, দুপুরবেলা একলা সংসারে কাজ করি; উনি প্রায়ই থাকতে পারেন না, ছেলেরা বই নিয়ে কে যে কখন কি বকে যায় তার বারো আনা আমি শুনতেই পাই নে। ওর কি, যা হোক একটা বলে দিলে।

অজয় তাহার যোগবাশিষ্ঠ লইয়া প্রস্থান করিল। রাজলক্ষ্মী গম্ভীরমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মুহূর্তকয়েক পরে সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাড়িটা আমার কাছাকাছি হ'লে আমিও তোমার চেলা হয়ে যেতুম ভাই। একে ত জানিনে কিছুই, তাতে আহিক—পুজোর কথাগুলোও যদি ঠিকমত বলতে পারতুম! মন্ত্রোচ্চারণ সম্বন্ধে তাহার সন্দিগ্ধ আক্ষেপ আমি অনেক শুনিয়াছি—ওটা আমার অভ্যাস ছিল; কিন্তু সুনন্দা এই প্রথমে শুনিয়াও কোন কথা কহিল না, কেবল মুচকিয়া একটু হাসিল মাত্র। কি জানি সে কি মনে করিল। হয়ত ভাবিল, যে তাৎপর্য বুঝে না, প্রয়োগ জানে না, শুধু অর্থহীন আবৃত্তির পরিশুদ্ধতায় তার এত দৃষ্টি কেন? হয়ত বা ইহা তাহার কাছেও নৃতন নয়,—আমাদের সাধারণ বাঙালী-ঘরের মেয়েদের মুখে এম্বিনি সকরূপ লোভ ও মোহের কথা সে অনেক শুনিয়াছে, ইহার উত্তর দেওয়া বা প্রতিবাদ করাও আর প্রয়োজন মনে করে না। অথবা এ-সকল কিছু নাও হইতে পারে, কেবল স্বাভাবিক বিনয়বশেই মৌন হইয়া রহিল। তবুও এ কথাটা ত মনে না করিয়া পারিলাম না, সে যদি আজ তাহার এই অপরিচিত অতিথিটিকে নিতান্তই সাধারণ মেয়েদের সমান করিয়া, ছোট করিয়া দেখিয়া থাকে ত আবার একদিন তাহার অতিশয় অনুত্তাপের সহিত মত বদলাইবার প্রয়োজন হইবে।

রাজলক্ষ্মী চেখের পলকে আপনাকে সামলাইয়া লইল। আমি জানি কেহ হাঁ করিলে সে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে। আর সে মন্ত্রত্বের ধার দিয়াও গেল না। এবং একটু পরেই নিছক ঘরকম্বা ও গৃহস্থালীর কথা আরম্ভ করিয়া

দিল। তাহাদের মৃদুকঠোর সমস্ত আলোচনা আমার কানেও গেল না, কান দিবার চেষ্টাও করিলাম না। বরঞ্চ তর্কালঙ্ঘারের থেলো হঁকায় অজয়-দত্ত শুক্ষ সুকঠোর তামাকু প্রাণপণ করিয়া নিঃশেষ করিতে নিযুক্ত হইলাম।

এই দুটি রমণী অস্পষ্ট মৃদুস্বরে সংসারযাত্রা সম্বন্ধে কোন্ জটিল তত্ত্বের সমাধান করিতে লাগিল, সে তাহারাই জানে; কিন্তু তাহাদেরই অদূরে হঁকাহাতে নীরবে বসিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, আজ সহসা একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি।

আমাদের বিরুদ্ধে একটা বিশ্রী অভিযোগ আছে, মেয়েদের আমরা হীন করিয়া রাখিয়াছি। এই শক্ত কাজটা যে কেমন করিয়া করিয়াছি এবং কোথায় উহার প্রতিকার, একথা অনেকবার অনেক দিক দিয়া আমি ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আজ সুনন্দাকে ঠিক এমনি করিয়া নিজের চোখে না দেখিলে বোধ করি সংশয় চিরদিন রহিয়াই যাইত।

দেশে ও বিদেশে রকমারি স্ত্রী-স্বাধীনতা কর্তৃ না দেখিয়াছি। ইহার যে নমুনা বর্মামুলুকে পা দিয়াই চোখে পড়িয়াছিল তাহা ভুলিবার জো কি! জন-তিনেক ব্রহ্মসুন্দরী প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া একটা ষণ্মার্কা পুরুষকে আখপেটা করিতেছেন দেখিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত ও ঘর্মাঙ্গ-কলেবর হইয়া উঠিয়াছিলাম। অভয়া মুঞ্চচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিল, ‘শ্রীকান্তবাবু, আমাদের বাঙালী মেয়েরা যদি এমনি—’। আমার খুড়ামশাই একবার জন-দুই মারোয়াড়ী রমণীর নামে নালিশ করতে গিয়েছিলেন, তাহারা রেলগাড়িতে নাকি খুড়ার নাক ও কান প্রবল পরাক্রমে মলিয়া দিয়াছিল। শুনিয়া খুড়ীমা আমায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, আমাদের বাঙালীর ঘরে ঘরে যদি ওর চলন থাকত! থাকিলে আমার খুড়ামশাই নিশ্চয় ঘোরতর আপত্তি করিতেন, কিন্তু ইহাতেই যে নারীজাতির হীন অবস্থার প্রতিবিধান হইত, তাহাও ত অসংশয়ে বলা যায় না। ইহাই যে কোথায় এবং কিরূপে হয়, সুনন্দার ভগ্নগৃহের ছিন্ন আসনখানিতে বসিয়া

আজ নিঃশব্দে এবং নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিলাম। কেবল একটা ‘আসুন’ বলিয়া অভ্যর্থনা করা ছাড়া সে আমার সহিত দ্বিতীয় বাক্যালাপ করে নাই, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গেও যে কোন বড় কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাও নয়, কিন্তু সেই যে অজয়ের মিথ্যা আড়ম্বরের প্রত্যন্তে হাসিমুখে জানাইয়াছিলে, এ বাড়িতে পান নাই; কিনিবার মত সামর্থ্য নাই,—এখানে উহা দুর্ভ বস্ত! তাহার সকল কথার মাঝে এই কথাটা যেন আমার কানে বাজিতেই ছিল। তাহার সঙ্কোচলেশহীন এইটুকু পরিহাসে দারিদ্র্যের সমস্ত লজ্জা কোথায় যে লজ্জায় মুখ লুকাইল, সারাক্ষণের মধ্যে আর তাহার দেখাই মিলিল না। এক মুহূর্তেই জানা গেল এই ভাঙা বাড়ি, এই জীর্ণ গৃহসজ্জা, এই দুঃখ দৈন্য অনটন—এই নিরাভরণ মেয়েটি তাহাদের অনেক উপরে। অধ্যাপক পিতা দিবার মধ্যে তাঁহার কন্যাকে তাঁহার অশেষ যত্নে ধর্ম ও বিদ্যাদান করিয়া শুশ্রুকুলে পাঠাইয়াছিলেন; তৎপরে সে জুতা-মোজা পরিবে কি ঘোমটা খুলিয়া পথে বেড়াইবে, কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে স্বামী-পুত্র লইয়া ভাঙা বাড়িতে বাস করিবে, তথায় মুড়ি ভাজিবে, কি যোগবাশিষ্ঠ পড়াইবে, সে চিন্তা নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। মেয়েদের আমরা হীন করিয়াছি কি না এ তর্ক নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এই দিক দিয়া যদি তাহাদের বঞ্চিত করিয়া থাকি ত সে কর্মের ফলভোগ অনিবার্য। অজয়ের ‘উৎপত্তি প্রকরণ’ উঠিয়া না পড়িলে সুনন্দার লেখাপড়ার কথা আমরা জানিতেও পারিতাম না। তাহার মুড়িভাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সরল ও সামান্য হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়া যোগবাশিষ্ঠের ঝাঁঁজ কোথাও উঁকি মারে নাই।

অথচ স্বামীর অবর্তমানে অপরিচিত অতিথির অভ্যর্থনা করিতেও তাহার কোনখানে বাধিল না। নির্জন গৃহের মধ্যে একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলের সে এতই সহজে ও অবলীলাক্রমে মা হইয়া গিয়াছে যে, শাসন ও সংশয়ের দড়িদড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিবার কল্পনাও বোধ করি কোনদিন তাহার স্বামীর মনে

উঠে নাই। অথচ ইহারই প্রহরা দিতে ঘরে ঘরে কত প্রহরীই না সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে!

তর্কালঙ্কার মহাশয় ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া হাটে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এদিকে বেলাও পড়িয়া আসিতেছিল। এই দরিদ্র গৃহলঙ্কার কত কাজই না পড়িয়া আছে মনে করিয়া রাজলঙ্কী উঠিয়া পড়িল এবং বিদায় লইয়া কহিল, আজ চললুম, যদি বিরক্ত না হও ত আবার আসব।

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমারও কথা কইবার লোক কেউ নেই, যদি অভয় দেন ত মাঝে মাঝে আসব।

সুনন্দা মুখে কিছু কহিল না, কিন্তু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

পথে আসিতে আসিতে রাজলঙ্কী কহিল, মেয়েটি চমৎকার। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী।

ভগবান এদের বেশ মিলিয়েছেন।

আমি কহিলাম, হাঁ।

রাজলঙ্কী কহিল, এদের ও-বাড়ির কথাটা আজ আর তুললুম না। কুশারীমহাশয়কে আজও ভাল চিনতে পারিনি, কিন্তু এরা দুটি জাই বড় চমৎকার।

বলিলাম, খুব সম্ভব তাই; কিন্তু তোমার ত মানুষ বশ করবার অঙ্গুত ক্ষমতা, দেখ না চেষ্টা করে যদি এদের আবার মিল করে দিতে পার।

রাজলঙ্কী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু তোমাকে বশ করাটা তার প্রমাণ নয়। চেষ্টা করলে ওটা অনেকেই পারত।

বলিলাম, হতেও পারে। তবে চেষ্টার যখন সুযোগ ঘটেনি তখন তর্ক করায় ফল হবে না।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତେମନି ହାସିଯା କହିଲ, ଆଚ୍ଛା ଗୋ ଆଚ୍ଛା । ଦିନ ଏରାଇ ମଧ୍ୟେ  
ଫୁରିଯେ ଗେଛେ ଭେବେ ରେଖୋ ନା ।

ଆଜ ସାରାଦିନଟାଇ କେମନ ଏକଟା ମେଘଲାଟେଗୋଛେର କରିଯାଛିଲ । ଅପରାହ୍ନ-  
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବେଇ ଏକଖଣ୍ଡ କାଳୋ ମେଘେର ଆଡ଼ାଲେ ଢାକା ପଡ଼ାଯ ଆମାଦେର ସାମନେର  
ଆକାଶଟା ରାଙ୍ଗା ହଇଯା ଉଠିଯାଛିଲ । ତାହାରଇ ଗୋଲାପୀ ଛାଯା ସମ୍ମୁଖେର କଠିନ ଧୂସର  
ମାଠେ ଓ ଇହାରଇ ଏକାନ୍ତବତ୍ତୀ ଏକବାଡ଼ ବାଁଶ ଓ ଗୋଟା-ଦୁଇ ତେଁତୁଳଗାଛେ ଯେନ ସୋନା  
ମାଖାଇଯା ଦିଯାଛିଲ । ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶେଷ ଅନୁଯୋଗେର ଜବାବ ଦିଲାମ ନା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେର  
ମନଟା ଯେନ ବାହିରେର ଦଶଦିକେର ମତଇ ରାଙ୍ଗିଯା ଉଠିଲ । ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକବାର ତାହାର  
ମୁଖେର ପ୍ରତି ଚାହିୟା ଦେଖିଲାମ, ଓଷ୍ଠାଧରେ ହାସି ତଥନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଲାଯ ନାଇ, ବିଗଲିତ  
ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଯ ଏହି ଏକାନ୍ତ ପରିଚିତ ହାସିମୁଖଖାନି ଏକେବାରେ ଯେନ ଅପୂର୍ବ ମନେ ହଇଲ ।  
ହ୍ୟତ ଏ କେବଳ ଆକାଶେର ରଙ୍ଗଇ ନୟ; ହ୍ୟତ ଯେ ଆଲୋ ଆର ଏକ ନାରୀର କାଛ  
ହିତେ ଏହିମାତ୍ର ଆମି ଆହରଣ କରିଯା ଆନିଯାଛିଲାମ, ତାହାରଇ ଅପରାହ୍ନ ଦୀପି  
ଇହାରା ଅନ୍ତରେ ଖେଲିଯା ବେଡ଼ାଇତେଛିଲ । ପଥେ ଆମରା ଛାଡ଼ା ଆର କେହ ଛିଲ ନା ।  
ମେ ସୁମୁଖେ ଆଙ୍ଗୁଳ ବାଡ଼ାଇଯା କହିଲ, ତୋମାର ଛାଯା ପଡ଼େନି କେନ ବଲ ତ? ଚାହିୟା  
ଦେଖିଲାମ ଅଦୂରେ ଡାନ ଦିକେ ଆମାଦେର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛାଯା ଏକ ହଇଯା ମିଲିଯାଛେ ।  
କହିଲାମ, ବଞ୍ଚି ଥାକଲେ ଛାଯା ପଡ଼େ—ବୋଧ ହ୍ୟ ଓଟା ଆର ନେଇ ।

ଆଗେ ଛିଲ?

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଦେଖିନି, ଠିକ ମନେ ପଡ଼ଚେ ନା ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସିଯା ବଲିଲ, ଆମାର ପଡ଼ଚେ—ଛିଲ ନା । ଏତୁକୁ ବୟସ ଥେକେ  
ଓଟା ଦେଖିତେ ଶିଖେଛିଲାମ । ଏହି ବଲିଯା ମେ ଏକଟା ପରିତୃପ୍ତିର ନିଃଶ୍ଵାସ ଫେଲିଯା  
କହିଲ, ଆଜକେର ଦିନଟା ଆମାର ବଡ଼ ଭାଲ ଲେଗେଚେ । ମନେ ହଚେ ଏତଦିନ ପରେ  
ଏକଟି ସଙ୍ଗୀ ପେଲାମ । ଏହି ବଲିଯା ମେ ଆମାର ପ୍ରତି ଚାହିଲ । ଆମି କିଛୁ କହିଲାମ  
ନା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ନିଶ୍ଚଯ ବୁଝିଲାମ, ମେ ଠିକ ସତ୍ୟ କଥାଟାଇ କହିଯାଛେ ।

বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু ধূলা-পা ধুইবার অবকাশ মিলিল না, শান্তি ও তৃষ্ণি দুই-ই একই সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। দেখি, বাহিরের উঠান ভরিয়া জন দশ-পনর লোক বসিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সমস্তমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রতন বোধ হয় এতক্ষণ বক্তৃতা করিতেছিল, তাহার মুখ উত্তেজনা ও নিগৃত আনন্দে চক্রচক্র করিতেছে; কাছে আসিয়া কহিল, মা, বার বার যা বলেছি ঠিক তাই হয়েচে।

রাজলক্ষ্মী অধীরভাবে কহিল, কি বলেছিলি আমার মনে নেই, আর একবার বল্।

রতন কহিল, নবনেকে পুলিশের লোক হাতকড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেছে।

বেঁধে নিয়ে গেছে! কখন? কি করেছিল সে?

মালতীকে সে একেবারে খুন করে ফেলেচে।

বলিস কি রে! তাহার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না না, মাঠাকরুন, একেবারে খুন করেনি। খুব মেরেচে বটে, কিন্তু মেরে ফেলেনি।

রতন চোখ রাঙাইয়া কহিল, তোরা কি জানিস? তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গেল কোথা? তোদের সুন্দ হাতে দড়ি পড়তে পারে জানিস?

শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইল। কেহ কেহ সরিবার চেষ্টাও করিল। রাজলক্ষ্মী রতনের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তুই ওধারে দাঁড়া গে যা। যখন জিজ্ঞেস করব বলিস। ভিড়ের মধ্যে মালতীর বুড়া বাপ পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা সবাই তাহাকে চিনিতাম, ইঙিতে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েচে সত্যি বল ত বিশ্বনাথ! লুকালে কিংবা মিছে কথা কইলে বিপদে পড়তে পার।

বিশ্বনাথ যাহা কহিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কাল রাত্রি হইতে মালতী তাহার পিতার বাটীতে ছিল। আজ দুপুরবেলা সে পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহার স্বামী নবীন কোথায় লুকাইয়া ছিল, একাকী পাইয়া বিষম প্রহার করিয়াছে—এমন কি মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথমে এখানে আসে, কিন্তু আমাদের দেখা না পাইয়া কুশারীমহাশয়ের সন্ধানে কাছারি বাটীতে যায়, সেখানে তাঁহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া সোজা থানায় গিয়া সমস্ত মারধরের চিহ্ন দেখাইয়া পুলিশ সঙ্গে করিয়া আনিয়া নবীনকে ধরাইয়া দেয়। সে তখন ঘরেই ছিল, নিজের হাতে দুটো চাল সিদ্ধ করিয়া খাইতে বসিতেছিল, সুতরাং পলাইবার সুযোগ পায় নাই। দারোগাবাবু লাঠি মারিয়া ভাত ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছেন।

ব্যাপার শুনিয়া রাজলক্ষ্মী অশ্বিমূর্তি হইয়া উঠিল। সে মালতীকে যেমন দেখিতে পারিত না, নবীনের প্রতিও তেমনি প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত রাগ পড়িল গিয়া আমার উপরে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, তোমাকে এক 'শ' বার বলেচি, ছোটলোকদের এসব নোংরা কাণ্ডের মধ্যে তুমি যেয়ো না।

যাও এখন সামলাও গে—আমি কিছু জানিনে। এই বলিয়া সে আর কোনদিকে দ্রুক্ষণ না করিয়া দ্রুতপদে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, নব্নের ফাঁসি হওয়াই উচিত। আর ও হারামজাদী যদি মরে থাকে ত আপদ গেছে।

কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমরা সবাই যেন আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। বকুনি খাইয়া মনে হইতে লাগিল কাল এমনি সময়ে মধ্যস্থ হইয়া ইহাদের যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা ভাল হয় নাই। না করিলে এ দুর্ঘটনা হয়ত আজ ঘটিত না। কিন্তু আমার মতলব ভাল ছিল। ভাবিয়াছিলাম, প্রেমলীলার যে অদৃশ্য চাপা-দ্রোতটা অন্তরালে বহিয়া সমস্ত পাড়াটাকে নিরন্তর ঘুলাইয়া তুলিতেছে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে হয়ত ভাল হইবে। দেখিতেছি ভুল করিয়াছি। কিন্তু তার পূর্বে

সমস্ত ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলা প্রয়োজন। মালতী নবীন ডোমের স্ত্রী বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া পর্যন্ত দেখিতেছি, সমস্ত ডোমপাড়ার মধ্যে সে একটা অনিষ্টুলিঙ্গ-বিশেষ। কখন কোন্ পরিবারের মাঝে সে যে অন্ধিকাণ্ড বাধাইয়া দিবে, এ লইয়া কোন মেয়ের মনেই শান্তি নাই। এই যুবতী মেয়েটা যেমন সুন্দরী তেমনি চপল। সে কাঁচপোকার টিপ পরে, নেবুর তেল মাখিয়া চুল বাঁধে, পরনে তার মিলের চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি, তাহার মাথার ঘোমটা পথেঘাটে ঘাড়ে নামিয়া পড়িবার কোন বাধা নাই। এই মুখরা মেয়েটাকে মুখের সামনে বলিবার কাহারো সাহস নাই, কিন্তু অগোচরে তাহার নামের সঙ্গে যে বিশেষণ পাড়ার মেয়েরা যোগ করিয়া দেয়, তাহা লেখা চলে না। প্রথমে নাকি মালতী নবীনের ঘর করিতে চাহে নাই, বাপের বাড়িতেই থাকিত। বলিত, ও আমাকে খাওয়াবে কি? এবং সেই ধিক্কারেই নাকি নবীন দেশত্যাগী হইয়া কোথায় কোন শহরে গিয়া পিয়াদাগিরি চাকরি করিয়া বছরখানেক হইল গ্রামে ফিরিয়াছে। আসিবার সময় মালতীর রূপার পৈঁচা, মিহি সুতার শাড়ি, রেশমের ফিতা, এক বোতল গোলাপজল এবং একটা টিনের তোরঙ সঙ্গে আনিয়াছে এবং এইগুলির পরিবর্তে স্ত্রীকে শুধু ঘরে আনা নয়, তাহার হৃদয় পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু এ সকল আমার শোনা কথা। আবার কবে হইতে যে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ জাগিল, ঘাটে যাবার পথে আড়ি পাতিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, এবং অতঃপর যাহা শুরু হইয়া গেল, আমি ঠিক জানি না। আমরা ত আসিয়া অবধি দেখিতেছি, ইহাদের বাক্ ও হাত-যুদ্ধ কোনদিন কামাই যায় না। মাথা ফাটাফাটি কেবল আজ নয়, আরও দিন-দুই হইয়া গেছে—বোধ করি, এই জন্যও আজ নবীন মোড়ুল স্ত্রীর মাথা ভাসিয়া আসিয়াও নিশ্চিন্তচিত্তে আহারে বসিতেছিল, কল্পনাও করে নাই পুলিশ ডাকিয়া মালতী তাহাকে বাঁধিয়া চালান দিবে। কাল সকালে প্রভাতী রাগিণীর ন্যায় মালতীর তৌক্ষকগঠ যখন গগন ভেদ করিয়া উঠিল, রাজলক্ষ্মী ঘরের কাজ ফেলিয়া

কাছে আসিয়া কহিল, বাড়ির পাশে রোজ এ হঙ্গমা সহ্য হয় না—নাহয় কিছু টাকাকড়ি দিয়ে হতভাগীকে তুমি দূর করে দাও।

বলিলাম, নবীনটাও কম পাজী নয়। কাজকর্ম করবে না, কেবল টেরি কেটে আর মাছ ধরে বেড়াবে, আর হাতে পয়সা পেলেই তাড়ি খেয়ে মারপিট শুরু করবে। বলা বাহ্যিক, এ-সকল সে শহরে শিখিয়া আসিয়াছিল।

দুই-ই সমান! বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, কাজকর্ম করবেই বা কখন? হারামজাদী তার সময় দিলে ত!

বস্তুতঃ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের গালিগালাজ ও মারামারির মকদ্দমা আরও বার-দুই করিয়াছি—কোন ফল হয় নাই। আজ ভাবিলাম খাওয়া-দাওয়ার পরে ডাকাইয়া আনিয়া এইবার শেষ মীমাংসা করিয়া দিব। কিন্তু ডাকিতে হইল না, দুপুরবেলা পাড়ার মেয়ে-পুরুষে বাড়ি ভরিয়া গেল। নবীন কহিল, বাবুমশায়, ওকে আর আমি চাইনে—নষ্ট মেয়েমানুষ। ও আমার ঘর থেকে দূর হয়ে যাক।

মুখরা মালতী ঘোমটার ভিতর হইতে কহিল, ও আমার শাঁখা-নোয়া খুলে দিক।

নবীন বলিল, তুই আমার রূপোর পৈঁচে ফিরিয়ে দে।

মালতী তৎক্ষণাত হাত হইতে সে-দুইগাছা টানিয়া খুলিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল।

নবীন কুড়াইয়া লইয়া কহিল, আমার টিনের তোরঙ তুই নিতে পাবিনে।

মালতী কঢ়িল, আমি চাইনে। এই বলিয়া সে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া তাহার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিল।

নবীন তখন বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া মালতীর শাঁখা পটপট করিয়া ভাঙিয়া দিল এবং নোয়াগাছটা টানিয়া খুলিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, যা, তোকে বিধবা করে দিলাম।

আমি ত অবাক হইয়া গেলাম। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তখন বুবাইয়া বলিল  
যে, এরূপ না হইলে মালতীর নিকা করা আর হইত না—সমস্তই ঠিকঠাক আছে।

কথায় কথায় ব্যাপারটা আরও বিশদ হইল। বিশেষেরের বড়জামায়ের  
ভাই আজ ছয় মাস ধরিয়া হাঁটাহাঁটি করিতেছে। তাহার অবস্থা ভাল, বিশেষে সে  
কুড়ি টাকা নগদ দিবে, এবং মালতীকে পায়ে মল, হাতে রংপোর চুড়ি এবং নাকে  
সোনার নথ দিবে বলিয়াছে, এমন কি এগুলি সে বিশেষ কাছে জমা রাখিয়া পর্যন্ত  
দিয়াছে।

শুনিয়া সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল। কিছুদিন হইতে যে একটা  
কদর্য ঘড়্যন্ত চলিতেছিল, তাহা নিঃসন্দেহ, এবং না জানিয়া হয়ত আমি তাহার  
সাহায্যই করিলাম। নবীন কহিল, আমি ত এই চাই। শহরে গিয়ে এবার মজা  
করে চাকরি করব—তোর মত অমন দশগঙ্গা বিয়ে করব। রাঙামাটির হরি মোড়ল  
ত তার মেয়ের জন্য সাধাসাধি করচে, তার পায়ের নোখেও তুই লাগিস নে। এই  
বলিয়া সে তাহার রূপার পৈঁচা ও তোরঙ্গের চাবি ট্যাঁকে গুঁজিয়া চলিয়া গেল। এই  
আক্ষালন সত্ত্বেও কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহার শহরের  
চাকরি কিংবা হরি মোড়লের মেয়ে কোনটার আশাই তাহার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল  
করিয়া ধরিয়াছে।

রতন আসিয়া কহিল, বাবু, মা বলচেন এ-সব নোংরা কাণ্ড বাড়ি থেকে  
বিদায় করুন।

আমাকে করিতে কিছু হইল না, বিশেষের মোড়ল তাহার মেয়েকে লইয়া  
উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু পাছে আমার পায়ের ধুলো লইতে আসে, এই ভয়ে  
তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ভাবিবার চেষ্টা করিলাম, যাক, যা হইল তা ভালই  
হইল। মন যখন ভাঙিয়াছে এবং উপায় যখন আছে, তখন ব্যর্থ আক্রোশে নিত্য-  
নিয়ত মারামারি কাটাকাটি করিয়া ঘর করার চেয়ে এ ভাল।

কিন্তু আজ সুনন্দার বাটী হইতে ফিরিয়া শুনিলাম, গত কল্যকার নিষ্পত্তি অমন নিছক ভালই হয় নাই। সদ্যবিধিবা মালতীর উপর নবীন স্বামীত্বের দাবি-দাওয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেও মারপিটের অধিকার ছাড়ে নাই। সে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় গিয়া হয়ত সমস্ত সকালটা লুকাইয়া অপেক্ষা করিয়াছে এবং এক সময়ে একাকী পাইয়া বিষম কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মেয়েটাই বা গেল কোথায়?

সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিমের জানালা দিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, খুব সন্তুষ্ট মালতী পুলিশের ভয়ে কোথায় লুকাইয়া আছে, কিন্তু নবীনকে সে যে ধরাইয়া দিয়াছে, ভালই করিয়াছে। হতভাগার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে—মেয়েটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

রাজলক্ষ্মী সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে ঘরে ঢুকিয়া ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। নীরবে বাহির হইয়া পাশের ঘরের চৌকাঠে পা দিয়াই কিন্তু কি একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া দেখি মস্ত একটা কাপড়ের পুঁটুলি দুই হাত বাড়াইয়া তাহার পা ধরিয়া তাহারি উপর মাথা খুঁড়িতেছে। রাজলক্ষ্মীর হাতের প্রদীপটা পাড়িয়া গেলেও জ্বলিতেছিল, তুলিয়া ধরিতেই সেই মিহি সূতার চওড়া কালাপেড়ে শাড়ি চোখে পড়িল!

বলিলাম, এ মালতী!

রাজলক্ষ্মী কহিল, হতভাগী, সন্ধ্যাবেলায় আমায় ছুঁলি? ইস্ম! এ কি বল্ত?

প্রদীপের আলোকে ঠাহর করিয়া দেখিলাম, তাহার মাথার ক্ষত হইতে পুনরায় রক্ত ঝরিয়া অপরের পা দুখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই হতভাগিনীর কান্না যেন শতধারে ফাটিয়া পড়িল; কহিল, মা, আমাকে বাঁচাও—

রাজলক্ষ্মী কটুকষ্টে কহিল, কেন, তোর আবার হ'ল কি?

সে কাঁদিয়া কহিল, দারোগা বলচে কাল সকালেই তাকে চালান দেবে—  
দিলেই পাঁচ বছরের জেল হয়ে যাবে।

আমি কহিলাম, যেমন কর্ম তেমনি শান্তি হওয়া ত চাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হ'লই বা জেল, তাতে তোর কি?

মেয়েটার কান্না যেন দমকা ঝড়ের মত তাহার বুক ফাটিয়া উঠিল; বলিল,  
বাবু বলেন বলুন, মা, ও-কথা তুমি ব'লো না—তার মুখের ভাত আমি খেতে  
দিইনি। বলিতে বলিতে সে আবার মাথা কুটিতে লাগিল; কহিল, মা, আমাদের  
তুমি এইবারটি বাঁচিয়ে দাও, আমরা বিদেশে কোথাও চলে গিয়ে ভিক্ষে করে  
খাব। নইলে তোমার পুরুরে গিয়ে ডুব দিয়ে মরব।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর দুই চোখ দিয়া বড় বড় জলের ফেঁটা গড়াইয়া পড়িল;  
ধীরে ধীরে তাহার একরাশ এলোচুলের উপর হাত রাখিয়া রূদ্ধস্বরে কহিল, আচ্ছা  
আচ্ছা, তুই চুপ কর—আমি দেখচি।

দেখিতেও হইল। রাজলক্ষ্মীর বাক্স হইতে শ'-দুই টাকা সেই রাত্রেই  
কোথায় গিয়া অন্তর্হিত হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু নবীন মোড়ল  
কিংবা মালতী কাহাকেও সকাল হইতে গঙ্গামাটিতে দেখিত পাওয়া গেল না।

## ନୟ

ତାହାଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସବାଇ ଭାବିଲ, ଯାକ, ବାଁଚା ଗେଲ! ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ତୁଚ୍ଛ କଥାଯ ମନ ଦିବାର ସମୟ ଛିଲ ନା; ସେ ଉହାଦେର ଦୁଇ-ଚାରିଦିନେଇ ବିଶ୍ଵତ ହଇଲ; ମନେ ପଡ଼ିଲେଓ କି ଯେ ମନେ କରିତ ସେଇ ଜାନେ । ତବେ, ପାଡ଼ା ହିତେ ଯେ ଏକଟା ପାପ ବିଦାୟ ହଇଯାଛେ ତାହା ଅନେକେଇ ଭାବିତ । କେବଳ ରତନ ଖୁଶି ହଇଲ ନା । ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମହାଜେ ମନେର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମୁଖ ଦେଖିଯା ମନେ ହଇତ ଜିନିସଟା ସେ ଏକେବାରେଇ ପଢ଼ନ କରେ ନାଇ । ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ହଇବାର, କର୍ତ୍ତ୍ଵ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଗେଲ, ଘରେର ଟାକା ଗେଲ—ଏତସବଡ଼ ଏକଟା ସମାରୋହ କାଣ୍ଡ ରାତାରାତି କୋଥା ଦିଯା କେମନ କରିଯା ବିଲୁଷ୍ଟ ହଇଯା ଗେଲ—ସବସୁନ୍ଦର ଜଡ଼ାଇଯା ସେ ଯେନ ନିଜେକେଇ ଅପମାନିତ, ଏମନ କି ଆହତ ଜ୍ଞାନ କରିଲ । ତଥାପି ସେ ଚୁପ କରିଯାଇ ରହିଲ । ଆର ବାଟିର ଯିନି କଣ୍ଠୀ, ତାଙ୍କର ତ କୋନଦିକେ ଖେଳମାତ୍ର ନାଇ । ଯତ ଦିନ କାଟିତେ ଲାଗିଲ ସୁନନ୍ଦା ଓ ତାହାର କାହିଁ ହିତେ ମନ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ଵର ଉଚ୍ଚାରଣଶୁଦ୍ଧିର ଲୋଭ ତାହାକେ ଯେନ ପାଇଯା ବସିତେ ଲାଗିଲ । କୋନଦିନ ତଥାଯ ଯାଓଯାର ତାହାର ବିରାମ ଛିଲ ନା । ସେଥାନେ ସେ କି ପରିମାଣେ ଯେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିତେଛିଲ ତାହା ଆମି ଜାନିବ କି କରିଯା? ଆମି କେବଳ ଜାନିତେଛିଲାମ ତାହାର ପରିବର୍ତନ । ତାହା ଯେମନ ଦ୍ରୁତ, ତେମନି ଅଭାବିତ । ଦିନେର ବେଳାଯ ଆହାରଟା ଆମାର ଚିରକାଳ ଏକଟୁ ବେଳାତେଇ ସାଙ୍ଗ ହଇତ । ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାବର ଆପନି କରିଯାଇ ଆସିଯାଛେ, ଅନୁମୋଦନ କଥନେ କରେ ନାଇ—ସେ ଠିକ; କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରତ୍ତି ସଂଶୋଧନେର ଜନ୍ୟ କଥନେ ଆମାକେ ଲେଶମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିତେବେଳେ ହେଲା ନାଇ । କିନ୍ତୁ ଆଜକାଳ ଦୈବାଂ କୋନଦିନ ଅଧିକ ବେଳା ହଇଯା ଗେଲେ ମନେ ମନେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରି । ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିତ, ତୁମି ରୋଗମାନୁସ, ତୋମାର ଏତ ଦେଇ କରା କେନ? ନିଜେର ଶରୀରେର ପାନେ ନା ଚାଓ, ଦାସୀ-ଚାକରଦେର ମୁଖେର ଦିକେ ତ ଚାଇତେ ହେଲା । ତୋମାର କୁଁଡ଼େମିତେ ତାରା ଯେ ମାରା ଯାଯ । କଥାଗୁଲୋ ଠିକ ସେଇ

আগেকার ত্বুও ঠিক তা নয়। সেই সম্মেহ প্রশ্নের সুর যেন আর বাজে না—  
বাজে বিরক্তির এমন একটা কুশাগ্র সূক্ষ্ম কটুতা যাহা চাকর-দাসী কেন, হয়ত  
আমি ছাড়া ভগবানের কানেও তাহার নিগৃঢ় রেশটুকু ধরা পড়ে না। তাই ক্ষুধার  
উদ্বেক না হইলেও দাসী-চাকরদের মুখ চাহিয়া তাড়াতাড়ি কোনমতে স্নানাহারটা  
সারিয়া লইয়া তাহাদের ছুটি করিয়া দিতাম। কিন্তু এই অনুগ্রহের প্রতি চাকর-  
দাসী যাহারা, তাহাদের আগ্রহ ছিল কি উপেক্ষা ছিল, সে তাহারাই জানে; কিন্তু  
রাজলক্ষ্মী দেখিতাম ইহার মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া  
যাইতেছে। কোনদিন রতন, কোনদিন বা দরোয়ান সঙ্গে যাইত, কোনদিন বা  
দেখিতাম সে একাই চলিয়াছে, ইহাদের কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবার সময়  
পর্যন্ত হয় নাই। প্রথমে দুই-চারি দিন আমাকে সঙ্গে যাইতে সাধিয়াছিল। কিন্তু  
ওই দুই-চারি দিনেই বুঝা গেল, কোন পক্ষ হইতেই তাহাতে সুবিধা হইবে না।  
হইলও না। অতএব আমি আমার নিরালা ঘরে পুরাতন আলস্যের মধ্যে এবং সে  
তাহার ধর্মকর্ম ও মন্ত্রতন্ত্রের নবীন উদ্দীপনার মধ্যে নিমগ্ন থাকায় ক্রমশঃই উভয়ে  
যেন পৃথক হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার খোলা জানালা দিয়া দেখিতে  
পাইতাম, সে রৌদ্রতন্ত্র শুক্ষ মাঠের পথ দিয়া দ্রুত পদক্ষেপে মাঠ পার হইয়া  
যাইতেছে। একাকী সমস্ত দুপুরবেলাটা যে আমার কি করিয়া কাটে, এদিকে  
খেয়াল করিবার সময় তাহার ছিল না—সে আমি বুঝিতাম।

ত্বুও যতদূর পর্যন্ত তাহাকে চোখ দিয়া অনুসরণ করা যায়, না করিয়া  
পারিতাম না। পায়েহাঁটা আঁকাবাঁকা পথের উপর তাহার বিলীয়মান দেহলতা ধীরে  
ধীরে দূরান্তরালে কোন্ এক সময়ে তিরোহিত হইয়া যাইত—অনেকদিন সেই  
সময়টুকুও যেন চোখে আমার ধরা পড়িত না; মনে হইত ওই একান্ত সুপরিচিত  
চলনখানি যেন তখনও শেষ হয় নাই—সে যেন চলিয়াই চলিয়াছে। হঠাৎ চেতনা  
হইত। হয়ত চোখ মুছিয়া আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া তার পরে  
বিছানায় শুইয়া পড়িতাম। কর্মহীনতার দুঃসহ ক্লান্তিবশতঃ হয়ত বা কোনদিন

ঘুমাইয়া পড়িতাম—নয়ত নিমীলিত চক্ষে নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিতাম। অদূরবর্তী কয়েকটা খর্বাকৃতি বাবলাগাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত, এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন্ একটা বাঁশঝাড় এমনি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে, মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বুঝি-বা আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে। ভয় হইত, এমন বুঝি বা আর বেশিদিন সহিতে পারিব না। রতন বাড়ি থাকিলে মাঝে মাঝে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে বলিত, বাবু, একবার তামাক দেব কি? এমন কতদিন হইয়াছে, জাগিয়াও সাড়া দিই নাই, ঘুমানোর ভান করিয়াছি; ভয় হইয়াছে, পাছে সে আমার মুখের উপর বেদনার ঘুণাগ্র আভাসও দেখিতে পায়। প্রতিদিনের মত সেদিনও দুপুরবেলায় রাজলক্ষ্মী সুনন্দার বাটীতে চলিয়া গেলে সহসা আমার বর্মার কথা মনে পড়িয়া বগুকালের পরে অভয়কে একখানা চিঠি লিখিতে বসিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, যে ফার্মে কাজ করিতাম, তাহার বড়সাহেবকেও একখানা পত্ৰ লিখিয়া খবর লইব। কি খবর লইব, কেন লইব, লইয়া কি হইবে, এত কথা তখনও ভাবি নাই। সহসা মনে হইল জানালার সুমুখ দিয়া যে রমণী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ত্বরিতপদে সরিয়া গেল, সে যেন চেনা—সে যেন মালতীর মত। উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখা গেল না। সেই মুহূর্তেই তাহার আঁচলের রাঙ্গা পাড়টুকু আমাদের প্রাচীরের কোণটায় অন্তর্হিত হইল।

মাসখানেকের ব্যবধানে ডোমদের সেই শয়তান মেয়েটাকে সবাই একপ্রকার ভুলিয়াছে, আমিই কেবল তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। জানি না কেন, আমার মনের একটা কোণে ওই উচ্ছ্বেষ্য মেয়েটার সেই সন্ধ্যাবেলাকার চোখের জলের এক ফোঁটা ভিজা দাগ তখনও পর্যন্তও মিলায় নাই। প্রায়ই মনে হইত, কি জানি কোথায় তাহারা আছে। জানিতে সাধ হইত, এই গঙ্গামাটির অসৎ প্রলোভন ও কৃৎসিত ষড়যন্ত্রের বেষ্টনের বাহিরে মেয়েটার স্বামীর কাছে থাকিয়া

কিভাবে দিন কাটিতেছে! ইচ্ছা করিতাম, এখানে তাহারা আর যেন শীত্র না আসে। ফিরিয়া গিয়া চিঠিটা শেষ করিতে বসিলাম। ছত্রকয়েক লেখার পরেই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, রতন। তাহার হাতে সাজা কলিকা, গুড়গুড়ির মাথায় বসাইয়া দিয়া নলটি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, বাবু, তামাক খান।

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, আচ্ছা।

রতন কিন্তু তৎক্ষণাত গেল না। নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরম গাঞ্জীরের সহিত কহিল, বাবু, এই রতন পরামাণিক যে কবে মরবে তাই কেবল সে জানে না!

তাহার ভূমিকার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল; রাজলক্ষ্মী হইলে বলিত, জানলে লাভ ছিল, কিন্তু কি বলতে এসেচিস বল। আমি কিন্তু শুধু মুখ তুলিয়া হাসিলাম। রতনের গাঞ্জীরের পরিমাণ তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না; কহিল, মাকে সেদিন বলেছিলাম কিনা ছোটলোকের কথায় মজবেন না! তাদের চোখের জলে ভুলে দু'দু'শ টাকা জলে দেবেন না; বলুন, বলেছিলাম কি না! আমি জানি, সে বলে নাই। এ সদভিপ্রায় তাহার অন্তরে ছিল বিচ্ছিন্ন—কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলা সে কেন, বোধ হয় আমারও সাহস হইত না। কহিলাম, ব্যাপার কি রতন?

রতন কহিল, ব্যাপার যা বরাবর জানি—তাই।

কহিলাম, কিন্তু আমি যখন এখনও জানিনে তখন একটু খুলেই বল।

রতন খুলিয়াই বলিল। সমস্ত শুনিয়াই মনের মধ্যে যে কি হইল বলা কঠিন। কেবল মনে আছে, ইহার নিষ্ঠুর কদর্যতা ও অপরিসীম বীভৎসতার ভারে সমস্ত চিত্ত একেবারে তিক্ত বিবশ হইয়া গেল। কি করিয়া যে কি হইল, রতন সবিস্তারে ইহার ইতিবৃত্ত এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু যেটুকু সত্য সে ছাঁকিয়া বাহির করিয়াছে, তাহা এই যে, নবীন মোড়ল সম্প্রতি জেল খাটিতেছে এবং মালতী তাহার ভগিনীপতির সেই বড়লোক ছোটভাইকে স্যাঙ্গ করিয়া উভয়ে তাহার পিতৃগৃহে বাস করিতে গঙ্গামাটিতে কাল ফিরিয়া আসিয়াছে।

মালতীকে একপ্রকার স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ করি বিশ্বাস করাই কঠিন হইত  
যে রাজলক্ষ্মীর টাকাগুলোর যথার্থই এইভাবে সদ্বাতি হইয়াছে।

সেই রাত্রে আমাকে খাওয়াইতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী এ সংবাদ শুনিল।  
শুনিয়া কেবল আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস্কি কি রতন, সত্যি নাকি? ছুঁড়িটা সেদিন  
আচ্ছা তামাশা করলে ত! টাকাগুলো গেল—অবেলায় আমাকে নাইয়ে মারলে! —  
ও কি, তোমার খাওয়া হয়ে গেল নাকি, তার চেয়ে খেতে না বসলেই ত হয়?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার কোনদিনই আমি বৃথা চেষ্টা করি না—  
আজও চুপ করিয়া রহিলাম। তবে একটা বস্তু উপলব্ধি করিলাম। আজ নানা  
কারণে আমার একেবারে ক্ষুধা ছিল না, প্রায় কিছুই খাই নাই—তাই আজ সেটা  
তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু কিছুকাল হইতে যে আমার খাওয়া ধীরে  
ধীরে কমিয়া আসিতেছিল, সে তাহার চোখে পড়ে নাই। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে  
তাহার নজর এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, ইহার লেশমাত্র কম-বেশি লইয়া তাহার আশঙ্কা  
ও অভিযোগের অবধি থাকিত না—কিন্তু আজ যে কারণেই হোক একজনের সেই  
শ্যেনদৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেছে বলিয়াই যে অপরের গভীর বেদনাকেও হা-হৃতাশের  
দ্বারা প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিব, সে-ও আমি নই। তাই উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস  
চাপিয়া লইয়া নিরুন্তরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার দিনগুলা একভাবেই আরম্ভ হয়, একভাবেই শেষ হয়। আনন্দ  
নাই, বৈচিত্র্য নাই, অথচ কোন দুঃখ-কষ্টের নালিশও নাই। শরীর মোটের উপর  
ভালই আছে। পরদিন প্রভাত হইল, বেলা বাড়িয়া উঠিল, যথারীতি স্নানাহার  
সমাপ্ত করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলাম। সুমুখের সেই খোলা জানালা এবং  
তেমনি বাধাহীন উন্মুক্ত শুক্ষ মাঠ।

পাঁজিতে আজ বোধ হয় বিশেষ কোন উপবাসের বিধি ছিল; রাজলক্ষ্মীর  
তাই আজ সেইটুকু সময় অপব্যয় করিতে হইল না—যথাসময়ের কিছু পূর্বেই  
সুনন্দার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। অভ্যাসমত বোধ করি বহুক্ষণ তেমনিই

চাহিয়াছিলাম, হঠাৎ স্মরণ হইল কালকার অসমাপ্ত চিঠি দুটা আজ শেষ করিয়া  
বেলা তিনটার পূর্বেই ডাকবাট্টে ফেলা চাই। অতএব আর মিথ্যা কালহরণ না  
করিয়া অবিলম্বে তাহাতেই নিযুক্ত হইলাম। চিঠি দুখানা সম্পূর্ণ করিয়া যখন  
পড়িতে লাগিলাম, তখন কোথায় যেন ব্যথা বাজিতে লাগিল, কি যেন একটা না  
লিখিলেই ভাল হইত; অথচ নিতান্তই সাধারণ লেখা, তাহার কোথায় যে ক্রটি,  
বার বার পড়িয়াও ধরিতে পারিলাম না। একটা কথা আমার মনে আছে। অভয়ার  
পত্রে রোহিণীদাদাকে নমস্কার জানাইয়া শেষের দিকে লিখিয়াছি, তোমাদের  
অনেকদিন খবর পাই নাই। তোমরা কেমন আছ, কেমন করিয়া তোমাদের দিন  
কাটিতেছে, কেবলমাত্র কল্পনা করা ছাড়া জানিবার চেষ্টা করি নাই। হয়ত সুখেই  
আছ, হয়ত নাই, কিন্তু তোমাদের জীবনযাত্রার এই দিকটাকে সেই যে একদিন  
ভগবানের হাতে ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় পর্দা টানিয়া দিয়াছিলাম, আজও সে তেমনি  
রুলানো আছে; তাহাকে কোনদিন তুলিবার ইচ্ছা পর্যন্তও করি নাই। তোমার সঙ্গে  
ঘনিষ্ঠতা আমার দীর্ঘকালের নয়, কিন্তু যে অত্যন্ত দুঃখের ভিতর দিয়া একদিন  
আমাদের পরিচয় আরম্ভ এবং আর একদিন সমাপ্ত হয়, তাহাকে সময়ের মাপ  
দিয়া মাপিবার চেষ্টা আমরা কেহই করি নাই। যেদিন নিদারঞ্জন রোগাক্রান্ত হই,  
সেদিন সেই আশ্রয়হীন সুদূর বিদেশে তুমি ছাড়া আমার যাইবার স্থান ছিল না।  
তখন একটি মুহূর্তের জন্যও তুমি দ্বিধা কর নাই—সমস্ত হৃদয় দিয়া পীড়িতকে  
গহণ করিয়াছিলে। অথচ তেমনি রোগে, তেমনি সেবা করিয়া আর কখনো যে  
কেহ আমাকে বাঁচায় নাই, এ-কথা বলি না; কিন্তু আজ অনেক দূরে বসিয়া  
উভয়ের প্রভেদটাও অনুভব করিতেছি। উভয়ের সেবার মধ্যে, নির্ভয়ের মধ্যে,  
অন্তরের অকপট শুভকামনার মধ্যে, তোমাদের নিবিড় মেঝের মধ্যে গভীর ঐক্য  
রহিয়াছে; কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটি স্বার্থলেশহীন সুকোমল নির্লিপ্ততা,  
এমন অনিবচ্চনীয় বৈরাগ্য ছিল যাহা কেবলমাত্র সেবা করিয়াই আপনাকে আপনি  
নিঃশেষ করিয়াছে। আমার আরোগ্যের মধ্যে এতটুকু চিহ্ন রাখিতে একটি পা-ও

কখনো বাড়ায় নাই, তোমার এই কথাটাই আজ বারংবার মনে পড়িতেছে। হয়ত অত্যন্ত মেহ আমার সহে না বলিয়াই, হয়ত বা স্নেহের যে রূপ একদিন তোমার চোখে-মুখে দেখিতে পাইয়াছি তাহারই জন্য সমস্ত চিন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ তোমাকে আর একবার মুখোমুখি না দেখা পর্যন্ত ঠিক করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সাহেবের চিঠিখানাও শেষ করিয়া ফেলিলাম। একসময়ে তিনি আমার সত্যসত্যই বড় উপকার করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছি। প্রার্থনা কিছুই করি নাই, কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরে সহসা গায়ে পড়িয়া এমন ধন্যবাদ দিবার ঘটা দেখিয়াও নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করিতে লাগিল। ঠিকানা লিখিয়া খামে বন্ধ করিতে গিয়া দেখি সময় উভীরণ হইয়া গেছে, এত তাড়াতাড়ি করিয়াও ডাকে দেওয়া গেল না, কিন্তু মন তাহাতে ক্ষুঁশ না হইয়া যেন স্বত্ত্ব অনুভব করিল। মনে হইল এ ভালই হইল যে, কাল আর একবার পড়িয়া দেখিবার সময় মিলিবে।

রতন আসিয়া জানাইল কুশারীগৃহিণী আসিয়াছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কহিলাম, তিনি ত বাড়ি নেই, ফিরে আসতে বোধ করি সম্ভ্যা হবে।

তা জানি, এই বলিয়া তিনি জানালার উপর হইতে একটা আসন টানিয়া লইয়া নিজেই মেঝের উপর পাতিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, কহিলেন, কেবল সম্ভ্যা কেন, ফিরে আসতে ত প্রায় রাত হয়েই যায়।

লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিলাম, ধনী-গৃহিণী বলিয়া ইনি অতিশয় দাস্তিকা। কাহারও বাড়ি বড় একটা যান না। এ বাড়ির সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যবহার অনেকটা এইরূপ; অন্ততঃ এতদিন ঘনিষ্ঠতা করিতে গ্ৰন্থসূক্য প্ৰকাশ কৱেন নাই। ইতিপূৰ্বে ঘাত্র বার-দুই আসিয়াছেন। মনিববাড়ি বলিয়া একবার নিজেই আসিয়াছিলেন এবং আর একবার নিমন্ত্ৰণ রাখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু

কেন যে আজ অকস্মাত স্বেচ্ছায় আগমন করিলেন এবং বাটীতে কেহ নাই জানিয়াও—আমি ভাবিয়া পাইলাম না।

আসন গ্রহণ কহিয়া কহিলেন, আজকাল ছোটগিন্নীর সঙ্গে ত একেবারে এক-আত্মা।

না জানিয়া তিনি একটা ব্যথার স্থানেই আঘাত করিলেন; তথাপি ধীরে ধীরে বলিলাম, হাঁ প্রায়ই ওখানে যান বটে। কুশারীগৃহিণী কহিলেন, প্রায়? রোজ, রোজ! প্রত্যহ! কিন্তু ছোটগিন্নী কি কখনও আসে? একটি দিনও না! মানীর মান রাখবে সুনন্দা সে মেয়েই নয়! এই বলিয়া তিনি আমার মুখের প্রতি চাহিলেন। আমি একজনের নিত্য যাওয়ার কথাই কেবল ভাবিয়াছি, কিন্তু আর একজনের আসার কথা মনেও করি নাই; সুতরাং তাঁহার কথায় হঠাৎ একটু যেন ধাক্কা লাগিল। কিন্তু ইহার উত্তর আর কি দিব? শুধু মনে হইল ইঁহার আসার উদ্দেশ্যটা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, এবং একবার এমনও মনে হইল যে, মিথ্যাসঙ্কোচ ও চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলি, আমি নিতান্তই নিরূপায়, অতএব এই অক্ষম ব্যক্তিকে শক্রপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া কোন লাভ নাই। বলিলে কি হইত জানি না, কিন্তু না বলার ফলে দেখিলাম সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজনা তাঁহার চক্ষের পলকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং কবে, কাহার কি ঘটিয়াছিল, এবং কি করিয়া তাহার সম্বন্ধে হইয়াছিল, ইহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তাঁহার শৃঙ্গরকুলের বছর-দশেকের ইতিহাস প্রায় রোজনামচার আকারে অনৰ্গল বকিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাঁহার গোটাকয়েক কথার পরেই কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণও ছিল। মনে করিয়াছিলাম, একদিকে আত্মপক্ষের স্তুতিবাদ, দয়াদাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি যাহা কিছু শাস্ত্রোক্ত সদ্গুণাবলী মনুষ্যজন্মে সম্ভবপর সমস্তগুলিরই বিস্তৃত আলোচনা—এবং অন্যদিকে যত কিছু ইহারই বিপরীত তাহারই বিশদ বিবরণ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে আরোপ করিয়া সন, তারিখ,

মাস, প্রতিবেশী সাক্ষীদের নামধার্ম-সমেত আবৃত্তি করা ভিন্ন তাঁহার এই বলার মধ্যে আর কিছুই থাকিবে না। প্রথমটা ছিলও না—কিন্তু হঠাৎ একসময়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল কুশারীগৃহিণীর কর্ষ্ণস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে। একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েচে? তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রাখিলেন, তার পরে ধরা-গলায় বলিয়া উঠিলেন, হবার আর কি বাকি রইল বাবু? শুনলাম, কাল নাকি ঠাকুরপো হাটের মধ্যে নিজের হাতে বেগুন বেচতেছিলেন।

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হইল না, এবং মন ভাল থাকিলে হয়ত হাসিয়াই ফেলিতাম। কহিলাম, অধ্যাপক মানুষ তিনি হঠাৎ বেগুনই বা পেলেন কোথায়, আর বেচতেই বা গেলেন কেন?

কুশারীগৃহিণী বলিলেন, ওই হতভাগীর জ্বালায়। বাড়ির মধ্যেই নাকি গোটাকয়েক গাছে বেগুন ফলেছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছিল হাটে বেচতে—এমন করে শক্রতা করলে আমরা গাঁয়ে বাস করি কি করে?

বলিলাম, কিন্তু একে শক্রতা করা বলচেন কেন? তাঁরা ত আপনাদের কিছুর মধ্যেই নেই। অভাব হয়েচে, নিজের জিনিস বিক্রি করতে গেছেন, তাতে আপনার নালিশ কি?

আমার জবাব শুনিয়া কুশারীগৃহিণী বিস্তরের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন, এই বিচারই যদি করেন, তাহলে আমার বলবার আর কিছু নেই, মনিবের কাছে নালিশ জানাবারও কিছু নেই—আমি উঠলাম।

শেষের দিকে তাঁহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিলাম, দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ আপনার মনিব-ঠাকুরুনকে জানাবেন, তিনি হয়ত সকল কথা বুঝতেও পারবেন, আপনার উপকার করতেও পারবেন।

তিনি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, আর আমি কাউকে বলতেও চাইনে, আমার উপকার করেও কারও কাজ নেই। এই বলিয়া তিনি সহসা অঞ্চলে চোখ

মুছিয়া বলিলেন, আগে আগে কর্তা বলতেন, দু'মাস যাক, আপনিই ফিরে আসবে। তারপরে সাহস দিতেন, থাকো না আরও মাস-দুই চেপে, সব শুধরে যাবে—কিন্তু এমনি করে মিথ্যে আশায় আশায় প্রায় বছর ঘুরে গেল। কিন্তু কাল যখন শুনলাম সে উঠানের দুটো বেগুন পর্যন্ত বেচতে পেরেচে, তখন কারও কথায় আর আমার কোন ভরসা নেই। হতভাগী সমস্ত সংসার ছারখার করে দেবে, কিন্তু ও-বাড়িতে আর পা দেবে না। বাবু, মেয়েমানুষে যে এমন শক্ত পাষাণ হতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

তিনি কহিতে লাগিলেন, কর্তা ওকে কোনদিন চিনতে পারেন নি, কিন্তু আমি চিনেছিলাম। প্রথম প্রথম এর-ওর-তার নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে জিনিসপত্র পাঠাতাম; উনি বলতেন, সুনন্দা জেনেশনেই নেয়—কিন্তু অমন করলে তাদের চৈতন্য হবে না। আমিও ভাবতাম, হবেও বাই! কিন্তু একদিন সব ভুল ভেঙ্গে গেল। কি করে সে জানতে পারে, যতদিন যা-কিছু দিয়েছি, একটা লোকের মাথায় সমস্ত টান মেরে আমাদের উঠানের মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেল। তাতে কর্তার তবুও চৈতন্য হ'ল না—হ'ল আমার।

এতক্ষণে আমি তাঁর মনের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম। সদয়কষ্টে কহিলাম, এখন আপনি কি করতে চান? আচ্ছা, তাঁরা কি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কোনপ্রকার শক্ততা করবার চেষ্টা করেন?

কুশারীগৃহিণী আর একদফা কাঁদিয়া ফেলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, পোড়াকপাল, তা হলে ত একটা উপায় হ'ত। সে আমাদের এমনি ত্যাগ করেচে যে, কোনদিন যেন আমাদের চোখেও দেখেনি, নামও শোনেনি, এমনি কঠিন, এমনি পাষাণ মেয়ে! আমাদের দু'জনকে সুনন্দা তার বাপ-মায়ের বেশি ভালবাসত; কিন্তু যেদিন থেকে শুনেচে তার ভাঙ্গরের বিষয় পাপের বিষয়, সেই দিন থেকে তার সমস্ত মন যেন একেবারে পাথর হয়ে গেছে। স্বামী-পুত্র নিয়ে সে দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, তবু এর কড়াক্রান্তি ছোঁবে না। কিন্তু

এতবড় সম্পত্তি কি আমরা ফেলে দিতে পারি বাবু? সে যেমন দয়ামায়াইন—  
হেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতেও পারে, কিন্তু আমরা ত তা পারিনে।

কি জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু আস্তে আস্তে কহিলাম, আশ্চর্য  
মেয়েমানুষ!

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, কুশারীগৃহিণী নীরবে কেবল ঘাড় নাড়িয়া সায়  
দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু হঠাৎ দুই হাত জোড় করিয়া বলিয়া ফেলিলেন,  
সত্য বলচি বাবু, এদের মাঝে পড়ে আমার বুকখানা যেন ফেটে যেতে চায়।  
কিন্তু শুনতে পাই আজকাল সে মার নাকি বড় বাধ্য—কোন একটা উপায় হয়  
না? আমি যে আর সহিতে পারিনে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনিও আর কিছু বলিতে পারিলেন না—  
তেমনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

## ଦଶ

ମାନୁଷେର ପରକାଳେର ଚିତ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ନାକି ପରେର ଚିତ୍ତାର ଠାଁଇ ନାହିଁ, ନା ହଇଲେ ଆମାର ଖାଓୟା-ପରାର ଚିତ୍ତା ରାଜଲଙ୍ଘ୍ନୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିତେ ପାରେ ଏତ ବଡ଼ ବିଷ୍ୟ ସଂସାରେ ଆର କି ଆଛେ? ଏହି ଗଞ୍ଜାମାଟିତେ ଆମରା କତଦିନଇ ବା ଆସିଯାଇଛି, ଏହି କଟା ଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ହୃଦୟ କତଦୂରେଇ ନା ସରିଯା ଗେଲ! ଆମାର ଖାବାର କଥା ଜିଜ୍ଞେସା କରିତେ ଆସେ ଏଥିନ ବାମୁନଠାକୁର, ଆମାକେ ଖାଓୟାଇତେ ବସେ ରତନ । ଏକପକ୍ଷେ ବାଁଚିଯାଇଛି, ମେ ଦୂର୍ଜ୍ୟ ପୀଡ଼ାପୀଡ଼ି ଆର ନାହିଁ । ରୋଗୀ ଶରୀରେ ଏଗାରୋଟାର ମଧ୍ୟେ ନା ଖାଇଲେ ଏଥିନ ଆର ଅସୁଖ କରେ ନା । ଏଥିନ ଯେମନ ଇଚ୍ଛା, ଯଥିନ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ । ଶୁଦ୍ଧ ରତନେର ପୁନଃପୁନଃ ଉତ୍ତେଜନାୟ ଓ ବାମୁନଠାକୁରେର ସଥେଦ ଆଭାର୍ତ୍ତସନାୟ ସ୍ଵଲ୍ପାହାରେର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନା—ମେ ବେଚାରା ମାନୁଷେ କେବଳି ମନେ କରିତେ ଥାକେ, ତାହାରଇ ରାନ୍ଧାର ଦୋଷେ ଆମାର ଖାଓୟା ହଇଲ ନା । କୋନମତେ ଇହାଦେର ସନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ କରିଯା ବିଛାନାୟ ଗିଯା ବସି । ସମୁଖେର ସେଇ ଖୋଲା ଜାନାଲା, ଆର ସେଇ ଉଷର ପ୍ରାତରେର ତୀର ତଣ୍ଡ ହାଓୟା । ମଧ୍ୟାତର ଦୀର୍ଘ ଦିନମାନ କେବଳମାତ୍ର ଏହି ଛାଯାହୀନ ଶୁକ୍ଳତାର ପ୍ରତି ଚାହିୟା ଚାହିୟା ଯଥିନ ଆର କାଟିତେ ଚାହିତ ନା, ତଥିନ ଏକଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସବଚେଯେ ଆମାର ବେଶି ମନେ ପଡ଼ିତ—ମେ ଆମାଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେର କଥାଟା । ଭାଲ ଆମାକେ ମେ ଆଜଓ ବାସେ, ଇହଲୋକେ ଆମିଇ ତାର ଏକାନ୍ତ ଆପନାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକାନ୍ତରେ ତାର କାହେ ଆମି ତତ ବଡ଼ଇ ପର । ତାହାର ଧର୍ମଜୀବନେର ଆମି ଯେ ସଙ୍ଗୀ ନାହିଁ, ମେଥାନେ ଆମାକେ ଦାବି କରିବାର ଯେ ତାହାର କୋନ ଦଲିଲ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁଘରେର ମେଯେ ହଇଯା ଏକଥା ମେ ଭୁଲେ ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥିବୀଟାଇ ଶୁଦ୍ଧ ନଯ, ଇହାରେ ଅତୀତ ଯେ ସ୍ଥାନଟା ଆଛେ, ପାଥେୟ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧ ଆମାକେ କେବଳ ଭାଲବାସିଯାଇ ଅର୍ଜନ କରା ଯାଇବେ ନା, ଏ-ସଂଶୟ ବୋଧ କରି ଖୁବ ବଡ଼ କରିଯାଇ ତାହାର ମନେ ଉଠିଯାଇଛେ ।

সে রহিল এই লইয়া, আর আমার দিনগুলা কাটিতে লাগিল এম্বিনি করিয়া। কমহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের দিবারস্ত হয় শ্রান্তিতে, অবসান হয় অবসন্ন গ্লানিতে। নিজের আয়ুক্ষালটাকে নিজের হাত দিয়া প্রতিনিয়ত হত্যা করিয়া চলা ব্যতীত সংসারে আর যেন আমার কিছু করিবার নাই। রতন আসিয়া মাঝে মাঝে তামাক দিয়া যায়, সময় হইলে চা আনিয়া দেয়—কিছু বলে না। কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহার বোধ হয়, সে পর্যন্ত আমাকে যেন কৃপার চক্ষে দেখিতে শুরু করিয়াছে। কখনো বা হঠাত আসিয়া বলে, বাবু, জানালাটা বন্ধ করে দিন, আগুনের ঝলক আসচে। আমি বলি, থাক। মনে হয়, কত লোকের গায়ের স্পর্শ এবং কত না অচেনা লোকের তপ্ত শ্বাসের আমি যেন ভাগ পাই। হয়ত, আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু ইন্দ্রনাথ আজিও বাঁচিয়া আছে, এই উষও বায়ু হয়ত তাহাকে এইমাত্র ছুঁইয়া আসিল। হয়ত, সে আমারই মত তাহার অনেকদিনের সুখ-দুঃখের শিশু সঙ্গীটিকে স্মরণ করিতেছে। আর আমাদের উভয়ের সেই অনন্দাদিদি! ভাবিতাম, হয়ত এতদিনে তাঁহার সকল দুঃখের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কখনও মনে হয়, এই কোণেই ত বর্মাদেশ, বাতাসের ত বাধা নাই, কে বলিবে সমুদ্র পার করিয়া অভয়ার স্পর্শটুকু সে আমার কাছে বহিয়া আনিতেছে না! অভয়াকে মনে পড়িলে সহজে সে আমার মন ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। রোহিণীদা এখন কাজে গিয়াছেন, আর তাহাদের ছোট্ট বাসাবাড়ির সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের মেঝেতে বসিয়া অভয়া তাহার সেলাই লইয়া পড়িয়াছে।

দিনের বেলা আমারি মত সে ঘুমাইতে পারে না, এতদিনে—হয়ত, কোন ছোট শিশুর কাঁথা, কিংবা ছোট বালিশের অড়, কিংবা এম্বিনি কিছু তাহার ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র গৃহিণীপনা!

বুকের মাঝখানে গিয়া যেন তীরের মত বিঁধে। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত সংক্ষার, যুগ-যুগান্তরের ভাল-মন্দ বিচারের অভিমান আমারও ত রক্তের মধ্যে

প্রবহমান। কেমন করিয়া অকপটে তাহাকে দীর্ঘায় হও বলিয়া আশীর্বাদ করি! কিন্তু মন যে সরমে সঙ্কোচে একেবারে ছোট হইয়া আসিতে চায়।

কর্মনিরতা অভয়ার শান্ত প্রসন্ন মুখছবি আমি মনশক্ষে দেখিতে পাই। তাহারি পাশে নিষ্কলন্ক ঘূমন্ত বালক। যেন সদ্যফোটা পদ্মের মত শোভায় সম্পদে গন্ধে মধুতে টলটল করিতেছে। এতখানি অমৃত বস্ত্রের জগতে কি সত্যই প্রয়োজন ছিল না? মানবসমাজে মানব-শিশুর মর্যাদা নাই, নিমন্ত্রণ নাই—স্থান নাই বলিয়া ইহাকেই ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিতে হইবে? কল্যাণের ধনকেই চির অকল্যাণের মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিবার অপেক্ষা মানব-হৃদয়ের বৃহত্তর ধর্ম আর নাই?

অভয়াকে আমি চিনি। এইটুকুকে পাইতে সে যে তাহার জীবনের কতখানি দিয়াছে, তাহা আর কেহ না জানে আমি ত জানি। হৃদয়হীন-বর্বরতায় কেবলমাত্র অশৰ্দ্ধা ও উপহাসের দ্বারাই সংসারে সকল প্রশ্নের জবাব হয় না। ভোগ! অত্যন্ত মোটা রকমের লজ্জাকর দেহের ভোগ! তাই বটে! অভয়াকে ধিক্কার দিবার কথাই বটে!

বাহিরের তপ্ত বাতাসে চোখের তপ্ত অশ্রু আমার নিমেষে শুকাইত। বর্মা হইতে চলিয়া আসার কথাটা মনে পড়িত। ঠিক সেই সময়টায় তখন রেঙ্গুনে মরণের ভয়ে ভাই বোনকে, ছেলে বাপ-মাকেও ঠাঁই দিত না। মৃত্যু-উৎসবের উদগু মৃত্যুলীলা শহরময় চলিয়াছে—তেমনি সময়ে যখন আমি মৃত্যুদূতের কাঁধে চড়িয়া তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন নৃতন-পাতা ঘরকল্পার মোহ ত তাহাকে একটা মুহূর্তও দ্বিধায় ফেলে নাই! সে কথা ত শুধু আমার আখ্যায়িকার এই কয়টা লাইন পড়িয়াই বুঝা যাইবে না, কিন্তু আমি ত জানি সে কি! আরও অনেক বেশি আমি জানি। আমি জানি কিছুই অভয়ার কাছে কঠিন নয়, মৃত্যু—সেও তাহার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা—এই-সব প্রাচীন ও মামুলি বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবলমাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি জম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।

কাজের জন্য পুরানো মনিবের কাছে দরখাস্ত করিয়াছি, ভরসা আছে আবেদন নামঙ্গুর হইবে না। সুতরাং আবার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে। ইতিমধ্যে দুই তরফেই অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। তাহার ভারও সামান্য নয়, কিন্তু সে ভার সে জমা করিয়াছে আপনার অসামান্য সরলতায় ও স্বেচ্ছায়, আর আমার জমিয়া উঠিয়াছে তেমনি অসাধারণ বলহীনতায় ও ইচ্ছাশক্তির অভাবে। কি জানি, ইহাদের রঙ ও চেহারা সেদিন মুখোমুখি কেমনতর দেখিতে হইবে।

একাকী সমস্তদিন প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন বেলা পড়িলে একটুখানি বেড়াইতে বাহির হইতাম। দিন পাঁচ-সাত হইতে ইহা একপ্রকার অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। ধূলাময় যে পথটা দিয়া একদিন আমরা গঙ্গামাটিতে আসিয়াছিলাম, সেই পথ ধরিয়া কোন কোন দিন অনেকদূর পর্যন্ত চলিয়া যাইতাম।

অন্যমনে আজও তেমনি চলিয়াছিলাম, সহসা দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে ধূলার পাহাড় সৃষ্টি করিয়া কে-একজন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। সভয়ে রাস্তা ছাড়িয়া নামিয়া দাঁড়াইলাম। ঘোড়সওয়ার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া ঘোড়া থামাইল, ফিরিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার নাম শ্রীকান্তবাবু না? আমাকে চিনতে পারেন?

বলিলাম, নাম আমার তাই বটে, কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারলাম না।

লোকটি ঘোড়া হইতে নামিল। পরনে তাহার ছিল ও মণিন সাহেবী পোশাক, মাথায় জরাজীর্ণ সোলার হ্যাট খুলিয়া হাতে লইয়া কহিল, আমি সতীশ ভরদ্বাজ। থার্ডক্লাস থেকে প্রোমোশন না পেয়ে সার্ভে-স্কুলে পড়তে যাই, মনে পড়ে না?

মনে পড়িল। খুশি হইয়া কহিলাম, তাই বল, তুমি আমাদের ব্যাঙ। এখানে সাহেব সেজে যাচ্ছ কোথায়?

ব্যাঙ হাসিয়া কহিল, সাহেব কি আর সাধে সাজি ভাই, রেলওয়ে কনস্ট্রাক্শনে সাব-ওভারসিয়ারী চাকরি করি, কুলি তাড়াতেই জীবন যায়, হ্যাট-কোট না থাকলে কি আর রক্ষা ছিল? এতদিন তারাই আমাকে তাড়াত। সোপলপুরে একটু বরাত সেরে ফিরচি—মাইলটাক দূরে আমার তাঁবু, সাঁইথিয়া থেকে যে নতুন লাইন বসচে তাতেই কাজ। যাবে আমার ওখানে? চা খেয়ে আসবে?

অস্বীকার করিয়া কহিলাম, আজ নয়, কোনদিন সুযোগ হয় আসব।

ব্যাঙ তখন অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—শরীর কেমন, কোথায় থাকি, এখানে কি সূত্রে আসা, ছেলে-মেয়ে কয়টি, তাহারা কে কেমন আছে, ইত্যাদি।

জবাবে বলিলাম, শরীর ভাল নয়, থাকি গঙ্গামাটিতে, যে সূত্রে এখানে আসা তাহা অত্যন্ত গোলমেলে। ছেলে-মেয়ে নাই, অতএব তাহারা কে কেমন আছে এ প্রশ্ন নিরর্থক।

ব্যাঙ সাদাসিধাগোছের লোক। আমার উত্তরগুলা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অপরের ব্যাপার বুঝিতেই হইবে এরূপ দৃঢ়সঞ্চল ব্যক্তি সে নয়। সে নিজের কথাই বলিতে লাগিল। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, তরিতরকারি মেলে, মাছ এবং দুধ চেষ্টা করিলে পাওয়া যায়; তবে লোকজন নাই, সঙ্গীসাথীর অভাব, কিন্তু কষ্ট বিশেষ হয় না, কারণ সন্ধ্যার পরে একটু নেশা-ভাঙ করিলেই বেশ চলিয়া যায়। সাহেবরা হাজার হোক বাঙালীর চেয়ে তের ভাল—টেম্পোরারি গোছের তাড়ির শেড একটা খোলা হইয়াছে—যত ইচ্ছা খাও, তার নিজের ত একরকম পয়সা লাগে না বলিলেই হয়—সবই ভাল—কনস্ট্রাক্শনে দু'পয়সা আছেও বটে, এবং আমার জন্যে বড়সাহেবকে ধরিয়া চাকরি একটা অনায়াসে করিয়া দিতে পারে—এমনি সব তাহার সৌভাগ্যের ছোট-বড় কাহিনী। ব্যাঙ তাহার বেতো ঘোড়ার মুখ ধরিয়া অনেকদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে বকিতে বকিতে চলিল; বার বার জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি নাগাইদ তাহার ক্যাম্পে পায়ের ধূলা দিতে পারি, এবং

তরসা দিয়া জানাইল যে, পোড়ামাটিতে প্রায়ই তাহার কাজ থাকে, ফিরিবার পথে  
একদিন আমার গঙ্গামাটিতে সে নিশ্চয় গিয়া উপস্থিত হইবে।

সেদিন বাড়িতে ফিরিতে আমার একটু রাত্রি হইল। পাচক আসিয়া  
জানাইল আহার প্রস্তুত। হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়াছি, এমন  
সময় রাজলক্ষ্মীর কর্তৃস্বর শোনা গেল। সে ঘরে ঢুকিয়া চৌকাঠের কাছে বসিয়া  
পড়িল, হাসিমুখে কহিল, তুমি কিন্তু কিছুতেই অমত করতে পাবে না বলে রাখচি।

কহিলাম, না, আমার অমত নেই।

কি তা না শুনেই?

কহিলাম, আবশ্যক মনে হয় ব'লো একসময়।

রাজলক্ষ্মীর হাসিমুখ গন্তীর হইল, কহিল, আচ্ছা—হঠাত তাহার দৃষ্টি পড়িল  
আমার থালার উপরে। কহিল, ভাত খাচ যে বড়? তুমি জান রাত্রে তোমার ভাত  
সহ্য হয় না—তুমি কি তোমার অসুখটা আমাকে সারাতে দেবে না ঠিক করেচ?

ভাত আমার ভালই সহ্য হইতেছিল, কিন্তু সেকথা বলিয়া লাভ নাই।  
রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক দিল, মহারাজ! পাচক দ্বারের কাছে আসিতেই তাহাকে  
থালা দেখাইয়া ততোধিক তীব্রস্বরে কহিল, কি এ? তোমাকে বোধহয় এক হাজার  
বার বলেচি ভাত বাবুকে কিছুতেই রাত্রে দেবে না—তোমাকে একমাসের মাইনে  
আমি জরিমানা করলুম। অবশ্য টাকার দিক দিয়া জরিমানার কোন অর্থ নাই,  
তাহা সকল চাকরেই জানে, কিন্তু তিরক্ষারের দিক দিয়া তাহার অর্থ আছে বৈ  
কি! মহারাজ রাগ করিয়া কহিল, ঘি নেই, আমি কি করব?

নেই কেন তাই শুনি?

সে জবাব দিল, দু-তিনদিন জানিয়েচি আপনাকে ঘি ফুরিয়েচে, লোক  
পাঠান। আপনি না পাঠালে আমার দোষ কি?

সংসার খরচের সাধারণ ঘি এইখানেই পাওয়া যাইত, কিন্তু আমার জন্য আসিত সাঁহিয়ার নিকটবর্তী কি একটা গ্রাম হইতে। তাহা লোক পাঠাইয়া আনাইয়া লইতে হইত।

কথাটা রাজলক্ষ্মীর অন্যমনস্ক কর্ণরঞ্জে হয় প্রবেশ করে নাই, না হয় ত সে ভুলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কবে থেকে নেই মহারাজ?

তা হবে পাঁচ-সাতদিন।

এই পাঁচ-সাতদিন তাঁকে ভাত খাওয়াচ? রতনকে ডাকিয়া কহিল, আমিই যেন ভুলেছিলাম, কিন্তু তুই কি আনিয়ে দিতে পারতিস নে বাবা! এম্বিনি করেই কি সবাই মিলে আমাকে জন্ম করতে হয়!

রতন মনে মনে তাহার ঠাকুরানীর উপর খুশি ছিল না। দিবারাত্রি বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র থাকায় এবং বিশেষ করিয়া আমার প্রতি ওদাসীন্যে তাহার বিরক্তির একশেষ হইয়া ছিল, কর্তৃর অনুযোগের উভরে ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, কি জানি মা, তুমি গেরাহ্যি করলে না দেখে ভাবলুম ভাল দামী ঘি বোধ হয় আর চাইনে। নইলে পাঁচ-ছদ্দিন ধরে রোগামানুষকে আমি ভাত খেতে দিই!

রাজলক্ষ্মীর বলিবার কিছুই ছিল না, তাই ভৃত্যের কাছে এতবড় খোঁচা খাইয়াও সে কিছুক্ষণ নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছটফট করিয়া বোধ করি সেইমাত্র তন্মা আসিয়াছিল, রাজলক্ষ্মী দ্বার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল এবং আমার পায়ের কাছে আসিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া ডাকিল, তুমি কি ঘুমোলে?

বলিলাম, না,

রাজলক্ষ্মী কহিল, তোমাকে পাবার জন্যে আমি যা করেছি, তার অর্ধেক করলেও বোধ হয় ভগবানকে এতদিনে পেতুম। কিন্তু তোমাকে পেলুম না।

বলিলাম, হতে পারে মানুষকে পাওয়া আরও শক্ত।

মানুষকে পাওয়া? রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, যাই হোক,  
ভালবাসাটাও ত একরকমের বাঁধন, বোধ হয় এও তোমার সয় না— গায়ে লাগে।

এ অভিযোগের জবাব নাই, এ অভিযোগ শাশ্বত ও সনাতন। আদিম  
মানব-মানবী হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এ কলহের মীমাংসক কেহ নাই—  
এ বিবাদ যেদিন মিটিবে, সংসারের সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য সেদিন তিক্ত বিষ  
হইয়া উঠিবে। তাই উত্তর দিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া নীরব হইয়া রহিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, উত্তরের জন্য রাজলক্ষ্মী পীড়াপীড়ি করিল না।  
জীবনের এতবড় সর্বব্যাপী প্রশ্নটাকেও সে যেন এক নিমিষে আপনা-আপনিই  
ভুলিয়া গেল। কহিল, ন্যায়রত্ন ঠাকুর বলছিলেন একটা ব্রতের কথা,—কিন্তু একটু  
বলে সবাই নিতে পারে না, আর এত সুবিধাই বা ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

অসমাঞ্ছ প্রস্তাবের মাঝখানে মৌন হইয়া রহিলাম; সে বলিতে লাগিল,  
তিনদিন একরকম উপোস করেই থাকতে হয়, সুনন্দারও ভারি ইচ্ছে,—দু'জনের  
একসঙ্গেই তা হলে হয়ে যায়, কিন্তু—এই বলিয়া সে নিজেই একটু হাসিয়া বলিল,  
তোমার মত না হলে ত আর—

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মত না হলে কি হবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা হলে হবে না।

কহিলাম, তবে এ মতলব ত্যাগ কর, আমার মত নেই।

যাও—তামাশা করতে হবে না।

তামাশা নয়, সত্যি আমার মত নেই—আমি নিষেধ করচি

কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মীর মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্তুতিভাবে  
থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমরা যে সমস্ত স্থির করে ফেলেচি। জিনিসপত্র কিনতে  
লোক গেছে—কাল হবিষ্য করে পরশ থেকে যে—বাঃ! এখন বারণ করলে হবে  
কেন? সুনন্দার কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে? ছোটঠাকুর—বাঃ! এ কেবল

তোমার চালাকি। আমাকে মিছিমিছি রাগবার জন্যে—না, সে হবে না, তুমি বল  
তোমার মত আছে।

বলিলাম, আছে। কিন্তু তুমি কোনদিনই ত আমার মতামতের অপেক্ষা  
কর না লক্ষ্মী, আজই বা হঠাতে কেন তামাশা করতে এলে? আমার আদেশ মানতে  
হবে এ দাবি আমি ত কখনো তোমার কাছে করিনি!

রাজলক্ষ্মী আমার পায়ের উপর হাত রাখিয়া কহিল, আর কখনও হবে  
না, এইবারটি শুধু প্রসন্ন মনে আমাকে হৃকুম দাও।

কহিলাম, আচ্ছা। কিন্তু ভোরেই তোমাকে হয়ত যেতে হবে, আর রাত  
ক'রো না শুতে যাও।

রাজলক্ষ্মী গেল না, আস্তে আস্তে আমার পায়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে  
লাগিল। যতক্ষণ না স্বুমাইয়া পড়িলাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার কেবলি মনে হইতে  
লাগিল, সে ম্লেহস্পর্শ আর নাই। সেও ত বেশিদিনের কথা নয়, আরা রেলওয়ে  
স্টেশন হইতে আমাকে যেদিন সে কুড়াইয়া বাড়ি আনিয়াছিল, সেদিন এমনি  
করিয়াই পায়ে হাত বুলাইয়া আমাকে সে ঘুম পাঢ়াইতে ভালবাসিত। ঠিক এমনিই  
নীরবে, কিন্তু মনে হইত তাহার দশ অঙ্গুলি যেন দশ ইন্ডিয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা  
দিয়া নারীহৃদয়ের ঘাহা-কিছু আছে, সমস্ত নিঃশেষ করিয়া আমার এই পা-দুটার  
উপরে উজাড় করিয়া দিতেছে। অথচ, এ আমি চাহি নাই, এই লইয়াই যে কেমন  
করিয়া কি করিব সেও ভাবিয়া পাই নাই। বানের জলের মত—আসার দিনেও  
আমার মত চাহে নাই, হয়ত ঘাবার দিনেও তেমনি মুখ চাহিবে না। চোখ দিয়া  
আমার সহজে জল পড়ে না, ভালবাসার কাঙালবৃত্তি করিতেও আমি পারি না।  
জগতে কিছুই নাই, কাহারো কাছে কিছু পাই নাই, দাও দাও বলিয়া হাত বাড়াইয়া  
থাকিতে আমার লজ্জা করে। বইয়ে পড়িয়াছি এই লইয়া কত বিরোধ, কত জ্বালা,  
মান-অভিমানের কতই না প্রমস্ত আক্ষেপ—মনের সুধা গরল হইয়া উঠার কত

ନା ବିକ୍ଷୁଳ କାହିନୀ! ଏ-ସକଳ ମିଥ୍ୟା ନୟ ଜାନି, କିନ୍ତୁ ଆମାର ମନେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ବୈରାଗୀ  
ତନ୍ଦ୍ରାଚୂଳ ଛିଲ, ହଠାତ୍ ଚମକ ଭାଙ୍ଗିଯା ବଲିତେ ଲାଗିଲ ଛି ଛି!

ବହୁକ୍ଷଣ ପରେ, ସୁମାଇୟା ପଡ଼ିଯାଛି ମନେ କରିଯା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଥନ ସାବଧାନେ  
ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଯା ଗେଲ, ତଥନ ଜାନିତେଓ ପାରିଲ ନା ଯେ, ନିଦ୍ରାବିହୀନ ନିମ୍ନାଲିତ  
ଚୋଥେର କୋଣ ଦିଯା ଆମାର ଅଶ୍ରୁ ଝରିଯା ପଡ଼ିତେଛେ । ଅଶ୍ରୁ ପଡ଼ିତେଇ ଲାଗିଲ, କିନ୍ତୁ  
ଆଜିକାର ଆୟତ୍ତାତୀତ ଧନ ଏକଦିନ ଆମାରଇ ଛିଲ ବଲିଯା ବ୍ୟର୍ଥ ହାହାକାରେ ଅଶାନ୍ତି  
ସୃଷ୍ଟି କରିଯା ତୁଲିତେ ଆର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହଇଲ ନା ।

## এগার

সকালে উঠিয়া শুনিলাম, অতি প্রত্যুষেই রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া রতনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেছে, এবং তিনদিনের মধ্যে যে বাড়ি আসিতে পারিবে না, এ খবরও পাইলাম। হইলও তাহাই। সেখানে বিরাট কাণ কিছু যে চলিতে লাগিল তাহা নয়, তবে দু-দশজন ব্রাহ্মণ-সজ্জনের যে গতিবিধি হইতেছে, কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন হইয়াছে, তাহার আভাস জানালায় বসিয়াই অনুভব করিতাম। কি ব্রত, কিরণ তাহার অনুষ্ঠান, সম্পন্ন করিলে স্বর্গের পথ কতখানি সুগম হয়, ইহার কিছুই জানিতাম না, জানার কৌতুলও ছিল না। রতন প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিত। বলিত, আপনি একবারও বলেন না বাবু?

জিজ্ঞাসা করিতাম, তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

রতন একটু মুক্ষিলে পড়িত। সে এইভাবে জবাব দিত যে, আমার একেবারে না যাওয়াটা লোকের চোখে যেন কেমন কেমন ঠেকে। হয়ত বা কেউ মনে করে, এতে আমার অনিচ্ছা। বলা যায় না ত!

না, বলা কিছুই যায় না। প্রশ্ন করিতাম, তোমার মনিব কি বলেন?

রতন বলিত, তাঁর ইচ্ছে ত জানেন, আপনি না থাকলে কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু কি করবেন, তাই কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, রোগা শরীর, এতখানি হাঁটলে অসুখ করতে পারে। আর এসে হবেই বা কি!

বলিলাম, সে ত ঠিক। তা ছাড়া তুমি ত জান রতন, এই-সব পূজা-অর্চনা, ধর্মকর্মের মাঝখানে আমি ভয়ানক বেমানান হয়ে পড়ি। যাগযজ্ঞের ব্যাপারে আমার একটু গা-আড়াল দিয়ে থাকাই ভাল। ঠিক না?

রতন সায় দিয়া বলিত, সে ঠিক। কিন্তু আমি বুঝিতাম রাজলক্ষ্মীর দিক দিয়া আমার উপস্থিতি তথায়—কিন্তু থাক সে।

হঠাৎ মন্ত একটা সুখবর পাইলাম। মনিবের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিবার অজুহাতে গোমন্তা কাশীনাথ কুশারীমহাশয় সন্তীক গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বলিস কি রতন, একেবারে সন্তীক?

আজ্জে হাঁ। তাও আবার বিনা নেমন্তন্ত্রে।

বুবিলাম ভিতরে রাজলক্ষ্মীর কি একটা কৌশল আছে। সহসা এমনও মনে হইল, হয়ত এইজন্যই সে নিজের বাটীতে না করিয়া অপরের গৃহে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছে।

রতন কহিতে লাগিল, বিনুকে কোলে নিয়ে বড়গিল্লীর সে কি কান্না! ছেট-মাঠাকরুণ স্বহস্তে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন, খেতে চাননি বলে আসন পেতে ঠাঁই করে ছেট মেয়ের মত তাঁকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিলেন। মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। ব্যাপার দেখে বুড়ো কুশারীঠাকুরমশাই ত একেবারে ভেউভেউ করে কেঁদে উঠলেন— আমার ত বোধ হয় বাবু, কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে ছেট-মাঠাকরুণ এবার ওই ভাঙ্গা কুঁড়েটার মায়া কাটিয়ে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। তা যদি হয় ত গাঁ-সুন্দ সবাই খুশি হবে। আর এ কীর্তি যে আমার মায়ের, সেও কিন্তু আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি বাবু।

সুনন্দাকে যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে এতখনি আশাপ্রিত হইতে পারিলাম না, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর উপর হইতে আমার অনেকখানি অভিমান শরতের মেঘাছন্ন আকাশের মত দেখিতে দেখিতে সরিয়া গিয়া চোখের সুমুখটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিল।

এই দুটি ভাই ও জায়েদের মধ্যে বিচ্ছেদ যেখানে সত্যও নয়, স্বাভাবিকও নয়, মনের মধ্যে এতটুকু চিড় না খাইয়াও বাহিরে যেখানে এতবড় ভঙ্গন ধরিয়াছে—সেই ফাটল জোড়া দিবার মত হৃদয় ও কৌশল যাহার আছে তাহার মত শিল্পী আর আছে কোথায়? এই উদ্দেশ্যে কতদিন হইতেই না সে গোপনে উদ্যোগ করিয়া আসিতেছে। একান্তমনে আশীর্বাদ করিলাম, এই সদিচ্ছা যেন

তাহার পূর্ণ হয়। কিছুদিন হইতে আমার অন্তরের মধ্যে নিভৃতে যে ভার সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার অনেকখানি হাঙ্কা হইয়া গিয়া আজিকার দিনটা আমার বড় ভাল কাটিল। কোন্ শাস্ত্রীয় ব্রত রাজলক্ষ্মী নিয়াছে আমি জানি না, কিন্তু আজ তাহার তিনদিনের মিয়াদ পূর্ণ হইয়া কাল আবার দেখা হইবে, এই কথাটা বহুদিন পরে আবার যেন নৃতন করিয়া স্মরণ হইল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী আসিতে পারিল না, কিন্তু অনেক দুঃখ করিয়া রতনের মুখে খবর পাঠাইল যে, এমনি অদৃষ্ট একবার দেখা করিয়া যাইবারও সময় নাই—দিন-ক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। নিকটে কোথায় বক্রেশ্বর বলিয়া তীর্থ আছে, সেখানে জাগ্রত দেবতা এবং গরম জলের কুণ্ড আছে, তাহাতে অবগাহন-মান করিলে শুধু কেবল সেই-ই নয়, তাহার পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শুশুরকুলের তিনকোটি জন্মের যে যেখানে আছে সবাই উদ্ধার হইয়া যাইবে। সঙ্গী জুটিয়াছে, দ্বারে গরুর গাড়ি প্রস্তুত, যাত্রাক্ষণ প্রত্যাসন্ধায়। দু-একটা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু দারোয়ানের হাত দিয়া রতন পাঠাইয়া দিল, সে বেচারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া দিতে গেল। শুনিলাম ফিরিয়া আসিতে পাঁচ-সাতদিন বিলম্ব হইবে।

আরও পাঁচ-সাতদিন! বোধ করি অভ্যাসবশতঃই হইবে, আজ তাহাকে দেখিবার জন্য মনে মনে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু রতনের মুখে অকস্মাত তাহার তীর্থযাত্রার সংবাদ পাইয়া অভিমান বা ক্রোধের পরিবর্তে বুকের মধ্যেটা আমার সহসা করুণা ও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। পিয়ারী সত্য সত্যই নিঃশেষ হইয়া মরিয়াছে এবং তাহারই কৃতকর্মের দুঃসহ ভারে আজ রাজলক্ষ্মীর সর্বদেহমনে যে বেদনার আর্তনাদ উচ্ছ্঵সিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সংবরণ করিবার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই যে অশ্রান্ত বিক্ষেপ, নিজের জীবন হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার এই যে দিঘিহীন ব্যাকুলতা, ইহার কি কোন শেষ নাই? খাঁচায় আবদ্ধ পাথির মত কি সে দিনরাত্রি অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া মরিবে? আর সেই পিঙ্গরের লৌহশ্লাকার মত আমিই কি চিরদিন তাহার মুক্তিপথের দ্বার

আগলাইয়া থাকিব? সংসারে যাহাকে কোনকিছু দিয়া কোনদিন বাঁধিতে পারিল না, সেই আমার ভাগ্যেই কি শেষে এত বড় দুর্ভোগ লিখিয়া দিয়াছেন? আমাকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে, আমার মোহ সে কাটাইতে পারে না। ইহারই পুরস্কার দিতে কি তাহার সকল ভবিষ্যৎ সুকৃতির গায়ে নিগড় হইয়া থাকিবে?

মনে মনে বলিলাম, আমি তাহাকে ছুটি দিব—সেবারের মত নয়, এবার, একান্তচিত্তে, অন্তরের সমস্ত শুভাশীর্বাদ দিয়া চিরদিনের মত মুক্তি দিব, এবং যদি পারি, সে ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই আমি এ দেশ ছাড়িয়া যাইব। কোন প্রয়োজনে, কোন অজুহাতে, সম্পদ ও বিপদের কোন আবর্তনেই আর তাহার সম্মুখীন হইব না। একদিন নিজের অদৃষ্টই আমাকে এ সকল স্থির রাখিতে দেয় নাই, কিন্তু আর তাহার কাছে আমি কিছুতেই পরাভব মানিব না।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্টই বটে! একদিন পাটনা হইতে যখন বিদায় লইয়াছিলাম, পিয়ারী চুপ করিয়া তাহার দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। তখন মুখে তাহার কথা ছিল না, কিন্তু সেই নিরবন্ধ অন্তরের অশঙ্গাত্ ফিরিবার ডাক কি সমস্ত পথটাই আমার কানে গিয়া পুনঃপুনঃ পৌঁছে নাই? কিন্তু ফিরি নাই। দেশ ছাড়িয়া সুদূর বিদেশে চলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই যে রূপহীন, ভাষাহীন দুর্বার আকর্ষণ আমাকে অহনীশি টানিতে লাগিল, দেশ-বিদেশের ব্যবধান তাহার কাছে কতটুকু? আবার একদিন ফিরিয়া আসিলাম। বাহিরের লোকে আমার পরাজয়ের প্লানিটাই দেখিতে পাইল, আমার মাথার অল্পানকান্ত জয়মাল্য তাহাদের চোখে পড়িল না।

এমনিই হয়। আমি জানি, অচিরভবিষ্যতে আবার একদিন বিদায়ের ক্ষণ আসিয়া পড়িবে। সেদিনও হয়ত সে এমনি নীরব হইয়াই রহিবে, কিন্তু আমার শেষ বিদায়ের যাত্রাপথ ব্যাপিয়া সেই অশ্রুপূর্ব নিবিড় আহ্বান হয়ত আর কানে পশিবে না।

মনে মনে বলিলাম, থাকার নিমন্ত্রণ শেষ হইয়া যখন যাওয়াটাই কেবল থাকী থাকে, সে কি ব্যথার বস্তু! অথচ এ ব্যথার অংশী নাই, শুধু আমারই হৃদয়ে গহ্নন খনিয়া এই নিষিদ্ধ বেদনাকে চিরদিন একাকী থাকিতে হইবে। রাজলক্ষ্মীকে ভালবাসিবার অধিকার সংসার আমাকে দেয় নাই; এই একাগ্র প্রেম, এই হাসিকান্না, মান-অভিমান, এই ত্যাগ, এই নিরিড়ি মিলন—সমস্তই লোকচক্ষে যেমন ব্যর্থ, এই আসন্ন বিছেদের অসহ অন্তর্দাহও বাহিরের দৃষ্টিতে আজ তেমনি অর্থহীন। আজ এই কথাটাই আমার সবচেয়ে বেশি বাজিতে লাগিল, একের মর্মান্তিক দুঃখ যখন অপরের কাছে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, তাহার চেয়ে বড় ট্র্যাজিডি পৃথিবীতে আর আছে কি! অথচ, এমনিই বটে। লোকের মধ্যেও বাস করিয়া যে লোক লোকাচার মানে নাই, বিদ্রোহ করিয়াছে, সে নালিশ করিবে গিয়া কাহার কাছে? এ সমস্যা শাশ্বত ও পুরাতন। সৃষ্টির দিন হইতে আজি পর্যন্ত এই প্রশ্নই বারংবার আবর্তিয়া চলিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের গভৰ্ণে যতদূর দৃষ্টি যায় ইহার সমাধান চোখে পড়ে না। ইহা অন্যায়, অবাঞ্ছিত। তথাপি, এত বড় সম্পদ, এত বড় ঐশ্বর্যই কি মানুষের আর আছে? অবাধ্য নরনারীর এই অবাঞ্ছিত হৃদয়াবেগের কত নিঃশব্দ বেদনার ইতিহাসকেই না মাঝখানে রাখিয়া যুগে যুগে কত পুরাণ, কত কাহিনী, কত কাব্যেরই না অন্তর্ভুক্ত সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আজ ইহা যদি থামিয়া যায়? মনে মনে বলিলাম, থাক। রাজলক্ষ্মীর ধর্মে মতি হোক, তাহার বক্রেশ্বরের রাস্তা সুগম হোক, তাহার মন্ত্রোচ্চারণ নির্ভুল হোক, আশীর্বাদ করি তাহার পুণ্যার্জনের পথ নিরন্তর নির্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক হোক, আমার দুঃখের ভার আমি একাই বহন করিব।

পরদিন ঘুম ভঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনে হইল, গঙ্গামাটির এই বাড়িঘর, পথঘাট, খোলা মাঠ, সকল বন্ধনই যেন আমার শিথিল হইয়া গেছে। রাজলক্ষ্মী কবে ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু মন যেন আর একটা দণ্ডও এখানে থাকিতে চাহে না। স্নানের জন্য রতন তাগিদ শুরু করিয়াছে। কারণ, যাইবার

সময় রাজলক্ষ্মী শুধু কড়া ভুকুম দিয়াই নিশ্চিত হইতে পারে নাই, রতনকে তাহার পা ছুঁয়াইয়া দিব্য করাইয়া লইয়াছে যে, তাহার অবর্তমানে আমার এতটুকু অ্যতু বা অনিয়ম না হয়।

খাবার সময় সকালে এগারোটা ও রাত্রে আটটার মধ্যে ধার্য হইয়াছে, রতনকে প্রত্যহ ঘড়ি দেখিয়া সময় লিখিয়া রাখিতে হইবে। কথা আছে, ফিরিয়া আসিয়া সে প্রত্যেককে একমাসের করিয়া মাহিনা বকশিশ দিবে। রান্না শেষ করিয়া বামুনঠাকুর ঘর-বাহির করিতেছে, এবং চাকরের মাথায় তরিতরকারি, মাছ, দুধ প্রভৃতি লইয়া প্রভাত না হইতেই যে কুশারীমহাশয় স্বয়ং আসিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেছেন আমি তাহা বিছানায় শুইয়া টের পাইয়াছিলাম। ঔৎসুক্য কিছুতেই আর ছিল না—বেশ, এগারোটা এবং আটটাই সহ। একমাসের উপরি মাহিনা হইতে আমার জন্য কেহ বঞ্চিত হইবে না তাহা নিশ্চিত।

কাল রাত্রে অতিশয় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, আজ নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই স্নানাহার শেষ করিয়া বিছানায় শুইতে না শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙ্গিল চারিটার কাছাকাছি। কয়েকদিন হইতেই নিয়মিত বেড়াইতে বাহির হইতেছিলাম, আজিও হাতমুখ ধুইয়া চা খাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

দ্বারের বাহিরে একজন লোক বসিয়াছিল, সে হাতে একখানা চিঠি দিল। সতীশ ভরঢাজের চিঠি, কে একজন অনেক কষ্টে এক ছত্র লিখিয়া জানাইয়াছে যে, সে অত্যন্ত পীড়িত। আমি না গেলে সে মরিয়া যাইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে তাহার?

লোকটা বলিল, কলেরা।

খুশি হইয়া কহিলাম, চল। খুশি তাহার কলেরার জন্য নয়। গৃহের সংস্কৰণ হইতেই কিছুক্ষণের জন্যও যে দূরে যাইবার সুযোগ মিলিল ইহাই পরম লাভ বলিয়া মনে হইল।

একবার ভাবিলাম রতনকে ডাকিয়া একটা খবর দিয়া যাই, কিন্তু সময়ের অভাবে ঘটিয়া উঠিল না। যেমন ছিলাম, তেমনি বাহির হইয়া গেলাম, এ বাড়ির কেহ কিছু জানিতে পারিল না।

প্রায় ক্রোশ-তিনেক পথ হাঁটিয়া শেষবেলায় গিয়া সতীশের ক্যাম্পে পৌঁছিলাম। ধারণা ছিল, রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের ইনচার্জ এস. সি. বর্দাজের অনেক কিছু প্রশ্ন দেখিতে পাইব, কিন্তু গিয়া দেখিলাম হিংসা করিবার মত কিছু নয়। ছোট একটা ছোলদারি তাঁবুতে সে থাকে, পাশেই তাহার লতাপাতা খড়কুটা দিয়া তৈরি কুটীরে রান্না হয়। একটি হষ্টপুষ্ট বাউরী মেয়ে আগুন জ্বালিয়া কি একটা সিন্দু করিতেছিল, আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। এ সতীশের প্রণয়ণী।

ইতিমধ্যে রামপুরহাট হইতে একজন ছোকরাগোছের পাঞ্জাবী ডাঙ্গার আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে সতীশের বাল্যবন্ধু জানিয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। রোগীর সম্বন্ধে জানাইলেন যে কেস সিরিয়াস্ নয়, প্রাণের আশঙ্কা নাই। তাঁহার ট্রিলি প্রস্তুত, এখন বাহির হইতে না পারিলে হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছাতে অতিশয় রাত্রি হইয়া যাইবে—ক্লেশের অবধি থাকিবে না। আমার কি হইবে সে তাঁহার ভাবিবার বস্ত নয়। কখন কি করিতে হইবে রীতিমত উপদেশ দিলেন, এবং ঠেলাগাড়িতে রওনা হইবার মুখে কি ভাবিয়া তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া গোটা দুই-তিন কোটা ও শিশি আমার হাতে দিয়া কহিলেন, কলেরা কতকটা ছোঁয়াচে রোগের মত। ঐ ডোবার জলটা ব্যবহার করতে মানা করে দেবেন, এই বলিয়া তিনি মাটিতোলা খাদটা হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আর যদি খবর পান কুলিদের মধ্যে কারও হয়েচে—হতে পারে—এই উষ্ণধণ্ডলো ব্যবহার করবেন।

এই বলিয়া তিনি রোগের কি অবস্থায় কোনটা দিতে হইবে বলিয়া দিলেন।

মানুষটি মন্দ নয়, মায়াদয়া আছে। আমার বাল্যবন্ধু কেমন থাকেন কাল  
যেন তিনি খবর পান, এবং কুলিদের উপরও যেন দৃষ্টি রাখিতে ভুল না হয়,  
আমাকে বার বার সাবধান করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ হইল ভাল। রাজলক্ষ্মী গিয়াছে বক্রেশ্বর দেখিতে, আর রাগ করিয়া  
আমি বাহির হইয়াছি পথে। পথেই এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ। বাল্যকালের  
পরিচয়, অতএব বাল্যবন্ধু ত বটেই। তবে বছর-পনর খবরাখবর ছিল না, হঠাৎ  
চিনিতে পারি নাই। কিন্তু দিন-দুয়ের মধ্যেই অকস্মাত এ কি ঘোরতর মাখামাখি!  
তাঁহার কলেরায় চিকিৎসার ভার, শুশ্রাবার ভার, মায় তাঁর শ-দেড়েক মাটিকাটা  
কুলির খবরদারির ভার গিয়া পড়িল আমার উপর! বাকি রহিল শুধু তাঁহার সোলার  
হ্যাট এবং টাটু ঘোড়াটি। আর বোধ হয় যেন ওই কুলি মেয়েটিও। তাহার  
মানভূমের অনিবর্চনীয় বাউরী ভাষার অধিকাংশই ঠেকিতে লাগিল, কেবল এটুকু  
ঠেকিল না যে, মিনিট দশ-পনর মধ্যেই সে আমাকে পাইয়া অনেকখানি আশ্চর্ষ  
হইয়াছে। যাই, আর ত্রুটি রাখি কেন, ঘোড়াটিকে একবার দেখিয়া আসি গে।

ভাবিলাম, আমার অদৃষ্টই এমনি। না হইলে রাজলক্ষ্মীই বা আসিত  
কিরূপে, অভয়াই বা আমাকে দিয়া তাহার দুঃখের বোৰা বহাইত কেমন করিয়া?  
আর এই ব্যাঞ্চ এবং তাহার কুলি গ্যাঞ্চ! কোন ব্যক্তির পক্ষেই ত এ-সকল ঝাড়িয়া  
ফেলিতে একমুহূর্তের অধিক সময় লাগিত না। আর আমিই বা সারাজীবন বহিয়া  
বেড়াই কিসের জন্য?

তাঁবুটা রেল কোম্পানির। সতীশের নিজস্ব সম্পত্তির একটা তালিকা মনে  
মনে প্রস্তুত করিয়া লইলাম। কয়েকটা এনামেলের বাসন, একটা স্টেভ, একটা  
লোহার তোরঙ্গ, একটা কেরোসিন তেলের বাক্স, এবং তাহার শয়ন করিবার  
ক্যান্সিশের খাট, বহু-ব্যবহারে ডোঙার আকার ধারণ করিয়াছে। সতীশ চালাক  
লোক, এ খাটে বিছানার প্রয়োজন হয় না, একখানা যা-তা হইলেই চলিয়া যায়,  
তাই ডোরাকাটা একখানা শতরঞ্জিৎ ছাড়া আর কিছুই সে কেনে নাই। ভবিষ্যতে

কলেরা হওয়ার কোন ব্যবস্থাই তাহার ছিল না। ক্যাম্পিশের খাটে শুশ্রাৰ কৱার  
অত্যন্ত অসুবিধা এবং একমাত্ৰ শতৰঞ্জিৎ অতিশয় নোংৰা হইয়া উঠিয়াছে। এতএব  
তাহাকে নীচে শোয়ানো ছাড়া উপায় নাই।

আমি যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। মেয়েটির নাম কালীদাসী;  
জিজ্ঞাসা করিলাম, কালী, কারও দু-একখানা বিছানা পাওয়া যাবে?

কালী কহিল, না।

কহিলাম, দুটি খড়-টড় যোগাড় করে আনতে পার?

কালী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে,  
এখানে কি গরু আছে?

কহিলাম, বাবুকে তা হলে শোয়াই কোথায়?

কালী নির্ভয়ে মাটি দেখাইয়া কহিল, হেথাকে। উ কি বাঁচবেক!

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল, এমন নির্বিকল্প প্রেম জগতে  
সুদুর্লভ। মনে মনে বলিলাম, কালী, তুমি ভক্তির পাত্র। তোমার কথাগুলি শুনলে  
আর শক্তবের মোহ-মুদ্গর-পাঠের আবশ্যকতা থাকে না; কিন্তু আমার সেৱনপ  
বিজ্ঞানময় অবস্থা নয়, লোকটা এখনও বাঁচিয়া; কিছু একটা পাতা চাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবুর পরনের একখানা কাপড়চোপড়ও কি নেই?

কালী ঘাড় নাড়িল। তাহার মধ্যে দ্বিধা-সংকোচ ছিল না। সে ‘বোধ হয়’  
বলে না। কহিল, কাপড় নেই, পেন্টুলুন আছে।

পেন্টুলুন সাহেবী জিনিস, মূল্যবান বস্তু, কিন্তু তাহার দ্বারা শয্যারচনার  
কাজ চলে কি না ভাবিয়া পাঠিলাম না। সহসা মনে পড়িল, আসিবার সময় অদূরে  
একটা ছিন্ন জীৰ্ণ ত্রিপল দেখিয়াছিলাম; কহিলাম, চল না যাই, দু'জনে ধৰাধৰি  
করে সেটা নিয়ে আসি। পেন্টুলুন পাতার চেয়ে সে ভাল হবে।

কালী রাজী হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তখনও তাহা পড়িয়া ছিল, আনিয়া  
তাহাতেই সতীশ ভৱাজকে শোয়াইয়া দিলাম। তাহারই একধারে কালী অত্যন্ত

সবিনয়ে স্থান লইল, এবং দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ধারণা ছিল, মেরেদের নাক ডাকে না। কালী তাহাও অপ্রমাণ করিয়া দিল।

আমি একাকী সেই কেরোসিনের বাক্সের উপর বসিয়া। এদিকে সতীশের হাতে-পায়ে ঘন ঘন খিল ধরিতেছে, সেকতাপের প্রয়োজন, বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া কালীকে তুলিলাম, সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া জানাইল, কাঠকুটা নাই, সে আগুন জ্বালিবে কি দিয়া? নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিতাম, কিন্তু আলোর মধ্যে সম্ভল এই হ্যারিকেন লঠনটি। তথাপি একবার তাহার রান্নাঘরে গিয়া খোঁজ করিয়া দেখিলাম, কালী মিথ্যা বলে নাই। এই কুটীরটা ছাড়া অগ্নিসংযোগ করিতে পারি এক্ষেপ দ্বিতীয় বস্ত নাই। কিন্তু সাহস হইল না, পাছে প্রাণ বাহির হইবার পূর্বেই সতীশের সৎকার করিয়া ফেলি! ক্যাম্প খাট এবং কেরোসিনের বাক্স বাহিরে আনিয়া দেশলাই জ্বালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইলাম, নিজের জামা খুলিয়া পুঁচুলির মত করিয়া কিছু কিছু সেঁক দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া রোগীর কোন উপকারই তাহাতে হইল না।

রাত্রি দুটাই হইবে কি তিনটাই হইবে, খবর আসিল জন-দুই কুলির ভেদবর্মি হইতেছে।

তাহারা আমাকে ডাক্তারবাবু বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহাদেরই আলোর সাহায্যে ওষধপত্র লইয়া কুলি-লাইনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মালগাড়িতে তাহারা থাকে। ছাদবিহীন খোলা ট্রাকের সারি লাইনের উপর দাঁড়াইয়া আছে, মাটি কাটার প্রয়োজন হইলে ইঞ্জিন জুড়িয়া দিয়া তাহাদের গম্যস্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

বাঁশের মই দিয়া ট্রাকের উপরে উঠিলাম। একধারে একজন বুড়াগোছের লোক শুইয়া আছে, তাহার মুখের পরে আলো পড়িতেই বুকা গেল রোগ সহজ নয়, ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেছে। অন্যধারে জন পাঁচ-সাত লোক,

স্তৰী-পুৱৰষ দুই-ই আছে, কেহ বা ঘুম ভাসিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, কাহারও বা তখন  
পৰ্যন্ত সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই।

ইহাদের জমাদার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেশ বাঙ্গলা বলিতে পারে,  
জিজ্ঞাসা করিলাম, আৱ একজন রোগী কৈ?

সে অন্ধকারে অঙ্গুলি নিৰ্দেশ কৱিয়া আৱ-একখানা ট্ৰাক দেখাইয়া কহিল,  
উখানে।

পুনৰায় মই দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, এবাৱ একজন স্তৰীলোক। বয়স  
পঁচিশ-ত্ৰিশের অধিক নয়, গুটি দুই ছেলেমেয়ে তাহার পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছে।  
স্বামী নাই, সে গত বৎসৱ আড়কাঠিৰ পাণ্ডায় পড়িয়া অপৱ একটি অপেক্ষাকৃত  
কম বয়সেৰ স্তৰীলোক লইয়া আসামে চা-বাগানে কাজ কৱিতে গিয়াছে।

এ গাড়িতেও আৱও জন পাঁচ-ছয় স্তৰী-পুৱৰষ ছিল, তাহারা একবাবকে  
তাহার পাষণ্ড স্বামীৰ নিন্দা কৱা ছাড়া আমাৱ বা রোগীৰ কোন সাহায্যই কৱিল  
না। পাঞ্জাৰী ডাঙ্কারেৰ শিক্ষামত উভয়কেই ঔষধ দিলাম, শিশু-দুটাকে স্থানান্তরিত  
কৱিবাৱ চেষ্টা কৱিলাম, কিন্তু কাহাকেও তাহাদেৱ ভাৱ লইতে স্বীকাৱ কৱাইতে  
পাৱিলাম না।

সকাল নাগাদ আৱ একটি ছেলেৰ ভেদবমি শুৱ হইল, ওদিকে সতীশ  
ভৱনাজেৱ অবস্থা উত্তৰোত্তৰ মন্দ হইয়াই আসিতেছে। বহু সাধ্যসাধনায়  
একজনকে পাঠাইলাম সাঁইথিয়া স্টেশনে পাঞ্জাৰী ডাঙ্কারকে খবৱ দিতে। সে  
সন্ধ্যা নাগাদ ফিৱিয়া আসিয়া জানাইল, তিনি আৱ কোথায় গিয়াছেন রোগী  
দেখিতে।

আমাৱ সবচেয়ে মুক্ষিল হইয়াছিল সঙ্গে টাকা ছিল না। নিজে ত কাল  
হইতে উপবাসে আছি। নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, কিন্তু সে না হয় হইল, কিন্তু জল  
না খাইয়া বাঁচি কিৱিপে? সুমুখেৰ খাদেৱ জল ব্যবহাৱ কৱিতে সকলকেই নিষেধ  
কৱিয়া দিলাম কিন্তু কেহই কথা শুনিল না। মেয়েৱা মৃদুহাস্যে জানাইল, এ ছাড়া

জল আর আছে কোথায় ডাঙ্গার? কিছুদূরে গ্রামের মধ্যে জল ছিল, কিন্তু যায় কে? তাহারা মরিতে পারে, কিন্তু বিনা পয়সায় এই ব্যর্থ কাজ করিতে রাজী নয়।

এম্বিনি করিয়া ইহাদের সঙ্গে এই ট্রাকের উপরেই আমাকে দুইদিন তিনরাত্রি বাস করিতে হইল। কাহাকেও বাঁচাইতে পারিলাম না, সব-কয়টাই মরিল, কিন্তু মরাটাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার নয়। মানুষ জন্মাইলেই মরে, কেহ দুইদিন আগে, কেহ দুইদিন পরে—এ আমি সহজে এবং অত্যন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারি। বরঞ্চ ইহাই ভাবিয়া পাই না, এই মোটা কথাটা বুঝিবার জন্য এত শান্তালোচনা, এত বৈরাগ্যসাধনা, এত প্রকারের তত্ত্ববিচারের প্রয়োজন হয় মানুষের কিসের জন্য? সুতরাং মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। এ যেন আমি সহিতেই পারি না।

পরদিন সকালে ভরঞ্চাজের দেহত্যাগ হইল। লোকাভাবে দাহ করা গেল না, মা ধরিব্রতী তাহাকে কোলে স্থান দিলেন।

ওদিকের কাজ মিটাইয়া ট্রাকে ফিরিয়া আসিলাম। না আসিলেই ছিল ভাল, কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না, জনারণ্যের মাঝখানে রোগীদের লইয়া আমি নিছক একাকী। সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হন্দয়ইন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে, এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। প্রথম সূর্যতাপে চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহারই মাঝে ত্রিপলের নীচে রোগীদের লইয়া আমি একা। ছোট ছেলেটা যে কি দুঃখই পাইতে লাগিল তাহার অবধি নাই, অথচ এক ভাঁড় জল দিবার পর্যন্ত কেহ নাই। সরকারী কাজ, মাটি-কাটা বন্ধ থাকিতে পারে না, হঞ্চার শেষে মাপ করিয়া তাহার মজুরি মিলিবে। অথচ তাহাদেরই স্বজ্ঞাতি, তাহাদেরই ত ছেলে! গ্রামের মধ্যে দেখিয়াছি, কিছুতেই ইহারা এমনধারা নয়। কিন্তু এই যে সমাজ হইতে, গৃহ হইতে সর্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লোকগুলাকে কেবলমাত্র উদয়ান্ত মাটি কাটার জন্যই সংগ্রহ করিয়া

আনিয়া ট্রাকের উপর জমা করা হইয়াছে, এইখানেই তাহাদের মানব-হৃদয়-বৃত্তি  
বলিয়া আর কোথাও কিছু বাকি নাই! শুধু মাটি-কাটা, শুধু মজুরি।

সভ্য মানুষে এ কথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে  
পশ্চ করিয়া না লইতে পারিলে পশ্চর কাজ আদায় করা যায় না।

ভরদ্বাজ গিয়াছে, কিন্তু তাহার অমর কীর্তি তাড়ির দোকান অক্ষয় হইয়া  
আছে। সন্ধ্যাবেলায় নরনারী নির্বিশেষে মাতাল হইয়া দলে দলে ফিরিয়া আসিল,  
দুপুরবেলায় রাঁধা ভাত হাঁড়িতে জল দেওয়া আছে, এ হঙ্গামাটাও এ বেলায়  
মেয়েদের নাই। তাহার পরে কে বা কাহার কথা শুনে। জমাদারের গাড়ি হইতে  
ঢোল ও করতাল সহযোগে প্রবল সঙ্গীতচর্চা হইতে লাগিল, সে যে কখন থামিবে  
ভবিয়া পাইলাম না। কাহারও জন্য তাহাদের মাথাব্যথা নাই। আমার ঠিক পাশের  
ট্রাকেই কে-একটা মেয়ের বোধ হয় জন-দুই প্রণয়ী জুটিয়াছে, সারা রাত্রি ধরিয়া  
তাহাদের উদ্দাম প্রেমলীলার বিরাম নাই। এদিকে ট্রাকে এক ব্যাটা কিছু অধিক  
তাড়ি খাইয়াছে; সে এমনি উচ্চ-কলরোলে স্তৰীর কাছে প্রণয় ভিক্ষা করিতে লাগিল  
যে, আমার লজ্জার সীমা রহিল না। দূরের একটা গাড়ি হইতে কে একজন  
স্ত্রীলোক মাঝে মাঝে বিলাপ করিতেছিল, তাহার মা ওষধ চাহিতে আসায় খবর  
পাইলাম কামিনীর সন্তান-সন্তাবনা হইয়াছে। লজ্জা নাই, সরম নাই, গোপনীয়  
কোথাও কিছু নাই—সমস্ত খোলা, সমস্ত অনাবৃত। জীবনযাত্রার অবাধ গতি  
বীভৎস প্রকাশ্যতায় অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে। শুধু আমিই কেবল দল-ছাড়া।  
আসন্ন মৃত্যুলোকযাত্রী মা ও তাহার ছেলেকে লইয়া গভীর আঁধার রাত্রে একাকী  
বসিয়া আছি।

ছেলেটা বলিল, জল—

মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিলাম, জল নেই বাবা, সকাল হোক।

ছেলেটা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তারপর চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে রহিল।

ত্বকার জল না থাক, কিন্তু আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। হায় রে হায়! শুধু কেবল মানবের সুকুমার হৃদয়বৃত্তি নয়, নিজের সুদুঃসহ যাতনার প্রতিও কি অপরিসীম উদাসীন্য! এই ত পশ্চ! এ ধৈর্যশক্তি নয়, জড়তা। এ সহিষ্ণুতা মানবতার তের নীচের স্তরের বস্ত।

আমাদের ট্রাকের অন্য লোকগুলা অকাতরে ঘুমাইতেছে। কালি-পড়া হ্যারিকেনের অত্যন্ত মলিন আলোকেও আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, মা ও ছেলে উভয়েরই সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া খিল ধরিয়াছে। কিন্তু কি-ই-বা আমার করিবার ছিল!

সম্মুখে কালো আকাশের অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া সপ্তর্ষিমন্ডল জুলজুল করিয়া জুলিতেছে, সেদিকে চাহিয়া আমি বেদনায়, ক্ষোভে ও নিষ্কল আক্ষেপে বার বার করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম, আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।

## বার

সকালে খবর পৌঁছিল আর দুই জন পীড়িত হইয়াছে। উষধ দিলাম,  
জমাদার সাঁইথিয়ায় সংবাদ পাঠাইয়া দিল। আশা করিলাম, এবার কর্তৃপক্ষের  
আসন উলিবে।

বেলা নয়টা আন্দাজ ছেলেটা মরিল। ভালই হইল। এই ত ইহাদের  
জীবন!

সম্মুখের মাঠের পথ দিয়া দুই জন ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দিয়া  
চলিয়াছিলেন; কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে গ্রাম কত দূরে?

যিনি বৃন্দ, তিনি মুখ্যটা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন, এই যে!

জিজ্ঞাসা করিলাম, খাবার জিনিস কিছু মেলে?

অন্যজন বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, মেলে না কি রকম! ভদ্রলোকের  
গ্রাম—চাল, ডাল, ঘি, তেল, তরিতরকারি যা খুশি আপনার। আসছেন কোথা  
থেকে? নিবাস? মশায়, আপনারাও?

সংক্ষেপে তাঁহাদের কৌতুহল নিরূপি করিয়া সতীশ ভরদ্বাজের নাম  
করিতে উভয়ে রুষ্ট হইয়া উঠিলেন; বৃন্দ বলিলেন, মাতাল, বদমাইস, জোচোর!  
ইনি কোন্-একটা হাইস্কুলের হেডমাস্টার।

তাঁহার সঙ্গী কহিলেন, রেলের লোক আর কত ভাল হবে! কাঁচা পয়সাটা  
বেশ হাতে ছিল কিনা!

প্রত্যুন্তে সতীশের টাটকা কবরের ঢিপিটা আমি হাত দিয়া দেখাইয়া  
জানাইলাম, এখন তাহার সম্বন্ধে আলোচনা বৃথা। কাল সে মরিয়াছে, লোকাভাবে  
দাহ করিতে পারা যায় নাই, এখানে মাটি দিতে হইয়াছে।

বলেন কি! বামুনের ছেলেকে—

কিন্তু উপায় কি?

শুনিয়া উভয়েই ক্ষুরূ হইয়া জানাইলেন যে, ভদ্রলোকের গ্রাম, একটুখানি খবর পাইলে যা হোক একটা উপায় নিশ্চয় হইয়া যাইত। একজন প্রশ্ন করিলেন, আপনি তাঁর কে?

বলিলাম, কেউ না। সামান্য পরিচয় ছিল মাত্র। এই বলিয়া কি করিয়া এখানে জুটিলাম সংক্ষেপে তাহারই বিবরণ দিলাম। দুইদিন খাওয়া হয় নাই, অথচ, কুলিদের মধ্যে কলেরা শুরু হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছি না।

খাওয়া হয় নাই শুনিয়া তাঁহারা অতিশয় উদ্বিঘ্ন হইলেন, এবং সঙ্গে যাইবার জন্য বারংবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং, এই ভয়ানক ব্যাধির মধ্যে খালি পেটে থাকা যে মারাত্মক ব্যাপার তাহাও একজন জানাইয়া দিলেন।

বেশি বলিতে হইল না—বলার প্রয়োজনই ছিল না, ক্ষৃৎপিপাসায় মৃতকন্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম—তাঁহাদের সঙ্গ লইলাম। পথে এই বিষয়েই আলাপ হইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ের লোক, শহরের শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহাদের ছিল না, কিন্তু মজা এই যে ইংরাজ রাজত্বের খাঁটি পলিটিক্যাটুকু তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত নয়। এ যেন দেশের লোকে দেশের মাটি হইতে, জল হইতে, আকাশ হইতে, বাতাস হইতে অস্ত্রিমজ্জা দিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

উভয়েই কহিলেন, সতীশ ভরদ্বাজের দোষ নেই মশায়, আমরা হলেও ঠিক অমনি হয়ে উঠতাম। কোম্পানি বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সে-ই চোর না হয়ে পারবে না। এমনি এঁদের ছোঁয়াচের গুণ!

ক্ষুধার্ত ও একান্ত ক্লান্ত দেহে অধিক কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, কি দরকার ছিল মশাই, দেশের

বুক চিরে আবার একটা রেলের লাইন পাতবার? কোন লোকে কি তা' চায়? চায় না।

কিন্তু তবু চাই। দীর্ঘ নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই, গীৱৰকালে গৱৰ-বাচুৱণলো জলাভাৱে ধড়ফড় কৱে মৱে যায়—কোথাও একটু ভাল খাবার জল থাকলে কি সতীশবাবুই মাৰা যেতেন? কখনো না। ম্যালেরিয়া, কলেৱা হ্ৰ-ৱকমেৰ ব্যাধি পীড়ায় লোক উজোড় হয়ে গেল, কিন্তু কা কস্য পৱিবেদনা! কৰ্তাৱা আছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কাৰ ঘৱে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান কৱে নিয়ে যেতে। কি বলেন মশাই? ঠিক নয়?

আলোচনা কৱিবার মত গলায় জোৱ ছিল না বলিয়াই শুধু ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে সায় দিয়া মনে মনে সহস্রবার বলিতে লাগিলাম, এই, এই, এই! কেবলমাত্ৰ এইজন্য তেব্রিশ কোটি নৱনারীৰ কষ্ট চাপিয়া বিদেশীয় শাসনতন্ত্ৰ ভাৱতে প্ৰতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুদ্ধমাত্ৰ এই হেতুই ভাৱতেৰ দিকে দিকে রঞ্জে রঞ্জে রেলপথ বিস্তাৱেৰ আৱ বিৱাম নাই। বাণিজ্যেৰ নাম দিয়া ধনীৰ ধনভাণ্ডাৰ বিপুল হইতে বিপুলতৰ কৱিবার এই অবিৱাম চেষ্টায় দুৰ্বলেৰ সুখ গেল, শাস্তি গেল, অন্ধ গেল, ধৰ্ম গেল—তাহাৰ বাঁচিবার পথ দিনেৰ পৱ দিন সঞ্চীৰ্ণ ও নিৱস্তৱ বোৰা দুৰ্বিষহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার জো নাই।

বৃন্দ ভদ্ৰলোকটি আমাৰ এই চিন্তাতেই যেন বাক্যযোজনা কৱিয়া কহিলেন, মশাই, ছেলেবেলায় মামাৰ বাড়িতে মানুষ আমি, আগে বিশ ক্ৰোশেৱে মধ্যে রেলগাড়ি ছিল না, তখন কি সস্তা, আৱ কি প্ৰচুৱ জিনিসপত্ৰই না সেখানে ছিল। তখন কাৱও কিছু জন্মালে পাড়াপ্রতিবেশী সবাই তাৱ একটু ভাগ পেত, এখন থোড়, মোঢ়া, উঠোনেৰ দুই-আঁটি শাক পৰ্যন্ত কেউ কাউকে দিতে চায় না, বলে, থাক, সাড়ে-আটটাৱ গাড়িতে পাইকেৱেৱ হাতে তুলে দিলে দু'পয়সা

আসবে। এখন দেওয়ার নাম হয়েচে অপব্যয়—মশাই, দুঃখের কথা বলতে কি, পয়সা-করার নেশায় মেয়ে-পুরুষে সবাই যেন একেবারে ইতর হয়ে গেছে।

আর আপনারাই কি প্রাণভরে ভোগ করতে পায়? পায় না। শুধু ত আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী নয়, নিজেদেরও সকল দিক দিয়ে ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা পাওয়াটাই হয়েছে যেন তাদের একটিমাত্র পরমার্থ।

এই-সমস্ত অনিষ্টের গোড়া হচ্ছে এই রেলগাড়ি। শিরার মত দেশের রক্ষে রক্ষে রেলের রাস্তা যদি না চুকতে পেত, খাবার জিনিস চালান দিয়ে পয়সা রোজগারের এত সুযোগ না থাকত, আর সেই লোভে মানুষ যদি এমন পাগল হয়ে না উঠত, এত দুর্দশা দেশের হতো না।

রেলের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগও কম নহে। বস্তুতঃ যে ব্যবস্থায় মানুষের জীবন-ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার প্রতিদিন অপহত হইয়া শৌখিন আবর্জনায় সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতি তীব্র বিত্তৈশ্বর না জনিয়াই পারে না। বিশেষতঃ, দরিদ্র মানবের যে দুঃখ ও যে হীনতা এইমাত্র চোখে দেখিয়া আসিলাম, কোন যুক্তিকর দিয়াই তাহার উত্তর মিলে না; তথাপি কহিলাম, আবশ্যকের অতিরিক্ত জিনিসগুলো অপচয় না করে যদি বিক্রি হয়ে অর্থ আসে সে কি নিতান্তই মন্দ?

ভদ্রলোক লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নিঃসঙ্গে বলিলেন, হ্যাঁ নিতান্ত মন্দ, নিছক অকল্যাণ।

ইঁহার ক্রোধ ও ঘৃণা আমার অপেক্ষা তের বেশি প্রচণ্ড।

বলিলেন, এই অপচয়ের ধারণাটা আপনার বিলাতের আমদানি, ধর্মস্থান ভারতবর্ষের মাটিতে এর জন্ম হয়নি, জন্ম হতেই পারে না। মশাই, মাত্র নিজের প্রয়োজনটুকুই কি একমাত্র সত্য? যার নেই তার প্রয়োজন মিটানোর কি কোন মূল্যই পৃথিবীতে নেই? সেটুকু বাইরে চালান দিয়ে অর্থ সঞ্চয় না করাই হ'ল অপচয়, হ'ল অপরাধ? এই নির্মম, নিষ্ঠুর উক্তি আমাদের মুখ দিয়ে বার হয়নি,

বার হয়েছে তাদের যারা বিদেশ থেকে এসে দুর্বলের গ্রাস কেড়ে নেবার দেশব্যাপী জালে ফাঁসের পর ফাঁস যোজনা করে চলেছে।

বলিলাম, দেখুন, দেশের অন্ন বিদেশে বার করে নিয়ে যাবার আমি পক্ষপাতী নই, কিন্তু একের উদ্ভূত অন্নে অপরের চিরদিন ক্ষুণ্ণবৃত্তি হতে থাকবে, এইটেই কি মঙ্গলের? তা ছাড়া, বাস্তবিক, বিদেশ থেকে এসে ত তারা জোর করে কেড়ে নিয়ে যায় না? অর্থ দিয়ে কিনে নিয়েই ত যায়?

ভদ্রলোক তিক্তকগ্রে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কিনেই বটে। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে জলে ফেলা যেমন মাছের সাদর নিমন্ত্রণ!

এই ব্যঙ্গেত্তির আর উত্তর দিলাম না। কারণ, একে ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শান্তিতে বাদানুবাদের শক্তি ছিল না, অপিচ তাঁহার বক্তব্যের সহিত মূলতঃ আমার বিশেষ মতভেদও ছিল না।

কিন্তু আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি অকস্মাত ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং আমাকেই প্রতিপক্ষ জ্ঞানে অত্যন্ত উদ্ধার সহিত বলিতে লাগিলেন, মশাই, ওদের উদাম বণিকবুদ্ধির তত্ত্বকথাটুকুকেই সার সত্য বলে বুঝে আছেন, কিন্তু আসলে এতবড় অসৎ বস্তু পৃথিবীতে আর নেই। ওরা জানে শুধু ঘোল আনার পরিবর্তে চৌষট্টি পয়সা গুনে নিতে—ওরা বোঝে কেবল দেনা আর পাওনা, ওরা শিখেচে শুধু ভোগটাকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে স্বীকার করতে। তাইত ওদের পৃথিবী-জোড়া সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ব্যসন জগতের সমস্ত কল্যাণ আচ্ছন্ন করে দিয়েচে। মশাই, এই রেল, এই কল, এই লোহা-বাঁধানো রাস্তা—এই ত হ'ল পৰিত্ব vested interest—এই গুরুভাবেই ত সংসারে কোথাও গরীবের নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই।

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি বলছিলেন একের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুকু চালান দেবার সুযোগ না থাকলে হয় নষ্ট হ'ত, না হয় অভাবগ্রস্তেরা বিনামূল্যে খেত। একেই অপচয় বলছিলেন, না?

কহিলাম, হাঁ, তার দিক দিয়ে অপচয় বৈ কি।

বৃন্দ প্রত্যুভরে অধিকতর অসহিষ্ণুও হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, এসব বিলাতি বুলি অর্বাচীন অধার্মিকের অজুহাত। কারণ, আর একটু যখন বেশি চিন্তা করতে শিখবেন, তখন আপনারই সন্দেহ হবে বাস্তবিক এইটেই অপচয়, না দেশের শস্য বিদেশে রঞ্জনি করে ব্যাকে টাকা জমানোটাই বেশি অপচয়। দেখুন মশাই, চিরদিনই আমাদের গ্রামে গ্রামে জনকতক উদ্যমহীন, উপার্জন-বিমুখ উদাসীন প্রকৃতির লোক থাকত, তাদের মুদি-ময়রার দোকানে দাবা-পাশা খেলে, মড়া পুড়িয়ে, বড়লোকের আড়ডায় গান-বাজনা করে, বারোয়ারীতলায় মোড়লি ক'রে, আরও—এম্বিনি সব অকাজেই দিন কাটত। তাদের সকলেরই যে ঘরের মধ্যে অন্নসংস্থান থাকত তা নয়, তবুও অনেকের উদ্বৃত্ত অংশেই তাদের সুখে-দুঃখে দিন চলে যেত। আপনাদের অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিতদের যত আক্রোশ তাদের পরেই ত? যাক, চিন্তার হেতু নেই, এই-সব অলস, অকেজো, পরাণ্তি মানুষগুলো এখন লোপ পেয়েছে।

কারণ, উদ্বৃত্ত বলে ত আর কোথাও কিছু নেই, সুতরাং, হয় অন্নাভাবে মরেচে, না হয় কোথাও গিয়ে কোন ছোট দাস্যবৃত্তিতে ভর্তি হয়ে জীবন্তভাবে পড়ে আছে। ভালই হয়েছে। মেহন্তের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জীবন-সংগ্রাম বুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু আমার মত যাদের বেশি বয়স হয়েছে তারাই জানে কি গেছে। জীবন-সংগ্রাম তাদের বিলুপ্ত করেছে—কিন্তু সমস্ত গ্রামের আনন্দটুকুও যেন তাদেরই সঙ্গে সহমরণে গেছে।

এই শেষ কথাটায় চকিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলাম। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাকে অন্নশিক্ষিত, সাধারণ গ্রাম্য ভদ্রলোক ব্যতীত কিছুই বেশি মনে হইল না—অথচ বাক্য যেন তাঁহার অকস্মাত আপনাকে অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া গেল।

তাঁহার সকল কথাকেই যে অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারিলাম  
তাহা নয়, কিন্তু অঙ্গীকার করিতেও বেদনা বোধ করিলাম। কেমন যেন সংশয়  
জন্মিল, এ-সকল বাক্য তাঁহার নিজের নয়, এ যেন অলক্ষ্মিত আর কাহারও  
জবানি।

অতিশয় সঞ্চাচের সহিত প্রশ্ন করিলাম, কিছু যদি মনে না করেন—  
না না, মনে করব কেন? বলুন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এ-সকল কি আপনার নিজেরই অভিজ্ঞতা,  
নিজেরই চিন্তার ফল?

ভদ্রলোক রাগ করিলেন। বলিলেন, কেন, এসব মিথ্যে নাকি? একটি  
অক্ষরও মিথ্যে নয় জানবেন।

না না, মিথ্যে ত বলিনি, তবু—

তবু আবার কি? আমাদের স্বামীজী কখনো মিথ্যে উচ্চারণ করেন না।  
তাঁর মত জ্ঞানী কেউ আছে নাকি?

প্রশ্ন করিলাম, স্বামীজী কে?

ভদ্রলোকের সঙ্গীটি ইহার উত্তর দিলেন। কহিলেন, স্বামী বজ্জানন্দ। বয়সে  
কম হলে কি হয়, অগাধ পণ্ডিত, অগাধ—

তাঁকে আপনারা চেনেন নাকি?

চিনিনে? বেশ! তিনি আমাদের আপনার লোক বললেই যে হয়! এঁর  
বাড়িতেই যে তাঁর প্রধান আড়ডা! এই বলিয়া তিনি সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া  
দিলেন।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাত্ম সংশোধন করিয়া কহিলেন, আড়ডা ব'লো না নরেন,—বল  
আশ্রম। মশাই, আমি গরীব, যা পারি তাঁর সেবা করি। কিন্তু এ যেন বিদুরের  
গৃহে শ্রীকৃষ্ণ। মানুষ ত নয়, মানুষের আকৃতিতে দেবতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সম্প্রতি কতদিন আছেন আপনাদের গ্রামে?

নরেন কহিলেন, প্রায় মাস-দুই হবে। এ অঞ্চলে না আছে একটা ডাঙ্কার-বদ্য, না আছে একটা ইস্কুল। এর জন্যেই তাঁর যত পরিশ্রম। আবার নিজেও একজন মস্ত ডাঙ্কার।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হইল। ইনিই সেই আনন্দ। সাঁইথিয়া স্টেশনে আহারাদি করাইয়া রাজলক্ষ্মী যাঁহাকে পরম সমাদরে গঙ্গামাটিতে আনিয়াছিল। সেই বিদায়ের ক্ষণটি মনে পড়িল। রাজলক্ষ্মীর সে কি কান্না! পরিচয় ত মাত্র দুদিনের, কিন্তু কত বড় মেহের বস্তুকেই যেন চোখের আড়ালে কোন্ ভয়ানক বিপদের মুখে পাঠাইয়া দিতেছে এমনি তাহার ব্যথা। ফিরিয়া আসিবার সে কি ব্যাকুল অনুনয়! কিন্তু আনন্দ সম্ম্যাসী। তাহার মমতাও নাই, মোহ নাই। নারী হৃদয়ের বেদনার রহস্য তাহার কাছে মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। তাই এতদিন এত কাছে থাকিয়াও অপ্রয়োজনে দেখা দিবার প্রয়োজন সে পলকেরে জন্যও অনুভব করে নাই, এবং ভবিষ্যতে হয়ত কখনো এই প্রয়োজনের হেতু আসিবে না।

কিন্তু রাজলক্ষ্মী এ কথা শুনিলে যে কত বড় আঘাত পাইবে, সে শুধু আমিই জানি।

নিজের কথা মনে পড়িল। আমারও বিদায়ের মুহূর্ত আসন্ন হইয়া আসিতেছে—যাইতেই হইবে তাহা প্রতিনিয়তই উপলব্ধি করিতেছি—আমার প্রয়োজন রাজলক্ষ্মীর সমাপ্ত হইয়া আসিতেছে, কেবল ইহাই ভাবিয়া পাই না, সেদিনের দিনান্তটা রাজলক্ষ্মীর কোথা দিয়া কেমন করিয়া অবসান হইবে।

গ্রামে পৌঁছিলাম। নাম মামুদপুর। বৃদ্ধ যাদব চক্ৰবৰ্তী তাহারই উল্লেখ করিয়া সগৰ্বে কহিলেন, নাম শুনে চমকাবেন না মশাই, আমাদের চতুঃসীমানার মধ্যে মুসলমানের ছায়াটুকু পর্যন্ত মাড়াতে হয় না। যেদিকে তাকান ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর সৎজাত। অনাচরণীয় জাতের বসতি পর্যন্ত নেই। কি বল নরেন, আছে?

নরেন সানন্দে সায় দিয়া বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিল, একটিও না,  
একটিও না। তেমন গাঁয়ে আমরা বাস করিনে।

হইতে পারে সত্য, কিন্তু এত খুশি হইবারই বা কি আছে ভাবিয়া পাইলাম  
না।

চক্ৰবৰ্তী-গৃহে বজ্জ্বানদেৱ সাক্ষাৎ মিলিল। হাঁ তিনিই বটে। আমাকে  
দেখিয়া তাঁৰ যেমন বিস্ময়, তেমনি আনন্দ।

দাদা যে! হঠাৎ এখানে? এই বলিয়া আনন্দ হাত তুলিয়া নমস্কার  
করিলেন। এই নরদেহধাৰী দেবতাকে সসম্মানে অভিবাদন করিতে দেখিয়া  
চক্ৰবৰ্তী বিগলিত হইয়া গেলেন। আশেপাশে আৱও অনেকগুলি ভক্ত ছিলেন,  
তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি যেই হই, সামান্য ব্যক্তি যে নয়, এ সম্বন্ধে  
কাহারও সংশয় রহিল না।

আনন্দ কহিলেন, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে দাদা?

উভৰ দিলেন চক্ৰবৰ্তী। আমাৰ যে দিন-দুই আহাৱ-নিদ্রা ছিল না, এবং  
বহু পুণ্যফলেই শুধু বাঁচিয়া আসিয়াছি ইহাই ব্যক্তি করিয়া কুলিদেৱ মধ্যে মড়কেৱ  
বিবৰণ এম্বনি সবিস্তাৱে বৰ্ণনা করিলেন যে, আমাৰ পৰ্যন্ত তাক লাগিয়া গেল।

আনন্দ বিশেষ কোন ব্যাকুলতা প্ৰকাশ করিলেন না। ঈষৎ হাসিয়া,  
অপৱেৱ কান বাঁচাইয়া কহিলেন, এতটা দু'দিনেৱ উপবাসে হয় না দাদা, একটু  
দীৰ্ঘকালেৱ দৱকাৱ। কি হয়েছিল? জুৱ?

বলিলাম, আশৰ্য নয়। ম্যালেৱিয়া ত আছেই।

চক্ৰবৰ্তী আতিথ্যেৱ ত্ৰিটি করিলেন না, খাওয়াটা আজ ভালৱকমই হইল।

আহাৱান্তে প্ৰস্থানেৱ আয়োজন করিতে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি  
হঠাৎ কুলিদেৱ মধ্যে জুটেছিলেন কি কৱে?

বলিলাম, দৈবেৱ চক্ৰান্তে।

আনন্দ সহায়ে কহিলেন, চক্রান্তই বটে। রাগের মাথায় বাড়িতে বোধ হয় খবরও দেননি?

বলিলাম, না, কিন্তু সে রাগ করে নয়। দেওয়া বাহ্যিক বলেই দিইনি। তা ছাড়া লোকই বা পেতাম কোথায়?

আনন্দ বলিলেন, সে একটা কথা। কিন্তু আপনার ভাল-মন্দ দিদির কাছে বাহ্যিক হয়ে উঠলো কবে থেকে? তিনি হয়ত ভয়ে ভাবনায় আধমরা হয়ে গেছেন।

কথা বাড়াইয়া লাভ নাই—এ প্রশ্নের আর জবাব দিলাম না। আনন্দ স্থির করিলেন জেরায় আমাকে একেবারে জন্ম করিয়া দিয়াছেন। তাই স্মিঞ্চ মৃদুহাস্যে ক্ষণকাল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়া কহিলেন, আপনার রথ প্রস্তুত, বোধ করি সন্ধ্যার পূর্বেই গিয়ে বাড়ি পৌঁছিতে পারবেন। আসুন, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি।

বলিলাম, কিন্তু বাড়ি যাবার পূর্বে কুলিদের একটু খবর নিয়ে যেতে হবে।

আনন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তার মানে রাগ এখনো পড়েনি। কিন্তু আমি বলি, দৈবের ঘড়্যন্ত্রে দুর্ভোগ যা কপালে ছিল তা ফলেচে। আপনি ডাক্তারও নয়, সাধুবাবাও নয়, গৃহী লোক। এখন খবর নেবার যদি কিছু থাকে ত সে ভার আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। কিন্তু গিয়ে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, তাঁর আনন্দ ভাল আছে।

দ্বারে গরুর গাড়ি তৈরি ছিল। গৃহস্থামী চক্ৰবৰ্তী আসিয়া সন্নির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন, এদিকে আর যদি কখনো আসা হয় এ বাড়িতে যেন পদধূলি দিয়া যান। তাঁহার আন্তরিক আতিথ্যের জন্য সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু দুর্লভ পদধূলির আশা দিতে পারিলাম না। বাঙলাদেশ আমাকে অচিরে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ কথা মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিলাম, সুতরাং কোনদিন কোন কারণেই এ প্রদেশে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা আমার পক্ষে সুদূরপরাহত।

গাড়িতে উঠিয়া বসিলে আনন্দ ছইয়ের মধ্যে মাথা গলাইয়া আস্তে আস্তে  
বলিলেন, দাদা, এদিকের জল বাতাস আপনার সহচে না। আমার হয়ে দিদিকে  
বলবেন, পশ্চিমমুলুকের মানুষ আপনি, আপনাকে যেন তিনি সে দেশেই নিয়ে  
যান।

বলিলাম, এ দেশে কি মানুষ বাঁচে না আনন্দ?

প্রত্যন্তেরে আনন্দ লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কহিলেন, না। কিন্তু এ  
নিয়ে তর্ক করে কি হবে দাদা, শুধু আমার সন্দৰ্ভ অনুরোধটা তাঁকে জানাবেন।  
বললেন, আনন্দ সন্ধ্যাসীর চোখ নিয়ে না দেখলে এর সত্যতা বোৰা যাবে না।

মৌন হইয়া রহিলাম। কারণ রাজলক্ষ্মীকে এ অনুরোধ জানানো যে আমার  
পক্ষে কত কঠিন, আনন্দ তাহার কি জানে?

৭৪৬

গাড়ি ছাড়িলে তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কই, আমাকে ত একবারও যাবার  
নিমন্ত্রণ করলেন না দাদা?

মুখে বলিলাম, তোমার কত কাজ, তোমাকে নিমন্ত্রণ করা কি সোজা  
ভাই! কিন্তু মনে মনে আশঙ্কা ছিল ইতিমধ্যে পাছে কোনদিন তিনি নিজেই গিয়া  
উপস্থিত হন। এই তীক্ষ্ণধী সন্ধ্যাসীর দৃষ্টি হইতে তখন কিছুই আর আড়ালে  
রাখিবার জো থাকিবে না। একদিন তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না, মনে মনে  
হাসিয়া বলিতাম, আনন্দ, এ জীবনের অনেক কিছুই বিসর্জন দিয়াছি তাহা  
অস্বীকার করিব না, কিন্তু আমার লোকসানের সেই সহজ হিসাবটাই শুধু দেখিতে  
পাইলে; কিন্তু তোমার দেখার বাহিরে যে আমার সংগ্রহের অক্ষটা একেবারে  
সংখ্যাতীত হইয়া রহিল! মৃত্যু-পারের সে পাথেয় যদি আমার জমা থাকে এদিকের  
কোন ক্ষতিকেই আমি গণনা করিব না। কিন্তু, আজ? বলিবার কথা কি ছিল?  
তাই নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া চক্ষের পলকে মনে হইল ঐশ্বর্যের সেই অপরিমেয়  
গৌরব যদি সত্যি আজ মিথ্যা মরীচিকায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে ত এই গলগ্রহ

ভগ্নস্বাস্থ্য অবাঞ্ছিত গৃহস্বামীর ভাগ্যে অতিথি আহ্বান করিবার বিড়ম্বনা যেন না আর ঘটে।

আমাকে নীরব দেখিয়া আনন্দ তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, আচ্ছা, নৃতন করে না-ই যেতে বললেন, আমার সাবেক নিমন্ত্রণ পুঁজি আছে, আমি সেই দাবিতেই হাজির হতে পারব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কাজটা কি নাগাদ হতে পারবে?

আনন্দ হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই দাদা, আপনাদের রাগ পড়বার ভিতরে গিয়ে উত্ত্যক্ত করব না—তার পরেই যাব।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। রাগ করিয়া যে আসি নাই তাহা বলিতেও ইচ্ছা হইল না।

পথ কম নহে, গাড়োয়ান ব্যস্ত হইতেছিল, গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তিনি আর-একবার নমস্কার করিয়া মুখ সরাইয়া লইলেন।

এ অঞ্চলে যানবাহনের প্রচলন নাই, সে উদ্দেশ্যে পথ তৈরি করিয়াও কেহ রাখে নাই; গো-শকট মাঠ ভাসিয়া উঁচু নিচু খানাখন্দ অতিক্রম করিয়া যদৃচ্ছা চলিতে লাগিল। ভিতরে অর্ধশায়িতভাবে পড়িয়া আনন্দ সন্ধ্যসীর কথার সুরটাই আমার কানের মধ্যে ঘূরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাগ করিয়া আসি নাই, ও বস্তুটা লাভেরও নয়—লোভেরও নয়, কিন্তু কেবলি মনে হইতে লাগিল, এও যদি সত্য হইত। কিন্তু সত্য নয়, সত্য হইবার পথ নাই। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, রাগ করিব কাহার উপরে? কিসের জন্য? কি তাহার অপরাধ? বরনার জলধারার অধিকার লইয়াই বিবাদ করা চলে, কিন্তু উৎসমুখে জলই যদি শেষ হইয়া থাকে ত শুষ্ক খাদের বিরুদ্ধে মাথা খুঁড়িয়া মরিব কোনু ছলনায়?

এমনি করিয়া কতক্ষণ যে কাটিয়াছিল হঁশ করি নাই। হঠাৎ খালের মধ্যে গাড়ি গড়াইয়া পড়ায় ঝাঁকুনি খাইয়া উঠিয়া বসিলাম। সুমুখের চট্টের পর্দা সরাইয়া মুখ বাঢ়াইয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা হয়-হয়। গাড়ির চালকটি ছেলেমানুষ, বোধ করি

বছর পনরু বেশি হইবে না। বলিলাম, ওরে, এত জায়গা থাকতে খানায় নামলি  
কেন?

ছেলেটি তাহার রাঢ়দেশের ভাষায় তৎক্ষণাতে জবাব দিল, নামবো কিসের  
তরে? বলদ আপনি নেমে গেল।

নেমে গেল কি রে? তুই কি গরু সামলাতে পারিস নে?

না। বলদ নতুন যে।

খুব ভাল। কিন্তু এদিকে যে অন্ধকার হয়ে এল, গঙ্গামাটি আর কতদূরে?  
তার কি জানি! গঙ্গামাটি কখনো আসচি নাকি?

বলিলাম, কখনো যদি আসনি বাবা, তবে আমার উপরেই বা এত প্রসন্ন  
হলে কেন? কাউকে জিজ্ঞেস করু না রে, গঙ্গামাটি আর কতদূরে?

উত্তরে সে কহিল, এদিকে লোক আছে নাকি? নেই।

ছেলেটার আর যাই দোষ থাক, জবাবগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি প্রাঞ্জল।  
জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই গঙ্গামাটির পথ চিনিস ত?

তেমনি সুস্পষ্ট উত্তর। কহিল, না।

তবে এলি কেন রে?

মামা বললে, বাবুকে নিয়ে যা। এই সোজা দক্ষিণে গিয়ে পুবে বাঁক  
ধরলেই গঙ্গামাটি। যাবি আর আসবি।

সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি, আর বেশি বিলম্বও নাই। এতক্ষণ ত চোখ বুজিয়া  
নিজের চিন্তাতেই মশ্শ ছিলাম, ছেলেটার কথায় এবার ভয় পাইয়া বলিলাম, এই  
সোজা দক্ষিণের বদলে উত্তরে গিয়ে পশ্চিমে বাঁক ধরিস নি ত রে?

ছেলেটা কহিল, তার কি জানি!

বলিলাম, জানিস নে ত চল দু'জনে অন্ধকারে যমের বাড়ি যাই। হতভাগা,  
পথ চিনিস নে ত এলি কেন? তোর বাপ আছে?

না।

মা আছে?

না, মরে গেছে।

আপদ গেছে। চল্ল, তা হলে আজ রাত্রে তাদের কাছেই যাওয়া যাক! তোর মামার শুধু বুদ্ধি-বিবেচনা নয়, দয়ামায়া আছে।

আর খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পরে ছেলেটা কাঁদিতে লাগিল, জানাইল যে আর সে যাইতে পারিবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, থাকবি কোথায়?

সে জবাব দিল যে, সে ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু এই অবেলা সন্ধ্যাবেলায় আমার উপায়?

পূর্বে বলিয়াছি ছেলেটি স্পষ্টবাদী। কহিল, তুমি বাবু নেবে যাও। মামা বলে দেছে ভাড়া পাঁচ সিকে। কম দিলে আমাকে মারবে।

কহিলাম, আমার জন্যে তুমি মার খাবে সে কেমন কথা! একবার ভাবিলাম, এই গাড়িতেই যথাস্থানে ফিরিয়া যাই। কিন্তু কেমন যেন প্রবৃত্তি হইল না। রাত্রি আসন্ন, স্থান অপরিচিত, লোকালয় যে কোথায় এবং কতদূরে বুঝিবার জো নাই; কেবল সুমুখে একটা বড় আমকাঁঠালের বাগান দেখিয়া অনুমান করিলাম গ্রাম বোধ হয় খুব বেশি দূরে হইবে না। আশ্রয় হয়ত একটা মিলিবে। আর যদি নাই-ই মিলে তাহাতেই-বা কি? নাহয়, এমনি করিয়াই এবার যাত্রা শুরু হইবে।

নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। দেখিলাম, ছেলেটির শুধু কথাই নয়, কাজের ধারাও চমৎকার স্পষ্ট। নিমেষে গাড়ির মুখ ফিরাইয়া লইল, বৃষ্যুগল গৃহ প্রত্যাগমনের ইঙ্গিতমাত্র চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

## তের

সন্ধ্যা শেষ হইল বলিয়া, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতে তখনও বিলম্ব ছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে যেমন করিয়া হটক আশ্রয় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এ কাজ আমার পক্ষে নৃতনও নহে, কঠিন বলিয়াও কোনদিন ভয় হয় নাই। কিন্তু আজ সেই আমবাগানের পাশ দিয়া পায়ে-চলা পথের রেখা ধরিয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন কেমন যেন উদ্বিঘ্ন লজ্জায় মনের ভিতরটা ভরিয়া আসিতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু এখন যে পথে চলিয়াছি সে যে বাঙ্গলার রাঢ় দেশ। ইহার সম্বন্ধে ত কোন অভিজ্ঞতা নাই! কিন্তু একথা স্মরণ হইল না যে, সে-সকল দেশের সম্বন্ধেও একদিন এমনি অনভিজ্ঞই ছিলাম, জ্ঞান যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা এমনি করিয়াই আপনাকে সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, অপরে করিয়া দেয় নাই।

আসল কথা, কিসের জন্য যে সেদিন দ্বার আমার সর্বত্রই মুক্ত ছিল এবং আজ সঙ্কোচ ও দ্বিধায় তাহা অবরুদ্ধপ্রায়, সেই কথাটাই ভাবিয়া দেখিলাম না। সেদিনের সে-যাওয়ার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না, কিন্তু আজ যাহা করিতেছি সে শুধু সেদিনের নকল মাত্র। সেদিন বাহিরের অপরিচিতই ছিল আমার পরমাত্মায়, তাদের পরে নিজের ভারাপণ করিতে তখন বাধে নাই, কিন্তু সেই ভার আজ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি একাত্মভাবে ন্যস্ত হইয়া সমস্ত ভারকেন্দ্রটাই অন্যত্র অপসারিত হইয়া গেছে। তাই আজ অজানা-অচেনার মধ্যে চলিবার পা-দুটো আমার প্রতিপদেই ভারি হইয়া আসিতেছে। সেদিনের সেই-সব সুখ-দুঃখের ধারণায় আজ কতই না প্রভেদ! তথাপি চলিতে লাগিলাম। এই বনের মধ্যে

ରାତ୍ରିଯାପନେର ସାହସଓ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିଓ ଗେଛେ—ଆଜିକାର ମତ କିଛୁ ଏକଟା ପାଇତେଇ  
ଯେ ହଇବେ ।

ଭାଗ୍ୟ ଭାଲ, ଖୁବ ବେଶ ଦୂର ହାଁଟିତେ ହଇଲ ନା । ପତ୍ରଘନ କି ଏକଟା ଗାଛେର  
ଫାଁକ ଦିଯା ଅଟ୍ଟାଲିକାର ମତ ଦେଖା ଗେଲ । ସେଇ ପଥଟୁକୁ ଘୁରିଯା ତାହାର ସମୁଖେ ଗିଯା  
ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲାମ ।

ଅଟ୍ଟାଲିକାଇ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ହଇଲ ଜନହୀନ । ସୁମୁଖେ ଲୋହାର ଗେଟ, କିନ୍ତୁ  
ଭାଙ୍ଗା । ଶିକଗୁଳାର ଅଧିକାଂଶଇ ଲୋକେ ଖୁଲିଯା ଲହିଯା ଗିଯାଛେ । ଭିତରେ ତୁକିଯା  
ପଡ଼ିଲାମ । ଖୋଲା ବାରାନ୍ଦା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଟୋ ଘର, ଏକଟା ବନ୍ଧ ଏବଂ ଯେଟା ଖୋଲା ତାହାର  
ଦ୍ୱାରେ ଆସିବାମାତ୍ର ଏକଜନ କକ୍ଷାଲସାର ମାନୁଷ ବାହିରେ ଆସିଯା ଦାଁଡାଇଲ । ଦେଖିଲାମ,  
ଘରେର ଚାର କୋଣେ ଚାରିଟା ଲୋହାର ଖାଟ—ଏକଦିନ ଗଦି ପାତା ଛିଲ, କିନ୍ତୁ କାଲକ୍ରମେ  
ଚଟଗୁଲା ଲୁଣ୍ଡ ହଇଯାଛେ, ଆଛେ ଶୁଦ୍ଧ ଛୋବଡ଼ାର କିଛୁ କିଛୁ ତଥନେ ଅବଶିଷ୍ଟ, ଏକଟା  
ତେପାଇ, ଗୋଟା-କ୍ୟେକ ଟିନ ଓ ଏନାମେଲେର ପାତ୍ର, ତାହାଦେର ଶ୍ରୀ ଓ ବର୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା  
ବର୍ଣନାତୀତ ଅନୁମାନ ଯାହା କରିଯାଇଲାମ, ତାହାଇ ବଟେ । ବାଡ଼ିଟି ହାସପାତାଳ । ଏଇ  
ଲୋକଟି ବିଦେଶୀ, ଚାକରି କରିତେ ଆସିଯା ପୌଡ଼ିତ ହଇଯା ଦିନପନର ହଇଲ ଇନ୍ଦ୍ରୋର  
ପେଶେନ୍ଟ ହଇଯା ଆଛେ । ଲୋକଟିର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଆଲାପ ଏହିରୂପ ସ୍ଥିତିଲ—

ବାବୁମଶାୟ, ଗୋଟା-ଚାରେକ ପଯସା ଦେବେନ?

କେନ ବଲ ତ?

କଷିଦେଯ ମରି ବାବୁ, ମୁଡ଼ିଟୁଡ଼ି ଦୁଟୋ କିନେ ଖାବ ।

ଜିଞ୍ଜାସା କରିଲାମ, ତୁମି ରୋଗୀ-ମାନୁଷ, ଯା ତା ଖାଓଯା ତୋମାର ବାରଣ ନୟ?  
ଆଜେ, ନା ।

ଏଖାନେ ତୋମାକେ ଖେତେ ଦେଯ ନା?

ଲୋକଟି ଜାନାଇଲ ଯେ, ସକାଳେ ଏକବାଟି ସାଣ ଦିଯାଛିଲ ତାହା ସେ କୋନ୍‌  
କାଳେ ଖାଇଯା ଫେଲିଯାଛେ । ତଥନ ହଇତେ ସେ ଗେଟେର କାଛେ ବସିଯା ଥାକେ, ଭିକ୍ଷା ପାଯ  
ତ ଆର ଏକବେଳା ଖାଓଯା ଚଲେ, ନା ହୟ ତ ଉପବାସେ କାଟେ । ଡାକ୍ତାର ଏକଜନ

আছেন, বোধ হয় যৎসামান্য হাতখরচা মাত্র বন্দোবস্ত আছে, সকালবেলায় একবার করিয়া তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। আর একটি লোক নিযুক্ত আছে, তাহাকে কম্পাউণ্ডার হইতে শুরু করিয়া লঠনে তেল দেওয়া পর্যন্ত সমস্তই করিতে হয়। পূর্বে একজন চাকর ছিল বটে, কিন্তু মাস-ছয়েক হইল মাহিনা না পাওয়ায় রাগ করিয়া চলিয়া গেছে, এখনও নৃতন কেহ ভর্তি হয় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ঝাঁটপাট কে দেয়?

লোকটি বলিল, আজকাল আমিই দি। আমি চলে গেলে আবার যে নতুন রোগী আসবে সেই দেবে।

কহিলাম, বেশ ব্যবস্থা। হাসপাতালটি কার জান?

লোকটি আমাকে ওদিকের বারান্দায় লইয়া গেল। কড়ি হইতে একটি টিনের লঠন ঝুলিতেছে। কম্পাউণ্ডারবাবু বেলাবেলি সেটি জ্বালিয়া দিয়া কাজ সারিয়া ঘরে চলিয়া গেছেন। দেয়ালের গায়ে আঁটা মস্ত একটি মর্মর প্রস্তর-ফলক—সোনার জল দিয়া ইংরাজী অক্ষরে আগাগোড়া খোদাই-করা সন-তারিখ সংবলিত শিলালিপি। জেলার যে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট দয়া করিয়া ইহার উদ্বোধনকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম-ধার সর্বাগ্রে, নীচে প্রশংসি-পাঠ। কে একজন রায়বাহাদুর তাঁহার রত্নগভী মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে জননী-জন্মভূমিতে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর শুধু মাতা-পুত্রই নয়, উর্ধ্বতন তিন-চারি পুরুষের বিবরণ। বোধ করি ছোটখাটো কুলকারিকা বলিলেও অভুক্তি হয় না। লোকটি যে রাজসরকারে রায়বাহাদুরির যোগ্য তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ টাকা নষ্ট করার দিক দিয়া ত্রুটি ছিল না। ইট ও কাঠ এবং বিলাতের আমদানি লোহার কড়ি-বরগার বিল মিটাইয়া অবশিষ্ট যদি বা কিছু থাকিয়া থাকে সাহেব শিল্পীর হাতে বংশগৌরব লিখাইতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। ডাক্তার ও রোগীর ঔষধ-পথ্যাদির ব্যাপারের ব্যবস্থা করিবার হয়ত টাকাও ছিল না, ফুরসতও ছিল না।

প্রশ্ন করিলাম, রায়বাহাদুরের বাড়ি কোথায়?

সে কহিল, বেশি দূরে নয়, কাছেই।

এখন গেলে দেখা হবে?

আজ্জে না, বাড়িতে তালাবন্ধ, তাঁরা সব কলকাতায় থাকেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কবে আসেন জান?

লোকটি বিদেশী, সঠিক সংবাদ দিতে পারিল না, তবে কহিল যে, বছর-তিনেক পূর্বে একবার আসিয়াছিলেন একথা সে ডাক্তারবাবুর মুখে শুনিয়াছে।  
সর্বত্র একই দশা, অতএব দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু ছিল না।

৭৫০

এদিকে অপরিচিত স্থানে সন্ধ্যা উভীর্ণ হইতেছিল, সুতরাং রায়বাহাদুরের  
কার্যকলাপ পর্যালোচনা করার চেয়ে জরুরি কাজ বাকি ছিল। লোকটিকে কিছু  
পয়সা দিয়া জানিয়া লইলাম যে, নিকটই একঘর চক্ৰবৰ্তী ব্ৰাহ্মণের বাটী। তাঁহারা  
অতিশয় দয়ালু, এবং রাত্রিটার মত আশ্রয় মিলিবেই। সে নিজেই রাজি হইয়া  
আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, কহিল, তাহাকে ত মুদিৰ দোকানে যাইতেই হইবে,  
একটুখানি ঘুৱপথ, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না।

চলিতে চলিতে তাহার কথাবার্তায় বুঝিলাম, এই দয়ালু ব্ৰাহ্মণ পরিবার  
হইতে সে পথ্যাপথ্য অনেক রাত্রিই গোপনে সংগ্ৰহ কৰিয়া খাইয়াছে।

মিনিট-দশেক হাঁটিয়া চক্ৰবৰ্তীর বহিৰ্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।  
আমার পথপ্রদর্শক ডাক দিয়া কহিল, ঠাকুৱমশাই ঘৰে আছেন?

কোন সাড়া আসিল না। ভাবিয়াছিলাম কোন সম্পৰ্ক ব্ৰাহ্মণ-বাটীতে  
আতিথ্য লইতে চলিয়াছি, কিন্তু ঘৰদ্বাৰের শ্ৰী দেখিয়া মনটা দমিয়া গেল। ওদিকে  
সাড়া নাই, এদিকে আমার সঙ্গীর অধ্যবসায়ও অপৰাজেয় তাহা না হইলে এই  
গ্ৰাম ও হাসপাতালে বহুদিন পূৰ্বেই তাহার রূপ-আত্মা স্বর্গীয় হইয়া তবে ছাড়িত।  
সে ডাকেৰ উপর ডাক দিতেই লাগিল।

হঠাতে জবাব আসিল, যা যা, আজ যা। যা বলচি।

লোকটি কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, প্রত্যন্তেরে কহিল, কে এসেচে বার হয়ে দেখুন না।

কিন্তু বিচলিত হইয়া উঠিলাম আমি। যেন, চক্ৰবৰ্তীৰ পৱনপূজ্য গুৱামুদ্বোধ গৃহ পৰিত্ব কৱিতে অক্ষমাত্র আবিৰ্ভূত হইয়াছি।

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর মুহূৰ্তে মোলায়েম হইয়া উঠিল—কে রে ভীম? বলিতে বলিতে গৃহস্থামী দ্বারপথে দেখা দিলেন। পৱনেৰ বন্ধুখানি মলিন এবং অতিশয় ক্ষুদ্ৰ, অন্ধকারে তাঁহার বয়স অনুমান কৱিতে পারিলাম না, কিন্তু খুব বেশি বলিয়াও মনে হইল না। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা কৱিলেন, কে রে ভীম?

বুঝিলাম, আমাৰ সঙ্গীৰ নাম ভীম। ভীম বলিল, ভদ্রলোক, বামুন। পথ ভুলে হাসপাতালে গিয়ে হাজিৰ। আমি বলিলাম, ভয় কি, চলুন না ঠাকুৰমশায়েৰ বাড়িতে রেখে আসি, গুৱাহাটী আদৰে থাকবেন।

বস্তুতঃ ভীম অতিশয়োক্তি কৰে নাই, চক্ৰবৰ্তী আমাকে পৱন সমাদৰে গ্ৰহণ কৱিলেন। স্বহস্তে মাদুৰ পাতিয়া বসিতে দিলেন এবং তামাক ইচ্ছা কৱি কি না জানিয়া লইয়া ভিতৰে গিয়া নিজেই তামাক সাজিয়া আনিলেন।

বলিলেন, চাকৰগুলো সব জুৱে পড়ে রয়েছে—কৱি কি!

শুনিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, এক চক্ৰবৰ্তীৰ গৃহ ছাড়িয়া আৱ এক চক্ৰবৰ্তীৰ গৃহে আসিয়া পড়িলাম। কে জানে আতিথ্যটা এখানে কিৰূপ দাঁড়াইবে। তথাপি ছঁকাটা হাতে পাইয়া টানিবাৰ উপক্ৰম কৱিয়াছি, সহসা অন্তৱাল হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠেৰ প্ৰশংসন আসিল, হাঁ গা, কে মানুষটি এলো?

অনুমান কৱিলাম, ইনিই গৃহিণী। জবাব দিতে চক্ৰবৰ্তীৱাই শুধু গলা কঁপিল না, আমাৰও যেন হৎকম্প হইল।

তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, মস্ত লোক গো মস্ত লোক। অতিথি, ব্রাহ্মণ—নারায়ণ! পথ ভুলে এসে পড়েচেন—শুধু রাত্রিটা—ভোর না হতেই আবার সকালেই চলে যাবেন।

ভিতর হইতে জবাব আসিল, হাঁ সবাই আসে পথ ভুলে! মুখপোড়া অতিথের আর কামাই নেই। ঘরে না আছে একমুঠো চাল, না আছে একমুঠো ডাল—খেতে দেবে কি উন্ননের পাঁশ?

আমার হাতের ছঁকা হাতেই রহিল। চক্ৰবৰ্তী কহিলেন, আহা, কি যে বল তুমি! আমার ঘরে আবার চাল-ডালের অভাব! চল চল, ভেতরে চল, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

চক্ৰবৰ্তীগৃহিণী ভিতরে যাইবার জন্য বাহিরে আসেন নাই। বলিলেন, কি ঠিক করে দেবে শুনি? আছে ত খালি মুঠোখানেক চাল, ছেলেমেয়ে-দুটোকে রাত্তিরের মত সেন্দু করে দেবো। বাছাদের উপুসী রেখে ওকে দেব গিলতে? মনেও ক'রো না।

মা ধৰিব্বি, দ্বিধা হও! না না করিয়া কি একটা বলিতে গেলাম, কিন্তু চক্ৰবৰ্তীৰ বিপুল ক্ৰোধে তাহা ভাসিয়া গেল। তিনি তুমি ছাড়িয়া তখন তুই ধৰিলেন, এবং অতিথিসৎকার লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে যে আলাপ শুৱ হইল, তাহার ভাষাও যেমন গভীৰতাও তেম্নি। আমি টাকা লইয়া বাহিৰ হই নাই, পকেটে সামান্য যাহা-কিছু ছিল তাহাও খৱচ হইয়া গিয়াছিল। শুধু গলায় সোনার বোতাম ছিল, কিন্তু কেবা কাহার কথা শোনে! ব্যাকুল হইয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে চক্ৰবৰ্তী সজোৱে আমার হাত চাপিয়া ধৰিয়া কহিলেন, অতিথি নারায়ণ। বিমুখ হয়ে গেলে গলায় দড়ি দেব।

গৃহিণী কিছুমাত্ৰ ভীত হইলেন না, তৎক্ষণাৎ চ্যালেঞ্জ অ্যাক্সেপ্ট করিয়া কহিলেন, তা হলে ত বাঁচি। ভিক্ষে-সিক্ষে করে বাছাদের খাওয়াই।

এদিকে আমার ত প্রায় হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম করিয়াছিল; হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, চক্ৰবৰ্তীমশাই, সে নাহয় একদিন ভেবেচিত্তে ধীরে-সুস্থে করবেন—কড়াইভাল কিন্তু সম্প্রতি আমাকে হয় ছাড়ুন, নাহয় একগাছা দড়ি দিন, ঝুলে পড়ে আপনার আতিথ্যের দায় থেকে মুক্ত হই।

চক্ৰবৰ্তী অন্তঃপুর লক্ষ্য করিয়া হাঁকিয়া বলিলেন, আক্লেন হ'ল? বলি শিখলি কিছু?

পাল্টা জবাব আসিল, হ্যাঁ। মুহূৰ্ত-কয়েক পরে ভিতর হইতে শুধু একখানি হাত বাহির হইয়া, দুম করিয়া একটা পিতলের ঘড়া বসাইয়া দিয়া আদেশ হইল, যাও, শ্রীমন্তির দোকানে এটা রেখে চাল ডাল তেল নুন নিয়ে এসো গে। দেখো যেন মিন্সে হাতে পেয়ে সব কেটে না নেয়।

চক্ৰবৰ্তী খুশী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আৱে, না না, একি ছেলের হাতের নাড়ু?

চট করিয়া ছুঁকাটা তুলিয়া লইয়া বার-কয়েক টান দিয়া কহিলেন, আগুন নিবে গেছে। গিন্ধী, দাও দিকি কলকেটা পালটে, একবার খেয়েই যাই। যাৰ আৱ আসব। এই বলিয়া তিনি কলিকাটা হাতে লইয়া অন্দৰের দিকে বাঢ়াইয়া দিলেন।

ব্যস, স্বামী-স্ত্রীতে সন্ধি হইয়া গেল। গৃহিণী তামাক সাজিয়া দিলেন, কৰ্তা প্রাণ ভৱিয়া ধূমপান কৰলেন। প্ৰসন্নচিত্তে ছুঁকাটি আমার হাতে দিয়া ঘড়া হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চাল আসিল, ডাল আসিল, তেল আসিল, নুন আসিল, যথাসময়ে রঞ্জনশালায় আমার ডাক পড়িল। আহাৰে বিন্দুমাত্ৰ রুচি ছিল না, তথাপি নিঃশব্দে গেলাম। কাৰণ, আপত্তি কৰা শুধু নিষ্ফল নয়, না বলিতে আমার আতঙ্ক হইল। এ জীবনে বহুবার বহুস্থানেই আমাকে অ্যাচিত আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিতে হইয়াছে, সৰ্বত্রই সমাদৃত হইয়াছি বলিলে অসত্য বলা হইবে, কিন্তু এমন সংবৰ্ধনাও কখনো ভাগ্যে জুটে নাই; কিন্তু শিক্ষার তখনও বাকি ছিল। গিয়া দেখিলাম, উন্নুন

জুলিতেছে, এবং অন্নের পরিবর্তে কলাপাতায় চাল ডাল আলু ও একটা পিতলের হাঁড়ি।

চক্ৰবৰ্তী উৎসাহভৱে কহিলেন, দিন হাঁড়িটা চড়িয়ে, চটপট হয়ে যাবে। খাঁড়ি-মুসুরের খিচুড়ি, আলুভাতে, তোফা লাগবে খেতে। ঘি আছে, গৱাম গৱাম—

চক্ৰবৰ্তীৰ রসনা সরস হইয়া উঠিল কিন্তু আমাৰ কাছে ব্যাপারটা আৱাও জটিল হইয়া উঠিল। কিন্তু পাছে আমাৰ কোন কথায় বা কাজে আবাৰ একটা প্ৰলয়কাণ্ড বাধিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার নিৰ্দেশমত হাঁড়ি চড়াইয়া দিলাম, চক্ৰবৰ্তীগৃহণী আড়ালে ছিলেন, স্ত্ৰীলোকেৰ চক্ষে আমাৰ অপটু হস্ত গোপন রহিল না, এবাৰ তিনি আমাকেই উদ্দেশ কৱিয়া কথা কহিলেন।

তাঁহার আৱ যা দোষই থাক, সঙ্কোচ বা চক্ষুলজ্জা বলিয়া যে শব্দগুলা অভিধানে আছে, তাহাদেৱ অতিবাহুল্য দোষ যে ইঁহার ছিল না একথা বোধ কৱি অতি বড় নিন্দুকেও স্বীকাৰ না কৱিয়া পাৰিবে না। তিনি কহিলেন, তুমি ত বাছা রান্নার কিছুই জান না।

আমি তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইয়া বলিলাম, আজ্ঞে না।

তিনি বলিলেন, কৰ্তা বলছিলেন বিদেশী লোক, কে বা জানবে, কে বা শুনবে। আমি বললাম, তা হতে পাৱে না। একটা রান্নিৰেৱ জন্যে একমুঠো ভাত দিয়ে আমি মানুষেৱ জাত মাৰতে পাৱে না। আমৰা বাবা অগ্ৰদানী বামুন।

আমাৰ যে আপত্তি নাই, এবং ইহা অপেক্ষাও গুৱতৰ পাপ ইতিপূৰ্বে কৱিয়াছি—একথা বলিতেও কিন্তু আমাৰ সাহস হইল না পাছে স্বীকাৰ কৱিলৈও কোন বিভাট ঘটে। মনেৰ মধ্যে শুধু একটিমাত্ৰ চিন্তা ছিল কেমন কৱিয়া রাত্ৰি কাটিবে এবং এই বাড়িৰ নাগপাশ হইতে অব্যাহতি লাভ কৱিব। সুতৱাং, নিৰ্দেশমত খিচুড়িও রাঁধিলাম, এবং পিণ্ড পাকাইয়া গৱাম ঘি দিয়া তোফা গিলিবাৰ চেষ্টাও কৱিলাম। এ অসাধ্য যে কি কৱিয়া সম্পন্ন কৱিলাম আজও বিদিত নই,

কেবলই মনে হইতে লাগিল চাল-ডালের তোফা পিণ্ড পেটের মধ্যে গিয়া পাথরের পিণ্ড পাকাইতেছে।

অধ্যবসায়ে অনেক-কিছুই হয়, কিন্তু তাহারও সীমা আছে। হাতমুখ ধুইবারও অবসর মিলিল না, সমস্ত বাহির হইয়া গেল। ভয়ে শীর্ণ হইয়া উঠিলাম, কারণ এগুলো যে আমাকেই পরিষ্কার করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে শক্তি আর ছিল না। চোখের দৃষ্টি বাপসা হইয়া উঠিল, কোনমতে বলিয়া ফেলিলাম, কোথাও আমাকে একটু শোবার জায়গা দিন, মিনিট-পাঁচেক সামলে নিয়েই আমি সমস্ত পরিষ্কার করে দেব। ভাবিয়াছিলাম প্রত্যন্তেরে কি যে শুনিব জানি না, কিন্তু আশ্চর্য এই চক্ৰবৰ্তীগৃহিণীৰ ভয়ানক কংগুস্বর অকস্মাৎ কোমল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে তিনি অন্ধকার হইতে আমার সম্মুখে আসিলেন। বলিলেন, তুমি কেন বাবা পরিষ্কার করতে যাবে, আমিই সব সাফ করে ফেলিচি। বাইরের বিছানাটা এখনও করে উঠতে পারিনি, ততক্ষণ এসো তুমি আমার ঘরে গিয়ে শোবে।

না বলিবার সামর্থ্যও নাই, নীরবে অনুসরণ করিয়া তাঁহারই শতচিন্ময় আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাসিল, তখন মাথা তুলিবারও শক্তি ছিল না এম্বনি জ্বর।

সহজে চোখ দিয়া আমার জল পড়ে না, কিন্তু এত বড় অপরাধের যে এখন কেমন করিয়া কি জবাবদিহি করিব এই কথা ভাবিয়া নিছক ও নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কেই আমার দুই চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল বভুবার বভু নিরন্দেশ-যাত্রাতেই বাহির হইয়াছি, কিন্তু এতখানি বিড়স্বনা জগদীশ্বর আর কখনও অদ্বৃষ্টে লিখেন নাই। আর একবার প্রাণপণে উঠিয়া বসিবার প্রয়াস করিলাম, কিন্তু কোনমতেই মাথা সোজা করিতে না পারিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আজ চক্রবর্তীগৃহিণীর সহিত মুখেমুখি আলাপ হইল। বোধ হয় অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে দিয়াই নারীর সত্যকার গভীর পরিচয়টুকু লাভ করা যায়। তাঁহাকে চিনিয়া লইবার এমন কষ্টপাথরও আর নাই, তাঁহার হস্তয় জয় করিবার এতবড় অস্ত্রও পুরুষের হাতে আর দ্বিতীয় নাই। আমার শ্যাপার্শে আসিয়া বলিলেন, ঘুম ভেঙ্গেচে বাবা?

চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহার বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি—কিছু বেশি হইতেও পারে। রঙটি কালো, কিন্তু চোখমুখ সাধারণ ভদ্র গৃহস্থদের মেয়েদের মতই। রূক্ষতার কোথাও কিছু নাই, আছে শুধু সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া গভীর দারিদ্র্য ও অনশনের চিহ্ন আঁকা—চোখ মেলিয়া চাহিলেই তাহা ধরা পড়ে। কহিলেন, কাল আঁধারে দেখতে পাইনি বাবা, কিন্তু আমার বড়ছেলে বেঁচে থাকলে তার তোমার বয়সই হ'ত।

ইহার আর উত্তর কি। তিনি হঠাতে কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, জ্বরটা এখনও খুব রয়েচে।

আমি চোখ বুজিয়া ছিলাম, চোখ বুজিয়াই কহিলাম, কেউ একটুখানি সাহায্য করলে বোধ হয় হাসপাতালে যেতে পারব—সে ত আর বেশি দূর নয়।

তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার কথায় তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন বেদনায় ভরিয়া গেল। বলিলেন, দুঃখের জ্বালায় কাল কি-একটা বলেচি বলেই বাবা, রাগ করে ওই যমপুরীতে চলে যাবে? আর যাবে বলেনেই আমি যেতে দেব? এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, আতুরের নিয়ম নেই বাবা। এই যে লোকে হাসপাতালে গিয়ে থাকে সেখানে কাদের ছোঁওয়া খেতে হয় বল ত? কিন্তু তাতে কি জাত যায়? আমি সাগুবার্লি তৈরি করে দিলে কি তুমি খাবে না?

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম যে, বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই এবং শুধু পীড়িত বলিয়া নয়, অত্যন্ত নীরোগ শরীরেও আমার ইহাতে বাধা হয় না।

অতএব রহিয়া গেলাম। বোধ হয় সর্বসমেত দিন-চারেক ছিলাম। তথাপি সেই চারিদিনের স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়। জ্বর একদিনেই গেল, কিন্তু বাকী দিন-কয়টা দুর্বল বলিয়া তাঁহারা নড়িতে দিলেন না। কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়াই এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের দিন কাটিতেছে এবং দুর্গতিকে সহস্রগুণে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে বিনাদোষে সমাজের অর্থহীন পীড়ন। চক্ৰবৰ্তীগৃহিণী তাঁহার অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যেও এতটুকুও অবসর পাইলে আমার কাছে আসিয়া বসিতেন। মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেন, ঘটা করিয়া রোগের পথ্য যোগাইতে পারিতেন না, এই ক্রটি যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবার কি ঐকান্তিক চেষ্টাই না তাঁহার দেখিতে পাইতাম। পূর্বে অবস্থা সচ্ছল ছিল, জমিজমাও মন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁহার নির্বোধ স্বামীকে লোকে প্রতারিত করিয়াই এই দুঃখে ফেলিয়াছে। তাহারা আসিয়া ঝণ চাহিত, বলিত, দেশে বড়লোক তের আছে, কিন্তু এত বড় বুকের পাটা কয়জনের আছে? অতএব এই বুকের পাটা সপ্রমাণ করিতে তিনি ঝণ করিয়া ঝণ দিতেন। প্রথমে হ্যান্ডনেট কাটিয়া এবং পরে স্ত্রীকে গোপন করিয়া সম্পত্তি বন্ধক দিয়া। ইহার ফল অধিকাংশ স্থলেই যাহা হয় এখানেও তাহাই হইয়াছে।

এ কুকার্য যে চক্ৰবৰ্তীর অসাধ্য নয় তাহা একটা রাত্রির অভিজ্ঞতা হইতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলাম। বুদ্ধির দোষে বিষয়-সম্পত্তি অনেকেরই যায় এবং তাহার পরিণামও অত্যন্ত দুঃখের হয়, কিন্তু এই দুঃখ যে সমাজের অনাবশ্যক, অঙ্গ নিষ্ঠুরতায় কতখানি বাড়িতে পারে তাহা চক্ৰবৰ্তীগৃহিণীর প্রতি কথায় অঙ্গিমজ্জায় অনুভব করিলাম। তাঁহাদের দুইটিমাত্র শোবার ঘর। একটিতে ছেলেমেয়েরা থাকে এবং অন্যটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বাহিরের লোক হইয়াও আমি অধিকার করিয়া আছি।

ইহাতে আমার সঙ্কোচের অবধি ছিল না। বলিলাম, আজ ত আমার জ্বর হেঢ়েচে এবং আপনাদেরও ভারি কষ্ট হচ্ছে। যদি বাইরের ঘরে একটা বিছানা করে দেন ত আমি ভারি তৃষ্ণি পাই।

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সে কি হয় বাছা, আকাশে মেঘ করে আছে, বৃষ্টি যদি হয় ত ও-ঘরে এমন ঠাঁই নেই যে মাথাটুকু রাখা যায়। তুমি রোগা মানুষ, এ ভরসা ত করতে পারিনে বাবা।

তাঁহাদের প্রাঙ্গণের একধারে কিছু খড় সঞ্চিত ছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহাই ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সময়ে মেরামত করে নেননি কেন? জলঝড়ের ত দিন এসে পড়চে।

ইহার প্রত্যুভরে জানিলাম যে, তাহা সহজে হইবার নয়। পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া এ অঞ্চলের চাষীরা তাঁহাদের কাজ করে না। গ্রামান্তরে মুসলমান ঘরামী আছে, তাহারাই ঘর ছাইয়া দেয়। যে-কোন কারণে হোক, এ বৎসর তাহারা আসিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বাবা, আমাদের দুঃখের কি সীমা আছে? সে বছর আমার সাত-আট বছরের মেয়েটা হঠাতে কলেরায় মারা গেল; পুজোর সময় আমার ভাইয়েরা গিয়েছিল কাশী বেড়াতে, তাই আর লোক পাওয়া গেল না, ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে একা এঁকেই শাশানে নিয়ে যেতে হ'ল। তাও কি সৎকার করা গেল? কাঠকুটো কেউ কেটে দিলে না, বাপ হয়ে গর্ত খুঁড়ে বাছাকে পুঁতে রেখে ইনি ঘরে ফিরে এলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার পুরাতন শোক একেবারে নৃতন করিয়া দেখা দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে যাহা বলিতে লাগিলেন তাহার মোট অভিযোগ এই যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের কোন্ কালে কে শ্রান্নের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ত অপরাধ? অথচ, শ্রান্ন হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য এবং কেহ-না-কেহ দান গ্রহণ না করিলে সে শ্রান্ন অসিদ্ধ ও নিষ্কল হইয়া যায়। তবে দোষটা কোথায়? আর দোষই যদি থাকে ত মানুষকে প্রলুক্ত করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করান কিসের জন্য?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও যেমন কঠিন, পূর্ব-পিতামহগণের কোন্‌  
দুষ্কৃতির শাস্তিস্বরূপ তাঁহাদের বংশধরগণ এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন তাহা  
এতকাল পরে আবিক্ষার করাও তেমনি দুঃসাধ্য। শ্রাদ্ধের দান লওয়া ভাল কি  
মন্দ জানি না। মন্দ হইলেও এ-কথা সত্য যে, ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ তাঁহারা  
করেন না, অতএব নিরপরাধ। অথচ প্রতিবেশী হইয়া আর একজন প্রতিবেশীর  
জীবনযাত্রার পথ বিনাদোষে মানুষে এতখানি দুর্গম ও দুঃখময় করিয়া দিতে  
পারে, এমন হৃদয়হীন নির্দয় বর্বরতার উদাহরণ জগতে বোধ করি এক হিন্দু  
সমাজ ব্যতীত আর কোথাও নাই।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, এ গ্রামে লোক বেশি নেই, জ্বর আর ওলাউঠায়  
অর্ধেক মরে গেছে। এখন আছে শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্ত আর রাজপুত। আমাদের যে  
কোন উপায় নেই বাবা, নইলে ইচ্ছে হয়, কোন মুসলমানের গ্রামে গিয়ে বাস  
করি।

বলিলাম, কিন্তু সেখানে ত জাত যেতে পারে।

চক্ৰবৰ্তীগৃহীণী এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলেন না, কহিলেন, আমার  
সম্পর্কে একজন খুড়শশুর আছেন, তিনি দুমকায় চাকরি করতে গিয়ে খ্রিস্টান  
হয়েচেন। তাঁর ত আর কোন কষ্টই নেই।

চুপ করিয়া রাহিলাম। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ ধর্মাত্ম-গ্রহণে মনে  
মনে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে শুনিলে ক্লেশবোধ হয়, কিন্তু সাঙ্গনাই বা দিব কি  
বলিয়া? এতদিন জানিতাম অস্পৃশ্য, নীচ জাতি যাহারা আছে তাহারাই শুধু হিন্দু  
সমাজের মধ্যে নির্যাতন ভোগ করে, কিন্তু আজ জানিলাম কেহই বাদ যায় না।  
অর্থহীন অবিবেচনায় পরস্পরের জীবন দুর্ভর করিয়া তোলাই যেন এ সমাজের  
মজ্জাগত সংক্ষার। পরে অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেকেই স্বীকার করিয়া  
বলিয়াছেন, ইহা অন্যায়, ইহা গর্হিত, তথাপি নিরাকরণেরও কোন পদ্ধতি তাঁহারা  
নির্দেশ করিতে পারেন না। এই অন্যায়েরই মধ্য দিয়া তাঁহারা জন্ম হইতে মৃত্যু

পর্যন্ত চলিতে সম্মত আছেন, কিন্তু প্রতিকারের প্রবৃত্তি বা সাহস কোনটাই তাঁহাদের নাই। জানিয়া বুঝিয়াও অবিচারের প্রতিবিধান করিবার শক্তি যাহাদের এমন করিয়া তিরোহিত হইয়াছে, সে জাতি যে দীর্ঘকাল বাঁচিবে কি করিয়া ভাবিয়া পাওয়া শক্তি।

দিন-তিনেক পরে সুস্থ হইয়া একদিন সকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলাম, মা, আজ আমাকে বিদায় দিন।

চক্ৰবৰ্তীগৃহীৰ দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল; বলিলেন, দুঃখীৰ ঘৰে অনেক দুঃখ পেলে বাবা, তোমাকে কটুকথা কম বলিনি।

এ কথার উভয় খুঁজিয়া পাইলাম না। না না, সে কিছুই না—আমি মহাসুখে ছিলাম, আমার কৃতজ্ঞতা—ইত্যাদি মামুলি ভদ্রবাক্য উচ্চারণ করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইল। বজ্রানন্দের কথা মনে পড়িল। সে একদিন বলিয়াছিল, ঘৰে ছাড়িয়া আসিলে কি হইবে! এই বাঙ্গলাদেশের গৃহে গৃহে মা-বোন, সাধ্য কি তাঁহাদের স্নেহের আকর্ষণ এড়াইয়া যাই। কথাটা কতবড়ই না সত্য!

নিরতিশয় দারিদ্র্য ও নির্বোধ স্বামীৰ অবিবেচনার আতিশয় এই গৃহস্থঘরের গৃহীণকে প্রায় পাগল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু যে মুহূর্তেই তিনি অনুভব করিলেন আমি পীড়িত, আমি নিরূপায়—আর তাঁহার ভাবিবার কিছু রহিল না। মাতৃত্বের সীমাহীন স্নেহে আমার রোগ ও পরগৃহবাসের সমস্ত দুঃখ যেন দুই হাত দিয়া মুছিয়া লইলেন।

চক্ৰবৰ্তী চেষ্টা করিয়া একখানি গো-যান সংগ্ৰহ করিয়া আনিলেন, গৃহীণীৰ ভাৱি ইচ্ছা ছিল আমি জ্ঞানহার করিয়া যাই, কিন্তু রৌদ্র বাড়িবার আশঙ্কায় পীড়াপীড়ি করিলেন না। শুধু যাত্রাকালে দেবদেবীৰ নাম স্মৰণ করিয়া চোখ মুছিয়া কহিলেন, বাবা, যদি কখনও এদিকে এস আৱ একবাৰ দেখা দিয়ে যেয়ো।

এদিকে আসাও কখনও হয় নাই, দেখা দিতেও আর পারি নাই, শুধু  
বহুদিন পরে শুনিয়াছিলাম, রাজলক্ষ্মী কুশারীমহাশয়ের হাত দিয়া তাঁহাদের  
অনেকখানি খণের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

## চৌল

গঙ্গামাটির বাটীতে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। দ্বারের উভয় পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট বসান। উপরে আম্বপল্লবের মালা দোলানো। বাহিরে অনেকগুলি লোক বসিয়া জটলা করিয়া তামাক খাইতেছে। গরুর গাড়ির শব্দে তাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল। বোধ হয় ইহারই মধুর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আর একজন যিনি অকস্মাত সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখি, তিনি স্বয়ং বজ্রানন্দ। তাঁহার উল্লসিত কলরব উদ্বাম হইয়া উঠিল, এবং কে একজন ছুটিয়া ভিতরে খবর দিতেও গেল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন যে, তিনি আসিয়া সকল বিবরণ জানানো পর্যন্ত চারিদিকে লোক পাঠাইয়া তাঁকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টারও যেমন বিরাম নাই, বাড়িসুন্দ সকলের দুশ্চিন্তারও তেমনি অবধি নাই। ব্যাপার কি? অকস্মাত কোথায় ডুব দিয়েছিলেন বলুন ত? গাড়োয়ান ছোঁড়াটা ত গিয়ে বললে আপনাকে গঙ্গামাটির পথে নামিয়ে দিয়ে সে ফিরে গেছে।

রাজলক্ষ্মী কাজে ব্যস্ত ছিল, আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, বাড়িসুন্দ সবাইকে কি শান্তিই তুমি দিলে! বজ্রানন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিন্তু দেখ আনন্দ, আমার মন জানতে পেরেছিল যে আজ উনি আসবেনই।

হাসিয়া বলিলাম, দোরে কলাগাছ আর ঘটস্থাপনা দেখেই আমি বুঝেছি যে, আমার আসার খবরটি তুমি পেয়েচ।

কবাটের আড়ালে রতন আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে সেজন্যে নয়। আজ বাড়িতে ব্রাহ্মণভোজন হবে কিনা। বক্রেশ্বর দেখে এসে মা—

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରି ଦିଯା ତାହାକେ ଥାମାଇୟା ଦିଲ, ତୋକେ ଆର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ  
ହବେ ନା ରତନ, ନିଜେର କାଜେ ଯା ।

ତାହାର ଆରଙ୍ଗ ମୁଖେର ପ୍ରତି ଚାହିୟା ବଜ୍ରାନନ୍ଦ ହାସିଯା ଫେଲିଲ, କହିଲ, କି  
ଜାନେନ ଦାଦା, କୋନ ଏକଟା କାଜେ ଲେଗେ ନା ଥାକଲେ ମାନସିକ ଉଂକର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ  
ବୃଦ୍ଧି ପାୟ, ସହା ଯାଯ ନା । ଭୋଜେର ଆୟୋଜନଟା କେବଳ ଏଇଜନ୍ୟେହି । ନା ଦିଦି?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜବାବ ଦିଲ ନା, ରାଗ କରିଯା ବାହିର ହଇୟା ଗେଲ । ବଜ୍ରାନନ୍ଦ  
ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ଭୟାନକ ରୋଗା ଦେଖାଚେ ଦାଦା, ଇତିମଧ୍ୟେ କାଣ୍ଡଟା କି ସଟେଛିଲ  
ବଲୁନ ତ? ବାଡ଼ି ନା ଢୁକେ ହଠାତ ଗା-ଢାକା ଦିଲେନ କେନ?

ଗା-ଢାକା ଦିବାର ହେତୁ ସବିଷ୍ଟାରେ ବର୍ଣନା କରିଲାମ । ଶୁଣିଯା ଆନନ୍ଦ କହିଲ,  
ଭବିଷ୍ୟତେ ଏରକମ କରେ ଆର ପାଲାବେନ ନା । କିଭାବେ ଯେ ଓର ଦିନଗୁଲୋ କେଟେଚେ  
ତା ଚୋଥେ ନା ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରା ଯାଯ ନା ।

ତାହା ଜାନିତାମ । ସୁତରାଂ ଚୋଥେ ନା ଦେଖିଯାଓ ଆମି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲାମ ।  
ରତନ ଚା ଓ ତାମାକ ଦିଯା ଗେଲ । ଆନନ୍ଦ କହିଲ, ଆମିଓ ବାଇରେ ଯାଇ ଦାଦା । ଏଥିନ  
ଆପନାର କାହେ ବସେ ଥାକଲେ ଆର ଏକଜନ ହୟତ ଇହଜମ୍ବେ ଆମାର ମୁଖ ଦେଖିବେନ  
ନା । ଏହି ବଲିଯା ସେ ହାସିଯା ପ୍ରତ୍ଥାନ କରିଲ ।

ଖାନିକ ପରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଯା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜଭାବେ କହିଲ, ଓ ସରେ  
ଗରମ ଜଳ ଗାମଛା କାପଡ଼ ସମ୍ମତ ରେଖେ ଏଲାମ, ଶୁଦ୍ଧ ଗା-ମାଥା ମୁଛେ କାପଡ଼ ଛେଡେ  
ଫେଲ ଗେ । ଜୁରେର ଓପର ଖବରଦାର ସେନ ମାଥାଯ ଜଳ ଢେଲୋ ନା ବଲଚି ।

କହିଲାମ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ତୋମାକେ ଭୁଲ ବଲେଛେ, ଜୁର ଆମାର ନେଇ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ନା-ଇ ଥାକ, କିନ୍ତୁ ହତେ କତକ୍ଷଣ?

କହିଲାମ, ସେ ଖବର ତୋମାକେ ସଠିକ ଦିତେ ପାରବ ନା, କିନ୍ତୁ ଗରମେ ଆମାର  
ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନେ ଯାଚେ, ମାନ କରା ଦରକାର ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ଦରକାର ନାକି? ତାହ'ଲେ ଏକା ହୟତ ପେରେ ଉଠିବେ ନା,  
ଚଲ ଆମିଓ ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଯାଚିଛି । ଏହି ବଲିଯା ସେ ନିଜେଇ ହାସିଯା ଫେଲିଯା କହିଲ,

কেন আড়ি ক'রে আমাকেও কষ্ট দেবে, নিজেও কষ্ট পাবে? এত অবেলায় নেয়ো  
না, লক্ষ্মীটি।

এই ধরনের কথা বলায় রাজলক্ষ্মীর জোড়া কোথাও দেখি নাই। নিজের  
ইচ্ছাকেই জোর করিয়া পরের স্ফঙ্গে চাপাইয়া দিবার কটুতাটুকু সে মেহের  
মাধুর্যরসে এমনিই ভরিয়া দিতে পারিত যে, সে জিদের বিরুদ্ধে কাহারও কোন  
সন্ধানই মাথা তুলিতে পারিত না। এ ব্যাপারটা তুচ্ছ, স্নান না করিলেও আমার  
চলিয়া যাইবে, কিন্তু চলিয়া যায় না এমন ব্যাপারও বহুবার দেখিয়াছি। তাহার  
ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি শুধু কেবল আমিই পাই নাই তাহা  
নয়, কাহাকেও কোনদিনই খুঁজিয়া পাইতে দেখি নাই। আমাকে তুলিয়া দিয়া সে  
খাবার আনিতে গেল।

বলিলাম, তোমার ব্রাক্ষণভোজনের পালাটা আগে শেষ হোক না!

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া কহিল, রক্ষে কর তুমি, সে পালা শেষ হতে যে  
সক্ষে হয়ে যাবে।

গেলই বা।

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, তাই বটে। ব্রাক্ষণভোজন আমার মাথায় থাক,  
তার জন্যে তোমাকে উপোস করালে আমার স্বর্গের সিঁড়ি উপরের বদলে  
একেবারে পাতালে মুখ করে দাঁড়াবে। এই বলিয়া সে আহার্য আনিতে প্রস্তান  
করিল।

অন্তিকাল পরে কাছে বসিয়া আজ সে আমাকে যাহা খাওয়াইতে বসিল  
তাহা রোগীর পথ্য। কর্মবাটীর যাবতীয় গুরুপাক বস্ত্র সহিত তাহার সমন্বন্ধ ছিল  
না; বুরো গেল, আমার আসার পরেই সে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছে। তথাপি আসা  
পর্যন্ত তাহার আচরণে, তাহার কথা কহার ধরনে এমনই কি একটা অনুভব  
করিতেছিলাম যাহা শুধুই অপরিচিত নয়, অত্যন্ত নৃতন। ইহাই খাওয়ানোর সময়ে  
একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অথচ কিসে এবং কেমন করিয়া যে সুস্পষ্ট হইল,

কেহ জিজাসা করিলে আমি অস্পষ্ট করিয়াও বুঝাইতে পারিতাম না। হয়ত এই কথাটাই প্রত্যন্তের বলিতাম যে, মানুষের অত্যন্ত ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করিবার ভাষা বোধ হয় আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজলক্ষ্মী খাওয়াইতে বসিল, কিন্তু খাওয়া-না-খাওয়া লইয়া তাহার আগেকার দিনের সেই অভ্যন্ত জবরদস্তি ছিল না, ছিল ব্যাকুল অনুনয়। জোর নয়, ভিক্ষা। বাহিরের চক্ষে তাহা ধরা পড়ে না, পড়ে শুধু মানুষের নিঃস্তুত হৃদয়ের অপলক চোখ-দুটির দৃষ্টিতে।

খাওয়া শেষ হইল। রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি এখন যাই?

অতিথি-সজ্জন বাহিরে সমবেত হইতেছিলেন, বলিলাম, যাও।

আমার উচ্চিষ্ট পাত্রগুলি হাতে লইয়া সে যখন ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন বহুক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্যমনে সেইদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল, রাজলক্ষ্মীকে যেমনটি রাখিয়া গিয়াছিলাম, এই কটা দিন পরে তেমনটি ত আর ফিরিয়া পাইলাম না। আনন্দ বলিয়াছিল, কাল হইতেই দিদির একপ্রকার অনাহারে কাটিয়াছে, আজ জলস্পর্শ করেন নাই, এবং কাল কত বেলায় যে তাঁহার উপবাস ভাসিবে তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। অসম্ভব নয়।

চিরদিনই দেখিয়া আসিয়াছি, ধর্মপিপাসু চিত্ত তাহার কোনদিন কোন কৃচ্ছসাধনেই পরাঞ্জুখ নয়। এখানে আসিয়া অবধি সুনন্দার সাহচর্যে সেই অবিচলিত নিষ্ঠা তাহার নিরত বাড়িয়াই উঠিতেছিল। আজ তাহাকে অল্পক্ষণমাত্রই দেখিবার অবকাশ পাইয়াছি, কিন্তু যে দুর্জেয় রহস্যময় পথে সে এই অবিশ্রান্ত দ্রুতবেগে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, মনে হইল, তাহার নিন্দিত জীবনের সঞ্চিত কালিমা যত বড়ই হোক আর তাহার নাগাল পাইবে না। কিন্তু আমি? আমি যে তাহার পথের মাঝখানে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর মত সমস্ত অবরোধ করিয়া আছি!

কাজকর্ম সারিয়া নিঃশব্দপদে রাজলক্ষ্মী যখন গৃহে প্রবেশ করিল তখন  
রাত্রি বোধ হয় দশটা। আলো কমাইয়া, অত্যন্ত সাবধানে আমার মশারি ফেলিয়া  
দিয়া সে নিজের শয্যায় গিয়া শুইতে যাইতেছিল, আমি কথা কহিলাম। বলিলাম,  
তোমার ব্রাঞ্ছণভোজনের পালা ত সন্ধ্যার পূর্বেই শেষ হয়েচে, এত রাত হ'ল যে?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে চমকিত হইল, পরে হাসিয়া কহিল, আ আমার কপাল!  
আমি ভয়ে ভয়ে আসচি পাছে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিই। এখনো জেগে আছ,  
ঘুমোও নি যে বড়?

তোমার আশাতেই জেগে আছি।

আমার আশায়? তবে ডেকে পাঠাও নি কেন? এই বলিয়া সে কাছে  
আসিয়া মশারির একটা ধার তুলিয়া দিয়া আমার শয্যার শিয়রে আসিয়া বসিল।  
বরাবরের অভ্যাসমত আমার চুলের মধ্যে তাহার দুই হাতের দশ আঙুল প্রবেশ  
করাইয়া দিয়া বলিল, ডেকে পাঠাও নি কেন?

ডেকে পাঠালেই কি তুমি আসতে? তোমার কত কাজ!

হোক কাজ। তুমি ডাকলে না বলতে পারি এমন সাধ্য আছে আমার?

ইহার উত্তর ছিল না। জানি, আমার আহ্বান সত্যই উপেক্ষা করিবার  
সাধ্য তাহার নাই। কিন্তু আজ এই সত্যকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইবার সাধ্য  
আমার কৈ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

ভাবচি।

ভাবচো? কি ভাবচো? এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে আমার কপালের উপরে  
তাহার মাথাটি ন্যস্ত করিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার উপর রাগ করে বাঢ়ি থেকে  
চলে গিয়েছিলে যে বড়?

রাগ করে গিয়েছিলাম তুমি জানলে কি করে?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଥା ତୁଳିଲ ନା, ଆଣେ ଆଣେ ବଲିଲ, ଆମି ରାଗ କରେ ଗେଲେ  
ତୁମି ଜାନତେ ପାର ନା?

କହିଲାମ, ବୋଧ ହୟ ପାରି ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ତୁମି ବୋଧ ହୟ ପାର, କିନ୍ତୁ ଆମି ନିଶ୍ଚୟ ପାରି, ଆର  
ତୋମାର ପାରାର ଚେଯେଓ ତେର ବେଶ ପାରି ।

ହାସିଯା କହିଲାମ, ତାଇ ହୋକ । ଏ ନିୟେ ବିବାଦ କରେ ଜୟୀ ହତେ ଆମି  
ଚାଇନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଜେ ହାରାର ଚେଯେ ତୁମି ହେରେ ଗେଲେଇ ଆମାର ତେର ବେଶ ଲୋକସାନ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ଯଦି ଜାନ ତବେ ବଲ କେନ?

କହିଲାମ, ବଲିଲେ ତ ଆର! କିନ୍ତୁ ବଲା ଯେ ଅନେକଦିନ ବନ୍ଧ କରେଚି ସେଇ  
ଖବରଟାଇ ତୁମି ଜାନ ନା ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୀରବ ହଇଯା ରହିଲ । ପୂର୍ବେ ହଇଲେ ସେ ଆମାକେ ସହଜେ ଅବ୍ୟାହତି  
ଦିତ ନା, ଲକ୍ଷ କୋଟି ପ୍ରକ୍ଷଣ କରିଯା ଇହାର କୈଫିୟତ ଆଦାୟ କରିଯା ଛାଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ  
ଏଥିନ ସେ ମୌନମୁଖେ ଶ୍ଵର ହଇଯା ରହିଲ । ବହୁକ୍ଷଣ ପରେ ସେ ମୁଖ ତୁଳିଯା ଅନ୍ୟ କଥା  
ପାଡ଼ିଲ । ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ତୋମାର ନାକି ଏର ମଧ୍ୟେ ଜୁର ହେଁଛିଲ? କୋଥାଯ ଛିଲେ?  
ବାଡ଼ିତେ ଆମାକେ ଖବର ପାଠାଲେ ନା କେନ?

ଖବର ନା ପାଠାଇବାର ହେତୁ ବଲିଲାମ । ଏକେ ତ ଖବର ଆନିବାର ଲୋକ ଛିଲ  
ନା, ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଯାହାର କାହେ ଖବର ପାଠାଇବ, ତିନି ଯେ କୋଥାଯ ଜାନିତାମ ନା । କିନ୍ତୁ  
କୋଥାଯ ଏବଂ କିଭାବେ ଛିଲାମ ତାହା ସବିଷ୍ଟାରେ ବର୍ଣନା କରିଲାମ । ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଗୃହିଣୀର  
ନିକଟ ଆଜଇ ସକାଳେ ବିଦାୟ ଲାଇୟା ଆସିଯାଛି । ସେଇ ଦୀନହିନ ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାରେ  
ସେଭାବେ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିଯାଛିଲାମ ଏବଂ ଯେମନ କରିଯା ଅପରିସୀମ ଦିନ୍ୟେର ମଧ୍ୟେଓ  
ଗୃହକର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଜାତକୁଳଶୀଳ ରୋଗଗ୍ରହଣ ଅତିଥିକେ ପୁତ୍ରାଧିକ ମେହେ ଶୁଣ୍ଟ୍ୟା କରିଯାଛେନ  
ତାହା ବଲିତେ ଗିଯା କୃତଜ୍ଞତା ଓ ବେଦନାୟ ଆମାର ଦୁଇ ଚକ୍ର ଜଲେ ଭରିଯା ଉଠିଲ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତ ଦିଯା ମୁଛାଇଯା ଦିଯା କହିଲ, ଯାତେ ତାଁରା ଝଗମୁକ୍ତ ହନ, କିନ୍ତୁ  
ଟାକା ପାଠିଯେ ଦାଓ ନା କେନ?

বলিলাম, থাকলে দিতাম, কিন্তু টাকা ত আমার নেই।

আমার এই-সকল কথায় রাজলক্ষ্মী মর্মান্তিক দুঃখিত হইত, আজও সে মনে মনে তেমনই দুঃখ পাইল, কিন্তু তাহার টাকা যে আমারও টাকা এ কথা সজোরে প্রতিপন্থ করিতে আগেকার দিনের মত আর কলহে প্রবৃত্ত হইল না, চুপ করিয়া রহিল।

এই জিনিসটা তাহার নৃতন দেখিলাম। আমার এই কথার উপরে ঠিক এম্বিনি শান্ত নিরুত্তরে বসিয়া থাকা আমাকেও বিধিল। কিছুক্ষণ পরে সে নিশ্চাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল, যেন দীর্ঘশ্বাসের বাতাস দিয়া সে তাহার চারিদিকে ঘনায়মান বাঞ্চাছন্ন মোহের আবরণটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিল। ঘরের মন্দ আলোকে তাহার মুখের চেহারা ভাল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু যখন সে কথা কহিল, তাহার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। রাজলক্ষ্মী বলিল, বর্মা থেকে তোমার চিঠির জবাব এসেচে। অফিসের বড় খাম, হয়ত জরুরী কিছু আছে ভেবে আনন্দকে দিয়ে পড়িয়ে নিলাম।

তার পরে?

বড়সাহেব তোমার দরখাস্ত মঞ্চুর করেচেন। জানিয়েচেন, তুমি গেলেই তোমার সাবেক চাকরি আবার ফিরে পাবে।

বটে!

হাঁ। আনবো চিঠিখানা?

না থাক। কাল সকালে দেখবো।

আবার দুজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। কি যে বলিব, কেমন করিয়া যে এই নীরবতা ভঙ্গিব ভাবিয়া না পাইয়া মনের ভিতরটায় কেবল তোলপাড় করিতে লাগিল। হঠাতে একফেঁটা চোখের জল টপ্প করিয়া আমার কপালের উপরে আসিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দরখাস্ত মঞ্চুর হয়েচে, এ ত খারাপ সংবাদ নয়। কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଁଚଳେ ନିଜେର ଚୋଥ ମୁହିୟା ବଲିଲ, ତୁମି ବିଦେଶେ ଚାକରି ନିଯେ ଆବାର ଚଲେ ଯାବାର ଚେଷ୍ଟା କରଚ, ଆମାକେ ଏ କଥା ଜାନାଓ ନି କେନ? ତୁମି କି ଭେବେଛିଲେ ଆମି ବାଧା ଦେବ?

କହିଲାମ, ନା । ବରଞ୍ଚ ଜାନାଲେ ତୁମି ଉଂସାହଇ ଦିତେ । କିନ୍ତୁ ସେଜନ୍ୟ ନୟ— ବୋଧ ହ୍ୟ ଭେବେଛିଲାମ ଏ-ସବ ତୁଚ୍ଛ ବ୍ୟାପାର ଶୋନବାର ତୋମାର ସମୟ ହବେ ନା ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିର୍ବାକ ହଇୟା ରହିଲ । କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ନିଶ୍ଚାସ ଚାପିବାର ପ୍ରାଣପଗ ଚେଷ୍ଟାଓ ଆମାର କାହେ ଗୋପନ ରହିଲ ନା । କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣକାଳ ମାତ୍ର । କ୍ଷଣେକ ପରେଇ ସେ ମୃଦୁକଟ୍ଟେ କହିଲ, ଏ କଥାର ଜବାବ ଦିଯେ ଆର ଆମାର ଅପରାଧେର ବୋକା ବାଡ଼ାବ ନା । ତୁମି ଯାଓ, ତୋମାକେ ଆମି କିଛୁତେଇ ବାରଣ କରବ ନା । ଏଇ ବଲିଯା ସେ ପୁନରାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକାଳ ସ୍ତର ଥାକିଯା ବଲିତେ ଲାଗିଲ, ଏଖାନେ ନା ଏଲେ ବୋଧ ହ୍ୟ ଆମି କୋନଦିନ ବୁଝାତେ ପାରତାମ ନା, ତୋମାକେ କତ ବଡ଼ ଦୁଗ୍ଧତିର ମଧ୍ୟେ ଟେନେ ଏଣେଚି ।

ଏଇ ଗଞ୍ଜାମାଟିର ଅନ୍ଧକୁପେ ମେଯେମାନୁଷେର ଚଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷେର ଚଲେ ନା । ଏଖାନକାର ଏଇ କମହିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ତ ତୋମାର ଆଭାହତ୍ୟାର ସମାନ । ଏ ଆମି ଚୋଖେର ଉପର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖେତେ ପେଯେଚି ।

ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, କେଉ କି ତୋମାଯ ଦେଖିଯେ ଦିଯେଚେ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ନା । ଆମି ନିଜେଇ ଦେଖେଚି । ତୀର୍ଥ୍ୟାତ୍ମା କରେଛିଲାମ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦେଖିତେ ପାଇନି । ତାର ବଦଳେ କେବଳ ତୋମାର ଲକ୍ଷ୍ୟହାରା ବିରସ ମୁଖଇ ଦିନରାତ୍ରି ଚୋଖେ ପଡ଼େଚେ । ଆମାର ଜନ୍ୟେ ତୋମାକେ ଅନେକ ଛାଡ଼ିତେ ହେଯେଚେ, କିନ୍ତୁ ଆର ନା ।

ଏତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାର ମନେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଜ୍ବାଲାର ଭାବଇ ଛିଲ; କିନ୍ତୁ ତାହାର କଷ୍ଟସ୍ଵରେର ଅନିର୍ବଚନୀୟ କରଣ୍ୟା ବିଭୋର ହଇୟା ଗେଲାମ । ବଲିଲାମ, ତୋମାକେଇ କି କମ ଛାଡ଼ିତେ ହେଯେଚେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଗଞ୍ଜାମାଟି ତ ତୋମାରେ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନୟ; କିନ୍ତୁ କଥାଟା ବଲିଯା ଫେଲିଯାଇ ସଙ୍କୋଚେ ମରିଯା ଗେଲାମ । କାରଣ, ଅନବଧାନତାବଶତଃ ଯେ ଗର୍ହିତ ବାକ୍ୟ ଆମାର ମୁଖ ଦିଯା ବାହିର ହଇୟା ଗେଲ, ତୀକ୍ଷ୍ବୁଦ୍ଧିଶାଲିନୀ ଏଇ ରମଣୀର କାହେ ତାହା ଗୋପନ ରହିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ଆମାକେ ଆଜ ସେ କ୍ଷମା କରିଲ । ବୋଧ ହ୍ୟ

কথার ভালমন্দ লইয়া মান-অভিমানের জাল বুনিয়া সময় নষ্ট করার মত সময় আর তাহার ছিল না। বলিল, বরঞ্চ আমিই গঙ্গামাটির যোগ্য নই। সকলে এ কথা বুঝবে না, কিন্তু তোমার বোৰা উচিত যে সত্যিই আমাকে কিছু ছাড়তে হয়নি। পাষাণের মত যে ভার একদিন লোকে আমার বুকে চাপিয়ে দিয়েছিল, কেবল তাই আর একদিন আমার ঘুচেচে। আর শুধু কি তাই! আজীবন তোমাকেই চেয়েছিলাম, তোমাকে পেয়ে ছাড়ার অসংখ্য গুণ যে ফিরে পেয়েচি, সে কি তুমিই জান না?

জবাব দিতে পারিলাম না। অন্তরের অজানা অভ্যন্তর হইতে কে যেন এই কথাই আমাকে বলিতে লাগিল, ভুল হইয়াছে, তোমার মন্ত ভুল হইয়াছে। না বুঝিয়া তাহাকে অত্যন্ত অবিচার করিয়াছ। রাজলক্ষ্মী ঠিক এই তারেই আঘাত করিল, বলিল, ভেবেছিলাম তোমার জন্যেই এ কথা কখনো তোমাকে জানাব না, কিন্তু আজ আর আমি থাকতে পারলুম না। এই কষ্টটাই আমার সবচেয়ে বেশি লেগেচে যে, তুমি অনায়াসে ভাবতে পেরেচ যে পুণ্যের লোভে আমি এমনি উন্মাদ হয়ে গেছি যে, তোমাকেও অবহেলা করতে শুরু করেচি। রাগ করে চলে যাবার আগে এ কথা তোমার একবারও মনে হয়নি যে, ইহকালে পরকালে রাজলক্ষ্মীর তোমার চেয়ে লোভের বস্ত আর কি আছে! বলিতে বলিতেই তাহার চোখের জল ঝরঝর করিয়া আমার মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল।

কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিবার ভাষা মনে পড়িল না, শুধু মাথার উপর হইতে তাহার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। রাজলক্ষ্মী বাঁ হাত দিয়া তাহার অশু মুছিয়া বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; তাহার পরে কহিল, প্রজাদের সব খাওয়া শেষ হ'ল কিনা আমি দেখে আসি গে। তুমি ঘুমোও। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাকে ধরিয়া রাখিলে হয়ত রাখিতে পারিতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিলাম না। সেও আর ফিরিয়া আসিল না—আমারও যতক্ষণ না ঘুম আসিল শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিলাম, জোর

করিয়া রাখিয়া লাভ হইত কি? আমার পক্ষ হইতে ত কোনদিন কোন জোরই ছিল না, সমস্ত জোরই আসিয়াছিল তাহার দিক দিয়া। আজ সে-ই যদি বাঁধন খুলিয়া আমাকে মুক্তি দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চায় ত আমি ঠেকাইব কোন্‌ পথে?

সকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রথমেই ওদিকের খাটের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী ঘরে নাই। রাত্রে সে আসিয়াছিল, কিংবা অতি প্রত্যুষে বাহির হইয়া গেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরের ঘরে গিয়া দেখি, সেখানে একটা কোলাহল উঠিয়াছে। রতন কেটলি হইতে গরম চা পাত্রে ঢালিয়াছে এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা স্টোভে করিয়া সিঙ্গাড়া কিংবা কচুরি ভাজিয়া তুলিতেছে, এবং বজ্রানন্দ তাহার সন্ধ্যাসীর নিষ্পত্তি নিরাসক দৃষ্টি দিয়া এই-সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। আমাকে ঢুকিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার ভিজা চুলের উপর আঁচল টানিয়া দিল এবং বজ্রানন্দ কলরব করিয়া উঠিল, এই যে দাদা! আপনার দেরি দেখে ভাবছিলাম বুঝি বা সমস্ত জুড়িয়ে জল হয়ে যায়।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, হাঁ, তোমার পেটের মধ্যে গিয়ে জুড়িয়ে জল হ'ত।

আনন্দ কহিল, দিদি, সন্ধ্যাসী ফকিরকে খাতির করতে শিখুন। ও-রকম কড়া কথা বলবেন না। আমাকে বলিল, কৈ, তেমন ভাল দেখাচ্ছে না ত! হাতটা একবার দেখব নাকি?

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, রক্ষে কর আনন্দ, তোমার আর ডাঙ্গারিতে কাজ নেই, উনি বেশ আছেন।

আনন্দ বলিল, সেইটাই নিশ্চয় করবার জন্যে হাতটা একবার।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, তোমাকে হাত দেখতে হবে না। এখনুনি হয়ত সাগুর ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বলিলাম, সাগু আমি তের খেয়েচি, সুতরাং ও ব্যবস্থা করে দিলেও  
আর শুনব না।

শুনেও তোমার কাজ নেই। এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্লেটে করিয়া খানকয়েক  
গরম কচুরি ও সিঙ্গড়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। রতনকে কহিল, তোর  
বাবুকে চা দে।

বজ্জানন্দ সন্ধ্যাসী হইবার পূর্বে ডাক্তারি পাশ করিয়াছিল, অতএব সহজে  
হার মানিবার পাত্র নয়; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে গেল, কিন্তু দিদি, এতটা দায়িত্ব  
আপনার[]

রাজলক্ষ্মী তাহার কথার মাঝখানেই থামাইয়া দিল, শোন কথা! ওর দায়িত্ব  
আমার নয় ত কি তোমার? আজ পর্যন্ত যত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ওঁকে খাড়া রাখতে  
হয়েচে সে যদি শুনতে ত দিদির কাছে আর ডাক্তারি করতে যেতে না। এই  
বলিয়া সে বাকী সমস্ত খাবার একটা থালায় ঢালিয়া তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া  
দিয়া সহাস্যে কহিল, এখন খাও এগুলো, কথা বন্ধ হোক।

আনন্দ হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, আরে এত খাওয়া যায়!

রাজলক্ষ্মী বলিল, যায় না ত সন্ধ্যাসী হতে গিয়েছিলে কেন? আরও  
পাঁচজন ভদ্রলোকের মত গেরস্ত থাকলেই ত হ'ত!

আনন্দের দুই চক্ষু সহসা বাঞ্পাছন্ন হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মত  
দিদির দল এই বাঙলা মূলুকে আছে বলেই ত, নইলে দিবিয় ক'রে বলচি, আজই  
এই গেরুয়া-টেরুয়াগুলো অজয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যেতাম। কিন্তু  
আমার একটা অনুরোধ আছে দিদি। পরশু থেকেই একরকম উপোস করে  
আছেন, আজ আহিক-টাহিকগুলো একটু সকাল সকাল সেরে নিন। এগুলোতে  
এখনও স্পর্শদোষ ঘটেনি, বলেন ত নাহয়[], এই বলিয়া সে সম্মুখের ভোজ্যবস্তুর  
প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

রাজলক্ষ্মী ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বল কি আনন্দ, কাল আমার  
সমস্ত ব্রাহ্মণ এসে উঠতে পারেন নি!

আমি বলিলাম, আগে তাঁরা এসে উঠুন। তার পরে—

আনন্দ কহিল, তাহলে আমাকেই উঠতে হ'ল। তাদের নাম ও ঠিকানা  
দিন, পাষণ্ডের গলায় গামছা দিয়ে এনে ভোজন করিয়ে ছাড়ব। এই বলিয়া সে  
উঠার পরিবর্তে থালা টানিয়া লইয়া নিজেই ভোজনে মন দিল।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, সন্ধ্যাসী কিনা, দেবদিজে অতিশয় ভক্তি।

এইরপে আমাদের সকালের চা-খাওয়ার পালাটা যখন সাঙ্গ হইল তখন  
বেলা আটটা। বাহিরে আসিয়া বসিলাম। শরীরেও গ্লানি ছিল না, হাসি-তামাশায়  
মনও যেন স্বচ্ছ, প্রসন্ন হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর বিগত রাত্রির কথাগুলার সহিত  
তাহার আজিকার কথা ও আচরণের কোন ঐক্যই ছিল না। সে যে অভিমান ও  
বেদনায় ব্যথিত হইয়াই ওরূপ কহিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুৎঃ  
রাত্রির স্তৰ আঁধার আবরণের মধ্যে তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনাকে বৃহৎ ও কঠোর  
কল্পনা করিয়া যে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ভোগ করিয়াছি, আজ দিনের আলোকে তাহা  
স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জাও পাইলাম, কৌতুকও অনুভব করিলাম।

কল্যাকার মত আজ আর উৎসবের ঘটা ছিল না, তথাপি মাঝে মাঝে  
আহুত ও অনাহুতের ভোজনগীলা সমস্ত দিনমান ব্যাপিয়াই অব্যাহত রহিল। বেলা  
গেল। আর একবার আমরা চায়ের সাজসরঞ্জাম লইয়া ঘরের মেঝেতে আসন  
করিয়া বসিলাম। সন্ধ্যার কাজকর্ম করকটা সারিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মী ক্ষণকালের  
জন্য আমাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বজ্জ্বানন্দ কহিল, দিদি, স্বাগত !

রাজলক্ষ্মী তাহার প্রতি হাসিমুখে চাহিয়া বলিল, সন্ধ্যাসীর বুবি দেবসেবা  
শুরু হ'ল, তাই এত আনন্দ?

আনন্দ কহিল, মিথ্যে বলেন নি দিদি। সংসারে যাবতীয় আনন্দ আছে তার মধ্যে ভজনানন্দ ও ভোজনানন্দই শ্রেষ্ঠ এবং শাস্ত্রে বলেচেন, ত্যাগীর পক্ষে দ্বিতীয়টিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ, সে তোমার মত ত্যাগীর পক্ষে।

আনন্দ উত্তর দিল, এও মিথ্যে নয় দিদি। আপনি গৃহিণী বলেই এর মর্মগ্রহণ করতে পারেন নি। নইলে আমরা ত্যাগীর দল যখন আনন্দে মশগুল হয়ে আছি, আপনি তখন তিন দিন ধরে কেবল পরকে খাওয়াচ্ছেন, আর নিজে মরছেন উপবাস করে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, মরচি আর কৈ ভাই? দিনের পর দিন ত দেখচি এ দেহটার কেবল শ্রীবৃন্দি হয়ে চলচে।

আনন্দ কহিল, তার কারণ, হতে বাধ্য। সেবারেও আপনাকে দেখে গিয়েছিলাম, এবারেও এসে দেখচি। আপনার পানে চাইলে মনে হয় না যে পৃথিবীর জিনিস দেখচি, এ যেন দুনিয়া ছাড়া আর কিছু।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে হাসিয়া কহিলাম, তোমার আনন্দের যুক্তির প্রগালীটা দেখলে?

শুনিয়া আনন্দও হাসিল, কহিল, এ ত যুক্তি নয়, স্তুতি। দাদা, সে দৃষ্টি থাকলে কি আর বর্মায় যেতেন চাকরির দরখাস্ত করতে? আচ্ছা দিদি, কোন্ দুষ্টবৃন্দি দেবতাটি দিয়েছিলেন এই অঙ্গ মানুষটিকে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে? তাঁর কি আর কাজ ছিল না?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, দেবতার দোষ নেই ভাই, দোষ এই ললাটের। আর ওঁর দোষ ত অতিবড় শক্রতেও দিতে পারবে না। এই বলিয়া সে আমাকে দেখাইয়া কহিল, পাঠশালে উনি ছিলেন সর্দার-প'ড়ো, যত না দিতেন পড়া ব'লে তার ঢের বেশি দিতেন বেত। তখন পড়ি ত সবে বোধোদয়, বইয়ের বোধ ত খুবই হ'ল, বোধ হ'ল আর

একরকমের। ছেলেমানুষ, ফুল পাব কোথায়, বনের বিহুচিফলের মালা গেঁথে ওঁকে  
করলাম বরণ। এখন ভাবি, তার সঙ্গে তার কাঁটাগুলোও যদি গেঁথে দিতাম!  
বলিতে বলিতে তাহার কুপিত কষ্টস্বর চাপাহাসির আভায় অপরূপ হইয়া উঠিল।

আনন্দ কহিল, উঃঃকি ভয়ানক রাগ !

রাজলক্ষ্মী বলিল, রাগ নয়ত কি? কাঁটা তুলে দেবার আর কেউ থাকলে  
নিশ্চয় দিতাম। এখনো পাই ত দি। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া  
যাইতেছিল, আনন্দ ডাকিয়া কহিল, পালাচ্ছেন যে বড়?

কেন, আর কাজ নেই নাকি? চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ওঁর কোঁদল করবার  
সময় আছে, কিন্তু আমার নেই।

আনন্দ বলিল, দিদি, আমি আপনার অনুগত ভক্ত। কিন্তু এ অভিযোগে  
সায় দিতে আমারও লজ্জা করচে। উনি একটা কথাও কইলে নাহয় পাকিয়ে  
তোলবার চেষ্টা করা যেত, কিন্তু একদম বোৰা মানুষকে ফাঁদে ফেলা যায় কি  
করে? করলেও ধর্মে সহিবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঐ ত হয়েছে আমার জ্বালা। বেশ, ধর্মে যা সয়, তাই  
না হয় কর। চায়ের বাটিগুলো সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। আমি ততক্ষণ  
রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি গে। বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বজ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, দাদার কি বর্মা যাবার সঙ্কল্প এখনও আছে  
নাকি? কিন্তু দিদি কখনো সঙ্গে যাবেন না তা আমাকে বলেছেন।

সে আমি জানি।

তবে?

তবে একলাই যেতে হবে।

বজ্রানন্দ কহিল, এই দেখুন আপনার অন্যায়। অর্থোপার্জনের আবশ্যক  
আপনাদের নেই, তবে কিসের জন্যে যাবেন পরের গোলামি করতে?

বলিলাম, অন্ততঃ অভ্যেসটা বজায় রাখতে।

এটা রাগের কথা দাদা।

কিন্তু রাগ ছাড়া কি মানুষের আর কোন হেতু থাকতে নেই আনন্দ?

আনন্দ কহিল, থাকলেও অপরের পক্ষে বোৰা কঠিন।

ইচ্ছা হইল বলি, এ কঠিন কাজ অপরের করিবারই বা প্ৰয়োজন কি, কিন্তু বাদানুবাদে জিনিসটা পাছে তিক্ত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় চুপ করিয়া গেলাম।

এম্বিনি সময়ে রাজলক্ষ্মী বাহিরের কাজ সারিয়া গৃহে প্ৰবেশ কৰিল এবং দাঁড়াইয়া না থাকিয়া এবাৰ ভালমানুষের মত আনন্দের পাশ্বে গিয়া স্থিৰ হইয়া বসিল। আনন্দ আমাকে উদ্দেশ কৰিয়া কহিল, দিদি, উনি বলছিলেন, অন্ততঃ গোলামিৰ অভ্যাস বহাল রাখিবার জন্যেও ওঁৰ বিদেশ যাওয়া চাই। আমি বলছিলাম, তাই যদি চাই, আসুন না, আমাৰ কাজে যোগ দেবেন। বিদেশে না গিয়ে দেশেৰ গোলামিতেই দুই ভাইয়ে জীবন কাটিয়ে দেব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু উনি ত ডাক্তারি জানেন না আনন্দ?

আনন্দ কহিল, আমি কি শুধু ডাক্তারিই কৱি? ইস্কুল কৱি, পাঠশালা কৱি, তাদেৱ দুর্দশা যে কত দিক দিয়ে কত বড় তা অবিশ্রাম বোৰাবার চেষ্টা কৱি।

তারা বোৰো?

আনন্দ কহিল, সহজে বোৰো না। কিন্তু মানুষেৱ শুভ-ইচ্ছা যখন বুক থেকে সত্য হয়ে বার হয়, তখন সে চেষ্টা ব্যৰ্থ হয় না দিদি।

রাজলক্ষ্মী আমাৰ মুখেৱ দিকে কটাক্ষে চাহিয়া ধীৱে ধীৱে মাথা নাড়িল। বোধ হয় সে বিশ্বাস কৰিল না, বোধ হয় সে আমাৰ জন্য মনে মনে শক্তি হইয়া উঠিল, পাছে আমিও সায় দিয়া বসি, পাছে আমিও—

আনন্দ প্ৰশ্ন কৰিল, মাথা নাড়লেন যে বড়?

রাজলক্ষ্মী প্ৰথমে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা কৰিল, পৱে স্নিঘ মধুৱকঢ়ে কহিল, দেশেৱ দুর্দশা যে কত বড় তা আমিও জানি আনন্দ। কিন্তু তোমাৰ

একলার চেষ্টায় আর কি হবে ভাই? আমাকে দেখাইয়া কহিল, আবার উনি যাবেন সাহায্য করতে? তবেই হয়েছে। তাহলে আমার মত ওঁর সেবাতেই তোমার দিন কাটবে, আর কারও কিছু করতে হবে না। এই বলিয়া সে হাসিল।

তাহার হাসি দেখিয়া আনন্দ নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজ নেই দিদি ওঁকে নিয়ে, থাকুন উনি চিরকাল আপনার চোখের মণি হয়ে। কিন্তু একলা-দোকলার কথা এ নয়! একলা মানুষেরও আন্তরিক ইচ্ছাশক্তি এত বড় যে, তার পরিমাণ হয় না। ঠিক বামনদেবের পায়ের মত। বাইরে থেকে সে দেখতে ছোট, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পদতলটুকু প্রসারিত হলে বিশ্ব আচ্ছন্ন করে দেয়।

চাহিয়া দেখিলাম, বামনদেবের উপমায় রাজগুরুর চিত্ত কোমল হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যুভাবে সে কিছুই কহিল না।

আনন্দ বলিতে লাগিল, হয়ত আপনার কথাই ঠিক, বিশেষ কিছু করতে আমি পারিনে। কিন্তু একটা কাজ করি। সাধ্যমত দুঃখীর দুঃখের অংশ আমি নিই দিদি।

রাজগুরু অধিকতর আর্দ্র হইয়া বলিল, সে আমি জানি আনন্দ। তোমাকে দেখে প্রথম দিনই আমি তা বুঝেছিলাম।

আনন্দ বোধ হয় একথায় কান দিল না, সে নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, আপনাদের মত আমারও অভাব কিছুই ছিল না। বাবার যা আছে, বিপুল সুখে দিন কাটাবার পক্ষেও সে বেশি। আমার কিন্তু তাতে প্রয়োজন নেই। এই দুখীর দেশে সুখভোগের লালসাটাও যদি এ জীবনে ঠেকিয়ে রাখতে পারি সেই আমার চের।

রতন আসিয়া জানাইল, পাচক বলিতেছে খাবার প্রস্তুত।

রাজগুরু তাহাকে ঠাঁই করিবার আদেশ দিয়া আমাদের কহিল, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল সেরে নাও আনন্দ, আমি বড় ক্লান্ত।

সে যে ক্লান্ত তাহাতে সংশয় ছিল না, কিন্তু ক্লান্তির দোহাই দিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই। উভয়ে নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রঙ-রহস্যে আজিকার প্রভাত আরম্ভ হইয়াছিল আমাদের ভারী একটা প্রসন্নতার মধ্য দিয়া, সায়াহের সভাও জমিয়াছিল হাস্যপরিহাসে উজ্জ্বল হইয়া। কিন্তু ভাঙ্গিল যেন নিরানন্দের মলিন অবসাদে। আহারের জন্য দুজনে যখন রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম তখন কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না।

পরদিন সকালে বজ্জানন্দ প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। কাহারও কোথাও যাইবার কথা উঠিলেই রাজলক্ষ্মী চিরদিন আপত্তি করে। দিনক্ষণের অজুহাতে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করিয়া অত্যন্ত বাধা দেয়। কিন্তু আজ সে একটা কথাও বলিল না। শুধু বিদায় লইয়া যখন সে প্রস্তুত হইল, তখন কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আনন্দ, আবার কবে আসবে ভাই?

আমি নিকটেই ছিলাম, স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম সন্ন্যাসীর চোখের দীপ্তি বাপসা হইয়া আসিল, কিন্তু সে মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আসব বৈকি দিদি! যদি বেঁচে থাকি, মাঝে মাঝে উৎপাত করতে হাজির হবই।

ঠিক ত?

নিশ্চয়।

কিন্তু আমরা ত শীত্রাই চলে যাব। যেখানে থাকব যাবে সেখানে?

আদেশ করলে যাব বৈ কি দিদি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেয়ো। তোমার ঠিকানা আমাকে লিখে দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখব।

আনন্দ পকেট হইতে কাগজ পেঙ্গিল বাহির করিয়া ঠিকানা লিখিয়া হাতে দিল। সন্ন্যাসী হইয়াও আমাদের উভয়কে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল এবং রতন আসিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলে আশীর্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

## ପନର

ସମ୍ମୟାସୀ ବଜ୍ରାନନ୍ଦ ତାହାର ଓଷଧେର ବାକ୍ର ଓ କ୍ୟାମ୍ବିସେର ବ୍ୟାଗ ଲଇୟା ଯେଦିନ ବାହିର ହଇୟା ଗେଲ ମେଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ମେ ଏ ବାଡ଼ିର ସମ୍ମତ ଆନନ୍ଦଟୁକୁଇ ଛାଁକିଯା ଲଇୟା ଗେଲ ତାଇ ନୟ, ଆମାର ମନେ ହଇଲ ଯେନ ମେ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ହ୍ରାନ୍ତକୁ ଛିନ୍ଦିହାନ ନିରାନନ୍ଦ ଦିଯା ଭରିଯା ଦିଯା ଗେଲ । ଘନ ଶୈବାଳ-ପରିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଳାଶୟେର ଯେ ଜଳଟୁକୁ ତାହାର ଅବିଶ୍ଵାସ ଚାପ୍ତଳ୍ୟେର ଅଭିଘାତେ ଆବର୍ଜନାମୁକ୍ତ ଛିଲ, ମେ ଯେନ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଧାନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ଲେପିଯା ଏକାକାର ହିତେ ଚଲିଲ । ତବୁଓ ଛ୍ୟ-ସାତଦିନ କାଟିଯା ଗେଲ । ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାୟ ସାରାଦିନଇ ବାଡ଼ି ଥାକେ ନା । କୋଥାଯ ଯାଯ, କି କରେ ଜାନି ନା, ଜିଜ୍ଞାସାଓ କରି ନା । ଦିନାନ୍ତେ ଏକବାର ଯଥନ ଦେଖା ହୟ ତଥନ ହୟ ମେ ଅନ୍ୟମନକ୍ଷ, ନାହୟ ବଡ଼ କୁଶାରୀଠାକୁର ସଙ୍ଗେ ଥାକେନ, କାଜେର କଥା ଚଲେ । ଏକଲା ଘରେର ମଧ୍ୟେ, ଯେ ଆନନ୍ଦ ଆମାର କେହ ନୟ, ତାକେଇ ବାର ବାର ମନେ ପଡ଼େ । ମନେ ହୟ ହଠାତ ସାଥେ ଆବାର ଆସିଯା ପଡ଼େ! ଶୁଦ୍ଧ କେବଳ ଆମିଇ ଖୁଶି ହଇ ତାଇ ନୟ, ଓଇ ଯେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରାନ୍ଦାର ଓଧାରେ ବସିଯା ପ୍ରଦୀପେର ଆଲୋକେ କି ଏକଟା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିତେଛେ, ଆମି ଜାନି, ମେଓ ତେମନି ଖୁଶି ହଇୟା ଉଠେ । ଏମନିହି ବଟେ! ଏକଦିନ ଯାହାଦେର ଉନ୍ନୁଥ ଯୁଗହଦୟ ବାହିରେର ସର୍ବବିଧ ସଂସ୍କର ପରିହାର କରିଯା ଏକାନ୍ତ ସମ୍ମିଳନେର ଆକାଙ୍କ୍ଷାଯ ବ୍ୟାକୁଲ ହଇୟା ଥାକିତ, ଆଜ ଭାଙ୍ଗନେର ଦିନେ ସେଇ ବାହିରଟାକେଇ ଆମାଦେର କତ ବଡ଼ି ନା ପ୍ରୋଜନ! ମନେ ହୟ, ଯେ-କେହ ହୋକ, ଏକବାର ମାଝଖାନେ ଆସିଯା ଦାଁଡାଇଲେ ଯେନ ହାଁଫ ଫେଲିଯା ବାଁଚି ।

ଏମିନି କରିଯା ଦିନ ଯଥନ ଆର କାଟିତେ ଚାହେ ନା, ତଥନ ହଠାତ ଏକସମଯେ ରତନ ଆସିଯା ସମ୍ମୁଖେ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲ । ମୁଖେର ହାସି ମେ ଆର ଚାପିତେ ପାରେ ନା । ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୃହେ ଛିଲ ନା, ଅତେବର ତାହାର ଭୀତ ହଇବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଛିଲ ନା, ତଥାପି ମେ ସାବଧାନେ ଚାରିଦିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଯା ଆଣେ ଆଣେ ବଲିଲ, ଶୋନେନ ନି ବୁଝି?

কহিলাম, না।

রতন বলিল, মা দুর্গা করুন মায়ের এই মতিটি যেন শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। আমরা যে দু-চারদিনেই যাচি।

কোথায় যাচি?

রতন আর একবার দ্বারের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কহিল, সে খবরটা সঠিক এখনো পাইনি। হয় পাটনায়, নাহয় কাশীতে, নাহয় কিন্তু এ ছাড়া মার বাড়ি ত আর কোথাও নেই!

চুপ করিয়া রহিলাম। আমার এতবড় ব্যাপারেও নিরুৎসুকতা লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় সে ভাবিল আমি তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাই সে চাপা গলায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি বলচি এ সত্যি। যাওয়া আমাদের হবেই। আঃঃঃ বাঁচা যায় তাহলে, না?

বলিলাম, হাঁ।

রতন অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিল, কষ্ট করে আর দু-চারদিন সবুর করুন, ব্যস্ত। বড়জোর হঞ্চাখানেক, তার বেশি নয়। গঙ্গামাটির সমস্ত ব্যবস্থা মা কুশারীমশায়ের সঙ্গে শেষ করে ফেলেছেন, এখন বেঁধেছেঁদে নিয়ে একবার দুর্গা দুর্গা বলে পা বাড়াতে পারলে হয়। আমরা হলুম সব শহরের মানুষ, এখানে কি কখনো মন বসে? এই বলিয়া সে খুশির আবেগে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

রতনের অজানা কিছুই নাই। তাহাদেরই মত আমিও যে একজন রাজলক্ষ্মীর অনুচরের মধ্যে, এবং ইহার অধিক কিছু নয় এ কথা সে জানে। সে জানে, কাহারও কোন মতামতেরই মূল্য নাই, সকলের সমস্ত ভাল লাগা-না-লাগা কঢ়ীর ইচ্ছা ও অভিরুচির ‘পরেই নির্ভর করে।

যে আভাসটুকু রতন দিয়া গেল সে নিজে তাহার মর্ম বুঝে না, কিন্তু তাহার বাক্যের সেই নিহিত অর্থ দেখিতে দেখিতে আমার চিত্তপটে সর্বদিক দিয়া

পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর শক্তির অবধি নাই, এই বিপুল শক্তি দিয়া পৃথিবীতে সে যেন কেবল নিজেকে লইয়াই খেলা করিয়া চলিয়াছে। একদিন এই খেলায় আমার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার সেই একাগ্র বাসনার প্রচণ্ড আকর্ষণ প্রতিহত করিবার সাধ্য আমার ছিল না, হেঁট হইয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে সে বড় করিয়া আনে নাই। ভাবিতাম, আমার জন্য সে অনেক স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু আজ চোখে পড়িল ঠিক তাহাই নয়। রাজলক্ষ্মীর স্বার্থের কেন্দ্রটা এতকাল দেখি নাই বলিয়াই এরূপ ভাবিয়া আসিয়াছি। বিত্ত, অর্থ, ঐশ্বর্য—অনেক কিছুই সে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে কি আমারই জন্য? আবর্জনাস্ত্রপের মত সে-সকল কি তাহার নিজের প্রয়োজনেরই পথ রোধ করে নাই? আমি এবং আমাকে লাভ করার মধ্যে যে রাজলক্ষ্মীর কতবড় প্রভেদ ছিল সেই সত্য আজ আমার কাছে প্রতিভাত হইল। আজ তাহার চিন্ত ইহলোকের সমস্ত পাওয়া তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার সেই পথ জুড়িয়া দাঁড়াইবার স্থান আমার নাই। অতএব অন্যান্য আবর্জনার মত আমাকেও যে এখন পথের একধারে অনাদরে পড়িয়া থাকিতে হইবে, তাহা যত বেদনাই দিক, অস্বীকার করিবার পথ নাই। অস্বীকার করিও না কখনও।

পরদিন সকালেই জানিতে পারিলাম ধূর্ত রতন তথ্য যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা ভাস্ত নহে। গঙ্গামাটি-সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থাই স্থির হইয়া গিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর নিজের মুখেই তাহা অবগত হইলাম। প্রভাতে নিয়মিত পূজা-আত্মিক সমাধা করিয়া সে অপরাপর দিনের মত বাহির হইল না। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, পরশ্ব এমনি সময়ে যদি খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে আমরা বার হয়ে যেতে পারি ত সাঁইথিয়ায় পশ্চিমের গাঢ়ি অনায়াসে ধরতে পারব, কি বল?

বলিলাম, পারবে।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ଏଖାନକାର ବିଲି-ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଏକରକମ ଶେଷ କରେ ଫେଲିଲାମ । କୁଶାରୀମଶାଇ ସେମନ ଦେଖଛିଲେନ ଶୁଣଛିଲେନ, ତେମନଇ କରବେନ ।

କହିଲାମ, ଭାଲଇ ହ'ଲ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷଣକାଳ ମୌନ ହଇଯା ରହିଲ । ବୋଧ ହ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଠିକମତ ଆରମ୍ଭ କରିତେ ପାରିତେଛିଲ ନା ବଲିଯାଇ ଶେଷେ କହିଲ, ବକୁକେ ଚିଠି ଲିଖେ ଦିଯେଚି, ସେ ଏକଥାନା ଗାଡ଼ି ରିଜାର୍ଡ କରେ ସ୍ଟେଶନେଇ ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀୟ ଥାକବେ । କିନ୍ତୁ ଥାକେ ତବେଇ ତ!

ବଲିଲାମ, ନିଶ୍ଚଯ ଥାକବେ । ସେ ତୋମାର ଆଦେଶ ଲଜ୍ଜନ କରବେ ନା ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ନା, ସାଧ୍ୟମତ କରବେ ନା । ତବୁ ଓ ଆଚା, ତୁମି କି ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ପାରବେ ନା?

କୋଥାଯ ଯାଇତେ ହଇବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିତେ ପାରିଲାମ ନା । ମୁଖେ ବାଧିଲ । କେବଳ ବଲିଲାମ, ଯଦି ଯାବାର ପ୍ରୋଜନ ମନେ କର ତ ଯେତେ ପାରି ।

ଇହାର ପ୍ରତ୍ୟେତରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଓ କିଛୁ ବଲିତେ ପାରିଲ ନା । ଅନେକକ୍ଷଣ ଚୁପ କରିଯା ଥାକିଯା ହଠାତ ଏକସମୟେ ବ୍ୟକ୍ତ ହଇଯା ଉଠିଲ, କୈ, ତୋମାର ଚା ଏଖନୋ ତ ଆନଲେ ନା?

କହିଲାମ, ନା, ବୋଧ ହ୍ୟ କାଜେ ବ୍ୟକ୍ତ ଆଛେ ।

ବସ୍ତୁତଃ ଚା ଆନିବାର ସମୟ ବହୁକ୍ଷଣ ଉତ୍ତାର୍ଗ ହଇଯା ଗିଯାଛିଲ । ପୂର୍ବେକାର ଦିନେ ଭୃତ୍ୟଦେର ଏତବଢ଼ ଅପରାଧ ସେ କିଛୁତେଇ ମାର୍ଜନା କରିତେ ପାରିତ ନା, ବକିଯା ଝକିଯା ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ କରିଯା ତୁଲିତ, କିନ୍ତୁ ଏଥନ କି-ଏକପ୍ରକାରେର ଲଜ୍ଜାଯ ସେ ସେନ ମରିଯା ଗେଲ ଏବଂ ଏକଟା କଥାଓ ନା କହିଯା ଦ୍ରତ୍ପଦେ ଘର ହଇତେ ବାହିର ହଇଯା ଗେଲ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନେ ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବାହ୍ନେ ସକଳ ପ୍ରଜାରା ଆସିଯାଇ ଘେରିଯା ଦାଁଡ଼ାଟିଲ । ଡୋମେଦେର ମାଲତୀ ମେଯେଟିକେ ଆର ଏକବାର ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଛିଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମ ତ୍ୟାଗ କରିଯା ତାହାରା ଅନ୍ୟତ୍ର ଗିଯା ସଂସାର ପାତିଆଛିଲ, ଦେଖା ହଇଲ ନା । ଖବର ପାଇଲାମ, ସେଥାନେ ସ୍ଵାମୀ ଲହିଯା ସେ ସୁଖେ ଆଛେ । କୁଶାରୀ-ସହୋଦର୍ୟୁଗଳ ରାତ୍ରି ଥାକିତେଇ ସପରିବାରେ ଆସିଯା ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀୟ ହଇଲେନ । ତାଁତିଦେର ସମ୍ପଦ୍ତି-ଘାଟିତ

বিবাদের সুমিমাংসা হওয়ায় তাঁহারা আবার এক হইয়াছিলেন। কি করিয়া যে রাজলক্ষ্মী কি করিল, সবিস্তারে জানিবার কৌতুহলও ছিল না, জানিও না। কেবল এইটুকু তাঁহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া জানিতে পারিলাম যে, কলহের অবসান হইয়াছে, এবং পূর্বসঞ্চিত বিচ্ছেদের ফ্লানি কোন পক্ষের মনেই আর বিদ্যমান নাই।

সুনন্দা আসিয়া তাহার ছেলেকে লইয়া আমাকে প্রণাম করিল; কহিল; আমাদের যে আপনি শীত্ব ভুলে যাবেন না সে আমি জানি। এ বাহুল্য প্রার্থনা আপনার কাছে আমি করব না।

সহাস্যে কহিলাম, আমার কাছে আবার কি কাজের প্রার্থনা করবে দিদি?  
আমার ছেলেকে আপনি আশীর্বাদ করুন।

কহিলাম, এই ত বাহুল্য প্রার্থনা, সুনন্দা। তোমার মত মায়ের ছেলেকে যে কোন্ আশীর্বাদ করা যায় সে ত আমিই জানিনে।

রাজলক্ষ্মী কি একটা প্রয়োজনে এই দিক দিয়া যাইতেছিল, কথাটা তাহার কানে যাইতেই ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার হইয়া জবাব দিয়া কহিল, ওর ছেলেকে তুমি এই আশীর্বাদ করে যাও যেন বড় হয়ে ও তোমার মত মন পায়।

হাসিয়া কহিলাম, বেশ আশীর্বাদ! তোমার ছেলেকে বুঝি লক্ষ্মী তামাশা করতে চায়, সুনন্দা।

কথা আমার শেষ না হইতেই রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, কি, তামাশা করতে চাই নিজের ছেলের সঙ্গে? এই যাবার সময়ে? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমিও ত ওর মায়ের মত, আমি প্রার্থনা করি ভগবান যেন ওকে এই বরই দেন। তার চেয়ে বড় ত আমি কিছুই জানিনে।

সহসা চাহিয়া দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আর একটি কথাও না কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর সবাই মিলিয়া গঙ্গামাটি হইতে চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এমন কি রতন পর্যন্ত পুনঃপুনঃ চোখ মুছিতে লাগিল। যাহারা রহিল তাহাদের সন্নির্বন্ধ অনুরোধে সকলেই আবার আসিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, শুধু দিতে পারিলাম না আমি। আমিই কেবল নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম, এ জীবনে এখানে ফিরিয়া আসিবার আমার সন্তানবন্ন নাই। তাই যাবার পথে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রতি বার বার ফিরিয়া চাহিয়া কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যেন অপরিমেয় মাধুর্য ও বেদনায় পরিপূর্ণ একখানি বিয়োগান্ত নাটকের এইমাত্র ঘবনিকা পড়িল; নাট্যশালার দীপ নিভিল—এইবার মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ সংসারের সহস্রবিধি ভিড়ের মধ্যে আমাকে রাস্তায় বাহির হইতে হইবে।

কিন্তু জনতার মাঝখানে যে মনের অত্যন্ত সতর্কতায় পদক্ষেপ করিবার কথা, আমার সেই মন যেন নেশার ঘোরে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পরে আমরা সাঁইথিয়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মীর আদেশ ও উপদেশের কোনটাই বঙ্গ অবহেলা করে নাই। সে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া নিজে আসিয়া স্টেশনের প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিল, যথাসময়ে ট্রেন আসিলে মালপত্র বোঝাই দিয়া রতনকে চাকরদের কামরায় তুলিয়া দিয়া বিমাতাকে লইয়া গাড়িতে উঠিল। কিন্তু আমার সহিত সে বিশেষ কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিল না, কারণ, এখন তাহার দর বাড়িয়াছে ঘরবাড়ি, টাকাকড়ি লইয়া এখন সংসারে সে মানুষের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বঙ্গ বিচক্ষণ ব্যক্তি। সকল অবস্থাকেই মানিয়া লইয়া চলিতে জানে। এ বিদ্যা যাহার অধিগত হইয়াছে পৃথিবীতে তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয় না।

গাড়ি ছাড়িতে তখনও মিনিট-পাঁচেক বাকী ছিল, কিন্তু আমার কলিকাতা যাইবার ট্রেন আসিবে প্রায় শেষ রাত্রে। একধারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, রাজলক্ষ্মী তাহার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া হাতের ইশারায় আমাকে আহ্বান করিল। নিকটে যাইতেই কহিল, একবার ভিতরে এস। ভিতরে আসিতে সে হাত

ধরিয়া আমাকে পার্শ্বে বসাইয়া কহিল, তুমি কি খুব শীত্রই বর্মায় চলে যাবে? যাবার আগে আর একটিবার দেখা দিয়ে যাবে না?

কহিলাম, যদি প্রয়োজন মনে কর যেতে পারি।

রাজলক্ষ্মী চুপিচুপি উত্তর দিল, সংসারে যাকে প্রয়োজন বলে সে নেই। শুধু আর একবার দেখতে চাই, আসবে?

আসব।

কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দেবে?

দেব।

বাহিরে গাড়ি ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং গার্ডসাহেব তাঁহার সবুজ আলো বার বার নাড়িয়া এই আদেশই কায়েম করিলেন। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিল। আমি নামিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার রূদ্ধ করিয়া দিতেই গাড়ি চলিতে শুরু করিল। অঙ্ককার রাত্রি, ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না, কেবল স্টেশনপ্লাটফর্মের গোটাকতক কেরোসিনের আলো মন্ত্র-গতিশীল গাড়ির সেই খোলা জানালার একটি অস্পষ্ট নারীমূর্তির উপরে বার-কয়েক আলোকপাত করিল।

কলিকাতায় আসিয়া চিঠি দিলাম এবং জবাবও পাইলাম। এখানে কাজ বেশি ছিল না, যাহা ছিল তাহা দিন পনরুর মধ্যে শেষ হইল। এইবার বিদেশে যাইবার আয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে প্রতিশ্রূতিমত আর একবার রাজলক্ষ্মীকে দেখা দিতে হইবে। আরও সপ্তাহ-দুই এম্বিই কাটিয়া গেল। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল, এতদিনে কি জানি কি তাহার মতলব হইবে, হয়ত সহজে ছাড়িতে চাহিবে না, হয়ত অত দূরে যাওয়ার বিরুদ্ধে নানারূপ ওজর-আপন্তি তুলিয়া জিদ করিতে থাকিবে—কিছুই অসম্ভব নয়। এখন সে কাশীতে। তাহার বাসার ঠিকানাও জানি, ইতিমধ্যে দুই-তিনখানা পত্রও পাইয়াছি, এবং ইহাও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমার প্রতিশ্রূতির বিষয় কোথাও সে

ইঙ্গিতে স্মরণ করাইবার প্রয়াস করে নাই। না করিবারই কথা! মনে মনে বলিলাম, আপনাকে এতখানি ছোট করিয়া আমিও বোধ করি মুখ ফুটিয়া লিখিতে পারিতাম না, তুমি একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া যাও।

অকস্মাত দেখিতে দেখিতে কেমন যেন অধীর হইয়া উঠিলাম। এ জীবনে সে যে এতখানি জড়াইয়াছিল তাহা কেমন করিয়া যে এতদিন ভুলিয়া ছিলাম, তাবিয়া আশ্চর্য হইলাম। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম তখনও সময় আছে, তখনও গাড়ি ধরিতে পারি। বাসায় সমস্ত পড়িয়া রহিল, বাহির হইয়া পড়িলাম। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলার প্রতি চাহিয়া মনে হইল, থাক এ-সকল পড়িয়া। আমার প্রয়োজনের কথা যে আমার চেয়েও বেশি করিয়া জানে তাহারই উদ্দেশে যাত্রা করিয়া আর প্রয়োজনের বোৰ্জা বহিব না। রাত্রে ট্রেনের মধ্যে কিছুতেই ঘুম আসিল না, অলস তন্দ্রার ঝোঁকে মুদিত দুই চক্ষুর পাতার উপরে কত খেয়াল, কত কল্পনাই যে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহার আদি-অন্ত নাই। হয়ত, অধিকাংশই এলোমেলো, কিন্তু সবটুকু যেন একেবারে মধু দিয়া ভরা। ক্রমশঃ সকাল হইল, বেলা বাড়িতে লাগিল, লোকজনের ওঠানামা, হাঁকাহাঁকি, দৌড়ঝাঁপের অবধি রহিল না, খর রৌদ্রতাপে চতুর্পার্শের কোথাও কোন কুহেলিকার চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু আমার চক্ষে সমস্তই একেবারে বাঞ্চাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পথে ট্রেনের বিলম্ব হওয়ায় রাজলক্ষ্মীর কাশীর বাটীতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা অধিক হইয়াছে। বাহিরে বসিবার ঘরের সম্মুখে একজন বৃন্দগোচের ব্রান্�কণ বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চান?

কি চাই সহসা বলিতে পারিলাম না। তিনি পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কাকে খুঁজছেন?

কাহাকে খুঁজিতেছি ইহাও সহসা বলা কঠিন। একটু থামিয়া কহিলাম,  
রতন আছে?

না, সে বাজারে গেছে।

ব্রাঞ্ছণ সজ্জন ব্যক্তি। আমার ধূলিধূসর মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া বোধ  
হয় অনুমান করিলেন যে, আমি দূর হইতে আসিতেছি। সদয়কঠে কহিলেন,  
আপনি বসুন, সে শীঘ্ৰই ফিরবে। আপনার কি তাকেই শুধু দরকার?

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, গাড়িতে কষ্ট হয়নি ত?

এ ছাড়া সে আর কি বলিতে পারে! ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িয়া  
ক্ষণকাল স্তন্ত্র হইয়া রহিলাম, বোধ হয় মুহূর্তকয়েকের বেশি নয়, তাহার পরে  
মুখ তুলিয়া কহিলাম, না, কষ্ট হয়নি।

এইবার ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যে শুধু  
থানকাপড় পরিয়া দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়, তাহার সেই  
মেঘের মত পিঠঝোড়া সুদীর্ঘ চুলের রাশি ও আর নাই। মাথার পরে ললাটের  
প্রান্ত পর্যন্ত আঁচলটানা, তথাপি তাহারই ফাঁক দিয়া কাটা-চুলের দুই-চারিগোছা  
অলক কঠের উভয় পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উপবাস ও কঠোর আত্মনিষ্ঠারে  
এমনি একটা রূক্ষ শীর্ণতা মুখের ‘পরে ফুটিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইল; এই একটা  
মাসেই বয়সেও সে যেন আমাকে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ভাতের গ্রাস আমার গলায় বাধিতেছিল, তবু জোর করিয়া গিলিতে  
লাগিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল যেন চিরদিনের মত এই নারীর জীবন  
হইতে আমি মুছিয়া বিলগ্ন হইতে পারি। এবং আজ, শুধু একটা দিনের জন্যও  
সে যেন আমার খাওয়ার স্বন্ধাতা লইয়া আর আলোচনা করিবার অবসর না পায়।

আহারের শেষে রাজলক্ষ্মী কহিল, বক্ষু বলছিল তুমি নাকি আজ রাত্রের  
গাড়িতেই ফিরে যেতে চাও?

বলিলাম, হাঁ।

ইস! আচ্ছা, কিন্তু তোমার জাহাজ ছাড়বে ত সেই রবিবারে।

তাহার এই ব্যক্তি ও অব্যক্তি উচ্ছ্বাসে বিশ্মিত হইয়া মুখের প্রতি চাহিতেই  
সে হঠাতে যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। পরক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে  
আস্তে বলিল, তার ত এখনও তিনদিন দেরি।

বলিলাম, হাঁ, আরও কাজ আছে।

পুনরায় রাজলক্ষ্মী কি একটা বলিতে গিয়াও চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয়,  
আমার শ্রান্তি বা অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনার কথা মুখে আনিতে পারিল না।  
খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, আমার গুরুদেব এসেচেন।

বুঝিলাম বাহিরে যে ব্যক্তির সহিত প্রথমেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তিনিই।  
ইঁহাকেই দেখাইবার জন্য সে আমাকে একবার এই কাশীতেই টানিয়া  
আনিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আমার গাড়ি ছাড়িবে  
বারটার পরে। এখনও তের সময়। মানুষটি সত্যই ভাল। স্বর্ধমে অবিচলিত নিষ্ঠাও  
আছে উদারতারও অভাব নাই। আমাদের সকল কথাই জানেন, কারণ গুরুর  
কাছে রাজলক্ষ্মী গোপন কিছুই করে নাই। অনেক কথাই বলিলেন, গল্পচ্ছলে  
উপদেশও কম দিলেন না, কিন্তু তাহা উগ্রও নয়, আঘাতও করে না। সমস্ত কথা  
মনে নাই, হয়ত মন দিয়াও শুনি নাই, তবে এটুকু স্মরণ আছে যে, একদিন  
রাজলক্ষ্মীর যে এরূপ পরিবর্তন ঘটিবে তিনি তাহা জানিতেন, তাই দীক্ষার  
সম্বন্ধেও তিনি প্রচলিত রীতি মানেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, যাহার পা পিছলাইয়াছে  
সদ্গুরুর প্রয়োজন তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক।

ইহার বিরঞ্জনে আর বলিবার কি আছে? তিনি আর একদফা শিয়্যার ভক্তি,  
নিষ্ঠা ও ধর্মশীলতার অজস্র প্রশংসা করিলেন; কহিলেন, এমন আর দেখি নাই।  
বস্তুতঃ, ইহাও সত্য এবং তাহা কাহারও অপেক্ষা আমি নিজেও কম জানি না।  
কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

সময় হইয়া আসিল, ঘোড়ার গাড়ি দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, গুরুদেবের নিকট বিদায় লইয়া আমি গাড়িতে গিয়া বসিলাম। রাজলক্ষ্মী পথে আসিয়া গাড়ির ভিতরে হাত বাড়াইয়া বার বার করিয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় দিল, কিন্তু কথা কহিল না। বোধ হয় সে শক্তি তাহার ছিল না। ভালই হইল যে, অন্ধকারে সে আমার মুখ দেখিতে পাইল না। আমি স্তৰ্ণ হইয়া রহিলাম, কি যে বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। শেষ বিদায়ের পালাটা নিঃশব্দেই সঙ্গ হইল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে দুই চোখ দিয়া আমার ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সর্বান্তঃকরণে কহিলাম, তুমি সুখী হও, শান্ত হও, তোমার লক্ষ্য ধূর হোক, তোমাকে হিংসা করি না, কিন্তু যে দুর্ভাগ্য সমস্ত বিসর্জন দিয়া একই সাথে একদিন তরণী ভাসাইয়াছিল এ জীবনে তাহার আর কুল মিলিবে না। ঘৰঘৰ ঝরঝর করিয়া গাড়ি চলিতে লাগিল, গঙ্গামাটির সকল সূতি আলোড়িত হইয়া উঠিল। সেদিন বিদায়ের ক্ষণে যে-সকল কথা মনে আসিয়াছিল, আবার তাহাই জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, এই যে এক জীবন-নাট্যের অত্যন্ত স্তূল এবং সাধু-উপসংহার হইল ইহার খ্যাতির আর অন্ত নাই। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিলে ইহার অম্লান দীপ্তি কোনদিন নিবিবে না, সশন্দ বিস্ময়ে মাথা নত করিবার মত পাঠকেরও কোনদিন সংসারে অভাব ঘটিবে না। কিন্তু আমার নিজের কথা কাহাকেও বলিবার নহে। আমি চলিলাম অন্যত্র, আমারই মত যে কলুম্বের পক্ষে মগ্ন হইয়া আছে, ভাল হইবার আর পথ নাই, সেই অভয়ার আশ্রয়ে। মনে মনে রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, তোমার পুণ্যজীবন উন্নত হইতে উন্নততর হোক, তোমার মধ্য দিয়া ধর্মের মতিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হোক, আমি আর ক্ষেত্র করিব না। অভয়ার চিঠি পাইয়াছি। সেহে, প্রেমে, করুণায় অটল অভয়া, ভগিনীর অধিক বিদ্রোহী অভয়া আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। বর্মা হইতে আসিবার কালে কুন্দ দ্বারপ্রান্তে তাহার সজল চক্ষু মনে পড়িল, মনে পড়িল তাহার সমস্ত অতীত

ও বর্তমান ইতিহাস। চিন্তের শুচিতায়, বুদ্ধির নির্ভয়তায় ও আত্মার স্বাধীনতায় সে যেন আমার সমস্ত দুঃখ একনিমেষে আবৃত করিয়া উত্তাসিত হইয়া উঠিল।

সহসা গাড়ি থামিতে চকিত হইয়া দেখিলাম স্টেশনে পৌঁছিয়াছি। নামিয়া দাঁড়াইতে আর এক ব্যক্তি কোচবাক্স হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আমার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

কে রে, রতন যে!

বাবু, বিদেশে চাকরের যদি অভাব হয় ত আমাকে একটু খবর দেবেন।  
যতদিন বাঁচব আপনার সেবার ক্রটি হবে না।

গাড়ির লঠনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, বিস্মিত হইয়া  
বলিলাম, তুই কাঁদিচিস্ কেন বল ত?

রতন জবাব দিল না, হাত দিয়া চোখ মুছিয়া পায়ের কাছে আর একবার  
চিপ করিয়া নমস্কার করিয়াই দ্রুতবেগে অঙ্ককারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আশ্চর্য, এই সেই রতন!

## চতুর্থ পর্ব

### এক

এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মত। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘূরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই, নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নাই। কাশীর ফেরত-ট্রেনের মধ্যে বসিয়া বার বার করিয়া এই কথাটাই ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আমার ভাগ্যেই বা পুনঃপুনঃ এমন ঘটে কেন? আমরণ নিজের বলিয়া কি কোনদিন কিছুই পাইব না? এম্বিনি করিয়াই কি চিরজীবন কাটিবে? ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। পরের ইচ্ছায় পরের ঘরে বছরের পর বছর জমিয়া এই দেহটাকেই দিল শুধু কৈশোর হইতে যৌবনে আগাইয়া, কিন্তু মনটাকে দিয়াছে কোন্ রসাতলের পানে খেদাইয়া। আজ অনেক ডাকাডাকিতেও সেই বিদায় দেওয়া মনের সাড়া মিলে না, যদিবা কোন ক্ষীণকঠের অনুরণন কদাচিং কানে আসিয়া লাগে, আপন বলিয়া নিঃসংশয়ে চিনিতে পারি না—বিশ্বাস করিতে ভয় পাই।

এটা বুঝিয়া আসিয়াছি রাজলক্ষ্মী আমার জীবনে আজ মৃত, বিসর্জিত প্রতিমার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত নদীতীরে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া ফিরিয়াছি—আশা করিবার, কল্পনা করিবার, আপনাকে ঠকাইবার কোথাও কোন সূত্র আর অবশিষ্ট রাখিয়া আসি নাই। ওদিকটা নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু এই শেষ যে কতখানি শেষ তাহা বলিবই বা কাহাকে, আর বলিবই বা কেন?

কিন্তু এই ত সেদিন। কুমারসাহেবের সঙ্গে শিকারে যাওয়া—দৈবাং পিয়ারীর গান শুনিতে বসিয়া এমন কিছু একটা ভাগ্যে মিলিল যাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অপরিসীম। নিজের গুণে পাই নাই, নিজের দোষেও হারাই নাই, তথাপি হারানোটাকেই আজ স্বীকার করিতে হইল, ক্ষতিটাই আমার জুড়িয়া

রহিল। চলিয়াছি কলিকাতায়, বাসনা একদিন আবার বর্মায় পৌঁছিব। কিন্তু এ যেন সর্বস্ব খোয়াইয়া জুয়াড়ির ঘরে ফেরা। ঘরের ছবি অস্পষ্ট, অপ্রকৃত—শুধু পথটাই সত্য। মনে হয়, এই পথের চলাটা যেন আর না ফুরায়।

অ্যাঁ! একি শ্রীকান্ত যে! এ-যে একটা স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে সে খেয়ালও করি নাই। দেখি, আমার দেশের ঠাকুর্দা ও রাঙাদিদি ও একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে ঘাড়ে মাথায় ও কাঁখে একরাশ মোটঘাট লইয়া প্ল্যাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া অকস্মাত আমার জানালার সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছেন।

ঠাকুর্দা বলিলেন, উঃ কি ভিড়! একটা ছুঁচ গলাবার জায়গা নেই, এই ত তিন-তিনটে মানুষ। তোমার গাড়িটি ত দিব্যি খালি,—উঠবো?

উঠুন, বলিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা তিন-তিনটে মানুষ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া যাবতীয় বস্তে নামাইয়া রাখিলেন। ঠাকুর্দা কহিলেন, এ বুঝি বেশি ভাড়ার গাড়ি, আমার দণ্ড লাগবে না ত?

বলিলাম, না, আমি গার্ডসাহেবকে বলে দিয়ে আসচি।

গার্ডকে বলিয়া যথাকর্তব্য সমাপন করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন তাঁহারা আরামে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছেন। গাড়ি ছাড়িলে রাঙাদিদি আমার দিকে নজর দিলেন, চমকাইয়া বলিলেন, তোর এ কি ছিরি হয়েছে শ্রীকান্ত! এ যে মুখ শুকিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গেছে! কোথায় ছিলি এতদিন? ভ্যালা ছেলে যা হোক! সেই যে গেলি একটা চিঠিও কি দিতে নেই? বাড়িসুন্দ সবাই ভেবে মরি।

এ-সকল প্রশ্নের কেহ জবাব প্রত্যাশা করে না, না পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে না।

ঠাকুর্দা জানাইলেন, তিনি সন্ত্রীক গয়াধামে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন এবং এই মেয়েটি তাঁর বড় শ্যালিকার নাতনি—বাপ হাজার টাকা গুণে দিতে চায়, তবু এত দিনে মনোমত একটি পাত্র জুটলো না। ছাড়লে না, তাই সঙ্গে করে আনতে হ'ল। পুঁটু, প্যাঁড়ার হাঁড়িটা খোল ত। গিন্ধী, বলি দইয়ের কড়াটা ফেলে

আসা হয়নি ত? দাও, শালপাতায় করে গুছিয়ে দাও দিকি গোটা-দুই প্যাঁড়া, একথাবা দই! এমন দই কখনো মুখে দাওনি ভায়া, তা দিব্যি করে বলতে পারি। না—না—না, ঘটির জলে হাতটা আগে ধূয়ে ফেলো পুঁটু—যাকে তাকে ত নয়,— এ-সব মানুষকে কি করে দিতে-থুতে হয় শেখো!

পুঁটু যথা আদেশ সংযতে কর্তব্য প্রতিপালন করিল। অতএব, অসময়ে ট্রেনের মধ্যে অ্যাচিত প্যাঁড়া ও দধি জুটিল। খাইতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম আমার ভাগ্য যত অঘটন ঘটে। এইবার পুঁটুর জন্য হাজার টাকা দামের পাত্র না মনোনীত হইয়া উঠি। বর্মায় ভালো চাকরি করি এ খবরটা তাঁহারা আগের বারেই পাইয়াছিলেন।

রাঙাদিদি অতিশয় মেহ করিতে লাগিলেন, এবং আত্মিয়জ্ঞানে পুঁটু ঘষ্টাখানেকের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কারণ, আমি ত আর পর নাই!

বেশ মেয়েটি। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের, ফর্সা না হোক, দেখিতে ভালোই। ঠাকুর্দা তাহার গুণের বিবরণ দিয়া শেষ করিতে পারেন না এমনি অবস্থা ঘটিল। লেখাপড়ার কথায় রাঙাদিদি বলিলেন, ও এমনি গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে যে, তোদের আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। ও বাড়ির নন্দরানীকে এমনি একখানি চিঠি লিখে দিয়েছিল যে, সাতদিনের দিন জামাই পনর দিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়ু।

রাজলক্ষ্মীর উল্লেখ কেহ ইঙ্গিতেও করিলেন না। সেরূপ ব্যাপার যে একটা ঘটিয়াছিল তাহা কাহার মনেই নাই।

পরদিন দেশের স্টেশনে গাড়ি থামিলে আমাকে নামিতেই হইল। তখন বেলা বোধ করি দশটার কাছাকাছি। সময়ে স্নানাহার না করিলে পিতৃ পড়িবার আশঙ্কায় দু'জনেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

বাড়িতে আনিয়া আদর-যত্নের আর অবধি রহিল না। পুঁটুর বর যে আমিই  
পাঁচ-সাতদিনে এ-সমস্কে গ্রামের মধ্যে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। এমন কি  
পুঁটুরও না।

ঠাকুর্দার ইচ্ছা আগামী বৈশাখেই শুভকর্ম সমাধা হইয়া যায়। পুঁটুর যে  
যেখানে আছে আনিয়া ফেলিবারও একটা কথা উঠিল। রাঙাদিদি পুলকিতচিত্তে  
কহিলেন, মজা দেখেচ, কে যে কার হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেচ, আগে থাকতে  
কারও বলবার জো নাই।

আমি প্রথমটা উদাসীন, পরে চিন্তিত, তারপরে ভীত হইয়া উঠিলাম। সায়  
দিয়াছি কি দিই নাই—ক্রমশঃ নিজেরই সন্দেহ জনিতে লাগিল। ব্যাপার এমনি  
দাঁড়াইল যে, না বলিতে সাহস হয় না, পাছে বিশ্বী কিছু-একটা ঘটে। পুঁটুর মা  
এখানেই ছিলেন, একটা রবিবারে হঠাতে বাপও দেখা দিয়া গেলেন। আমাকে কেহ  
যাইতেও দেয় না, আমোদ-আহুদ ঠাট্টা-তামাশাও চলে—পুঁটু যে ঘাড়ে চাপিবেই,  
শুধু দিন-ক্ষণের অপেক্ষা—উভরোত্তর এমনি লক্ষণই চারিদিক দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া  
উঠিল। জালে জড়াইতেছি—মনে শান্তিও পাই না—জাল কাটিয়া বাহির হইতেও  
পারি না। এমনি সময়ে হঠাতে একটা সুযোগ ঘটিল। ঠাকুর্দা জিজ্ঞাসা করিলেন,  
আমার কোন কোষ্ঠী আছে কি না। সেটা ত দরকার।

জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিয়া ফেলিলাম, আপনারা কি  
পুঁটুর সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া সত্যিই স্থির করেচেন?

ঠাকুর্দা কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, সত্যিই? শোন কথা  
একবার!

কিন্তু আমি ত এখনো স্থির করিনি।

করোনি? তা হলে করো। মেয়ের বয়েস বারো-তেরোই বলি, আর যাই  
করি, আসলে ওর বয়েস হ'ল সতেরো-আঠারো। এর পরে ও মেয়ে বিয়ে দেবো  
আমরা কেমন করে?

কিন্ত সে দোষ ত আমার নয়!

দোষ তবে কার? আমার বোধ হয়?

ইহার পরে মেয়ের মা ও রাঙাদিদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশী মেয়েরা পর্যন্ত আসিয়া পড়িল। কানাকাটি, অনুযোগ অভিযোগের আর অন্ত রহিল না। পাড়ার পুরুষেরা কহিল, এত বড় শয়তান আর দেখা যায় না, উহার রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কিন্ত শিক্ষা দেওয়া এক কথা, মেয়ের বিবাহ দেওয়া আর-এক কথা। সুতরাং ঠাকুর্দা চাপিয়া গেলেন। তারপরে শুরু হইল অনুনয়-বিনয়ের পালা। পুঁটুকে আর দেখি না, সে বেচারা লজ্জায় বোধ করি কোথাও মুখ লুকাইয়া আছে। ক্লেশবোধ হইতে লাগিল। কি দুর্ভাগ্য লইয়াই উহারা আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে! শুনিতে পাইলাম ঠিক এই কথাই উহার মা বলিতেছে, —ও হতভাগী আমাদের সবাইকে খেয়ে তবে যাবে। ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমন্দুর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়,—পোড়া শোল মাছ জলে পালায়। এমন ওর হবে না ত হবে কার?

কলিকাতায় যাইবার পূর্বে ঠাকুর্দাকে ডাকিয়া বাসার ঠিকানা দিলাম, বলিলাম, আমার একজনের মত নেওয়া দরকার, তিনি বললেই আমি সম্মত হবো।

ঠাকুর্দা গদগদকষ্টে আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, দেখো ভাই, মেয়েটাকে মেরো না। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলো যেন অমত না করেন।

বলিলাম, আমার বিশ্বাস তিনি অমত করবেন না, বরঞ্চ খুশি হয়েই সম্মতি দেবেন।

ঠাকুর্দা আশীর্বাদ করিলেন,—কবে তোমার বাসায় যাব দাদা?

পাঁচ-ছ'দিন পরেই যাবেন।

পুঁটুর মা, রাঙাদিদি রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া চোখের জলের সঙ্গে আমাকে  
বিদায় দিলেন।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট ! কিন্তু এ ভালোই হইল যে, একপ্রকার কথা  
দিয়া আসিলাম। রাজলক্ষ্মী এ বিবাহে যে লেশমাত্র আপত্তি করিবে না এ কথা  
আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

## দুই

স্টেশনে পদার্পণ মাত্র ট্রেন ছাড়িয়া গেল; পরেরটা আসিতে ঘণ্টা-দুই দেরি। সময় কাটাইবার পছন্দ খুঁজিতেছি,—বন্ধু জুটিয়া গেল। একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি মুহূর্তকয়েক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শ্রীকান্ত না?

হাঁ।

আমায় চিনতে পারলে না? আমি গহর। এই বলিয়া সে সবেগে আমার হাত মলিয়া দিল, সশন্দে পিঠে চাপড় মারিল এবং সজোরে গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, চল্ আমাদের বাড়ি। কোথা যাওয়া হচ্ছিল, কলকাতায়? আর যেতে হবে না,—চল্।

সে আমার পাঠশালার বন্ধু। বয়সে বছর-চারেকের বড়, চিরকাল আধপাগলা গোছের ছেলে—মনে হইল বয়সের সঙ্গে সেটা বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। তাহার জবরদস্তি পূর্বেও এড়াইবার জো ছিল না, সুতরাং আজ রাত্রের মত সে যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না, এই কথা মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বলা বাহ্য্য, তাহার উল্লাস ও আনন্দায়তার সহিত পাঞ্চা দিয়া চলিবার মত শক্তি আজ আমার নাই। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। আমার ব্যাগটা সে নিজেই তুলিয়া লইল, কুলি ডাকিয়া বিছানাটা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিল, জোর করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিয়া ভাড়া করিয়া আমাকে কহিল, ওঠ।

পরিত্রাণ নাই,—তর্ক করা বিফল।

বলিয়াছি গহর আমার পাঠশালার বন্ধু। আমাদের গ্রাম হইতে তাহাদের বাড়ি এক ক্রেশ দূরে, একই নদীর তীরে। বাল্যকালে তাহারই কাছে বন্দুক ছুঁড়িতে শিখি। তাহার বাবার একটা সেকেলে গাদাবন্দুক ছিল, সেই লইয়া নদীর ধারে, আমবাগানে, ঝোপেঝাড়ে দু'জনে পাখি মারিয়া বেড়াইতাম, ছেলেবেলা

কতদিন তাহাদের বাড়িতে রাত কাটাইয়াছি,—তাহার মা মুড়ি গুড় দুধ কলা দিয়া  
আমার ফলারের যোগাড় করিয়া দিত। তাহাদের জমিজমা চাষ-আবাদ অনেক  
ছিল।

গাড়িতে বসিয়া গহর প্রশ্ন করিল, এতদিন কোথায় ছিলি, শ্রীকান্ত?

যেখানে যেখানে ছিলাম একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। জিজ্ঞাসা  
করিলাম, তুমি এখন কি করো গহর?

কিছুই না।

তোমার মা ভালো আছেন?

মা-বাবা দু'জনেই মারা গেছেন—বাড়িতে আমি একলা আছি।

বিয়ে করোনি?

সেও মারা গেছে।

মনে মনে অনুমান করিলাম এইজন্যই যাহাকে হোক ধরিয়া লইয়া যাইতে  
তাহার এত আগ্রহ। কথা খুঁজিয়া না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের সেই  
গাদাবন্দুকটা আছে?

গহর হাসিয়া কহিল, তোর মনে আছে দেখছি। সেটা আছে, আর একটা  
ভালো বন্দুক কিনেছিলাম, তুই শিকারে যেতে চাস্ ত সঙ্গে যাবো, কিন্তু আমি  
আর পাখি মারিনে—বড় দুঃখ লাগে।

সে কি গহর, তখন যে এই নিয়ে দিনরাত থাকতে?

তা সত্যি, কিন্তু এখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েচি।

গহরের আর-একটা পরিচয় আছে—সে কবি। তখনকার দিনে সে মুখে  
মুখে অনর্গল ছড়া কাটিতে পারিত, যে-কোন সময়ে, যে-কোন বিষয়ে অনেকটা  
পাঁচালীর ধরনে। ছন্দ, মাত্রা, ধ্বনি ইত্যাদি কাব্যশাস্ত্র-বিধি মানিয়া চলিত কিনা  
সে জ্ঞান আমার তখনও ছিল না, এখনও নাই, কিন্তু মণিপুরের যুদ্ধ,  
টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বের কাহিনী তাহার মুখে ছড়ায় শুনিয়া আমরা সেকালে

ପୁନঃପୁନঃ ଉତ୍ତେଜିତ ହଇଯା ଉଠିତାମ । ଏ ଆମାର ମନେ ଆଛେ । ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, ଗହର, ତୋମାର ଯେ ଏକଦିନ କୃତ୍ତିବାସେର ଚେଯେ ଭାଲୋ ରାମାୟଣ ରଚନାର ଶଖ ଛିଲ, ସେ ସଙ୍କଳନ ଆଛେ, ନା ଗେଛେ?

ଗେଛେ! ଗହର ମୁହଁରେ ଗଞ୍ଜୀର ହଇଯା ଉଠିଲ, ବଲିଲ, ସେ କି ଯାବାର ରେ! ଏ ନିଯେଇ ତ ବେଁଚେ ଆଛି । ଯତଦିନ ଜୀବନ ଥାକବେ, ତତଦିନ ଏ ନିଯେଇ ଥାକବ । କତ ଲିଖେଚି, ଚଲ୍ ନା ଆଜ ତୋକେ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଶୋନାବ, ତବୁ ଫୁରୋବେ ନା ।

ବଲ କି ଗହର!

ନୟତ କି ତୋରେ ମିଥ୍ୟେ ବଲଚି?

ପ୍ରଦୀପ କବି-ପ୍ରତିଭାୟ ତାହାର ଚୋଖମୁଖ ଘକଘକ କରିତେ ଲାଗିଲ । ସନ୍ଦେହ କରି ନାଇ, ଶୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଵଯ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଛିଲାମ ମାତ୍ର, ତଥାପି, ପାଛେ କେଂଚୋ ଖୁଡ଼ିତେ ସାପ ବାହିର ହୟ, ଆମାକେ ଧରିଯା ବସାଇଯା ସେ ସାରାରାତ୍ରି ବ୍ୟାପିଯା କାବ୍ୟଚର୍ଚା କରେ, ଏହି ଭଯେ ଶକ୍ତାର ସୀମା ରହିଲ ନା । ପ୍ରସନ୍ନ କରିତେ ବଲିଲାମ, ନା ଗହର, ତା ବଲିନି, ତୋମାର ଅନ୍ଦୁତ ଶକ୍ତି ଆମରା ସବାଇ ସ୍ଵୀକାର କରି, ତବେ ଛେଲେବେଳାର କଥା ମନେ ଆଛେ କିନା ତାଇ ଶୁଦ୍ଧ ବଲଛିଲାମ । ତା ବେଶ ବେଶ—ଏ ଏକଟା ବାଙ୍ଗଲାଦେଶେର କୀର୍ତ୍ତି ହୟେ ଥାକବେ ।

କୀର୍ତ୍ତି? ନିଜେର ମୁଖେ କି ଆର ବଲବ ଭାଇ, ଆଗେ ଶୋନ, ତାରପରେ ହବେ କଥା ।

କୋନଦିକ ଦିଯାଇ ନିଷ୍ଠାର ନାଇ । କ୍ଷଣକାଳ ହିର ଥାକିଯା କତକଟା ଯେନ ନିଜେର ମନେଇ ବଲିଲାମ, ସକାଳ ଥେକେଇ ଶରୀରଟା ଏମନ ବିଶ୍ରୀ ଠେକଚେ ଯେ ମନେ ହଚ୍ଛେ ଘୁମୋତେ ପେଲେ—

ଗହର କାନ୍ଦ ଦିଲ ନା, ବଲିଲ, ପୁଷ୍ପକ-ରଥେ ସୀତା ଯେଖାନେ କାଁଦିତେ କାଁଦିତେ ଗୟନା ଫେଲେ ଦିଚେନ, ସେ ଜାଯଗାଟା ଯାରା ଯାରା ଶୁନେଚେ ଚୋଥେର ଜଳ ରାଖିତେ ପାରେନି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ।

চোখের জল যে আমিহি রাখিতে পারিব সে সন্ধাবনা কম। বলিলাম,  
কিন্তু—

গহর কহিল, আমাদের সেই বুড়ো নয়নচাঁদ চক্ৰবৰ্তীকে তোৱ মনে আছে  
ত, তার জ্বালায় আমি আৱ পাৱিনে। যখন-তখন এসে বলবে, গহর, সেইখানটা  
একবাৱ পড় দেখি, শুনি।

৭৭৯

বলে, বাবা তুই কখনো মোছলমানেৱ ছেলে নোস্—তোৱ গায়ে আসল  
ৱ্ৰক্ষৱজ্ঞ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

নয়নচাঁদ নামটা খুব সচৱাচৱ মেলে না, তাই মনে পড়িল। বাড়ি গহৱদেৱ  
থামেই। জিজ্ঞাসা কৱিলাম, সেই চক্ৰোতি বুড়ো ত? যাৱ সঙ্গে তোমাৱ বাবাৱ  
লাঠালাঠি মালি-মোকন্দমা চলছিল?

গহর বলিল, হাঁ কিন্তু বাবাৱ সঙ্গে পাৱবে কেন—তার জমি, বাগান, পুকুৱ,  
মায় বাস্তসমেত বাবা দেনাৱ দায়ে নিলেম কৱে নিয়েছিল; আমি কিন্তু তার পুকুৱ  
আৱ ভিটেটা ফিৱিয়ে দিয়েচি। ভাৱি গৱীব—দিনৱাত চোখেৱ জল ফেলত, সে কি  
আৱ ভাল শ্ৰীকান্ত!

ভাল ত নয়ই। চক্ৰবৰ্তীৱ কাব্য-প্ৰীতিতে এমনি কিছু-একটা আন্দাজ  
কৱিতেছিলাম, বলিলাম, এখন চোখেৱ জল ফেলা থেমেচে ত?

গহর কহিল, লোকটি কিন্তু সত্যিই ভালোমানুষ। দেনাৱ জ্বালায় একসময়ে  
যা কৱেছিল অমন অনেকেই কৱে। ওৱ বাড়িৱ পাশেই বিষে-দেড়েকেৱ একটা  
আমবাগান আছে, তার প্ৰত্যেক গাছটাই চক্ৰোতিৱ নিজেৱ হাতে পোঁতা। নাতি-  
নাতনী অনেকগুলি, কিনে খাবাৱ পয়সা নেই—তা ছাড়া আমাৱ কেই-বা আছে,  
কেই-বা খাৰে।

সে ঠিক। ওটাও ফিৱিয়ে দাও গে।

দেওযাই উচিত শ্রীকান্ত। চোখের সামনে আম পাকে, ছেলেপুলেগুলোর নিঃশ্বাস পড়ে—আমার ভারি দুঃখ হয় ভাই। আমের সময় আমার বাগানগুলো ত সব ব্যাপারীদের জমা করেই দিই—ও বাগানটা আর বিক্রি করিনে, বলি, চক্রস্তিমশাই, তোমার নাতিরা যেন পেড়ে খায়। কি বলিস রে, ভালো না?

নিশ্চয়ই ভালো। মনে মনে বলিলাম, বৈকুণ্ঠের খাতার জয় হোক, তাহার কল্যাণে গরীব নয়নচাঁদ যদি যৎকিঞ্চিং গুছাইয়া লইতে পারে, হানি কি? তাছাড়া গহর কবি। কবি-মানুষের অত বিষয়-সম্পত্তি কিসের জন্য, যদি রসগীলী রসিক সুজনদের ভোগেই না লাগে?

চৈত্রের প্রায় মাঝামাঝি। গাড়ির কপাটটা গহর অকস্মাত শেষ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে মাথা বাড়াইয়া বলিল, দক্ষিণে বাতাসটা টের পাচ্ছিস শ্রীকান্ত?

পাচ্ছি।

গহর কহিল, বসন্তকে ডাক দিয়ে কবি বলেচেন, ‘আজ দখিন দুয়ার খোলা—’

কাঁচা মেঠো রাস্তা, এক ঝাপটা মলয়ানিল রাস্তার শুকনো ধূলা আর রাস্তায় রাখিল না, সমস্ত মাথায় মুখে মাখাইয়া দিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কবি বসন্তকে ডাকেন নি, তিনি বলেচেন এ সময়ে যমের দক্ষিণ-দোর খোলা—সুতরাং গাড়ির দরজা বন্ধ না করলে হয়ত সে-ই এসে হাজির হবে।

গহর হাসিয়া কহিল, গিয়ে একবার দেখবি চল। দুটো বাতাবি লেবুর গাছে ফুল ফুটেচে, আধক্রোশ থেকে গন্ধ পাওয়া যায়। সুমুখের জামগাছটা মাধবী ফুলে ভরে গেছে, তার একটা ডালে মালতীর লতা ফুল এখনো ফোটেনি, কিন্তু খোপা থোপা কুঁড়ি। আমাদের চারিদিকেই ত আমের বাগান, এবার মৌলে মৌলে গাছ ছেয়ে গেলে, কাল সকালে দেখিস মৌমাছির মেলা। কত

দোয়েল, কত বুলবুলি, আর কত কোকিলের গান। এখন জ্যোৎস্না রাত  
কিনা, তাই রাত্রিতেও কোকিলদের ডাকাডাকি থামে না। বাইরের ঘরের দক্ষিণের  
জানালাটা যদি খুলে রাখিস তোর দু'চোখে আর পলক পড়বে না। এবার কিন্তু  
সহজে ছেড়ে দিচ্ছিনে ভাই, তা আগে থেকেই বলে রাখচি। তা ছাড়া খাবার  
ভাবনাও নেই, চক্রোত্তিমশাই একবার খবর পেলে হয়, তোরে গুরুর আদর  
করবে।

তাহার আমন্ত্রণের অকপট আন্তরিকতায় মুঞ্ছ হইলাম। কতকাল পরে  
দেখা কিন্তু ঠিক সেদিনের সে গহর—এতটুকু বদলায় নাই—তেমনি ছেলেমানুষ—  
তেমনি বন্ধু-সম্মিলনে তাহার অকৃত্রিম উল্লাসের ঘটা।

গহররা মুসলমান ফকির-সম্প্রদায়ের লোক। শুনিয়াছি তাহার পিতামহ  
বাউল, রামপ্রসাদী ও অন্যান্য গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। তাহার একটা পোষা  
শালিক পাথির অলৌকিক সঙ্গীত-পারদর্শিতার কাহিনী তখনকার দিনে এদিকে  
প্রসিদ্ধ ছিল। গহরের পিতা কিন্তু পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তেজারতি ও পাটের  
ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করিয়া ছেলের জন্য সম্পত্তি খরিদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে,  
অথচ ছেলে পাইল না বাপের বিষয়বুদ্ধি, পাইয়াছে ঠাকুর্দার কাব্য ও সঙ্গীতের  
অনুরাগ। সুতরাং, পিতার বহুশ্রমার্জিত জমিজমা চাষ-আবাদের শেষ পরিণাম যে  
কি দাঁড়াইবে তাহা শঙ্কা ও সন্দেহের বিষয়।

সে যাই হোক, বাড়িটা তাহাদের দেখিয়াছিলাম ছেলেবেলায়। ভালো মনে  
নাই। এখন হয়ত তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে কবির বাণী-সাধনার তপোবনে। আর  
একবার চোখে দেখিবার আগ্রহ জন্মিল।

তাহাদের গ্রামের পথ আমাদের পরিচিত, তাহার দুর্গমতার চেহারাও মনে  
পড়ে, কিন্তু অন্ন কিছুক্ষণেই জানা গেল শৈশবের সেই মনে-পড়ার সঙ্গে আজকের  
চোখে-দেখার একেবারে কোন তুলনাই হয় না। বাদশাহী আমলের রাজবর্জ—  
অতিশয় সন্তান। ইট-পাথরের পরিকল্পনা এদিকের জন্য নয়, সে দুরাশা কেহ

করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মন হইতে বহুকাল পূর্বে মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকে জানে অনুযোগ-অভিযোগ বিফল—তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু ‘পথকর’ যোগাইতে হয়, কিন্তু সে-পথ যে কোথায় এবং কাহার জন্য এ-সকল চিন্তা করাও তাহাদের কাছে বাহ্যিক।

সেই পথের বহুকাল-সঞ্চিত স্তুপীকৃত ধূলাবালির বাধা ঠেলিয়া গাড়ি আমাদের কেবলমাত্র চাবুকের জোরেই অগ্রসর হইতেছিল, এমনি সময়ে গহর অকস্মাত উচ্চ-কোলাহলে ডাক দিয়া উঠিল, গাড়োয়ান, আর না, আর না—থামো, থামো —একদম রোকো।

সে এমন করিয়া উঠিল, যেন এ পাঞ্জাব-মেলের ব্যাপার। সমস্ত ভ্যাকুয়াম-  
এক চক্ষের নিমিষে কসিতে না পারিলে সর্বনাশের সম্ভাবনা।

গাড়ি থামিল। বাঁ-হাতি পথটা তাহাদের গ্রামে ঢুকিবার। নামিয়া পড়িয়া গহর কহিল, নেমে আয় শ্রীকান্ত। আমি ব্যাগটা নিচি, তুই নে বিছানাটা,—চল।

গাড়ি বুঝি আর যাবে না?

না। দেখচিস্ক নে পথ নেই!

তা বটে। দক্ষিণে ও বামে শিয়াকুল ও বেতসকুঞ্জের ঘন-সম্মিলিত শাখা-  
প্রশাখায় পল্লীবীথিকা অতিশয় সঙ্কীর্ণ। গাড়ি ঢোকার প্রশ্নেই অবৈধ, মানুষেও  
একটু সাবধানে কাত হইয়া না ঢুকিলে কাঁটায় জামা-কাপড়ের অপঘাত অনিবার্য।  
অতএব কবির মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনবদ্য। সে ব্যাগটা কাঁধে করিল, আমি  
বিছানাটা বগলে চাপিয়া গোধূলিবেলায় গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম।

কবিগৃহে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুমান  
করিলাম আকাশে বসন্ত-রাত্রির চাঁদও উঠিয়াছে। তিথিটা ছিল বোধ করি পূর্ণিমার  
কাছাকাছি, অতএব আশা করিয়া রহিলাম, গভীর নিশীথে চন্দ্রদেব মাথার উপরে  
আসিলে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইবে। গৃহের চারিদিকেই নিরিডি বেণুবন,

খুব সম্ভব তাহার কোকিল, দোয়েল ও বুলবুলির দল এর মধ্যেই থাকে এবং অহনিশ শিস দিয়া, গান গাহিয়া কবিকে ব্যাকুল করিয়া দেয়। পরিপক্ষ অসংখ্য বেণুপত্ররাশি ঝরিয়া ঝরিয়া উঠান-আঙিনা পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, দৃষ্টিমাত্রাই বরাপাতার গান গাহিবার প্রেরণায় সমস্ত মন মুহূর্তে গর্জন করিয়া উঠে। চাকর আসিয়া বাহিরের ঘর খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, গহর তক্ষপোশটা দেখাইয়া কহিল, তুই এই ঘরেই থাকবি। দেখিস কিরকম হাওয়া।

অসম্ভব নয়। দেখিলাম, দখিনা-বায়ে রাজ্যের শুকনা লতাপাতা গবাক্ষপথে ভিতরে তুকিয়া ঘর ভরিয়াছে, তক্ষপোশ ভরিয়াছে, মেঝেতে পা ফেলিতে গা ছমছম করে। খাটের পায়ার কাছে ইঁদুরে গর্ত খুঁড়িয়া একরাশ মাটি তুলিয়াছে, দেখাইয়া বলিলাম, গহর, এ ঘরে কি তোমরা ঢোকো না?

গহর বলিল, না, দরকারই হয় না। আমি ভেতরেই থাকি। কাল সব পরিষ্কার করিয়ে দেব।

তা যেন দিলে, কিন্তু গর্তটায় সাপ থাকতে পারে ত ?

চাকরটা বলিল, দুটো ছিল, আর নেই। এমন দিনে তারা থাকে না, হাওয়া খেতে বার হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করে জানলে মিএঁ ?

গহর হাসিয়া কহিল, ও মিএঁ নয়, ও আমাদের নবীন। বাবার আমলের লোক। গরুবাচুর চাষবাস দেখে, বাড়ি আগলায়। আমাদের কোথায় কি আছে না আছে সব জানে।

নবীন হিন্দু বাঙালীও বটে, পৈতৃককালের লোকও বটে। এই পরিবারের গরুবাচুর চাষবাস হইতে বাড়িঘরদোরের অনেক কিছু জানাও তাহার অসম্ভব নয়, তথাপি সাপের সম্বন্ধে ইহার মুখের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। ইহাদের বাড়িসুন্দ সকলকে দখিনা হাওয়ায় পাইয়া বসিয়াছে। ভাবিলাম, হাওয়ার

লোভে সর্প্যুগলের বহির্গমন আশ্চর্য নয় মানি, কিন্তু প্রত্যাগমন করিতেই বা কতক্ষণ?

গহর বুঝিল, আমি বিশেষ ভরসা পাই নাই, কহিল, তুই ত থাকবি খাটে, তোর ভয়টা কিসের? তা ছাড়া ওঁরা থাকেন না আর কোথায়? কপালে লেখা থাকলে রাজা পরীক্ষিঃও নিষ্ঠার পান না—আমরা ত তুচ্ছ। নবীন, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে খালের মুখে একটা ইট চাপা দিয়ে দিস্। ভুলিস্ নে। কিন্তু কি খাবি বল্ ত শ্রীকান্ত?

বলিলাম, যা জোটে।

নবীন কহিল, দুধ মুড়ি আর ভালো আখের গুড় আছে। আজকের মত যোগাড়—

বলিলাম, খুব খুব, এ বাড়িতে ও জিনিসের আমার অভ্যাস আছে। আর কিছু যোগাড়ের দরকার নেই বাবা, তুমি বরঞ্চ আঙ্গো দেখে একখানা ইট যোগাড় করে আনো। গর্তটা একটু মজবুত করে চাপা দাও—দখিনে বাতাসে ভরপুর হয়ে ওঁরা যখন ঘরে ফিরবেন তখন হঠাৎ না ঢুকে পড়তে পারেন।

নবীন আলো দিয়া চৌকির তলায় কিছুক্ষণ উঁকিবুঁকি মারিয়া বলিল, নাঃ—হবে না।

কি হবে না হে?

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হবে না। খালের মুখ কি একটা বাবু? এক পাঁজা ইট চাই যে। ইঁদুরে মেঝেটা একেবারে ঝাঁঝরা করে রেখেচে।

গহর বিশেষ বিচলিত হইল না, শুধু লোক লাগাইয়া কাল নিশ্চয় ঠিক করিয়া ফেলিতে হুকুম করিয়া দিল।

নবীন হাত-পা ধুইবার জল দিয়া ফলারের আয়োজনে ভিতরে চলিয়া গেলে জিঞ্জাসা করিলাম, তুমি কি খাবে গহর?

আমি? আমার এক বুড়ো মাসী আছেন, তিনিই রাঙ্গা করেন। সে যাক,  
খাওয়া-দাওয়া চুকলে লেখাগুলো তোরে পড়ে শোনাব।

সে আপন কাব্যের অনুধ্যানেই মগ্ন ছিল, অতিথির সুখ-সুবিধার কথা  
হয়ত চিন্তাও করে নাই; কহিল, বিছানাটা পেতে ফেলি, কি বল? রাত্তিরে দু'জনে  
একসঙ্গেই থাকব, কেমন?

এ আর এক বিপদ। বলিলাম, না ভাই গহর, তুমি তোমার ঘরে শোও  
গে, আজ আমি বড় ক্লান্ত, বই তোমার কাল সকালে শুনব।

কাল সকালে? তখন কি সময় হবে?

নিশ্চয় হবে।

গহর চুপ করিয়া একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, কিংবা একটা কাজ  
করলে হয় না শ্রীকান্ত? আমি পড়ে যাই, তুমি শুয়ে শুয়ে শোনো। ঘুমিয়ে পড়লেই  
আমি উঠে যাবো, কি বলো? এই বেশ মতলব,—না?

আমি মিনতি করিয়া বলিলাম, না ভাই গহর, তাতে তোমার বইয়ের  
মর্যাদা নষ্ট হবে। কাল আমি সমস্ত মন দিয়ে শুনব।

গহর ক্ষুঞ্চমুখে বিদায় লইল। কিন্তু বিদায় করিয়া নিজের মনটাও প্রসন্ন  
হইল না।

এই এক পাগল! ইতিপূর্বে ইশারায় ইঙ্গিতে বুঝিয়াছিলাম তাহার কাব্যগ্রন্থ  
সে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে চায়। মনে আশা, সংসারে একটা নৃতন সাড়া  
পড়িবে। সে লেখাপড়া বেশি করে নাই, পাঠশালায় ও স্কুলে সামান্য একটু বাঙ্গলা  
ও ইংরাজি শিখিয়াছিল মাত্র। মনও ছিল না, বোধ হয় সময়ও পায় নাই! কবে  
কোন্ শৈশবে সে কবিতা ভালোবাসিয়াছে, হয়ত এ মুঞ্চতা তাহার শিরার রক্তে  
প্রবহমান, তারপরে জগতের বাকী সব কিছুই তাহার চক্ষে অর্থহীন হইয়া  
গিয়াছে। নিজের অনেক রচনাই তাহার মুখস্থ, গাড়িতে বসিয়া গুণগুন করিয়া  
মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেও ছিল, শুনিয়া তখন মনে করিতে পারি নাই বাগ্

দেবী তাঁহার স্বর্ণপদ্মের একটি পাপড়ি খসাইয়াও এই অক্ষম ভঙ্গিকে কোনদিন পুরস্কার দিবেন। কিন্তু অক্লান্ত আরাধনার একাগ্র আত্মনিবেদনে এ বেচারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, বারো বৎসর পরে এই দেখা। এই দ্বাদশ-বর্ষ ব্যাপিয়া এ পার্থিব সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কথার পরে কথা গাঁথিয়া শ্লোকের পাহাড় জমা করিয়াছে, কিন্তু এ-সব কোন্ কাজে লাগিবে? কাজেও লাগে নাই জানি। গহর আজ আর নাই। তাহার দুশ্চর তপস্যার অকৃতার্থতা স্মরণ করিয়া মনে আজও দুঃখ পাই। ভাবি, লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন গন্ধহীন কত ফুল ফুটিয়া আপনি শুকায়। বিশ্ববিধানে কোন সার্থকতা যদি তাহার থাকে, গহরের সাধনাও হয়ত ব্যর্থ হয় নাই।

অতি প্রত্যয়েই ডাকাডাকি করিয়া গহর আমার ঘূম ভাঙাইয়া দিল; তখন হয়ত সবে সাতটা বাজিয়াছে, কিংবা বাজেও নাই। তাহার ইচ্ছা বসন্তদিনের বঙ্গের নিভৃত পঞ্জীর অপরূপ শোভাসৌন্দর্য স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হই। তাহার ভাবটা এমনি, যেন আমি বিলাত হইতে আসিয়াছি। তাহার আগ্রহ ক্ষ্যাপার মত, অনুরোধ এড়াইবার জো নাই, অতএব হাতমুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতে হইল। প্রাচীরের গায়ে আধমরা একটা জামগাছের অর্ধেকটায় মাধবী ও অর্ধেকটায় মালতীলতা—কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অত্যন্ত নিজীব চেহারা—তথাপি একটায় গোটাকয়েক ফুল ফুটিয়াছে, অপরটায় সবে কুঁড়ি ধরিয়াছে। তাহার ইচ্ছা গোটাকয়েক ফুল আমাকে উপহার দেয়, কিন্তু গাছে এত কাঠপিঁপড়া যে ছোঁবার জো নাই। সে এই বলিয়া আমাকে সাঙ্গনা দিল যে, আর একটু বেলা হইলে আঁকশি দিয়া অনায়াসে পাঢ়াইয়া দিতে পারিবে।— আচ্ছা, চলো।

নবীন প্রাতঃক্রিয়ার স্বচ্ছন্দ সুনির্বাহের উদ্যোগপর্বে দম ভরিয়া তামাক টানিয়া প্রবলবেগে কাশিতেছিল, থুথু ফেলিয়া ঢেক গিলিয়া অনেকটা সামলাইয়া লইয়া হাত নাড়িয়া নিমেধ করিল। বলিল, বনে-বাদাড়ে মেলাই যাবেন না বলে দিছি।

গহর বিরক্ত হইয়া উঠিল—কেন রে?

নবীন জবাব দিল, গোটা দুভিন শিয়াল ক্ষেপেচে—গরু-মনিষি একসাই  
কামড়ে বেড়াচে ।

আমি সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইলাম।— কোথায় হে নবীন?

কোথায় সে কি দেখে রেখেচি? আছেই কোন্ ঠাঁই ঝোপেবাড়ে । যান ত  
একটু চোখ রেখে চলবেন ।

তাহলে কাজ নেই ভাই গহর ।

বাঃ রে! এই সময়টায় শিয়াল-কুকুর একটু ক্ষেপেই, তা বলে লোকজন  
রাস্তায় চলবে না নাকি? বেশ ত!

এও দখিনা হাওয়ার ব্যাপার । অতএব, প্রকৃতির শোভা দেখিতে সঙ্গে  
যাইতেই হইল, পথের দু'ধারে আমবাগান । কাছে আসিতেই অগণিত ছেট ছেট  
পোকা চড়চড় পটপট শব্দে আম্বমুকুল ছাড়িয়া চোখে নাকে মুখে জামার ভিতরে  
তুকিয়া পড়িল, শুকনা পাতায় আমের মধু ঝরিয়া চটচটে আঠার মত হইয়াছে,  
সেগুলো জুতার তলায় জড়াইয়া ধরে, অপ্রশস্ত পথের অধিকাংশ বেদখল করিয়া  
বিরাজিত ঘেঁটুগাছের কুঞ্জ, মুকুলিত বিকশিত পুষ্পসম্ভারে একান্ত নিবিড় । মনে  
পড়িয়া গেল নবীনের সতর্কবাণী । গহরের মতে কালটা ক্ষেপিবার উপযোগী ।  
সুতরাং ঘেঁটুফুলের শোভা সময়মত আর-একদিন না হয় উপভোগ করা যাইবে,  
আজ গহর ও আমি, অর্থাৎ নবীনের ‘গরু-মনিষি’ একটু দ্রুতপদেই স্থানতাগ  
করিলাম ।

বলিয়াছি আমাদেরই গ্রামের নদী ইহাদেরও গ্রামপ্রাণে প্রবাহিত । বর্ষার  
পরিস্ফীত জলধারা বসন্তসমাগমে একান্ত শীর্ণ, সেদিনের স্নোতশালিত অপরিমেয়  
পানা ও শৈবাল আজ শুক্র তটভূমিতে পড়িয়া শিশির ও রৌদ্রে পচিয়া সমস্ত  
স্থানটাকে দুর্গন্ধে নরককুণ্ড করিয়া তুলিয়াছে । পরপারে দূরে কয়েকটা শিমুলগাছে  
অজস্র রাঙ্গা ফুল ফুটিয়া আছে চোখে পড়িল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

করাটা কবির কাছেও এখন যেন বাড়াবাড়ি বলিয়া ঠেকিল। বলিল, চল, ঘরে  
ফিরি।

তাই চলো।

আমি ভেবেছিলাম তোর এ-সব ভালো লাগবে।

বলিলাম, লাগবে ভাই লাগবে। ভাল ভাল কথা দিয়ে এ-সব তুমি কবিতায়  
লিখো, পড়ে আমি খুশিই হবো।

তাই বোধ হয় গাঁয়ের লোক ফিরেও চায় না।

না। দেখে দেখে তাদের অরুচি ধরে গেছে। চোখের রুচি আর কানের  
রুচি এক নয় ভাই। যারা মনে করে কবির বর্ণনা চোখে দেখতে পেলে লোকে  
মোহিত হয়ে যায়, তারা জানে না। দুনিয়ার সকল ব্যাপারই তাই। চোখে যা  
সাধারণ ঘটনা, হয়ত-বা সামান্য সাধারণ বস্তু, কবির ভাষায় তাই হয়ে যায় নতুন  
সৃষ্টি। তুমি দেখতে পাও সেও সত্যি, আমি যে দেখতে পেলাম না সেও সত্যি।  
এর জন্য তুমি দুঃখ করো না গহর।

তবুও ফিরিবার পথে সে কত কি যে আমাকে দেখাইবার চেষ্টা করিল  
তাহার সংখ্যা নাই। পথের প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি লতাগুল্ম পর্যন্ত যেন তাহার  
চেনা। কি একটা গাছের অনেকখানি ছাল কেহ বোধ হয় ওষধের প্রয়োজনে  
চাঁচিয়া লইয়া গিয়াছে, তখনও আঠা ঝরিতেছে, গহর হঠাতে দেখিতে পাইয়া যেন  
শিহরিয়া উঠিল। তাহার দুই চোখে ছলছল করিয়া আসিল—অন্তরে সে যে কি  
বেদনাই বোধ করিল তাহার মুখ দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। চক্ৰবৰ্তী  
যে তাহার সমুদয় হারানো বিষয় ফিরিয়া পাইতেছিল, সে কেবল কৌশল বিস্তার  
করিয়া নয়—তাহার হেতু ছিল গহরের নিজেরই স্বভাবের মধ্যে। ৰাক্ষণের প্রতি  
অনেকখানি ক্রোধ আমার আপনিই পড়িয়া গেল। চক্ৰবৰ্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল  
না, কারণ, শোনা গেল তাঁহার গৃহে গুটি-দুই নাতির ‘মায়ের অনুগ্রহ’ দেখা

গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ওলাবিবি এখনো দেখা দেন নাই—পচা পুকুরের জল আর একটু শুকাইবার অপেক্ষায় আছেন।

সে যাই হোক, বাড়িতে ফিরিয়া গহর তাহার পুঁথি আনিয়া হাজির করিল, তাহার পরিমাণ দেখিয়া ভয় পায় না সংসারে এমন কেহ যদি থাকেও তাহা অত্যন্ত বিরল। বলিল, না পড়া হলে কিন্তু ছাড়া পাবে না, শ্রীকান্ত। সত্যি করে তোমাকে মত দিতে হবে।

এ আশঙ্কা ছিলই। স্পষ্ট করিয়া রাজী হইতে পারি এ সাহস ছিল না, তথাপি দিনের পর দিন করিয়া কবির বাটীতে কাব্য-আলোচনায় এ যাত্রায় আমার সাতদিন কাটিল। কাব্যের কথা থাক কিন্তু নিবিড় সাহচর্যে মানুষটির যে পরিচয় পাইলাম তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি বিশ্বায়কর। ৭৮৫

একদিন গহর বলিল, তোর কাজ কি শ্রীকান্ত বর্মায় গিয়ে। আমাদের দু'জনেরই আপনার বলতে কেউ নেই, আয় না দু'ভায়ে এখানেই একসঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

হাসিয়া বলিলাম, আমি ত তোমার মত কবি নই ভাই, গাছপালার ভাষাই বুঝিনে, তাদের সঙ্গে কথা কইতেও পারিনে, পারব কেন এই বনের মধ্যে বাস করতে? দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠবো যে!

গহর গভীর হইয়া উঠিল, বলিল, আমি কিন্তু সত্যিই ওদের ভাষা বুঝি, ওরা সতিই কথা কয়—তোরা পারিস নে বিশ্বাস করতে?

বলিলাম, বিশ্বাস করা যে শক্ত এটা তুমিও ত বোঝো!

গহর সহজেই স্বীকার করিয়া লইল; কহিল, হাঁ তাও বুঝি।

একদিন সকালে তাহার রামায়ণের অশোকবনের অধ্যায়টা কিছুক্ষণ পড়ার পরে সে হঠাৎ বই মুড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, আছা শ্রীকান্ত, তুই কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলি?

কাল অনেক রাত্রি জাগিয়া রাজলক্ষ্মীকে হয়ত আমার এই শেষ চিঠিই লিখিয়াছিলাম। ঠাকুর্দার কথা, পুটুর কথা, তাহার দুর্ভাগ্যের বিবরণ সমস্তই তাহাতে ছিল। তাঁহাদিগকে কথা দিয়াছিলাম একজনের অনুমতি চাহিয়া লইব—সে ভিক্ষাও তাহাতে ছিল। পাঠান হয় নাই, চিঠিটা তখনও আমার পকেটে পড়িয়া। গহরের প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া বলিলাম, না।

গহর কহিল, যদি কখনো ভালোবাসিস, যদি কখনো সেদিন আসে, আমাকে জানাস শ্রীকান্ত।

জেনে তোমার কি হবে?

কিছুই না। তখন শুধু তোদের মধ্যে গিয়ে দিনকতক কাটিয়ে আসব।

আচ্ছা।

আর যদি তখন টাকার দরকার হয় আমাকে খবর দিস। বাবা অনেক টাকা রেখে গেছে, সে আমার কাজে লাগল না—কিন্তু তোদের হয়ত কাজে লেগে যাবে।

তাহার বলার ধরনটা এমনি যে, শুনিলেও চোখে জল আসিয়া পড়িতে চায়। বলিলাম, আচ্ছা, তাও জানাব। কিন্তু আশীর্বাদ ক'রো সে প্রয়োজন যেন না হয়।

আবার যাবার দিনে গহর পুনরায় আমার ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া প্রস্তুত হইল। প্রয়োজন ছিল না, নবীন ত লজ্জায় প্রায় আধমরা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কানও দিল না। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া সে মেয়েমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমার মাথার দিব্যি রটিল শ্রীকান্ত, চলে যাবার আগে আবার একদিন এসো, যেন আর একবার দেখা হয়।

আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কথা দিলাম দেখা করিতে আবার আসিব।

কলকাতায় পৌঁছে কৃশ্ণ সংবাদ দেবে বলো?

এ প্রতিশ্রুতিও দিলাম। যেন কত দূরেই না চলিয়াছি।  
কলিকাতার বাসায় গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। চৌকাঠে পা  
দিয়াই যাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল সে আর কেহ নহে, স্বয়ং রতন।

এ কি রে, তুই যে ?

হ্যাঁ, আমিই। কাল থেকে বসে আছি—একখানা চিঠি আছে।

বুবিলাম সেই প্রার্থনার উত্তর। কহিলাম, চিঠি ডাকে দিলেও ত আসত?

রতন বলিল, সে ব্যবস্থা চাষাভুমো মুটেমজুর গেরস্ত লোকদের জন্য। মার  
চিঠি একটা লোক না-খেয়ে না-সুমিয়ে পাঁচ শ' মাইল ছুটে হাতে করে না আনলে  
খোয়া যায়। জানেন ত সব, কেন মিছে জিজ্ঞাসা করছেন।

পরে শুনিয়াছিলাম রতনের এ অভিযোগ মিথ্যা। কারণ সে নিজেই  
উদ্যোগী হইয়া এ চিঠি হাতে করিয়া আনিয়াছে। এখন মনে হইল গাড়ির ভিড়ে  
ও আহারাদির অব্যবস্থায় তাহার মেজাজ বিগড়াইয়াছে। হাসিয়া কহিলাম, উপরে  
আয়। চিঠি পরে হবে, চল তোর খাবার জোগাড়টা আগে করে দিই গে।

রতন পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, চলুন।

## তিনি

সশব্দ উদগারে চমকিত করিয়া রতন দেখা দিল।

কি রতন, পেট ভরলো?

আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আপনি যাই বলুন বাবু, আমাদের কলকাতায় বাঙালী  
বামুনঠাকুর ছাড়া রান্নার কেউ কিছু জানে না। ওদের ঐসব মেডুয়া  
মহারাজগুলোকে ত জানোয়ার বললেই হয়।

উভয় প্রদেশের রান্নার ভালমন্দ, অথবা পাচকের শিল্পৈপুণ্য লইয়া  
রতনের সঙ্গে কখনো তর্ক করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। কিন্তু রতনকে যতদূর  
জানি তাহাতে বুঝিলাম সুপ্রচুর ভোজনে সে পরিতৃষ্ণ হইয়াছে। না হইলে পশ্চিমা  
পাচকদের সম্বন্ধে এমন নিরপেক্ষ সুবিচার করিতে পারিত না। কহিল, গাড়ির  
ধকলটা ত সামান্য নয়, একটু আড়মোড়া ভেঙ্গে গড়িয়ে না নিলে—

বেশ ত রতন, ঘরে হোক, বারান্দায় হোক, একটা বিছানা পেতে নিয়ে  
শুয়ে পড়ো গে। কাল সব কথা হবে।

কি জানি কেন, চিঠির জন্য উৎকর্থা ছিল না। মনে হইতেছিল, সে যাহা  
লিখিয়াছে তাহা ত জানিই।

রতন ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া হাতে দিল।  
আগাগোড়া গালা দিয়া শিলমোহর করা। বলিল, বারান্দার ঐ দক্ষিণের জানালার  
ধারে বিছানাটা পেতে ফেলি, মশারি খাটাবার হাঙ্গমা নেই,—কলকাতা ছাড়া এমন  
সুখ কি আর কোথাও আছে! যাই—

কিন্তু খবর সব ভাল ত রতন?

রতন মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, তাই ত দেখায়। গুরুদেবের কৃপায়  
বাড়ির বাইরেটা গুলজার, ভেতরে দাসদাসী, বক্ষবাবু, নতুন বৌমা এসে ঘরদোর

আলো করেছেন, আর সবার ওপরে স্বয়ং মা আছেন যে বাড়ির গিন্ধী—এমন সংসারকে নিন্দে করবে কে? আমি কিন্তু অনেক কালের চাকর, জাতে নাপতে—রত্নাকে অত সহজে ভোলানো যায় না বাবু। তাই ত সেদিন ইস্টিশনে চোখের জল সামলাতে পারিনি, প্রার্থনা জানিয়েছিলাম বিদেশে চাকরের অভাব হলে রতনকে একটা খবর পাঠাবেন। জানি, আপনার সেবা করলেও সেই মায়ের সেবাই করা হবে। ধর্মে পতিত হবো না।

কিছুই বুঝিলাম না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলাম।

সে বলিতে লাগিল, বক্ষুবাবুর বয়সও হ'ল, যা হোক একটু বিদ্যেসিদ্যে শিখে মানুষও হয়েছেন। ভাবচেন বোধ হয় কিসের জন্য আর পরবশে থাকা? দানপত্রের জোরে মেরে ত সব নিয়েছেন। মোটামুটি যে বেশ কিছু মেরেচেন তা মানি, কিন্তু সে কতক্ষণ বাবু ?

স্পষ্ট এখনও হইল না, কিন্তু একটা আবছায়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল।

সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, স্বচক্ষেই ত দেখেছেন মাসে অন্ততঃ দুবার করে আমার চাকরি যায়। অবস্থা মন্দ নয়, রাগ করে চলে গেলেও পারি, কিন্তু যাইনে কেন? পারিনে। এটুকু জানি, যাঁর দয়ায় হয়েচে তাঁর একটা নিশ্চাসেই আশ্চর্ষনের মেঘের মত সমস্ত উবে যাবে, চোখের পাতা ফেলবার সময় দেবে না। ও তো মায়ের রাগ নয়, ও আমার দেবতার আশীর্বাদ।

এখানে পাঠককে একটু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, রতন ছেলেবেলায় কিছুকাল প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়াছিল।

একটু থামিয়া কহিল, মায়ের বারণ তাই কখনো বলিনে। ঘরে যা-কিছু ছিল খুড়োরা ঠকিয়ে নিলে, একঘর যজমান পর্যন্ত দিলে না। ছোট দুটি ছেলেমেয়ে আর তাদের মাকে ফেলে পেটের দায়ে একদিন গাঁ ছেড়ে বার হলাম, কিন্তু পূর্বজন্মের তপিস্যে ছিল, আমার এই মায়ের ঘরেই চাকরি জুটে গেল। সমস্ত

দুঃখই শুনলেন, কিন্তু কিছুই তখন বললেন না। বছরখানেক পরে একদিন নিবেদন জানালাম, মা, ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখতে একবার সাধ হয়, যদি দিনকয়েকের ছুটি দেন। হেসে বললেন, আবার আসবি ত? যাবার দিনে হাতে একটা পুঁচুলি গুঁজে দিয়ে বললেন, রতন, খুড়োদের সঙ্গে ঝগড়াবাঁটি করিস নে বাবা, যা তোর গেছে এই দিয়ে ফিরিয়ে নি গে যা। খুলে দেখি পাঁচ শ' টাকা। প্রথমে নিজের চোখ-দুটোকেই বিশ্বাস হ'ল না, তব হল বুঝি-বা জেগে জেগেই স্মৃতি দেখচি। আমার সেই মাকেই বক্সবাবু এখন ব্যাকাট্যারা কথা কয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে গজগজ করে। ভাবি, এর আর বেশি দিন নয়, মা লক্ষ্মী টললেন বলে।

আমি এ আশঙ্কা করি নাই, নিরুত্তরে শুনিতে লাগিলাম।

মনে হইল রতন কিছুদিন হইতেই ক্রোধে ও ক্ষোভে ফুলিতেছে। কহিল, মা যখন দেন দু'হাতে ঢেলে দেন। বক্সকেও দিয়েচেন। তাই ও ভেবেচে নেঙড়ানো মৌচাকের আর দাম কি, বড়জোর এখন জ্বালানোই চলে। তাই ওর এত অগ্রাহ্য। মুখ্য জানে না যে, আজও মায়ের একখানা গয়না বিক্রি করলে অমন পাঁচখানা বাড়ি তৈরি হয়।

আমিও জানিতাম না। হাসিয়া বলিলাম, তাই নাকি? কিন্তু সে-সব আছে কোথায়?

রতন হাসিল, কহিল, আছে তাঁরই কাছে। মা অত বোকা নন। এক আপনার পায়েই সমস্ত উজোড় করে দিয়ে তিনি ভিখিরী হতে পারেন, কিন্তু আর কারও জন্যে নয়। বক্স জানে না যে, আপনি বেঁচে থাকতে মায়ের আশ্রয়ের অভাব নেই, আর রতন বেঁচে থাকতে তাঁর চাকরের ভাবনা হবে না। সেদিন কাশী থেকে আপনার অমনি করে চলে আসা যে মা'র বুকে কি শেল বিঁধেচে, বক্সবাবু তার কি খবর রাখে? গুরুষ্ঠাকুরই বা তার সন্ধান পাবে কোথায়?

কিন্তু আমাকে যে তিনি নিজেই বিদায় করেচেন, এ খবর ত তুমি জান রতন?

রতন জিভ কাটিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। এতটা বিনয় কখনো তাহার পূর্বে দেখি নাই। বলিল, আমরা চাকরবাকর বাবু, এসব কথা আমাদের কানেও শুনতে নাই। ও মিথ্যে।

রতন আড়মোড়া ভাসিয়া একটু গড়াইয়া লইতে প্রস্থান করিল। বোধ করি কাল আটটার পূর্বে আর তার দেহটা ‘ধাতে’ আসিবে না।

দুটো বড় খবর পাওয়া গেল। একটা এই যে, বঙ্কু বড় হইয়াছে। পাটনায় যখন তাহাকে প্রথম দেখি তখন বয়স তাহার ঘোল-সতেরো। এখন একুশ বৎসরের যুবক। উপরন্তু এই পাঁচ-ছয় বৎসরের ব্যবধানে সে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শৈশবের এই সকৃতজ্ঞ ম্বেহ যদি আজ যৌবনের আত্মসম্মানবোধে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে, বিস্ময়ের কি আছে?

দ্বিতীয় সংবাদ—না বঙ্কু, না গুরুদেব, রাজলক্ষ্মীর গভীরতম বেদনার কোনও সন্ধান আজও তাঁহাদের জানা নাই।

মনের মধ্যে এই কথা-দুটাই বহুক্ষণ ধরিয়া নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

স্যন্ত-অক্ষিত শিলমোহরের গালার ছাপগুলো দেখিয়া লইয়া চিঠি খুলিলাম।

তাহার হাতের লেখা বেশি দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু স্মরণ হইল হস্তাক্ষর দুপ্পাঠ্য না হইলেও ভাল নয়। কিন্তু এই পত্রখানি সে অত্যন্ত সাবধানে লিখিয়াছে, বোধ হয়, তাহার ভয়, বিরক্ত হইয়া আমি না ফেলিয়া রাখি। যেন আগাগোড়া সবটুকুই সহজে পড়িতে পারি।

আচার-আচরণে রাজলক্ষ্মী সে যুগের মানুষ। প্রণয়-নিবেদন আতিশয় ত দূরের কথা, ‘ভালবাসি’ এমন কথাও কখনো সুমুখে উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সে লিখিয়াছে চিঠি—আমার প্রার্থনার অনুকূলে অনুমতি দিয়া। তবু কি-জানি কি আছে, পড়িতে কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। তাহার বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। সেদিন তাহার পড়াশুনা সাঙ্গ হইয়াছিল

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। পরবর্তীকালে ঘরে বসিয়া হয়ত সামান্য কিছু বিদ্যাচর্চা করিয়া থাকিবে। অতএব, ভাষার ইন্দ্রজাল, শব্দের ঝঞ্চার, পদবিন্যাসের মাধুরী তাহার পত্রের মধ্যে আশা করা অন্যায়। সর্বদা প্রচলিত সামান্য গোটাকয়েক কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর সে কি করিবে? একটা অনুমতি দিয়া মামুলি শুভকামনা করিয়া দু ছত্র লেখা—এই ত? কিন্তু খাম খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরের কিছুই আর মনে রাখিল না। পত্র দীর্ঘ নয়, কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গ যত সহজ ও সরল ভাবিয়াছিলাম তাহাও নয়। আমার আবেদনের উন্নত সে এইরূপ দিয়াছে—

### ৩ কাশীধাম

#### প্রণামাত্তে সেবিকার নিবেদন—

তোমার চিঠিখানা এইবার নিয়ে এক শ' বার পড়লুম। তবু ভেবে পেলুম না তুমি ক্ষেপেচ না আমি ক্ষেপেচি। ভেবেচো, বুঝি হঠাৎ তোমাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম? কুড়িয়ে তোমাকে পাইনি, পেয়েছিলুম অনেক তপস্যায়, অনেক আরাধনায়। তাই, বিদ্যায় দেবার কর্তা তুমি নও, আমাকে ত্যাগ করার মালিকানা স্বত্ত্বাধিকার তোমার হাতে নেই।

ফুলের বদলে বন থেকে তুলে বাঁইচির মালা গেঁথে কোন শৈশবে তোমাকে বরণ করেছিলুম সে তোমার মনে নেই। কাঁটায় হাত বয়ে রক্ত ঝরে পড়তো, রাঙ্গামালার সে রাঙ্গা-রং তুমি চিনতে পারনি, বালিকার পূজার অর্ঘ্য সেদিন তোমার গলায় তোমার বুকের ‘পরে রক্তরেখায় যে লেখা এঁকে দিত সে তোমার চোখে পড়েনি, কিন্তু যাঁর চোখে সংসারের কিছুই বাদ পড়ে না আমার সে নিবেদন তাঁর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছেছিল।

তার পরে এলো দুর্ঘোগের রাত, কালো মেঘে দিলে আমার আকাশের জ্যোৎস্না দেকে। কিন্তু সে সত্যিই আমি না আর কেউ, এ জীবনে যথার্থই ও-সব ঘটেছিল, না ঘূমিয়ে ঘূমিয়ে স্বপ্ন দেখেচি, ভাবতে গিয়ে অনেক সময়ে ভয় হয়

বুঝি-বা আমি পাগল হয়ে যাব। তখন সমস্ত ভুলে যাঁকে ধ্যান করতে বসি তাঁর নাম বলা চলে না। কাউকে বলতেও নেই। তাঁর ক্ষমাই আমার জগদীশ্বরের ক্ষমা। এতে ভুল নেই, সন্দেহ নেই, এখানে আমি নির্ভর্য।

হাঁ, বলছিলুম, তার পরে, এলো আমার দুর্দিনের রাত্রি, কলঙ্কে দিলে দু'চোখের সকল আলো নিবিয়ে। কিন্তু সেই কি মানুষের সমস্ত পরিচয়? সেই অখণ্ড গ্লানির নিরবকাশ আবরণের বাইরে তার কি আর কিছুই বাকী নেই?

আছে। অব্যাহত অপরাধের মাঝে মাঝে তাকে আমি বার বার দেখতে পেয়েচি। তাই যদি না হ'তো, বিগত দিনের রাক্ষসটা যদি আমার অনাগতর সমস্ত মঙ্গলকে নিঃশেষে গিলে খেতো, তবে তোমাকে ফিরে পেতুম কি করে? আমার হাতে এনে আবার তোমাকে দিয়ে যেতো কে?

আমার চেয়ে তুমি চার-পাঁচ বছরের বড়, তবু তোমাকে যা মানায় আমাকে তা সাজে না। বাঙালী-ঘরের মেয়ে আমি, জীবনের সাতাশটা বছর পার করে দিয়ে আজ যৌবনের দাবি আর করিনে। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না—যত অধমই হই, ও-কথা যদি ঘুণাক্ষরেও তোমার মনে আসে তার বাড়া লজ্জা আমার নেই। বক্ষ বেঁচে থাক, সে বড় হয়েছে, তার বৌ এসেছে—তোমার বিয়ের পরে তাদের সুমুখে বার হবো আমি কোন্ মুখে? এ অসম্মান সইব কি করে?

যদি কখনো অসুখে পড়ো দেখবে কে—পুঁটু! আর আমি ফিরে আসব তোমার বাড়ির বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে? তার পরেও বেঁচে থাকতে বলো নাকি?

হয়ত প্রশ্ন করবে, তবে কি এমনি নিঃসঙ্গ জীবনই চিরদিন কাটাব? কিন্তু প্রশ্ন যাই হোক, এর জবাব দেবার দায় আমার নয়, তোমার। তবে নিতান্তই যদি ভেবে না পাও, বুদ্ধি এতই ক্ষয়ে গিয়ে থাকে, আমি ধার দিতে পারি, শোধ দিতে হবে না,—কিন্তু ঝণটা অস্মীকার ক'রো না যেন।

তুমি ভাবো গুরুদেব দিয়েছেন আমাকে মুক্তির মন্ত্র, শান্তি দিয়েছে পথের  
সন্ধান, সুনন্দা দিয়েছে ধর্মের প্রবৃত্তি, আর তুমি দিয়েছ শুধু ভার বোঝা। এমনিই  
অন্ধ তোমরা।

জিজ্ঞেস করি, তোমাকে ত ফিরে পেয়েছিলুম আমার তেইশ বছর বয়সে,  
কিন্তু তার আগে এঁরা সব ছিলেন কোথায় ? তুমি এত ভাবতে পার, আর এটা  
ভাবতে পারো না?

আশা ছিল একদিন আমার পাপ ক্ষয় হবে, আমি নিষ্পাপ হবো। এ লোভ  
কেন জানো ? স্বর্গের জন্যে নয়, সে আমি চাইনে। আমার কামনা, মরণের পরে  
যেন আবার এসে জন্মাতে পারি। বুঝতে পারো তার মানে কি?

ভেবেছিলুম জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে,—তাকে নির্মল আমাকে  
করতেই হবে। কিন্তু আজ তার উৎসই যদি যায় শুকিয়ে ত থাকলো আমার  
জপতপ পূজা- অর্চনা, থাকলো সুনন্দা, থাকলো আমার গুরুদেব।

স্বেচ্ছায় মরণ আমি চাইনে। কিন্তু আমাকে অপমান করার ফন্দি যদি  
করে থাকো, সে বুদ্ধি ত্যাগ ক'রো। তুমি দিলে বিষ আমি নেবো, কিন্তু ও নিতে  
পারবো না। আমাকে জানো বলেই জানিয়ে দিলুম যে-সূর্য অস্ত যাবে তার  
পুনরুদয়ের অপেক্ষায়ে বসে থাকার আমার

আর সময়ে হবে না। ইতি—

রাজলক্ষ্মী

বাঁচা গেল! সুনিশ্চিত কঠোর অনুশাসনের চরম লিপি পাঠাইয়া একটা  
দিকে আমাকে সে একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল। এ জীবনে ও ব্যাপার লইয়া  
ভবিবার আর কিছু রহিল না। কিন্তু কি করিতে পারিব না তাহাই নিঃসংশয়ে  
জানিলাম, কিন্তু অতঃপর কি আমাকে করিতে হইবে এ সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মী  
একেবারে নির্বাক। হয়ত উপদেশ দিয়া আর একদিন চিঠি লিখিবে, কিংবা  
আমাকেই সশরীরে তলব করিয়া পাঠাইবে, কিন্তু আপাততঃ ব্যবস্থা যাহা হইল

তাহা অত্যন্ত চমৎকার। এদিকে ঠাকুর্দা মহাশয় সম্বতঃ কাল সকালেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন; ভরসা দিয়া আসিয়াছি চিন্তার হেতু নাই, অনুমতি পাওয়ার বিষ্ণ ঘটিবে না। কিন্তু যাহা আসিয়া পৌঁছিল তাহা নির্বিষ্ণ অনুমতিই বটে! রতন নাপিতের হাতে সে যে চেলি এবং টোপর পাঠায় নাই এই তের।

ও-পক্ষে দেশের বাটীতে বিবাহের আয়োজন নিশ্চয়ই অগ্রসর হইতেছে। পুঁতুর আত্মায়স্বজনও কেহ কেহ হয়ত আসিয়া হাজির হইতেছে এবং প্রাপ্তবয়স্কা অপরাধী মেয়েটা হয়ত এতদিনে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার পরিবর্তে একটুখানি সমাদরের মুখ দেখিতে পাইয়াছে। ঠাকুর্দাকে কি বলিব জানি, কিন্তু কেমন করিয়া সেই কথাটা বলিব ইহাই ভাবিয়া পাইলাম না। তাঁহার নির্মম তাগাদা ও লজ্জাহীন যুক্তি ও ওকালতি মনে মনে আলোচনা করিয়া অত্তরটা একদিকে যেমন তিক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার ব্যর্থ প্রত্যাবর্তনে নিরাশায় ক্ষিপ্ত পরিজনগণের ঐ দুর্ভাগ্য মেয়েটাকে অধিকতর উৎপীড়নের কথা মনে করিয়াও হৃদয় তেমনি ব্যথিত হইয়া আসিল। কিন্তু উপায় কি? বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া রাখিলাম। পুঁতুর কথা ভুলিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু নিরস্তর মনে পড়িতে লাগিল গঙ্গামাটির কথা। জনবিরল সেই ক্ষুদ্র পল্লীস্মৃতি কোনদিন মুছিবার নয়।

এ জীবনের গঙ্গা-যমুনাধারা একদিন এইখানে আসিয়া মিলিয়াছে এবং স্বল্পকাল পাশপাশি প্রবাহিত হইয়া আবার একদিন এইখানেই বিযুক্ত হইয়াছে। একএবাসের সেই ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি শুন্দায় গভীর, স্নেহে মধুর, আনন্দে উজ্জ্বল, আবার তাদের মতই নিঃশব্দ বেদনায় নিরতিশয় স্তৰ্ক। বিচ্ছেদের দিনেও আমরা প্রবর্ধনার পরিবাদে কেহ কাহাকেও কলঙ্ক-লিঙ্গ করি নাই, লাভ-ক্ষতির নিষ্পত্তি বাদপ্রতিবাদে গঙ্গামাটির শান্ত গৃহখানিকে আমরা ধূমাচ্ছন্ন করিয়া আসি নাই। সেখানের সবাই জানে আবার একদিন আমরা ফিরিয়া আসিব, আবার শুরু হইবে আমোদ-আহ্নাদ, শুরু হইবে ভূস্বামিনীর দীনদরিদ্রের সেবা ও সৎকার। কিন্তু সে

সম্ভাবনা যে শেষ হইয়াছে, প্রভাতের বিকশিত মল্লিকা দিনান্তের শাসন মানিয়া  
লইয়া নীরব হইয়াছে, এ কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না। ৭৯১

চোখে ঘুম নাই, বিনিদি রজনী ভোরের দিকে যতই গড়ইয়া আসিতে  
লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ রাত্রি যেন না পোহায়। এই একটিমাত্র  
চিন্তাই এমনি করিয়া যেন আমাকে মোহাছন্ন করিয়া রাখে।

বিগত কাহিনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে পড়ে, বীরভূম জেলার সেই তুচ্ছ  
কুটীরখানি মনের উপর ভূতের মত চাপিয়া বসে, অনুক্ষণ গৃহকর্মে নিযুক্তা  
রাজলক্ষ্মীর স্মিঞ্চহাত-দুটি চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ জীবনে পরিতৃপ্তির  
আস্থাদন এমন করিয়া কখনো করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

এতকাল ধরাই পড়িয়াছি, ধরিতে পারি নাই। কিন্তু আজ ধরা পড়িল  
রাজলক্ষ্মীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কোথায়। সে জানে আমি সুস্থ নই, যে-কোনদিন  
অসুখে পড়িতে পারি, তখন কোথাকার কে এক পুঁটু আমাকে ঘিরিয়া শয্যা জুড়িয়া  
বসিয়াছে, রাজলক্ষ্মীর কোনো কর্তৃত্বই নাই, এতবড় দুর্ঘটনা মনের মধ্যে সে ঠাঁই  
দিতে পারে না। সংসারের সবকিছু হইতেই নিজেকে সে বঞ্চিত করিতে পারে,  
কিন্তু এ বস্তু অস্ত্ব,- এ তাহার অসাধ্য। মরণ তুচ্ছ এর কাছে, রহিল তাহার  
গুরুদেব, রহিল তাহার জপতপ ব্রত- উপবাস। সে মিথ্যা ভয় আমাকে চিঠির  
মধ্যে দেখায় নাই।

ভোরের সময় বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, রতনের ডাকে যখন  
জাগিয়া উঠিলাম তখন বেলা হইয়াছে। সে কহিল, কে একটি বুড়ো ভদ্রলোক  
ঘোড়ার গাড়ি করে এইমাত্র এলেন।

এ ঠাকুর্দা। কিন্তু গাড়ি ভাড়া করিয়া? সন্দেহ জন্মিল।

রতন কহিল, সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে আছে।

এ পুঁটু। এই নির্লজ্জ মানুষটা তাহাকে কলিকাতার বাসায় পর্যন্ত টানিয়া  
আনিয়াছে। সকালের আলো তিক্তায় স্নান হইয়া উঠিল। বলিলাম, তাঁদের এই

ঘরে এনে বসাও রতন, আমি মুখহাত ধুয়ে আসচি, এই বলিয়া নীচে স্নানের ঘরে  
চলিয়া গেলাম।

ঘটাখানেক পরে ফিরিয়া আসিতে ঠাকুর্দাই আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা  
করিলেন, যেন আমিই অতিথি,— এসো দাদা, এসো। শরীরটা বেশ ভালো ত?

আমি প্রণাম করিলাম। ঠাকুর্দা হাঁকিলেন, পুঁটু গেলি কোথায়?

পুঁটু জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতেছিল, কাছে আসিয়া আমাকে  
নমস্কার করিল।

ঠাকুর্দা কহিলেন, ওর পিসিমা বিয়ের আগে ওকে একবার দেখতে চায়।  
পিসেমশাই হাকিম-পাঁচ শ' টাকা মাইনে। ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হয়ে এসেছে-  
ঘর-সংসার ফেলে পিসির বার হবার জো নেই, তাই সঙে নিয়ে এলুম, বললুম,  
পরের হাতে তুলে দেবার আগে ওকে একবার দেখিয়ে আনি গে। ওর দিদিমা  
আশীর্বাদ করে বললে, পুঁটি এমনি অদৃষ্ট যেন তোরও হয়।

আমি কিছু বলিবার পূর্বে নিজেই বলিলেন, আমি কিন্তু সহজে ছাড়ছি নে  
ভায়া। হাকিমই হোন আর যেই হোন, আঢ়ীয় ত- দাঁড়িয়ে থেকে কাজটি সমাধা  
করে দিতে হবে- তবে তাঁর ছুটি। জানোই তো দাদা, শুভকর্মে বহু বিষ্ণু—শান্ত্রে  
কি যে বলে—শ্রেয়াৎসি বহু

বিষ্ণানি,—অমন একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকলে কারুর টুঁ-শব্দ করবার  
ভরসা হবে না। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে ত বিশ্বাস নেই—ওরা সব পারে।  
কিন্তু হাকিম কিনা, ওদের রাশই আলাদা।

পুঁটুর পিসেমশাই হাকিম। খবরটা অবাস্তুর নয়—তাৎপর্য আছে।

নতুন ছঁকা কিনিয়া আনিয়া রতন সয়ত্বে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল,  
ঠাকুর্দা ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিলেন, লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছি  
বলে মনে হচ্ছে না?

রতন তৎক্ষণাত কহিল, আজ্জে হাঁ, দেখেচেন বৈ কি। দেশের বাড়িতে  
বাবুর অসুখের সময়ে।

ওঃ—তাই ত বলি। চেনা মুখ।

আজ্জে হাঁ। বলিয়া রতন চলিয়া গেল।

ঠাকুর্দার মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত লোক, বোধ  
হয় সমস্ত কথাই তাঁহার স্মরণ হইল। নীরবে তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন,  
বেরুবার সময়ে দিনটা দেখিয়ে এসেছিলাম, বেশ ভালো দিন, আমার ইচ্ছে  
আশীর্বাদের কাজটা অমনি সেবে রেখে যাই। নতুনবাজারে সমস্ত কিনতে পাওয়া  
যায়, চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দিলে হয় না? কি বলো ?

কিছুতেই কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কোনমতে শুধু বলিয়া ফেলিলাম, না।

না? না কেন? বেলা বারটা পর্যন্ত দিনটা ত বেশ ভালো। পাঁজি আছে?

বলিলাম, পাঁজির দরকার নেই। বিবাহ আমি করতে পারব না।

ঠাকুর্দা হঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। মুখ দেখিয়া বুঝিলাম  
যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছেন। গালাটা বেশ শান্ত ও গম্ভীর করিয়া কহিলেন,  
উযুগ-আয়োজন একরকম সম্পূর্ণ বললেই হয়। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, ঠাট্টা-  
তামাশার ব্যাপার ত নয়—কথা দিয়ে এসে এখন না বললে চলবে কেন ?

পুঁট পিছন ফিরিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে এবং দ্বারের আড়ালে  
রতন কান পাতিয়া রাখিয়াছে বেশ জানি।

বলিলাম, কথা দিয়ে যে আসিনি তা আমিও জানি, আপনিও জানেন।  
বলেছিলাম একজনের অনুমতি পেলে রাজী হতে পারি।

অনুমতি পাওনি ?

না।

ঠাকুর্দা একমুহূর্ত থামিয়া বলিলেন, পুঁটির বাপ বলে, সর্বরকমে সে হাজার  
টাকা দেবে। ধরাধরি করলে আর দু-এক শ' উঠতে পারে। কি বল হে ?

রতন ঘরে দুকিয়া বলিল, তামাকটা আর একবার পালটে দেব কি ?  
দাও। তোমার নামটি কি বাপু ?

রতন।

রতন ? বেশ নামটি—থাক কোথায় ?  
কাশীতে।

কাশী ? ঠাকুরনটি বুঝি আজকাল কাশীতেই থাকেন? কি করচেন  
সেখানে ?

রতন মুখ তুলিয়া বলিল, সে খবরে আপনার দরকার?

ঠাকুর্দা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, রাগ করো কেন বাপু, রাগের ত কিছু  
নেই। গাঁয়ের মেয়ে কিনা, তাই খবরটা জানতে ইচ্ছে করে। হয়ত তাঁর কাছে  
গিয়ে পড়তেই বা হয়। তা ভাল আছে ত?

রতন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল এবং মিনিট-দুই পরেই কলিকায় ফুঁ  
দিতে দিতে ফিরিয়া আসিয়া হঁকাটা তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ঠাকুর্দা  
সবলে কয়েকটা টান দিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—দাঁড়াও ত বাপু, পায়খানাটা  
একবার দেখিয়ে দেবে। ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল কিনা! বলিতে বলিতে  
তিনি রতনের আগেই ব্যস্ত-দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পুঁট মুখ ফিরিয়া চাহিল, কহিল, দাদামশায়ের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন  
না। বাবা হাজার টাকা কোথায় পাবেন যে দেবেন? অমনি করে পরের গয়না  
চেয়ে দিদির বিয়ে,— এখন তারা দিদিকে আর নেয় না। তারা বলে, ছেলের  
আবার বিয়ে দেবে।

এই মেয়েটি এত কথা আমার সঙ্গে পূর্বে কহে নাই; কিছু আশ্চর্য হইয়া  
জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা সত্যই কি হাজার টাকা দিতে পারেন না?

পুঁট ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কথখনো না। বাবা রেলে চাল্লিশ টাকা মোটে  
মাইনে পান, আমার ছোটভাইয়ের ইঙ্গুলের মাইনের জন্যে আর পড়াই হ'ল না।  
সে কত কাঁদে। বলিতে বলিতে তাহার চোখ-দুটি ছলছল করিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, তোমার কি শুধু টাকার জন্যেই বিয়ে হচ্ছে না?

পুঁট কহিল, হাঁ, তাই ত। আমাদের গাঁয়ের অমূল্যবাবুর সঙ্গে বাবা সমন্ব  
করেছিলেন। তার মেয়েরাই আমার চেয়ে অনেক বড়। মা জলে ডুবে মরতে  
গিয়েছিলেন বলেই ত সে বিয়ে বন্ধ হ'ল। এবারে বাবা বোধ হয় আর কারু কথা  
শুনবেন না, সেইখানেই আমার বিয়ে দেবেন।

বলিলাম, পুঁট, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

পুঁট সলজ্জে মুখ নীচু করিয়া একটুখানি মাথা নাড়িল।

কিন্তু আমিও ত তোমার চেয়ে চোদ্দ-পনের বছরের বড়?

পুঁট এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি আর কোথাও কখনো সমন্ব হয়নি?

পুঁট মুখ তুলিয়া খুশি হইয়া বলিল, হয়েছিল ত। আপনাদের গ্রামের  
কালিদাসবাবুকে জানেন? তাঁর ছোট ছেলে। বি. এ. পাশ করেছে, বয়েসে আমার  
চেয়ে কেবল একটুখানি বড়ো। তার নাম শশধর।

তোমার তাকে পছন্দ হয়?

পুঁট ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বলিলাম, কিন্তু শশধর তোমাকে যদি পছন্দ না করে?

পুঁট বলিল, তাই বৈ কি! আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কেবল আনাগোনা  
করত। রাঙাদিদিমা ঠাট্টা করে বলতেন, সে শুধু আমার জন্যেই।

কিন্তু এ বিয়ে হ'ল না কেন?

পুঁটুর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, কহিল, তার বাবা হাজার টাকার গয়না  
আর হাজার টাকা নগদ চাইলে। আর কোন না পাঁচ শ' টাকা খরচ হবে বলুন?

এ ত জমিদারদের ঘরের মেয়ের জন্যেই হয়। সত্যি নয়? ওরা বড়লোক, অনেক টাকা ওদের, আমার মা তাদের বাড়ি গিয়ে কত হাতেপায়ে ধরলে, কিন্তু কিছুতে শুনলে না।

শশধর কিছু বললে না?

না, কিছু না। কিন্তু সেও তো বেশি বড় নয়—তার বাপ-মা বেঁচে আছে কিনা।

তা বটে, শশধরের বিয়ে হয়ে গেছে?

পুঁটি ব্যগ্র হইয়া কহিল, না এখনো হয়নি। শুনচি নাকি শীগ়গির হবে।

আচ্ছা, সেখানে তোমার বিয়ে হলে তারা যদি তোমাকে ভালো না বাসে?

আমাকে? কেন ভালবাসবে না? আমি যে রাঁধাবাড়া, সেলাই করা, সংসারের সব কাজ জানি। আমি একলাই তাদের সব কাজ করে দেব।

এর বেশি বাঙালী ঘরের মেয়ে কি-ই বা জানে! কায়িক পরিশ্রম দিয়াই সে সমস্ত অভাব পূরণ করিতে চায়। জিঞ্জাসা করিলাম, তাঁদের সব কাজ নিশ্চয় করবে তো?

হাঁ, নিশ্চয় করব।

তা হলে তোমার মাকে গিয়ে বলো, শ্রীকান্তদাদা আড়াই-হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবে।

আপনি দেবেন? তাহলে বিয়ের দিনে যাবেন বলুন?

হাঁ, তাও যাব!

দ্বারপ্রান্তে ঠাকুর্দার সাড়া পাওয়া গেল। কোঁচায় মুখ মুছিতে মুছিতে তিনি প্রবেশ করিলেন—তোফা পায়খানাটি ভায়া! শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। রতন গেল কোথায়, আর এক কলকে তামাক দিক না।

## চার

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে, মানুষকে সদুপদেশ দিয়া কখনো  
ফললাভ হয় না। সৎপরামর্শ কিছুতেই কেহ শুনে না। কিন্তু সত্য বলিয়াই দৈবাং  
ইহার ব্যতিক্রমও আছে। সেই ঘটনাটা বলিব।

ঠাকুর্দা দাঁত বাহির করিয়া আশীর্বাদ করিয়া অতি হস্তচিত্তে প্রস্থান  
করিলেন, পুঁটু বিস্তর পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া আদেশ পালন করিল, কিন্তু তাহারা  
চলিয়া গেলে আমার পরিতাপের অবধি রহিল না। সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া  
কেবলি তিরক্ষার করিতে লাগিল যে, কে ইহারা যে বিদেশে চাকরি করিয়া বহু  
দুঃখে যাহা-কিছু সঞ্চয় করিয়াছি তাহাই দিয়া দিব? কোঁকের মাথায় একটা কথা  
বলিয়াছি বলিয়াই দাতাকর্ণগিরি করিতেই হইবে, তাহার অর্থ কি? কোথাকার কে  
এই মেয়েটা গাড়িতে অযাচিত প্যাঁড়া এবং দই খাওয়াইয়া আমাকে ত আচ্ছা  
ফাঁদে ফেলিয়াছে! একটা ফাঁস কাটিতে আর একটা ফাঁসে জড়াইয়া পড়িলাম।  
পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল এবং এই নিরীহ মেয়েটার  
প্রতি ক্রেত্ব ও বিরক্তির সীমা রহিল না। আর ঐ শয়তান ঠাকুর্দা। ইচ্ছা করিতে  
লাগিল লোকটা যেন না আর বাড়ি পৌঁছায়, রাস্তাতেই সর্দিগর্মি হইয়া মারা যায়।  
কিন্তু আশা ভিত্তিহীন, নিশ্চয় জানি, লোকটা কিছুতেই মরিবে না এবং একবার  
যখন আমার বাসার ঠিকানা জানিয়াছে তখন আবার আসিবে এবং যেমন করিয়া  
পারে টাকা আদায় করিবে। হয়ত এবার সেই হাকিম পিসেমশায়কে সঙ্গে করিয়া  
আনিবে। এক উপায়—য়ঃ পলায়তি। টিকিট কিনিতে গোলাম, কিন্তু জাহাজে  
স্থানাভাব—সমস্ত টিকিট পূর্বাঙ্গেই বিক্রি হইয়া গেছে, সুতরাং পরের মেলের জন্য  
অপেক্ষা করিতে হইবে। সে ছয়-সাত দিনের ব্যাপার।

আর এক পঞ্চা—বাসা বদল করা। ঠাকুর্দা না খুঁজিয়া পায়। কিন্তু এমন একটি ভাল জায়গা এত শীত্র পাওয়াই বা যায় কোথায়? কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ভালমন্দর প্রশ্নই অবান্তর—যথারণ্যং তথা গৃহম্—শিকারীর হাত হইতে প্রাণ বাঁচানর দায়।

ভয় ছিল আমার গোপন উদ্বেগটা পাছে রতনের চোখে পড়ে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে তাহার নড়িবার গা নাই, কাশীর চেয়ে কলিকাতা তাহার বেশি মনে ধরিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, চিঠির জবাব নিয়ে কি তুমি কালই যেতে চাইচো রতন?

রতন তৎক্ষণাত উত্তর দিল, আজ্ঞে না। আজ দুপুরে মাকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিলাম, আমার দু'-পাঁচদিন দেরি হবে। মরা সোসাইটি, জ্যান্ত সোসাইটি না দেখে আর ফিরচি নে। আবার কবে কোন্ কালে আসা হবে তার তো কোন ঠিক নেই।

বলিলাম, কিন্তু তিনি তো উদ্বিঘ্ন হতে পারেন—

আজ্ঞে না। গাড়ির ধকলটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সেকথা লিখে দিয়েছি।

কিন্তু চিঠির জবাবটা—

আজ্ঞে, দিন না। কালই রেজেস্ট্রী করে পাঠিয়ে দেবোখন। সে বাড়িতে মার চিঠি যমে খুলতেও সাহস করবে না।

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নাপিত ব্যাটার কাছে কোন ফন্দিই খাটিল না। সব প্রস্তাবই নাকচ করিয়া দিল।

যাবার সময় ঠাকুর্দা টাকার কথাটা প্রচার করিয়াই গেছেন। তাহা চিন্তের উদার্ঘ অথবা সারল্যের প্রাচুর্য—এ ভৱ যেন কেহ না করেন। তিনি সাক্ষী রাখিয়া গেছেন।

রতন ঠিক সেই কথাই পাড়িল, বলিল, যদি কিছু মনে না করেন তো  
একটা কথা বলি বাবু।

কি কথা রতন?

রতন একটু দ্বিধা করিয়া বলিল, আড়াই হাজার টাকা তো নিতান্ত তুচ্ছ  
নয় বাবু—ওরা কে যে ওদের মেয়ে বিয়েতে এতটা টাকা আপনি খামকা দান  
করবেন বললেন! তা ছাড়া, ঠাকুর্দাই হোক আর যাই হোক, বুড়োটা লোক ভাল  
নয়। ওকে বলাটা ভাল হয়নি বাবু।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া যেমন অনিবর্চনীয় আনন্দ লাভ করিলাম, মনের  
মধ্যে তেমনি জোর পাইলাম—ইহাই চাহিতেছিলাম।

তথাপি কঞ্চস্বরে কিঞ্চিৎ সন্দেহের আভাস দিয়া কহিলাম, বলাটা ভাল  
হয়নি, না রতন?

রতন বলিল, নিশ্চয় ভাল হয়নি বাবু। টাকাটা তো কম নয়। তা ছাড়া,  
কিসের জন্য বলুন তো?

ঠিক ত! কহিলাম, তাহলে না দিলেই হবে। রতন সবিস্ময়ে ক্ষণকাল  
চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সে ছাড়বে কেন?

কহিলাম, না ছেড়ে করবে কি? লেখাপড়া করে তো দিইনি। আর, তখন  
আমি এখানে থাকব কি বর্মায় চলে যাব, তাই বা কে জানে।

রতন একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, বলিল, বুড়োকে আপনি  
চিনতে পারেন নি বাবু, ওদের লজ্জা-শরম মান-অপমান নেই। কেঁদেকেটে ভিক্ষে  
করেই হোক, আর ভয় দেখিয়ে জুলুম করেই গোক, টাকা ও নেবেই। আপনার  
দেখা না পেলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ও কাশী গিয়ে মার কাছ থেকে আদায়  
করে ছাড়বে। মা বড় লজ্জা পাবেন বাবু, ও মতলবে কাজ নেই।

শুনিয়া নিষ্ঠক হইয়া বসিয়া রহিলাম। রতন আমার চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান। অথইন আকস্মিক করুণার হঠকারিতার জরিমানা আমাকে দিতেই হইবে। নিষ্ঠার নাই।

রতন পাড়াগাঁয়ের ঠাকুর্দাকে যে চিনিতে ভুল করে নাই, বুঝা গেল যখন চতুর্থ দিবসে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কেবল আশা করিয়াছিলাম এবার নিশ্চয় হাকিম পিসেমশাই সঙ্গে আসিবেন—কিন্ত একাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, দশখানা গ্রামের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে দাদা, সবাই বলচে, কলিকালে এমন কখনো শোনা যায় না। গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় এভাবে উদ্বার করে দিতে কেউ কখনো চোখে দেখেনি। আশীর্বাদ করি চিরজীবী হও।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বিয়ে কবে?

এই মাসের পঁচিশে স্থির হয়েচে, মধ্যে কেবল দশটা দিন বাকী। কাল পাকাদেখা, আশীর্বাদ—বেলা তিনটৈর পরে বারবেলা, এর ভেতরেই শুভকর্ম সমাধা করে নিতে হবে। কিন্ত তুমি না গেলে বরঞ্চ সব বন্ধ থাকবে, তবু কিছুই হতে পারবে না। এই নাও তোমার পুঁতুর চিঠি—সে নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েছে। কিন্ত তাও বলি দাদা, যে রত্ন তুমি স্বেচ্ছায় হারালে তার জোড়া কখনো পাবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁজ-করা একখণ্ড হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে দিলেন।

কৌতূহলবশতঃ চিঠিখানা পড়িবার চেষ্টা করিলাম, ঠাকুর্দা হঠাত একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, কালিদাসের পয়সা থাকলে হবে কি, একেবারে ছোটলোক—চামার। চোখের চামড়া বলে তার কোন বালাই নেই। কালই টাকাকড়ি সব নগদ চুকিয়ে দিতে হবে, গহনাপত্র নিজের সেকরা দিতে গড়িয়ে নেবে—ওর কাউকে বিশ্বাস নেই—এমন কি, আমাকে পর্যন্ত না।

লোকটার মস্ত দোষ। ঠাকুর্দাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না—আশ্চর্য!

পুঁটি স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছে। একপাতা দু'পাতা নয়, চার-পাতাজোড়া ঠাস  
বুনানি। চার-পাতাই সকাতর মিনতি। ট্রেনে রাঙাদিদি বলিয়াছিলেন।  
আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। কেবল আজকালকার নয়, সর্বকালের  
নাটক-নভেল হার মানে তাহা অস্বীকার করিব না। এই লেখার জোরে নন্দরাণীর  
স্বামী চৌদ্দ দিনের ছুটি লইয়া সাতদিনের দিন আসিয়া হাজির হইয়াছিল কথাটা  
বিশ্বাস হইল।

অতএব, আমিও পরদিন সকালেই যাত্রা করিলাম। টাকাটা সত্যই সঙ্গে  
লইয়াছি এবং ভাঙচুর করিয়া প্রতারণা করিতেছি না—ঠাকুর্দা নিজের চক্ষে তাহা  
যাচাই করিয়া লইলেন, বলিলেন, পথ চলবে জেনে, টাকা নেবে গুণে। আমরা  
দেবতা নই তো রে ভাই, মানুষ—ভুল হতে কতক্ষণ।

সত্যই ত! রতন কাল রাত্রেই কাশী রওনা হইয়া গেছে। তাহার হাতে  
চিঠির জবাব দিয়াছি, লিখিয়া দিয়াছি—তথাস্ত। ঠিকানা দিতে পারি নাই ঠিক নাই  
বলিয়া। এ ক্রটি যেন সে নিজগুণে ক্ষমা করে, এ প্রার্থনাও জানাইয়াছি।

যথাসময়ে গ্রামে পৌঁছিলাম, বাড়িসুন্দর লোকের দুশিষ্টা ঘুচিল। যত্ন ও  
সমাদর যাহা পাইলাম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা অভিধানে নাই।

পাকাদেখা ও আশীর্বাদ করার উপলক্ষে কালিদাসবাবুর সহিত পরিচয়  
হইল। লোকটা যেমন রূক্ষ মেজাজের, তেমনি দাস্তিক। তাঁহার অনেক টাকা এই  
কথাটা সকলকে সর্বক্ষণ স্মরণ করানো ছাড়া জগতে তাঁহার যে আর কোন কর্তব্য  
আছে মনে হয় না। সমস্ত স্বোপার্জিত। সদস্তে বলিলেন, মশাই, বরাত আমি  
মানিনে, যা করব তা নিজের বাহুবলে। দেব-দেবতার অনুগ্রহ আমি ভিক্ষে  
করিনে। আমি বলি দৈবের দোহাই দেয় কাপুরুষে।

বড়লোক বলিয়া এবং ছোটখাটো তালুকদার বলিয়া গ্রামের প্রায় সকলেই  
উপস্থিত ছিলেন এবং অধিকাংশেরই বোধ করি তিনি মহাজন, এবং দুর্দান্ত  
মহাজন—অতএব সকলেই একবাক্যে তাঁহার কথাগুলা স্বীকার করিয়া লইলেন।

তক্রতু মহাশয় কি একটা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন এবং আশপাশ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-একটা পুরাতন কাহিনীরও সূত্রপাত হইল।

অপরিচিত ও সামান্য ব্যক্তি অনুমানে তিনি অবহেলাভরে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। টাকার শোকে আমার অন্তরটা তখন পুড়িতেছিল, দৃষ্টিটা সহ্য হইল না, হঠাতে বলিয়া ফেলিলাম, বাহুবল আপনার কি পরিমাণ আছে জানিনে, কিন্তু টাকা উপায়ের ব্যাপারে দৈব এবং বরাতের জোর যে যথেষ্ট প্রবল তা আমিও স্বীকার করি।

তার মানে?

বলিলাম, মানে আমি নিজেই। বরকেও চিনিনে, কনেকেও না, অথচ টাকা যাচ্ছে আমার এবং সে তুকছে গিয়ে আপনার সিন্দুকে। একে বরাত বলে না ত বলে কাকে? এই বললেন, আপনি দেব-দেবতারও অনুগ্রহ নেন না, কিন্তু আপনার ছেলের হাতের আঙ্গটি থেকে বৌয়ের গলার হার পর্যন্ত তৈরি হবে যে আমারই অনুগ্রহের দানে। হয়ত-বা বৌভাতের খাওয়ানোটা পর্যন্ত আমাকেই যোগাতে হবে।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হইলেও বোধ করি সকলে এত বিচলিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। ঠাকুর্দা কি-সব বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই সুস্পষ্ট বা সুব্যক্ত হইয়া উঠিল না। কালিদাসবাবু ক্রোধে ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, আপনি টাকা দিচ্ছেন তা আমি জানব কি করে? এবং দিচ্ছেনই বা কেন?

বলিলাম, কেন দিচ্ছি সে আপনি বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও চাইনে। কিন্তু দেশসুন্দর সকলে শুনেচে, আমি টাকা দিচ্ছি, কেবল আপনিই শোনেন নি? মেয়ের মা আপনাদের বাড়িসুন্দর সকলের হাতেপায়ে ধরেচে, কিন্তু আপনি বি এ পাশ-করা ছেলের দাম আড়াই হাজারের এক পয়সা কম করতে রাজী হননি। মেয়ের বাপ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করে, তার চল্লিশটা পয়সা দেবার শক্তি নেই—এটা ভেবে দেখেন নি আপনার ছেলে কেনবার অত টাকা হঠাতে তারা পায়

কোথায়? যাই হোক, ছেলে-বেচা টাকা অনেকেই নেয়, আপনি নিলেও দোষ নেই, কিন্তু এর পরে গাঁয়ের লোককে বাড়িতে ডেকে টাকার অহঙ্কার আর করবেন না এবং একজন বাইরের লোকের ভিক্ষের দানে ছেলের বিয়ে দিয়েচেন এ কথাটাও মনে রাখবেন।

উদ্বেগ ও ভয়ে সকলের মুখ কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। বোধ হয় সবাই ভাবিলেন, এবার ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটিবে এবং ফটক বন্ধ করিয়া সকলকে লাঠিপেটা না করিয়া কালিদাসবাবু আর কাহাকেও ঘরে ফিরিতে দিবেন না।

কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, টাকা আমি নেব না।

বলিলাম, তার মানে ছেলের বিয়ে আপনি এখানে দেবেন না?

কালিদাসবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, তা নয়, আমি কথা দিয়েচি বিবাহ দেবো—তার নড়চড় হবে না। কালিদাস মুখুয়ে কথার খেলাপ করে না। আপনার নামটি কি?

ঠাকুর্দা ব্যগ্রকঠে আমার পরিচয় দিলেন।

কালিদাসবাবু চিনিতে পারিয়া কহিলেন, ওঃ—তাই বটে। এর বাপের সঙ্গেই না একবার আমার ভয়ানক ফৌজদারী মামলা বাঁধে?

ঠাকুর্দা বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ—কিছুই আপনি বিশ্বৃত হন না। এ তারই ছেলে বটে, সম্পর্কে আমারও নাতি হয়।

কালিদাসবাবু প্রসন্নকঠে বলিলেন, তা হোক। আমার বড়ছেলে বেঁচে থাকলে এমনি বয়সই হ'ত। শশধরের বিয়েতে এসো বাবা। আমার পক্ষ থেকে সেদিন তোমার নিমন্ত্রণ রইল।

শশধর উপস্থিত ছিল, সে শুধু স্কৃতজ্ঞচক্ষে আমার প্রতি একটিবারমাত্রে দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় মুখখানি আনত করিল।

আমি উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিলাম, বলিলাম, যেখানেই থাকি, অন্ততঃ  
বৌভাতের দিন এসে নববধূর হাতে অন্ন খেয়ে যাব। কিন্তু অনেক রূচি কথা  
বলেচি, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

কালিদাসবাবু বলিলেন, রূচি কথা যে বলেচ তা সত্যি, কিন্তু আমি ক্ষমাও  
করেচি। কিন্তু উঠলে চলবে না শ্রীকান্ত, শুভকর্ম উপলক্ষে সামান্য কিছু খাবার  
আয়োজন করে রেখেচি, তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।

যে আজ্ঞে, তাই হবে, বলিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলাম।

সেদিন পাত্রকে আশীর্বাদ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সভাস্থ  
অভ্যাগতগণের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কার্যই নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। এই  
অধ্যায়ের প্রারম্ভে সদুপদেশ সম্বন্ধে যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলাম, পুঁটুর  
বিবাহটা তাহারই একটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ। জগতে এই একটিমাত্রই নিজের  
চোখে দেখিয়াছি। কারণ নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত হতভাগ্য মেয়ের বাপের কান  
মলিলেই যেখানে টাকা আদায় হয় সেখানে বৈষ্ণব সাজিয়া হাতজোড় করিয়া  
বাঘের গ্রাস হইতে নিষ্ঠার পাওয়া যায় না। নিষ্ঠুর নির্দয় বলিয়া গালিগালাজ  
করিয়া সমাজ ও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্ষেত্র কিঞ্চিং মিটিতে পারে, কিন্তু  
প্রতিকার মিলে না। কারণ, প্রতিকার বরের বাপের হাতে নাই, সে আছে মেয়ের  
বাপেরই নিজের হাতে।

## পাঁচ

গহরের খোঁজে আসিয়া নবীনের সাক্ষাৎ মিলিল। সে আমাকে দেখিয়া খুশি হইল, কিন্তু মেজাজটা ভারী রূক্ষ; বলিল, দেখুন গে ঐ বোষ্টমী বেটীদের আড়তায়। কাল থেকে তো ঘরে আসাই হয়নি।

সে কি কথা নবীন! বোষ্টমী এলো আবার কোথা থেকে?

একটা? একপাল এসে জুটেছে।

কোথা থাকে তারা?

ঐ ত মুরারিপুরের আখড়ায়। এই বলিয়া নবীন হঠাৎ একটা নিশ্চাস ফেলিয়া কহিল, হায় বাবু, আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বুড়ো মথুরোদাস বাবাজী ম'লো, তার জায়গায় এসে জুটল এক ছোকরা বৈরাগী, তার গণ্ড-চারেক সেবাদাসী। দ্বারিকদাস বৈরাগীর সঙ্গে আমাদের বাবুর খুব ভাব, সেখানেই ত প্রায় থাকেন।

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তোমার বাবু ত মুসলমান, বৈষ্ণব-বৈরাগীরা তাদের আখড়ায় ওকে থাকতে দেবে কেন?

নবীন রাগ করিয়া কহিল, ঐসব আউলে-বাউলেগুলোর ধ্যানাধ্যম জ্ঞান আছে নাকি? ওরা জাতজন্ম কিছুই মানে না, যে-কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে ঢেনে নেয়, বাচবিচার করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেবার যখন তোমাদের এখানে ছ-সাত দিন ছিলাম তখন ত গহর ওদের কথা কিছুই বলেনি?

নবীন বলিল, বললে যে কমলিলতার গুণাগুণ প্রকাশ হয়ে পড়ত। সে কয়দিন বাবু আখড়ার কাছেও যায়নি। আর যেই আপনি চলে গেলেন, বাবুও অমনি খাতা-কাগজ-কলম নিয়ে আখড়ায় গিয়ে চুকলেন।

প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিলাম দ্বারিক বাটল গান বাঁধিতে, ছড়া রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। তাহাকে কবিতা শুনায়, তাহাকে দিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লয়। আর কমললতা একজন যুবতী বৈষণবী—এই আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুঞ্চ হইয়া যায়! বৈষণব সেবায় গহর মাঝে মাঝে টাকাকড়ি দেয়, আখড়ার সাবেক প্রাচীর জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। কাজটা তাহাদের সম্পদায়ের লোকের অগোচরে সে গোপনে করিয়াছে।

ছেলেবেলায় এই আখড়ার কথা শুনিয়াছিলাম আমার মনে পড়িল। পুরাকালে মহাপ্রভুর কোন্ এক ভক্ত শিষ্য এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদবধি শিষ্যপরম্পরায় বৈষণবেরা ইহাতে বাস করিয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত কৌতৃহল জন্মিল। বলিলাম, নবীন, আখড়াটা আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারবে? ৮০০

নবীন ঘাড় নাড়িয়া অস্মীকার করিল, বলিল, আমার অনেক কাজ। আর আপনিও ত এই দেশের মানুষ, চিনে যেতে পারবেন না? আধ-কোশের বেশি নয়, ঐ সুমুখের রাস্তা দিয়ে সিধে উত্তরমুখে চলে গেলে আপনিই দেখতে পাবেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সামনের দীঘির পাড়ে বকুলতলায় বৃন্দাবনগীলা চলচে, দূর থেকেই আওয়াজ কানে যাবে—ভাবতে হবে না।

আমার যাওয়ার প্রস্তাবটা নবীন গোড়াতেই পছন্দ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয় সেখানে—কীর্তন?

নবীন বলিল, হাঁ, দিনরাত। খঙ্গনি-কর্তালের কামাই নেই।

হাসিয়া বলিলাম, সে ভালোই নবীন। যাই, গহরকে ধরে আনি গে।

এবার নবীনও হাসিল, বলিল, হাঁ যান; কিন্তু দেখবেন কমললতার কেন্দ্র শুনে নিজেই যেন আটকে যাবেন না।

দেখি, কি হয়। এই বলিয়া হাসিয়া কমললতা বৈষ্ণবীর আখড়ার উদ্দেশে  
অপরাহ্নবেলায় যাত্রা করিলাম।

আখড়ার ঠিকানা যখন মিলিল তখন সন্ধ্যা বোধ করি-উকীর্ণ হইয়াছে,  
দূর হইতে কীর্তন বা খোল-করতালের শব্দমাত্রই পাই নাই, সুপ্রাচীন বকুলবৃক্ষটা  
সহজেই চোখে পড়িল, নীচে ভাঙাচোরা বেদী একটা আছে, কিন্তু লোকজন  
কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটা ক্ষীণ পথের রেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া  
প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া নদীর দিকে গিয়াছে, অনুমান করিলাম, হয়ত ওদিকে  
কাহারও সন্ধান মিলিতে পারে, অতএব সেদিকেই পা বাড়াইলাম। ভুল করি নাই,  
ক্ষীর সক্ষীর্ণ শৈবালাছম্ব নদীর তীরে একখণ্ড পরিষ্কৃত গোময়লিঙ্গ দৃষ্টবৃক্ষ ভূমির  
উপরে বসিয়া গহর এবং আর এক ব্যক্তি—আন্দাজ করিলাম, ইনিই বৈরাগী  
দ্বারিকদাস—আখড়ার বর্তমান অধিকারী। নদীর তীর বলিয়া তখনও সন্ধ্যার  
অন্ধকার গাঢ়তর হয় নাই, বাবাজীকে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। লোকটিকে  
ভদ্র ও উচ্চজাতির বলিয়াই মনে হইল। বর্ণ শ্যাম, রোগা বলিয়া কিছু দীর্ঘকায়  
বলিয়া চোখে ঠেকে; মাথায় চুল চূড়ার মত করিয়া সুমুখে বাঁধা, দাঢ়ি-গোঁফ প্রচুর  
নয়—সামান্যই, চোখেমুখে একটা স্বাভাবিক হাসির ভাব আছে, বয়সটা ঠিক  
আন্দাজ করিতে পারিলাম না, তবে পঁয়ত্রিশ-চতুর্শির বেশি হইবে বলিয়া বোধ  
করিলাম না। আমার আগমন বা উপস্থিতি উভয়ের কেহই লক্ষ্য করিল না,  
দু'জনেই নদীর পরপারে পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া স্তন্ত্র হইয়া আছে। সেখানে নানা  
রঙ ও নানা আকারের টুকরো মেঘের মাঝে ক্ষীণ পাঞ্চুর তৃতীয়ার চাঁদ এবং ঠিক  
যেন তাহারই কপালের মাঝখানে ফুটিয়া আছে অত্যুজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা।

বহু নিম্নে দেখা যায় দূর গ্রামান্তরে নীল বৃক্ষরাজি—তাহার যেন কোথাও  
আর শেষ নাই, সীমা নাই। কালো, সাদা, পাঁশটে নানা বর্ণের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘের  
গায়ে তখনও অন্তগত সূর্যের শেষ-দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে—ঠিক যেন দুষ্ট

হেলের হাতে রঙের তুলি পড়িয়া ছবির আদ্যশান্ত চলিতেছে। তাহার ক্ষণকালের আনন্দ—চিত্রকর আসিয়া কান মলিয়া হাতের তুলি কাড়িয়া লইল বলিয়া।

স্বল্পতোয়া নদীর কতকটা অংশ বোধ করি গ্রামবাসীরা পরিষ্কৃত করিয়াছে, সম্মুখের সেই স্বচ্ছ কালো অল্পপরিসর জলটুকুর উপরে ছোট ছোট রেখায় চাঁদের ও সন্ধ্যাতারার আলো পাশাপাশি পড়িয়া বিক্রিমিক করিতেছে—যেন কষ্টপাথেরে ঘষিয়া সেকরা সোনার দাম যাচাই করিতেছে। কাছে কোথাও বনের মধ্যে বোধ করি অজস্র কাঠমল্লিকা ফুটিয়াছে, তাহারই গন্ধে সমস্ত বাতাসটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে এবং নিকটে কোন গাছে অসংখ্য বকের বাসা হইতে শাবকগণের একটানা ঝুমৰুম শব্দ বিচিত্র মাধুর্যে অবিরাম কানে আসিয়া পশিতেছে। এসবই ভালো এবং যে দুটা লোক তদন্তচিত্তে জড়ভরতের মত বসিয়া আছে তাহারাও কবি সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দেখিতে এই জঙ্গলে সন্ধ্যাকালে আসি নাই। নবীন বলিয়াছিল একপাল বোষ্ঠমী আছে, এবং সকলের সেরা বোষ্ঠমী কমললতা আছে। তাহারা কোথায়?

ডাকিলাম, গহর!

গহর ধ্যান ভাসিয়া হতবুদ্ধির মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, গোঁসাই, তোমার শ্রীকান্ত, না?

গহর দ্রুতবেগে উঠিয়া আমাকে সজোরে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তাহার আবেগ থামিতে চাহে না এমনি ব্যাপার ঘটিল। কোনমতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বসিয়া পড়িলাম, বলিলাম, বাবাজী, আমাকে হঠাতে চিনলেন কি করে?

বাবাজী হাত নাড়িলেন—ও চলবে না গোঁসাই, ক্রিয়াপদে শেষের ঐ সন্ত্বরের ‘দন্ত্য ন’টি বাদ দিতে হবে। তবে ত রস জমবে।

বলিলাম, তা যেন দিলাম, কিন্তু হঠাতে আমাকে চিনলে কি করে?

বাবাজী কহিলেন, হঠাতে চিনব কেন! তুমি যে আমাদের বৃন্দাবনের চেনা মানুষ গোঁসাই, তোমার চোখ-দুটি যে রসের সমুদ্ধুর—ও যে দেখলেই চোখে পড়ে।

যেদিন কমললতা এলো—তারও এমনি দুটি চোখ—তারে দেখেই চিনলাম—কমললতা, কমললতা এতদিন ছিলে কোথা? কমল এসে সেই যে আপনার হ'ল তার আর আদি-অন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ রইল না। এই ত সাধনা গোঁসাই, একেই ত বলি রসের দীক্ষা।

বলিলাম, কমললতা দেখব বলেই ত এসেচি গোঁসাই, কই সে?

বাবাজী ভারী খুশি হইলেন, কহিলেন, দেখবে তাকে? কিন্তু সে তোমার অচেনা নয় গোঁসাই, বৃন্দাবনে তাকে অনেকবার দেখেচো। হয়ত ভুলে গেছ, কিন্তু দেখলেই চিনবে, সেই কমললতা। গোঁসাই, ডাকো না একবার তারে। এই বলিয়া বাবাজী গহরকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঁহার কাছে সবাই গোঁসাই, বলিলেন, বলো গে শ্রীকান্ত এসেচে তোমাকে দেখতে।

গহর চলিয়া গেলে জিঞ্জাসা করিলাম, গোঁসাই, আমার কথা বুবি তোমাকে গহর সমস্ত বলেচে?

বাবাজী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ সমস্ত বলেচে। তারে জিঞ্জাসা করলাম, গোঁসাই, ছ-সাতদিন আসনি কেন? সে বলল, শ্রীকান্ত এসেছিল। তুমি যে শীষ্টাই আবার আসবে তাও বলেচে। তুমি বর্মাদেশে যাবে তাও জানি।

শুনিয়া স্বস্তির নিশাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম, রক্ষা হোক! ভয় হইয়াছিল সত্যই বা ইনি কোন্ অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে আমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছেন। যাই হোক, এক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাঁহার আন্দাজটা যে বৈঠিক হয় নাই তাহা মানিতেই হইবে।

বাবাজীকে ভাল বলিয়াই ঠেকিল, অন্ততঃ অসাধু-প্রকৃতির বলিয়া মনে হইল না। বেশ সরল। কি জানি, কেন ইহাদের কাছে গহর আমার সকল কথাই বলিয়াছে—অর্থাৎ যতটুকু সে জানে। বাবাজী সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন, একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের,—হয়ত কবিতা ও বৈষণব-রসচর্চায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত।

অনতিকাল পরেই গহরগোঁসাইয়ের সঙ্গে কমলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স ত্রিশের বেশি নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি—হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা। ছাপ-ছোপের খুব বেশি আড়ম্বর নাই, কিংবা হয়ত সকালের দিকে ছিল, এ বেলায় কিছু কিছু মুছিয়া গেছে। ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে মনে হইল এই চোখমুখের ভাবটা যেন পরিচিত এবং চলার ধরনটাও যেন পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি।

বৈষণবী কথা কহিল। সে যে নীচের স্তরের লোক নয় তৎক্ষণাত্ বুঝিলাম। সে কিছুমাত্র ভূমিকা করিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, কি গোঁসাই, চিনতে পার?

বলিলাম, না, কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।

বৈষণবী কহিল, দেখেচ বৃন্দাবনে। বড়গোঁসাইজীর কাছে খবরটা শোননি এখনো ?

বলিলাম, তা শুনেচি। কিন্তু বৃন্দাবনে আমি ত কখন জন্মেও যাইনি!

বৈষণবী কহিল, গ্যাছো বৈ কি। অনেককালের কথা হঠাত স্মরণ হচ্ছে না। সেখানে গরু চৰাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে? এই বলিয়া সে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বুঝিলাম তামাশা করিতেছে, কিন্তু আমাকে না বড়গোঁসাইজীকে ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। কহিল, রাত হয়ে আসচে, আর জঙ্গলে বসে কেন? ভেতরে চলো।

বলিলাম, জঙ্গলের পথে আমাদেরও অনেকটা যেতে হবে। বরঞ্চ কাল আবার আসব।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, এখানের সন্ধান দিলে কে? নবীন?

হাঁ, সেই।

কমলিলতার খবর বলেনি?

হাঁ, তাও বলেচে।

বোষ্টমীর জাল ছিঁড়ে হঠাৎ বার হওয়া যায় না, তোমাকে সাবধান করে দেয়নি?

সহাস্যে কহিলাম, হাঁ, তাও দিয়েচে।

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, নবীন হঁশিয়ার মাঝি। তার কথা না শুনে ভাল করোনি।

কেন বলো ত?

বৈষ্ণবী ইহার জবাব দিল না, গহরকে দেখাইয়া কহিল, গোঁসাই বলে, তুমি বিদেশে যাচ্ছ চাকরি করতে। তোমার ত কেউ নেই, চাকরি করবে কেন?

তবে কি করবো?

আমরা যা করি। গোবিন্দজীর প্রসাদ কেউ ত আর কেড়ে নিতে পারবে না।

তা জানি। কিন্তু বৈরাগীগিরি আমার নতুন নয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, তা বুঝেচি, ধাতে সয় না বুঝি?

না, বেশিদিন সয় না।

বৈষ্ণবী মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, তোমার কমই ভাল। ভেতরে এসো, ওদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই। এখানে কমলের বন আছে।

তা শুনেচি। কিন্তু অন্ধকারে ফিরব কি করে?

বৈষ্ণবী পুনশ্চ হাসিল, কহিল, অন্ধকারে ফিরতেই বা আমরা দেব কেন? অন্ধকার কাটবে গো কাটবে। তখন যেয়ো। এসো।

চলো।

বৈষ্ণবী কহিল, গৌর! গৌর!  
গৌর গৌর, বলিয়া আমিও অনুসরণ করিলাম।

## ছয়

যদিচ ধর্মাচরণে নিজের মতিগতি নাই, কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদেরও  
বিষয় ঘটাই না। মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানি, এই গুরুতর বিষয়ের কোন অঙ্গসম্পর্ক  
আমি কোন কালে খুঁজিয়া পাইব না। তথাপি ধার্মিকদের আমি ভক্তি করি। বিখ্যাত  
স্বামীজী ও স্বখ্যাত সাধুজী—কাহাকেও ছেট-বড় করি না, উভয়ের বাণীই আমার  
কর্ণে সমান মধুবর্ষণ করে।

বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, বাঙলাদেশের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগৃত  
রহস্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে এবং সেইটাই নাকি বাঙলার নিজস্ব খাঁটি  
জিনিস। ইতিপূর্বে সন্ন্যাসী-সাধুসঙ্গ কিছু কিছু করিয়াছি—ফললাভের বিবরণ  
প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এবার যদি দৈবাং খাঁটি কপালে জুটিয়া থাকে  
ত এ সুযোগ ব্যর্থ হইতে দিব না, সক্ষম করিলাম। পুঁটুর বৌভাতের নিমন্ত্রণ  
আমাকে রাখিতেই হইবে, অন্ততঃ সে-কয়টা দিন কলিকাতার নিঃসঙ্গ মেসের  
পরিবর্তে বৈষ্ণবী-আখড়ার আশেপাশে কোথাও কাটাইতে পারিলে আর যাই হোক  
জীবনের সঞ্চয়ে বিশেষ লোকসান ঘটিবে না।

ভিতরে আসিয়া দেখিলাম কমললতার কথা মিথ্যা নয়, সেথায় কমলের  
বনই বটে, কিন্তু দলিত-বিদলিত। মতহস্তিকুলের সাক্ষাৎ মিলিল না, কিন্তু বহু  
পদচিহ্ন বিদ্যমান। বৈষ্ণবীরা নানা বয়সের ও নানা চেহারার এবং নানা কাজে  
ব্যাপ্ত। কেহ দুধ জাল দিতেছে, কেহ শ্বীর তৈরি করিতেছে, কেহ নাড়ু  
পাকাইতেছে, কেহ ময়দা মাখিতেছে, কেহ ফলমূল বানাইতেছে—এ-সকল  
ঠাকুরের রাত্রের ভোগের ব্যাপার। একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বৈষ্ণবী  
একমনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে এবং তাহারই কাছে বসিয়া আর একজন  
নানা রঙের ছাপানো ছোট ছোট বস্ত্রখণ্ড সংযতে কুঞ্চিত করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছে,

সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ কাল স্নানাতে পরিধান করিবেন। কেহই বসিয়া নাই। তাহাদের কাজের আগ্রহ ও একাগ্রতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সকলেই আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু নিমেষমাত্র। কৌতূহলের অবসর নাই, ওষ্ঠাধর সকলেরই নড়িতেছে, বোধ হয় মনে মনে নামজপ চলিতেছে। এদিকে বেলা শেষ হইয়া দুই-একটা করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে শুরু করিয়াছে; কমললতা কহিল, চলো ঠাকুর, নমস্কার করে আসবে। কিন্তু আচ্ছা—তোমাকে কি বলে ডাকব বল ত? নতুনগোঁসাই বলে ডাকলে হয় না?

বলিলাম, কেন হবে না? তোমাদের এখানে গহর পর্যন্ত যখন গহরগোঁসাই হয়েচে তখন আমি ত অন্ততঃ বামুনের ছেলে। কিন্তু আমার নিজের নামটা কি দোষ করলে? তার সঙ্গেই একটা গোঁসাই জুড়ে দাও না।

কমললতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে হয় না ঠাকুর, হয় না। ও নামটা আমার ধরতে নেই—অপরাধ হয়, এসো।

তা যাচ্ছি, কিন্তু অপরাধটা কিসের?

কিসের তা তোমার শুনে কি হবে? আচ্ছা মানুষ ত!

যে বৈষ্ণবীটি মালা গাঁথিতেছিল সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নিচু করিল। ঠাকুরঘরে কালোপাথর ও পিতলের রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি। একটি নয়, অনেকগুলি। এখানেও জনপাঁচ-ছয় বৈষ্ণবী কাজে নিযুক্ত। আরতির সময় হইয়া আসিতেছে, নিশ্চাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

ভক্তিভরে যথারীতি প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। ঠাকুরঘরটি ছাড়া অন্য সব ঘরগুলিই মাটির, কিন্তু স্বত্ত্ব পরিচ্ছন্নতার সীমা নাই। বিনা আসনে কোথাও বসিতেই সঙ্কেচ হয় না, তথাপি কমললতা পূবের বারান্দার একধারে আসন পাতিয়া দিল, কহিল, বসো, তোমার থাকবার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ে আসি।

আমাকে এখানেই আজ থাকতে হবে নাকি?

কেন, ভয় কি? আমি থাকতে তোমার কষ্ট হবে না।  
বলিলাম, কষ্টের জন্য নয়, কিন্তু গহর রাগ করবে যে!  
বৈষ্ণবী কহিল, সে ভার আমার। আমি ধরে রাখলে তোমার বন্ধু একটুও  
রাগ করবে না, এই বলিয়া সে হাসিয়া চলিয়া গেল।

একাকী বলিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবীদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। বাস্তবিকই  
তাহাদের সময় নষ্ট করিবার সময় নাই, আমার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না।  
মিনিট-দশেক পরে কমলতা যখন ফিরিয়া আসিল তখন কাজ শেষ করিয়া  
সকলে উঠিয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমই মঠের কর্তৃ নাকি?

কমলতা জিভ কাটিয়া কহিল, আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী—কেউ  
ছোট-বড় নেই। এক-একজনের এক-একটা ভার, আমার ওপর প্রভু এই ভার  
দিয়েছেন। এই বলিয়া সে মন্দিরের উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল।  
বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

বলিলাম, তাই হবে। আছা, বড়গোঁসাই, গহরগোঁসাই এঁদের দেখচি নে  
কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তাঁরা এলেন বলে, নদীতে স্নান করতে গেছেন।

এই রাত্রে? আর ঐ নদীতে?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

গহরও?

হাঁ, গহরগোঁসাইও।

কিন্তু আমাকেই-বা স্নান করালে না কেন?

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, আমরা কাউকে স্নান করাই নে, তারা আপনি  
করে। ঠাকুরের দয়া হলে তুমিও একদিন করবে, সেদিন মানা করলেও শুনবে  
না।

বলিলাম, গহর ভাগ্যবান, কিন্তু আমার ত টাকা নেই, আমি গরীব লোক—  
আমার প্রতি হয়ত ঠাকুরের দয়া হবে না।

বৈষ্ণবী ইঙ্গিতটা বোধ হয় বুঝিল এবং রাগ করিয়া কি-যেন একটা  
বলিতে গেল, কিন্তু বলিল না। তারপরে কহিল, গহরগোঁসাই যাই হোন কিন্তু  
তুমিও গরীব নয়। অনেক টাকা দিয়ে যে পরের কন্যাদায় উদ্ধার করে ঠাকুর  
তাকে গরীব ভাবে না। তোমার ওপরেও দয়া হওয়া আশ্চর্য নয়।

বলিলাম, তাহলে সেটা ভয়ের কথা। তবু, কপালে যা লেখা আছে ঘটবে,  
আটকান যাবে না—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কন্যাদায় উদ্ধারের খবর তুমি পেলে  
কোথায়?

বৈষ্ণবী কহিল, আমাদের পাঁচ বাড়িতে ভিক্ষে করতে হয়, আমরা সব  
খবরই শুনতে পাই।

কিন্তু এ খবর বোধ হয় এখনো পাওনি যে, টাকা দিয়ে দায় উদ্ধার করতে  
আমার হয়নি?

বৈষ্ণবী কিছু বিস্মিত হইল, কহিল, না, এ খবর পাইনি। কিন্তু হ'ল কি,  
বিয়ে ভেঙ্গে গেল?

হাসিয়া কহিলাম, বিয়ে ভাঙ্গেনি কিন্তু ভেঙ্গেছেন কালিদাসবাবু—বরের  
বাপ নিজে। পরের ভিক্ষের দানে ছেলেবেচা-পণের কড়ি হাত পেতে নিতে তিনি  
লজ্জা পেলেন। আমিও বেঁচে গেলাম। এই বলিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত  
করিলাম।

বৈষ্ণবী সবিস্ময়ে কহিল, বল কি গো, এ যে অঘটন ঘটল!

বলিলাম, ঠাকুরের দয়া। শুধু কি গহরগোঁসাইজীই অন্ধকারে পচা নদীর  
জলে ঢুব মারবে, আর সংসারের কোথাও কোন অঘটন ঘটবে না? তাঁর লীলাই  
বা প্রকাশ পাবে কি করে বল ত? বলিয়াই কিন্তু বৈষ্ণবীর মুখ দেখিয়া বুঝিলাম  
কথাটা আমার ভালো হয় নাই—মাত্রা ছাড়াইয়া গেছে।

বৈষ্ণবী কিন্তু প্রতিবাদ করিল না, শুধু হাত তুলিয়া মন্দিরের উদ্দেশে  
নিঃশব্দে নমস্কার করিল, যেন অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করিল।

সম্মুখ দিয়া একজন বৈষ্ণবী মন্ত একথালা লুটি লইয়া ঠাকুরঘরের দিকে  
গেল। দেখিয়া কহিলাম, আজ তোমাদের সমারোহ ব্যাপার। বোধ হয় বিশেষ  
কোন পর্বদিন,—না?

বৈষ্ণবী কহিল, না, আজ কোন পর্বদিন নয়। এ আমাদের প্রতিদিনের  
ব্যাপার, ঠাকুরের দয়ার অভাব কখনো ঘটে না।

কহিলাম, আনন্দের কথা। কিন্তু আয়োজনটা বোধ করি রাত্রেই বেশি  
করে করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, তাও না। সেবার সকাল-সন্ধ্যা নেই, দয়া করে যদি দু'দিন  
থাকো নিজেই সব দেখতে পাবে। দাসীর দাসী আমরা, ওঁর সেবা করা ছাড়া  
সংসারে আর ত আমাদের কোন কাজ নেই। এই বলিয়া সে মন্দিরের দিকে  
হাতজোড় করিয়া আর একবার নমস্কার করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন কি তোমাদের করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা দেখলে, তাই।

কহিলাম, এসে দেখলাম বাটনা-বাটা, কুটনো-কোটা, দুধ জ্বাল দেওয়া,  
মালা গাঁথা, কাপড় রঙ-করা—এমনি অনেক কিছু। তোমরা সারাদিন কি শুধু এই  
করো?

বৈষ্ণবী কহিল, হাঁ, সারাদিন শুধু এই করি।

কিন্তু এ-সব ত কেবল ঘরগৃহস্থালীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা  
ভজন-সাধন কর কখন!

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

এই রাঁধাবাড়া, জল-তোলা, কুটনো-বাটনা, মালা-গাঁথা, কাপড়-ছোপান—  
একেই বলে সাধনা?

বৈষ্ণবী বলিল হাঁ, একেই বলি সাধনা। দাসদাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাব কোথায় গোঁসাই? বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ-দুটি যেন অনিবর্চনীয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমার হঠাত মনে হইল, এই অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই। বলিলাম, কমললতা তোমার বাড়ি কোথায়?

বৈষ্ণবী আঁচলে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, গাছতলায়।

কিন্তু গাছতলা ত আর চিরকাল ছিল না?

বৈষ্ণবী কহিল, তখন ছিল ইট-কাঠের তৈরি কোন একটা বাড়ির ছোট একটি ঘর। কিন্তু সে গল্প করার ত এখন সময় নেই, গোঁসাই। এস ত আমার সঙ্গে, তোমার নতুন ঘরটি দেখিয়ে দিই!

চমৎকার ঘরখানি। বাঁশের আলনায় একটি পরিষ্কার তসরের কাপড় দেখাইয়া দিয়া কহিল, এটি পরে ঠাকুরঘরে এস। দেরি ক'রো না যেন! এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

একধারে ছোট একটি তক্কপোশে পাতা-বিছানা। নিকটেই জলচৌকির উপরে রাখা কয়েকখানি গ্রন্থ ও একথালা বকুলফুল; এইমাত্র প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ বোধ হয় ধূপধূনা দিয়া গেছে, তাহার গন্ধ ও ধোঁয়ায় ঘরটি তখনও পূর্ণ হইয়া আছে—ভারী ভাল লাগিল। সারাদিনের ক্লান্তি ত ছিলই, ঠাকুর-দেবতাকেও চিরদিন পাশ কাটাইয়া চলি, সুতরাং ওদিকের আকর্ষণ ছিল না,—কাপড় ছাড়িয়া ঝুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পরিলাম। কি জানি এ কাহার ঘর, কাহার শয্যা, অজ্ঞাত বৈষ্ণবী একটা রাত্রির জন্য আমাকে ধার দিয়া গেল—কিংবা হয়ত, এ তাহার নিজেরই—কিন্তু এ-সকল চিন্তায় মন আমার স্বভাবতঃই ভারী সঙ্কোচ বোধ করে, অথচ আজ কিছু মনেই হইল না, যেন কতকালের পরিচিত আপনার জনের কাছে হঠাত আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় একটু তন্ত্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম, কে

যেন দ্বারের বাহিরে ডাক দিল, নতুনগোঁসাই, মন্দিরে যাবে না? ওঁরা তোমাকে ডাকছেন যে।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মন্দিরা-সহযোগে কীর্তনগান কানে গেল, বঙ্গলোকের সমবেত কোলাহল নয়, গানের কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট। বামাকঞ্চ, রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম, এ কমললতা। নবীনের বিশ্বাস এই মিষ্টস্বরই তাহার প্রভুকে মজাইয়াছে। মনে হইল—অসম্ভব নয় এবং অন্ততঃ অসম্ভতও নয়।

মন্দিরে তুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম, কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলেরই দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রতি নিবন্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমললতা কীর্তন করিতেছে—মদন-গোপাল জয় জয় যশোদা-দুলাল কি, যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি, নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারী-লাল কি, গিরিধারী-লাল জয় জয় গোবিন্দ-গোপাল কি—এই সহজ ও সাধারণ গুটিকয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষঃস্থল মন্ত্রিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন; কিন্তু দেখিতে পাইলাম উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুক্ষ নয়।

গায়িকার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভাবে তাহার কঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া। এই-সকল রসের রসিক আমি নই, কিন্তু আমারও মনের ভিতরটা হঠাতে যেন কেমনধারা করিয়া উঠিল। বাবাজী দ্বারিকদাস মুদ্রিতনেত্রে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সচেতন কি অচেতন বুঝা গেল না এবং শুধু কেবল ক্ষণকাল পূর্বেই স্নিঘহাস্যপরিহাস-চপ্পল কমললতাই নয়, সাধারণ গৃহকর্মে নিযুক্তা যে-সকল বৈশ্ববীদের এইমাত্র সামান্য তুচ্ছ কুরুপা মনে হইয়াছিল, তাহারাও যেন এই ধূপ ও ধূনায় ধূমাচ্ছন্ন গৃহের অনুজ্জ্বল দীপালোকে আমার চক্ষে মুহূর্তকালের জন্য অপরাপ হইয়া উঠিল। আমারও যেন মনে হইতে লাগিল,

অদূরবর্তী ঈ পাথরের মূর্তি সত্যই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে এবং কান পাতিয়া  
কীর্তনের সমস্ত মাধুর্য উপভোগ করিতেছে।

ভাবের এই বিস্তুল মুঞ্চতাকে আমি অত্যন্ত ভয় করি, ব্যস্ত হইয়া বাহিরে  
চলিয়া আসিলাম—কেহ লক্ষ্যও করিল না। দেখি, প্রাঙ্গণের একধারে বসিয়া গহর।  
কোথাকার একটা আলোর রেখা আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। আমার পদশব্দে  
তাহার ধ্যান ভঙ্গিল না, কিন্তু সেই একান্ত সমাহিত মুখের প্রতি চাহিয়া আমিও  
নড়িতে পাড়িলাম না, সেইখানে স্তন্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল, শুধু  
আমাকেই একাকী ফেলিয়া রাখিয়া এ বাড়ির সকলেই যেন আর এক দেশে  
চলিয়া গেছে—সেখানের পথ আমি চিনি না। ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া  
পড়িলাম। নিশ্চয় জানি, জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ইহাদের সকলের বড়,  
তথাপি কিসের ব্যথায় জানি না, মনের ভিতরটা কাঁদিতে লাগিল এবং তেমনি  
অজানা কারণে চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কানে গেল,—ওগো নতুনগোঁসাই।

জাগিয়া উঠিয়া বলিলাম, কে?

আমি গো—তোমার সঙ্গেবেলার বন্ধু। এত ঘুমোতেও পার!

অন্ধকার ঘরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া কমললতা বৈষণবী। বলিলাম,  
জেগে থেকে লাভ হ'ত কি? তবু সময়টার একটু সন্ধিবহার হ'ল।

তা জানি। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ পাবে না?

পাব।

তবে ঘুমোচ যে বড়?

জানি বিষ্ণ ঘটবে না, প্রসাদ পাবই। আমার সঙ্গেবেলাকার বন্ধু রাত্রেও  
পরিত্যাগ করবে না।

বৈষণবী সহাস্যে কহিল, সে দাবী বৈষণবের, তোমাদের নয়।

বলিলাম, আশা পেলে বোষ্টম হতে কতক্ষণ। তুমি গহরকে পর্যন্ত গোঁসাই  
বানিয়েচ, আর আমিই কি এত অবহেলার? ভুক্ত করলে বোষ্টমের দাসানুদাস  
হতেও রাজি।

কমললতার কঢ়স্বর একটুখানি গভীর হইল, কহিল, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে  
তামাশা করতে নেই গোঁসাই, অপরাধ হয়। গহরগোঁসাইজীকেও তুমি ভুল  
বুঝেছো। তার আপন লোকেরাও তাকে কাফের বলে, কিন্তু তারা জানে না সে  
খাঁটি মুসলমান, বাপ-পিতামহর ধর্মবিশ্বাস সে ত্যাগ করেনি।

কিন্তু তার ভাব দেখে ত তা মনে হয় না।

বৈষ্ণবী কহিল, সেইটেই আশ্চর্য। কিন্তু আর দেরি ক'রো না, এসো।  
একটু ভাবিয়া কহিল, কিংবা প্রসাদ নাহয় তোমাকে এখানেই দিয়ে যাই—কি বল?

বলিলাম, আপত্তি নেই। কিন্তু গহর কোথায়? সে থাকে ত দু'জনকে  
একত্রেই দাও না।

তার সঙ্গে বসে থাবে?

বলিলাম, চিরকালই ত খাই। ছেলেবেলায় ওর মা আমাকে অনেক ফলার  
মেখে দিয়েছে, তোমাদের প্রসাদের চেয়ে সে তখন কম মিষ্টি হ'ত না। তা ছাড়া  
গহর ভক্ত, গহর কবি—কবির জাতের খোঁজ করতে নেই।

অন্ধকারেও মনে হইল বৈষ্ণবী একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, তারপরে  
কহিল, গহরগোঁসাইজী নেই, কখন চলে গেছে আমরা জানতে পারিনি।

কহিলাম, গহরকে দেখলাম সে উঠানে বসে। তাকে কি তোমরা ভেতরে  
যেতে দাও না?

বৈষ্ণবী কহিল, না।

বলিলাম, গহরকে আজ আমি দেখেচি। কমললতা, আমার তামাশাতে  
তুমি রাগ করলে, কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও বড় কম তামাশা  
করচো না। অপরাধ শুধু একটা দিকেই হয় তা নয়।

বৈষ্ণবী এ অনুযোগের আর জবাব দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটুখানি পরেই সে অন্য একটি বৈষ্ণবীর হাতে আলো ও আসন এবং নিজে প্রসাদের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল, কহিল, অতিথিসেবার ক্রটি হবে নতুনগোঁসাই, কিন্তু এখানকার সমস্তই ঠাকুরের প্রসাদ।

হাসিয়া বলিলাম, ভয় নেই গো সন্ধ্যার বন্দু, বোষ্টম না হয়েও তোমার নতুনগোঁসাইজীর রসবোধ আছে, আতিথ্যের ক্রটি নিয়ে সে রসভঙ্গ করে না। রাখো কি আছে—ফিরে এসে দেখবে প্রসাদের কণিকাটুকুও অবশিষ্ট নেই।

ঠাকুরের প্রসাদ অমনি করেই ত খেতে হয়। এই বলিয়া কমললতা নীচে ঠাঁই করিয়া সমুদয় খাদ্যসামগ্ৰী একে একে পরিপাণি করিয়া সাজাইয়া দিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই ঘূম ভাসিয়া গেল কাঁসরঘণ্টার বিকট শব্দে। সুবিপুল বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে মঙ্গল আরতি শুরু হইয়াছে। কানে গেল ভোরের সুরে কীর্তনের পদ—কানু-গলে বনমালা বিৱাজে, রাই-গলে মোতি সাজে। অরগনিত চৰণে মঞ্জুরী-রঞ্জিত খণ্ডন গণ্ডন লাজে। তাৰপৱে সারাদিন ধৰিয়া চলিল ঠাকুরসেবা। পূজা, পাঠ, কীর্তন, নাওয়ানো-খাওয়ানো, গা-মোছানো, চন্দন-মাখানো, মালা-পৱানো—ইহার আৰ বিৱাম-বিচ্ছেদ নাই। সবাই ব্যস্ত, সবাই নিযুক্ত। মনে হইল পাথৱের দেবতারই এই অষ্টপ্রত্বব্যাপী অফুরন্ত সেবা সহে, আৱ কিছু হইলে এতবড় ধকলে কবে ক্ষইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত।

কাল বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমৰা সাধন-ভজন কৰ কখন? সে উত্তৰে বলিয়াছিল—এই ত সাধন-ভোজন। সবিশ্বয়ে প্ৰশ্ন করিয়াছিলাম, এই রাঁধাবাড়া, ফুলতোলা, মালা-গাঁথা, দুধ জ্বাল দেওয়া, একেই বলো সাধনা? সে মাথা নাড়িয়া তখনি জবাব দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ, আমৱা একেই বলি সাধনা—আমাদেৱ আৱ কোন সাধন-ভজন নেই।

আজ সমস্তদিনেৱ কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম কথাগুলা তাহার বৰ্ণে বৰ্ণে সত্য। অতিৱঞ্চ অভ্যন্তি কোথাও নাই। দুপুৰবেলায় কোন এক ফাঁকে বলিলাম,

কমললতা, আমি জানি তুমি অন্য সকলের মত নও। সত্যি বল ত ভগবানের  
প্রতীক এই যে পাথরের মূর্তি—

বৈষ্ণবী হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল, কহিল, প্রতীক কি গো—  
উনিই যে সাক্ষাৎ ভগবান! এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না  
নতুনগোঁসাই—

আমার কথায় সেই যেন লজ্জা পাইল বেশি। আমিও কেমন একপ্রকার  
অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তবুও আস্তে আস্তে বলিলাম, আমি ত জানিনে, তাই  
জিজ্ঞাসা করচি, তোমরা কি সত্যই ভাবো এই পাথরের মূর্তির মধ্যেই ভগবানের  
শক্তি এবং চৈতন্য, তাঁর—

আমার এ কথাটাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, সে বলিয়া উঠিল, ভাবতে  
যাবো কিসের জন্যে গো, এ যে আমাদের প্রত্যক্ষ। সংস্কারের মোহ তোমরা  
কাটাতে পারো না বলেই ভাবো রক্ত-মাংসের দেহ ছাড়া চৈতন্যের আর কোথাও  
থাকবার জো নেই। কিন্তু তা কেন? আর এও বলি, শক্তি আর চৈতন্যের হাদিস  
কি তোমরাই সবখানি পেয়ে বসে আছ যে, বলবে পাথরের মধ্যে তার জায়গা  
হবে না? হয় গো হয়, ভগবানের কোথাও থাকতেই বাধা পড়ে না, নইলে তাঁকে  
ভগবান বলতে যাবো কেন বলো ত?

যুক্তি-হিসাবে কথাগুলো স্পষ্টও নয়, পূর্ণও নয়, কিন্তু এ ত তা নয়, এ  
তাহার জীবন্ত বিশ্বাস। তাহার সেই জোর ও অকপট উক্তির কাছে হঠাৎ  
কেমনধারা থতমত খাইয়া গেলাম, তর্ক করিতে, প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল  
না, ইচ্ছাও করিল না। বরঞ্চ ভাবিলাম, সতিই ত, পাথরই হোক আর যাই হোক,  
এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আপনাকে একান্ত সমর্পণ না করিতে পারিলে বৎসরের  
পর বৎসর দিনান্তব্যাপী এই অবিছিন্ন সেবার জোর পাইত ইহারা কি করিয়া?  
এমন সোজা হইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দাঁড়াইবার অবলম্বন মিলিত কোথায়? ইহারা  
শিশু ত নয়, ছেলেখেলার এই মিথ্যা অভিনয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মন যে শ্রান্তির অবসাদে

দু'দিনেই এলাইয়া পড়িত । কিন্তু সে ত হয় নাই, বরঞ্চ ভক্তি ও প্রীতির অখণ্ড  
একাগ্রতায় আত্মনিবেদনের আনন্দোৎসব ইহাদের বাড়িয়াই চলিয়াছে । এ জীবনে  
পাওয়ার দিক দিয়া সে কি তবে সবই ভূয়া, সবই ভুল, সবই আপনাকে ঠকান?

বৈষ্ণবী কহিল, কি গোঁসাই, কথা কও না যে?

বলিলাম, ভাবচি ।

কাকে ভাবচ?

ভাবচি তোমাকেই ।

ইস! বড় সৌভাগ্য যে আমার! একটু পরে কহিল, তবুও থাকতে চাও  
না, কোথায় কোন্ বর্মাদের দেশে চাকরি করতে যেতে চাও । চাকরি করবে কেন?

বলিলাম, আমার ত মঠের জমিজমাও নেই, মুঞ্চ ভঙ্গের দলও নেই—  
খাবো কি?

ঠাকুর দেবেন ।

কহিলাম, অত্যন্ত দুরাশা । কিন্তু তোমাদেরও যে ঠাকুরের ওপর খুব ভরসা  
তাও ত মনে হয় না । নইলে ভিক্ষে করতে যাবে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, যাই তিনি দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে  
থাকেন বলে । নইলে নিজেদের গরজ নেই, থাকলে যেতুম না, না খেয়ে শুকিয়ে  
মরলেও না ।

কমললতা, তোমার দেশ কোথায়?

কালকেই ত বলেছি গোঁসাই, ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে  
পথে ।

তা হলে গাছতলায় আর পথে-পথে না থেকে মঠে থাকো কিসের জন্যে?

অনেকদিন পথে-পথেই ছিলুম গোঁসাই, সঙ্গী পাই ত আবার একবার  
পথই সম্বল করি ।

বলিলাম, তোমার সঙ্গীর অভাব এ কথা বিশ্বাস হয় না, কমললতা। যাকে  
ডাকবে সেই যে রাজি হবে।

বৈষ্ণবী হাসিমুখে কহিল, তোমাকে ডাকচি নতুনগোঁসাই—রাজি হবে?

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, হাঁ রাজি। নাবালক অবস্থায় যে লোক যাত্রার  
দলকে ভয় করেনি, সাবালক অবস্থায় তার বোষ্টমীকে ভয় কি!

যাত্রার দলেও ছিলে নাকি?

হাঁ।

তা হলে ত গান গাইতেও পারো।

না, অধিকারী অতটা দূর এগোতে দেয়নি, তার আগেই জবাব দিয়েছিল।  
তুমি অধিকারী হলে কি হ'ত বলা যায় না।

বৈষ্ণবী হাসিতে লাগিল, বলিল, আমিও জবাব দিতুম। সে যাক, এখন  
আমাদের একজন জানলেই কাজ চলে যাবে। এদেশে যেমন-তেমন করেও  
ঠাকুরের নাম নিতে পারলে ভিক্ষের অভাব হয় না। চলো না গোঁসাই, বেরিয়ে  
পড়া যাক। বলেছিলে শ্রীবৃন্দাবনধাম কখনো দেখোনি, চলো তোমাকে দেখিয়ে  
নিয়ে আসি। অনেকদিন ঘরে বসে কাটল, পথের নেশা আবার যেন টানতে চায়।  
সত্যি, যাবে নতুনগোঁসাই?

হঠাৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভারি বিস্ময় জন্মিল; কহিলাম, পরিচয়  
তো এখনো আমাদের চরিশ ঘণ্টা পার হয়নি, আমাকে এতটা বিশ্বাস হ'ল কি  
করে?

বৈষ্ণবী কহিল, চরিশ ঘণ্টা ত কেবল একপক্ষেই নয় গোঁসাই, ওটা  
দু'পক্ষেই। আমার বিশ্বাস, পথে-প্রবাসে আমাকেও তোমার অবিশ্বাস হবে না।  
কাল পঞ্চমী, বেরিয়ে পড়বার ভারী শুভদিন,—চলো। আর পথের ধারে রেলের  
পথ ত রইলাই—ভালো না লাগে ফিরে এসো, আমি বারণ করব না।

একজন বৈষ্ণবী আসিয়া খবর দিল—ঠাকুরের প্রসাদ ঘরে দিয়ে আসা  
হয়েচে।

কমলতা বলিল, চলো, তোমার ঘরে গিয়ে বসি গে।

আমার ঘর? তাই ভাল।

আর একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এবার আর সন্দেহের  
লেশমাত্র রহিল না যে, সে পরিহাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ তাহাও  
নিশ্চিত, কিন্তু যে কারণেই হোক এখানের বাঁধন ছিঁড়িয়া এই মানুষটি পলাইতে  
পারিলেই যেন বাঁচে—তাহার এক মুহূর্তও বিলম্ব সহিতেছে না।

ঘরে আসিয়া খাইতে বসিলাম। অতি পরিপাটি প্রসাদ। পলায়নের  
ষড়যন্ত্রটা জমিত ভালো, কিন্তু কে একজন অত্যন্ত জরুরি কাজে কমলতাকে  
ডাকিয়া লইয়া গেল। সুতরাং একাকী মুখ বুজিয়া সেবা সমাপ্ত করিতে হইল।  
বাহিরে আসিয়া কাহাকেও বড় দেখিতে পাই না, বাবাজী দ্বারিকদাসই বা গেলেন  
কোথায়? দুই-চারিজন প্রাচীন বৈষ্ণবী ঘোরাঘুরি করিতেছে—কাল সন্ধ্যায়  
ঠাকুরঘরে ঘোঁঘার ঘোরে ইহাদেরই বোধ হয় অন্ধরা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আজ  
দিনের বেলায় কড়া আলোতে কল্যকার সেই অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যবোধটা তেমন অটুট  
রহিল না, গা-টা কেমনতর করিয়া উঠিল, সোজা আশ্রমের বাহিরে চলিয়া  
আসিলাম। সেই শৈবালাচ্ছম শীর্ণকায়া মন্দস্থোতা সুপরিচিত স্নোতস্বত্তি এবং সেই  
লতাগুল্মকটকাকীর্ণ তটভূমি এবং সেই সর্পসঙ্কুল সুদৃঢ় বেতসকুঞ্জ ও সুবিস্তৃত  
বেণুবন। দীর্ঘকালের অনভ্যাসবশতঃ গা ছমছম করিতে লাগিল। অন্যত্র যাইবার  
উপক্রম করিতেছি, কোথায় একটি লোক আড়ালে বসিয়া ছিল, উঠিয়া কাছে  
আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা আশ্চর্য হইলাম এ জায়গাতেও মানুষে থাকে! লোকটির  
বয়স হয়ত আমাদেরই মত—আবার বছর দশেকের বেশি হওয়া বিচ্ছি নয়।  
খৰাকৃতি রোগা গড়ন, গায়ের রঙটা খুব কালো নয় বটে, কিন্তু মুখের নীচের  
দিকটা যেমন অস্বাভাবিক রকমের ছোট, চোখের ঝ-দুটাও তেমনি অস্বাভাবিক

ରକମେର ଦୀର୍ଘ-ପ୍ରଷ୍ଟେ ବିତ୍ତିର୍ । ବସ୍ତୁତଃ ଏତ ବଡ ସନ ମୋଟା ଭୁରୁ ଯେ ମାନୁଷେର ହୟ ଇତିପୂର୍ବେ ଏ ଜାନ ଆମାର ଛିଲ ନା, ଦୂର ହଇତେ ସନ୍ଦେହ ହଇଯାଇଲ, ହୟତ ପ୍ରକୃତିର କୋନ ହାସ୍ୟକର ଖେଯାଲେ ଏକଜୋଡ଼ା ମୋଟା ଗୌଫ ଠେଁଟେର ବଦଳେ ଲୋକଟାର କପାଳେ ଗଜାଇଯାଛେ । ଗଲାଜୋଡ଼ା ମୋଟା ତୁଳସୀର ମାଲା, ପୋଶାକ-ପରିଚ୍ଛଦ୍ଵ ଅନେକଟା ବୈଷ୍ଣବଦେର ମତ, କିନ୍ତୁ ଯେମନ ମୟଳା ତେମନି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ।

ମଶାଇ!

ଥମକିଯା ଦାଁଡ଼ାଇଯା ବଲିଲାମ, ଆଜତା କରନ୍ତ ।

ଆପନି ଏଖାନେ କବେ ଏସେହେନ ଶୁନତେ ପାରି କି?

ପାରେନ । ଏସେହି କାଳ ବୈକାଳେ ।

ରାତ୍ରିତେ ଆଖଡ଼ାତେ ଛିଲେନ ବୁଝି?

ହାଁ, ଛିଲାମ ।

ଓঃ!

ମିନିଟଖାନେକ ନୀରବେ କାଟିଲ । ପା ବାଡ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିତେ ଲୋକଟା ବଲିଲ, ଆପନି ତ ବୋଷ୍ଟମ ନୟ, ଭଦ୍ରଲୋକ—ଆଖଡ଼ାର ମଧ୍ୟେ ଆପନାକେ ଥାକତେ ଦିଲେ ଯେ?

ବଲିଲାମ, ସେ ଖବର ତାଁରାଇ ଜାନେନ । ତାଁଦେର ଜିଜ୍ଞାସା କରବେନ ।

ଓঃ! କମଲିଲତା ଥାକତେ ବଲଲେ ବୁଝି?

ହାଁ ।

ଓঃ! ଜାନେନ ଓର ଆସଲ ନାମ କି? ଉଷାଙ୍ଗିନୀ । ବାଡ଼ି ସିଲେଟେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯ ଯେନ ଓ କଲକାତାର ମେଯେମାନୁଷ! ଆମାର ବାଡ଼ିଓ ସିଲେଟେ । ଗାଁଯେର ନାମ ମାମୁଦପୁର । ଶୁନବେନ ଓର ସ୍ଵଭାବ-ଚରିତ୍?

ବଲିଲାମ, ନା । କିନ୍ତୁ ଲୋକଟାର ଭାବଗତିକ ଦେଖିଯା ଏବାର ସତି ବିସ୍ମୟାପନ ହଇଲାମ । ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲାମ, କମଲିଲତାର ସଙ୍ଗେ ଆପନାର କି କୋନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଛେ?

ଆଛେ ନା?

କି ସେଟା?

লোকটা ক্ষণকাল ইত্ততঃ করিয়া হঠাতে গর্জন করিয়া উঠিল, কেন, মিথ্যে  
নাকি? ও আমার পরিবার হয়। ওর বাপ নিজে থেকে আমাদের কঠিবদল  
করিয়েছিল। তার সাক্ষী আছে।

কেন জানি না আমার বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি  
জাত?

আমরা দ্বাদশ-তিলি।

আর কমলতারা?

প্রত্যন্তেরে লোকটা তাহার সেই মোটা ঝ-জোড়া ঘুণায় কুঞ্চিত করিয়া  
বলিল, ওরা শুঁড়ি, ওদের জলে আমরা পা ধুইনে। একবার ডেকে দিতে পারেন?  
না। আখড়ায় সবাই যেতে পারে, ইচ্ছে হলে আপনিও পারেন।

লোকটা রাগ করিয়া বলিল, যাব মশাই, যাব, দারোগাকে দু পয়সা খাইয়ে  
রেখেচি, পেয়াদা সঙ্গে করে একবারে ঝুঁটি ধরে টেনে বার করে আনব। বাবাজীর  
বাবাও রাখতে পারবে না। শালা রাঙ্কেল কোথাকার!

আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিতে লাগিলাম। লোকটা পিছন হইতে  
কর্কশকংগে কহিল, তাতে আপনার কি হ'ল? গিয়ে একবার ডেকে দিলে কি শরীর  
ক্ষয়ে যেত নাকি? ওঃ—ভদ্রলোক!

আর ফিরিয়া চাহিতে ভরসা হইল না। পাছে রাগ সামলাইতে না পারি  
এবং এই অতি দুর্বল লোকটার গায়ে হাত দিয়া ফেলি এই ভয়ে একটু দ্রুতপদেই  
প্রস্থান করিলাম। মনে হইতে লাগিল বৈষ্ণবীর পলাইবার হেতুটা বোধ হয়  
এইখানেই কোথায় জড়িত।

মনটা বিগড়াইয়াছিল, ঠাকুরঘরে নিজেও গেলাম না, কেহ ডাকিতেও  
আসিল না। ঘরের মধ্যে একখানি জলচৌকির উপরে গুটিকয়েক বৈষ্ণবলী  
সংযতে সাজানো ছিল, তাহারি একখানা হাতে করিয়া প্রদীপটা শিয়রের কাছে  
আনিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। বৈষ্ণব-ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নয়, শুধু সময়

কাটাইবার জন্য। ক্ষেত্রের সহিত একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল, কমললতা সেই যে গিয়াছে আর আসে নাই। ঠাকুরের সন্ধ্যারতি যথারীতি আরম্ভ হইল, তাহার মধুর কণ্ঠ বার বার কানে আসিতে লাগিল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেই কথাটাই মনে হইতে লাগিল কমললতা সেই অবধি কোন তত্ত্ব আমার লয় নাই। আর সেই জ্ঞ-ওয়ালা লোকটা! কোন সত্যই কি তাহার অভিযোগের মধ্যে নাই?

আরও একটা কথা। গহর কৈ? সেও ত আজ আমার খোঁজ লইল না। ভবিয়াছিলাম দিনকয়েক এখানেই কাটাইব,— পুঁতুর বিবাহের দিনটি পর্যন্ত—কিন্তু সে আর হয় না। হয়ত কালই কলিকাতায় রওনা হইয়া পড়িব।

ক্রমশঃ আরতি ও কীর্তন সমাপ্ত হইল। কল্যকার সেই বৈষ্ণবী আসিয়া আজও বহু যত্নে প্রসাদ রাখিয়া গেল, কিন্তু যেজন্য পথ চাহিয়াছিলাম তাহার দেখা মিলিল না। বাহিরে লোকজনের কথাবার্তা, আনাগোনার পায়ের শব্দ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল, তাহার আসিবার কোন সম্ভাবনা আর নাই জানিয়া আহার করিয়া হাতমুখ ধুইয়া দীপ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

বোধ করি তখন অনেক রাত্রি, কানে গেল,—নতুনগোঁসাই?

জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম। অঙ্ককারে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া কমললতা; আস্তে আস্তে বলিল, আসিনি বলে মনে মনে বোধ হয় অনেক দুঃখ করেছো—না গোঁসাই?

বলিলাম, হাঁ, করেচি।

বৈষ্ণবী মুহূর্তকাল নীরব হইয়া রহিল, তার পরে বলিল, বনের মধ্যে ও লোকটা তোমাকে কি বলছিল?

তুমি দেখেছিলে নাকি?

হাঁ।

বলছিল সে তোমার স্বামী—অর্থাৎ তোমাদের সামাজিক আচারমতে তুমি  
তার কঠিবদল-করা পরিবার।

তুমি বিশ্বাস করেছো?

না, করিনি।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে আমার স্বভাব-চরিত্রের  
ইঙ্গিত করেনি?

করেছে।

আমার জাত?

হাঁ, তাও।

বৈষ্ণবী একটুখানি থামিয়া বলিল, শুন্বে আমার ছেলেবেলার ইতিহাস?  
কিন্তু হয়ত তোমার ঘৃণা হবে।

বলিলাম, তবে থাক, ও আমি শুনতে চাইনে।

কেন?

বলিলাম, তাতে লাভ কি কমললতা? তোমাকে আমার ভারী ভালো  
লেগেছে। কিন্তু কাল চলে যাবো, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না।  
নির্থক আমার সেই ভালোলাগাটুকু নষ্ট করে ফেলে ফল কি হবে বলো ত?

বৈষ্ণবী এবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া  
সে কি করিতেছে ভাবিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ভাবচ?

ভাবচি, কাল তোমাকে যেতে দেব না।

তবে, কবে যেতে দেবে?

যেতে কোনদিনই দেব না। কিন্তু অনেক রাত হ'লো, ঘুমোও। মশারিটা  
ভালো করে গোঁজা আছে ত?

কি জানি, আছে বোধ হয়।

বৈষ্ণবী হসিয়া কহিল, আছে বোধ হয়? বাঃ—বেশ ত! এই বলিয়া সে  
কাছে আসিয়া অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া বিছানার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া  
বলিল, ঘুমোও গোঁসাই—আমি চললুম। এই বলিয়া সে পা-টিপিয়া বাহির হইয়া  
গেল এবং বাহির হইতে অত্যন্ত সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

## সাত

আজ আমাকে বৈষ্ণবী বার বার করিয়া শপথ করাইয়া লইল তাহার পূর্ব-  
বিবরণ শুনিয়া আমি ঘৃণা করিব কি না।

বলিলাম, শুনতে আমি চাইনে, কিন্তু শুনলেও ঘৃণা করব না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, কিন্তু করবে না কেন? সে শুনলে মেয়েপুরুষে সবাই  
ত ঘৃণা করে!

বলিলাম, তুমি কি বলবে আমি জানিনে কিন্তু তরুণ আন্দাজ করতে পারি।  
সে শুনলে মেয়েরাই যে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে সে জানি এবং তার  
কারণও জানি, কিন্তু তোমাকে বলতে আমি চাইনে। পুরুষেরাও করে, কিন্তু  
অনেক সময়ে সে ছলনা, অনেক সময়ে আত্মবঞ্চনা। তুমি যা বলবে তার চেয়েও  
অনেক কুশ্রী কথা আমি তোমাদের নিজের মুখেও শুনেচি, চোখেও দেখেছি। কিন্তু  
তরুণ ঘৃণা হয় না।

কেন হয় না?

বোধ হয় আমার স্বভাব। কিন্তু কালই ত বলেচি তোমাকে, তার দরকার  
নেই। শুনতে আমি একটুও উৎসুক নই। তা ছাড়া, কোথাকার কে—সে—সব  
কাহিনী নাই বা আমাকে বললে।

বৈষ্ণবী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তার পরে হঠাতে জিজ্ঞাসা  
করিল, আচ্ছা গোঁসাই, তুমি পূর্বজন্ম পরজন্ম এ-সব বিশ্বাস করো?

না।

না কেন? একি সত্যিই নেই তুমি ভাবো?

আমার ভাবনার জন্য অন্য জিনিস আছে, এ-সব ভাববার বোধ হয় সময়  
পেয়ে উঠিলে।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, একটা ঘটনা তোমাকে বলবো, বিশ্বাস করবে? ঠাকুরের দিকে মুখ করে বলচি, তোমাকে মিথ্যে বলবো না।

হাসিয়া কহিলাম, কোরব গো কমলতা, কোরব। ঠাকুরের দিব্য না করে বললেও তোমাকে বিশ্বাস কোরব।

বৈষ্ণবী কহিল, তবে বলি। একদিন গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনলাম হঠাৎ তাঁর পাঠশালার বন্ধু এসেছিলেন বাড়িতে; ভাবলুম, যে লোক একটা দিন আমাদের এখানে না এসে পারে না সে রইলো কোন্ ছেলেবেলার বন্ধুকে নিয়ে মেতে ছ-সাত দিন। আবার ভাবলুম, এ কেমনধারা বামুন বন্ধু যে অন্যায়সে পড়ে রইলো মুসলমানের ঘরে, কারও ভয় করলে না! তার কি কোথাও কেউ নেই নাকি? জিজ্ঞাসা করতে গহরগোঁসাইও ঠিক এই কথাই বললে। বললে, সংসারে তার আপনার কেউ নেই বলে তার ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।

মনে মনে বললাম, তাই হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বন্ধুর নাম কি গোঁসাই? নাম শুনে যেন চমকে গেলুম। জানো ত গোঁসাই, ও নামটা আমার করতে নেই!

হাসিয়া বলিলাম, জানি। তোমার মুখেই শুনেছি।

বৈষ্ণবী কহিল, জিজ্ঞেস করলুম, বন্ধু দেখতে কেমন? বয়স কত? গোঁসাই কত কি যে বলে গেল তার কতক বা আমার কানে গেল, কতক বা গেল না, কিন্তু বুকের ভেতরটায় টিপ্পিচ করতে লাগল। তুমি ভাববে এমন মানুষ ত দেখিনি—এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়! কিন্তু শুধু নাম শুনেই মেয়েমানুষ পাগল হয় গোঁসাই,—এ সত্যি?

বলিলাম, তারপর?

বৈষ্ণবী বলিল, তারপরে নিজেও হাসতে লাগলুম, কিন্তু ভুলতে আর পারলুম না। সব কাজকর্মেই কেবল একটা কথা মনে হয় তুমি আবার করবে আসবে, তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাব করবে।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার মুখের পানে চাহিয়া আর হাসিতে পারিলাম না।

বৈষ্ণবী বলিল, সবে কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালোবাসে না। পূর্বজন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে!

একটু থামিয়া আবার সে বলিল, আমি জানি তুমি থাকতেও আসোনি, থাকবেও না। যত প্রার্থনাই জানাই নে কেন, দু-একদিন পরেই চলে যাবে। কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সামলাব তাই কেবল ভাবি। এই বলিয়া সে সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

চুপ করিয়া রহিলাম। এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয় নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্বে কখনো পুনর্কেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই। এবং ইহা অভিনয় যে নয় তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমললতা দেখিতে ভালো, অক্ষর-পরিচয়হীন মূর্খও নয়, তাহার কথায়বার্তায়, তাহার গানে, তাহার যত্ন ও অতিথিসেবার আন্তরিকতায় তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছে এবং সেই ভালো লাগাটা প্রশংস্তি ও রসিকতার অত্যুক্তিতে ফলাও করিয়া তুলিতে নিজেও কৃপণতা করি নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে পরিণতি যে এমন ঘোরালো হইয়া উঠিবে, বৈষ্ণবীর আবেদনে, অশ্রমোচনে ও মাধুর্যের অকৃত্তিত আত্মপ্রকাশে সমস্ত মন যে এমন তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, ক্ষণকাল পূর্বেও তাহার কি জানিতাম! যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কেবল লজ্জাতেই যে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল তাই নয়, কি-একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি-স্বত্ত্ব রহিল না। জানি না, কোন অশুভ লগ্নে কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম,

এ যে এক পুঁটুর জাল কাটিয়া আর এক পুঁটুর ফাঁদে গিয়া ঘাড়মোড় গুঁজিয়া  
পড়িলাম।

এদিকে বয়স ত যৌবনের সীমানা ডিঙাইতেছে, এই সময়ে অ্যাচিত  
নারীপ্রেমের বন্যা নামিল নাকি; কোথায় পলাইয়া যে আত্মরক্ষা করিব ভাবিয়া  
পাইলাম না। যুবতী-রমণীর প্রণয়ভিক্ষাও যে পুরুষের কাছে এত অরঞ্চির হইতে  
পারে তাহা ধারণা ছিল না। ভাবিলাম, অকস্মাৎ মূল্য আমার এত বাড়িল কি  
করিয়া? আজ রাজলক্ষ্মীর প্রয়োজনও আমাতে শেষ হইতে চাহে না—বজ্রমুষ্টি  
এতটুকু শিথিল করিয়াও আমাকে সে নিষ্ঠতি দিবে না, এ মীমাংসা চুকিয়াছে।  
কিন্তু এখানে আর না। সাধুসঙ্গ মাথায় থাক, স্থির করিলাম, কালই এস্থান ত্যাগ  
করিব।

বৈষ্ণবী হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল—এই যাঃ! তোমার জন্যে যে চা  
আনিয়েছি গোঁসাই।

বলো কি? পেলে কোথায়?

শহরে লোক পাঠিয়েছিলুম। যাই, তৈরি করে আনি গে। কোথাও পালিয়ো  
না যেন।

না। কিন্তু তৈরি করতে জানো ত?

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সেইদিকে চাহিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা  
বাজিল। চা-পান আশ্রমের ব্যবস্থা নয়, হয়ত নিষেধই আছে, তবুও জিনিসটা যে  
আমি ভালবাসি এ খবর সে জানিয়াছে এবং শহরে লোক পাঠাইয়া সংগ্রহ  
করিয়াছে। তাহার বিগত জীবনের ইতিহাস জানি না, বর্তমানেরও না, কেবল  
আভাসে এইটুকুই শুনিয়াছি তাহা ভাল নয়, তাহা নিন্দার্থ, শুনিলে লোকের ঘৃণা  
জন্মে। তথাপি আমার কাছে সে-কাহিনী সে লুকাইতে চাহে নাই, বলিবার জন্যই  
বার বার পীড়াপীড়ি করিয়াছে, শুধু আমিই শুনিতে রাজি হই নাই। আমার

কৌতুহল নাই—কারণ প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তাহার। একলা বসিয়া সেই প্রয়োজনের কথাটা ভাবিতে গিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, আমাকে না বলিয়া তাহার অন্তরের ফ্লানি ঘুচিতেছে না—মনের মধ্যে সে কিছুতেই জোর পাইতেছে না।

শুনিয়াছি আমার শ্রীকান্ত নামটা কমললতার উচ্চারণ করিতে নাই। জানি না কে তাহার এই পরমপূজ্য গুরুজন এবং কবে সে ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছে। দৈবাং আমাদের নামের মিলটা বোধ করি এই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং তখন হইতে কল্পনায় সে গত জন্মের স্বপ্নসাগরে ডুব মারিয়া সংসারের সকল বাস্তবতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে।

তবু মনে হয় বিস্ময়ের কিছু নাই। রসের আরাধনায় আকর্ষ মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত রসের তত্ত্ব পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ-সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত,—দ্বিধায় পীড়িত।

সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অঙ্গাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না—আজ তাই সে চমকিয়া বারে বারে তাহার বিগত-জন্মের রুদ্ধদ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সাম্মতা মাগিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি আমার ‘শ্রীকান্ত’ নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়!

বৈষ্ণবী চা আনিয়া দিল; সবই নৃতন ব্যবস্থা, পান করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। মানুষের মন কত সহজেই না পরিবর্তিত হয়,—আর যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, তোমরা কি শুঁড়ি?

কমললতা হাসিয়া বলিল, না, সোনারবেনে। কিন্তু তোমাদের কাছে ত প্রভেদ নেই, ও দুই-ই এক।

কহিলাম, অন্ততঃ আমার কাছে তাই বটে। দুই-ই এক কেন, সবই এক হ'লেও ক্ষতি ছিল না।

বৈষ্ণবী বলিল, তাই ত মনে হয়। তুমি গহরের মায়ের হাতেও খেয়েছো।

বলিলাম, তাঁকে তুমি জানো না। গহর বাপের মত হয়নি, তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে—এমন শান্ত, আত্মতোলা মিষ্টি মানুষ আর কখনও দেখেচো? ওর মা ছিলেন তেমনি। একবার ছেলেবেলায় গহরের বাপের সঙ্গে তাঁর বাগড়ার কথা আমার মনে আছে। কাকে নাকি লুকিয়ে অনেকগুলো টাকা দেওয়া নিয়ে বাগড়া বাধল। গহরের বাপ ছিল বদরাগী লোক, আমরা ত ভয়ে গেলাম পালিয়ে। ঘণ্টাকয়েক পরে চুপি চুপি ফিরে এসে দেখি গহরের মা চুপ করে বসে। গহরের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রথমটা তিনি কথা কইলেন না, কিন্তু আমাদের মুখের পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে ফেঁটাকতক জল গড়িয়ে পড়লো। এ অভ্যাস তাঁর ছিল।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, এতে হাসির কি হ'লো?

বলিলাম, আমরাও ত তাই ভাবলাম। কিন্তু হাসি থামলে কাপড়ে চোখ মুছে ফেলে বললেন, আমি কি বোকা মেয়ে বাপু! ও দিব্যি নেয়ে-খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘূমুচ্ছে, আর আমি না খেয়ে উপুস করে রেগে জ্বলেপুড়ে মরচি! কি দরকার বলো ত! আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাগ অভিমান ধুয়েমুছে নির্মল হয়ে গেল। মেয়েদের এ যে কত বড় গুণ তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভুক্তভোগী নাকি গোঁসাই?

একটু বিরত হইলাম। প্রশ্নটা তাহাকে ছাড়িয়া যে আমার ঘাড়ে পড়িবে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, সবই কি নিজে ভুগতে হয় কমললতা, পরের দেখেও শেখা যায়। ঐ ভুরুওয়ালা লোকটার কাছে তুমি কি কিছু শেখোনি?

বৈষ্ণবী বলিল, কিন্তু ও ত আমার পর নয়।

আর কোন প্রশ্ন আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না—একেবারে নিষ্ঠক  
হইয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী নিজেও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তার পরে হাতজোড় করিয়া  
বলিল, তোমাকে মিনতি করি গোঁসাই, আমার গোড়ার কথাটা একবার শোন—  
বেশ, বলো।

কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল বলা সহজ নয়। আমারি মত নতমুখে  
তাহাকেও বহুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু সে হার মানিল না,  
অন্তর্বিধাতে জয়ী হইয়া একসময়ে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন আমারও মনে  
হইল তাহার স্বভাবতঃ সুশ্রী মুখের ‘পরে যেন বিশেষ একটি দীপ্তি পড়িয়াছে।  
বলিল, অহঙ্কার যে মরেও মরে না গোঁসাই। আমাদের বড়গোঁসাই বলে, ও যেন  
তুমের আগুন, নিবেও নেবে না। ছাই সরালেই চোখে পড়ে ধিকিধিকি জ্বলচে।  
কিন্তু তাই বলে ফুঁ দিয়েও ত বাড়াতে পারব না। আমার এ পথে আসাই যে তা  
হলে মিথ্যে হয়ে যাবে। শোন। কিন্তু মেয়েমানুষ ত—হয়ত, সব কথা খুলে বলতেও  
পারব না।

আমার কুঠার অবধি রহিল না। শেষবারের মত মিনতি করিয়া বলিলাম,  
মেয়েদের পদস্থলনের বিবরণে আমার আগ্রহ নেই, ওৎসুক্য নেই, ও শুনতে  
আমার কোনদিন ভালো লাগে না কমলতা। তোমাদের বৈষ্ণব-সাধনায় অহঙ্কার  
বিনাশের কোন্ পস্তা মহাজনেরা নির্দেশ করে দিয়েছেন আমি জানিনে, কিন্তু  
নিজের গোপন পাপ অনাবৃত করার স্পর্ধিত বিনয়ই যদি তোমাদের প্রায়শিত্বের  
বিধান হয়, এ-সব কাহিনী যাদের কাছে অত্যন্ত রঞ্চিকর এমন বহুলোকের সাক্ষাৎ  
তুমি পাবে কমলতা, আমাকে ক্ষমা কর। এ ছাড়া বোধ হয় কালই আমি চলে  
যাবো—জীবনে হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না।

বৈষ্ণবী কহিল, তোমাকে ত আগেই বলেছি গোঁসাই, প্রয়োজন তোমার  
নয়, আমার। কিন্তু কালকের পর আর আমাদের দেখা হবে না, এই কি তুমি

সত্যিই বলতে চাও? না কখনো তা নয়, আমার মন বলে আবার দেখা হবে—  
আমি সেই আশা নিয়েই থাকবো। কিন্তু যথার্থই কি আমার সম্বন্ধে তোমার কোন  
কথাই জানতে ইচ্ছে করে না? চিরকাল শুধু একটা সন্দেহ আর অনুমান নিয়েই  
থাকবে?

প্রশ্ন করিলাম, আজ বনের মধ্যে যে লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল,  
যাকে তুমি আশ্রমে চুকতে দাও না, যার দৌরান্তে তুমি পালাতে চাচ্ছো, সে কি  
তোমার সত্যিই কেউ নয়? নিছক পর?

কিসের ভয়ে পালাচ্ছি তুমি বুঝেছো গোঁসাই?

হাঁ, এই ত মনে হয়। কিন্তু কে ও?

কে ও! ও আমার ইহ-পরকালের নরক-যন্ত্রণা। তাই ত অহরহ ঠাকুরকে  
কেঁদে বলি, প্রভু, আমি তোমার দাসী—মানুষের উপর থেকে এত বড় ঘৃণা আমার  
মন থেকে মুছে দাও—আমি আবার সহজ নিশাস ফেলে বাঁচি। আমার সকল  
সাধনা যে ব্যর্থ হয়ে যায়।

তাহার চোখের দৃষ্টিতে যেন আত্মানি ফুটিয়া উঠিল, আমি চুপ করিয়া  
রহিলাম।

বৈষ্ণবী কহিল, অথচ ওর চেয়ে আপন একদিন আমার কেউ ছিল না—  
জগতে অত ভালো বোধ করি কেউ কাউকে বাসেনি।

তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বয়ের সীমা রহিল না এবং এই সুরূপা রমণীর  
তুলনায় সেই ভালবাসার পাত্রটির কৃৎসিত কদাকার মূর্তি স্মরণ করিয়া মনও  
ভারী ছোট হইয়া গেল।

বুদ্ধিমত্তা বৈষ্ণবী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহা বুবিল, কহিল, গোঁসাই,  
এ ত শুধু ওর বাইরেটা—ওর ভিতরের পরিচয়টা শোন।

বলো।

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, আমার আরও দু'টি ছোটভাই আছে, কিন্তু বাপ-মায়ের আমিহি একমাত্র মেয়ে। বাড়ি আমাদের শ্রীহট্টে, কিন্তু বাবা কারবারী লোক, তাঁর ব্যবসা কলকাতায় বলে ছেলেবেলা থেকে আমি কলকাতায় মানুষ—মাসংসার নিয়ে দেশের বাড়িতেই থাকেন, আমি পুজোর সময় যদি কখনো দেশে যেতুম মাস খানেকের বেশি থাকতে পারতুম না। আমার ভালোও লাগত না। কলকাতাতেই আমার বিয়ে হয়, সতেরো বছর বয়সে কলকাতাতেই আমি তাঁকে হারাই, তাঁর নামের জন্যেই গোঁসাই, তোমার নামটা গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনে আমি চমকে উঠি। এইজন্যেই নতুনগোঁসাই বলে ডাকি, তোমার ও নামটা মুখে আনতে পারিনে।

বলিলাম, সে আমি বুঝেচি, তারপর?

বৈষ্ণবী কহিল, যার সঙ্গে তোমার আজ দেখা তার নাম মন্থ, ও ছিল আমাদের সরকার। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আমার বয়েস যখন একুশ বছর তখন আমার সন্তান-সন্তাবনা হ'লো—

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, মন্থর একটি পিতৃহীন ভাইপো আমাদের বাসায় থাকত, বাবা তাকে কলেজে পড়াতেন। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য ছোট ছিল, আমাকে সে যে কত ভালবাসত তার সীমা ছিল না।

তাকে ডেকে বললুম, যতীন, কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি ভাই, আমার এ বিপদে শেষবারের মত আমাকে একটু সাহায্য করো, আমাকে এক টাকার বিষ কিনে এনে দাও।

কথাটা প্রথমে সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু যখন বুঝলে মুখখানা তার মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললুম, দেরি করলে হবে না ভাই, তোমাকে এখনি কিনে এনে দিতে হবে। এছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই।

শুনে যতীনের সে কি কান্না! সে ভাবত আমাকে দেবতা, ডাকত আমাকে দিদি বলে। কি আঘাত, কি ব্যথাই সে যে পেলে, তার চোখের জল আর শেষ

হতেই চায় না। বললে, উষাদিদি, আঘাত্যার মত মহাপাপ আর নেই। একটা অন্যায়ের কাঁধে আর একটা তার বড় অন্যায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি পথ খুঁজে পেতে চাও? কিন্তু লজ্জা থেকে বাঁচবার এই উপায় যদি তুমি স্থির ক'রে থাকো দিদি, আমি কখনো সাহায্য করব না। এছাড়া তুমি আর যা আদেশ করবে আমি স্বচ্ছন্দে পালন কোরব।

তার জন্যেই আমার মরা হ'লো না।

ক্রমশঃ কথাটা বাবার কানে গেল। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, তেমনি শান্ত নিরীহপ্রকৃতির মানুষ। আমাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু দুঃখে, লজ্জায়, দু-তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। তার পরে গুরুদেবের পরামর্শে আমাকে নিয়ে নবদ্বীপে এলেন। কথা হ'লো মন্থ এবং আমি দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হবো, তখন ফুলের মালা আর তুলসীর মালাবদল করে নতুন আচারে হবে আমাদের বিয়ে। তাতে পাপের প্রায়শিত্ত হবে কিনা জানিনে, কিন্তু যে শিশু গর্ভে এসেছে, মা হয়ে তাকে যে হত্যা করতে হবে না সেই ভরসাতেই যেন অর্ধেক বেদনা মুছে গেল। উদ্যোগ আয়োজন চললো, দীক্ষাই বলো আর ভেখই বলো, তাও আমাদের সঙ্গ হ'লো, আমার নতুন নামকরণ হ'লো কমললতা। কিন্তু তখনো জানিনে যে, বাবা দশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তবে মন্থকে রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ, কি কারণে জানিনে বিয়ের দিনটা দিনকয়েক পেছিয়ে গেল। বোধ হয় সপ্তাহখানেক হবে। মন্থকে বড় একটা দেখিনে, নবদ্বীপের বাসায় আমি একলাই থাকি। এমনিই ক'দিন যায়, তার পরে শুভদিন আবার এসে উপস্থিত হ'লো। স্নান করে, শুচি হয়ে, শান্তমনে ঠাকুরের প্রসাদী মালা হাতে প্রতীক্ষা করে রইলুম।

বাবা বিষম্পমুখে একবার ঘুরে গেলেন, কিন্তু নবীন বৈষ্ণবের বেশে মন্থর যখন দেখা মিলল, হঠাৎ সমস্ত মনের ভেতরটা যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। সে

আনন্দের কি ব্যথার ঠিক জানিনে, হয়ত দুই-ই ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হ'লো উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসি, কিন্তু লজ্জায় সে আর হয়ে উঠল না।

আমাদের কলকাতার পুরোনো দাসী কি-সব জিনিসপত্র নিয়ে এলো—সে আমাকে মানুষ করেছিল, তার কাছেই দিন পিছবার কারণ শুনতে পেলুম।

কতকালের কথা, তবু গলা ভারী হইয়া তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।  
বৈশ্ববী মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কারণটা কি বললে সে?

বৈশ্ববী কহিল, বললে, মন্থ হঠাৎ দশ হাজারের বদলে বিশ হাজার টাকা দাবি করে বসল। আমি কিছুই জানতুম না, চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম,  
মন্থ কি টাকার বদলে রাজি হয়েছে নাকি? আর বাবাও বিশ হাজার টাকা দিতে  
চেয়েছেন? দাসী বললে, উপায় কি দিদিমণি? ব্যাপারটা ত সহজ নয়, প্রকাশ  
হয়ে পড়লে যে সমাজ-জাত-কুল-মান সব ঘাবে।

মন্থ আসল কথাটা শেষকালে প্রকাশ করে দিলে, বললে, দায়ী ত সে  
নয়, দায়ী তার ভাইপো যতীন। সুতরাং বিনা দোষে যদি তাকে জাত দিতেই হয়  
ত বিশ হাজারের কমে পারবে না। তা ছাড়া, পরের ছেলের পিতৃত্ব স্থাকার করে  
নেওয়া—এ কি কম কঠিন!

যতীন তার ঘরে বসে পড়েছিল, তাকে ডেকে এনে কথাটা শোনানো  
হ'লো। শুনে প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর বললে, মিছে  
কথা।

পিতৃব্য মন্থ গর্জন করে উঠল—পাজি নচ্ছার নেমকহারাম! যে লোক  
তোকে ভাতকাপড় দিয়ে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করচে তুই তারই করলি সর্বনাশ!  
কি কালসাপকেই না আমি মনিবের ঘরে ডেকে এনেছিলাম! ভেবেছিলাম বাপমা-  
মরা ছেলে মানুষ হবে। ছি ছি! এই না বলে সে বুকে কপালে পটাপট করাঘাত

করতে লাগল, বললে একথা উষা নিজের মুখে ব্যক্ত করেছে আর তুই বলিস,  
না!

যতীন চমকে উঠে বললে, উষাদিদি নিজে বলেছেন আমার নামে? কিন্তু  
তিনি ত কথ্যনো মিথ্যে বলেন না—এত বড় মিথ্যে অপবাদ তাঁর মুখ থেকে ত  
কিছুতেই বার হতে পারে না!

মন্থ আর একবার গর্জন করে উঠল—ফের! তবু অস্বীকার করবি পাজি  
হতভাগা শয়তান! জিজেস কর্ তবে মনিবকে। তিনি কি বলেন শোন!

কর্তা সায় দিয়ে বললেন, হাঁ।

যতীন বললে, দিদি নিজে করেছেন আমার নাম?

কর্তা আবার ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ।

বাবাকে সে দেবতা বলে জানত, এর পরে আর প্রতিবাদ করলে না, স্তু  
হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আন্তে আন্তে চলে গেল। কি ভাবলে সেই জানে।

রাত্রে কেউ তার খোঁজ করলে না। সকালে কে এসে তার খবর দিলে,  
সবাই ছুটে গিয়ে দেখলে আমাদের ভাঙ্গা আস্তাবলের এককোণে যতীন গলায়  
দড়ি দিয়ে ঝুলচে।

বৈষ্ণবী কহিল, শাস্ত্রে ভাইপোর আত্মহত্যায় খুড়োর অশৌচ বিধি আছে  
কি না জানিনে গোঁসাই, হয়ত নেই, হয়ত ডুব দিয়ে শুন্দ হয়—সে যাই হোক,  
শুভদিন দিনকয়েক মাত্র পেছিয়ে গেল—তার পরে গঙ্গামানে শুন্দ-শুচি হয়ে  
মন্থগোঁসাই মালাতিলক ধারণ করে অধিনীর পাপ-বিমোচনের শুভ-সঙ্কল্প নিয়ে  
নবদ্বীপে এসে অবতীর্ণ হলেন।

একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বৈষ্ণবী পুনরায় কহিল, সেদিন ঠাকুরের প্রসাদী  
মালা ঠাকুরের পাদপদ্মে ফিরিয়ে দিয়ে এলুম। মন্থর অশৌচ গেল কিন্তু পাপিষ্ঠা  
উষার অশৌচ ইহজীবনে আর ঘুচল না নতুনগোঁসাই।

কহিলাম, তার পরে?

বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়াছিল, জবাব দিল না। বুবিলাম, এবার তাহার সামলাইতে সময় লাগিবে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিলাম।

ইহার শেষ অংশটুকু শুনিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রশ্ন করা উচিত কি না ভাবিতেছিলাম, বৈষ্ণবী আর্দ্ধ মৃদুকঢে নিজেই বলিল, দ্যাখো গোঁসাই, পাপ জিনিসটা সংসারে এমন ভয়ঙ্কর কেন জানো?

বলিলাম, নিজের বিশ্বাসমত জানি একরকম, কিন্তু তোমার ধারণার সঙ্গে সে হয়ত না মিলতে পারে।

সে প্রত্যুভরে কহিল, জানিনে তোমার বিশ্বাস কি, কিন্তু সেদিন থেকে আমি একে আমার মত করে বুঝে রেখেচি গোঁসাই। স্পর্ধাভরে তুমি কত লোককে বলতে শুনবে, কিছুই হয় না। তারা কত লোকের নজির দিয়ে তাদের কথা প্রমাণ করতে চাইবে। কিন্তু তার ত কোন দরকার নেই। তার প্রমাণ মন্মথ, প্রমাণ আমি নিজে। আজও কিছুই আমাদের হয়নি। হলে একে এত ভয়ঙ্কর আমি বলতুম না। কিন্তু তা ত নয়, এর দণ্ড ভোগ করে নিরপরাধ নির্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল আত্মহত্যায়, কিন্তু সে তাই দিয়ে তার দিদির অপরাধের প্রায়শিত্ত করে গেল। বলো ত গোঁসাই, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংসারে আর কি আছে? কিন্তু এমনিই হয়, এমনি কোরেই ঠাকুর বোধ হয় তাঁর সৃষ্টি রক্ষে করেন।

এ নিয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। তাহার যুক্তি এবং ভাষা কোনটাই প্রাঞ্জল নয়, তথাপি ইহাই মনে করিলাম তাহার দুষ্কৃতির শোকাচ্ছন্ন স্মৃতি হয়ত এই পথেই আপন পাপ-পুণ্যের উপলক্ষ্মি অর্জন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, এর পরে কি হ'লো?

শুনিয়া সহসা সে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি বল গোঁসাই, এর পরেও আমার কথা তোমার শুনতে ইচ্ছে করে?

সত্যিই বলচি, করে।

বৈষ্ণবী বলিল, আমার ভাগ্য যে এ জন্মে আবার তোমার দেখা পেলুম।  
এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল,  
দিনচারেক পরে একটা মরা ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লো, তাকে গঙ্গার তীরে বিসর্জন দিয়ে  
গঙ্গায় স্নান করে বাসায় ফিরে এলুম। বাবা কেঁদে বললেন, আমি ত আর থাকতে  
পারিনে মা। বললুম, না বাবা, তুমি আর থেকো না, তুমি বাড়ি যাও। অনেক  
দুঃখ দিলুম, আর তুমি আমার জন্মে ভেবো না।

বাবা বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিবি ত মা?

বললুম, না বাবা, আমার খবর নেবার আর তুমি চেষ্টা ক'রো না।

কিন্তু তোমার মা যে এখনো বেঁচে রয়েচে উষা?

বললুম, আমি মরব না বাবা, কিন্তু আমার সতীলক্ষ্মী মা, তাঁকে ব'লো  
উষা মরেছে। মা দুঃখ পাবেন, কিন্তু মেয়ে তাঁর বেঁচে আছে শুনলে তার চেয়েও  
বেশি দুঃখ পাবেন।

চোখের জল মুছে বাবা কলকাতায় চলে গেলেন।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কমললতা বলিতে লাগিল, হাতে টাকা  
ছিল, বাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গী জুটে গেল—তারা  
যাচ্ছিল শ্রীবৃন্দাবনধামে—আমিও সঙ্গ নিলুম।

বৈষ্ণবী একটু থামিয়া বলিল, তারপরে কত তীর্থে, কত পথে, কত  
গাছতলায় কতদিন কেটে গেল।

বলিলাম, তা জানি, কিন্তু কত শত বাবাজীর কত শতসহস্র চোখের দৃষ্টির  
বিবরণ ত তুমি বললে না কমললতা?

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, বাবাজীদের দৃষ্টি অতিশয় নির্মল, তাঁদের  
সমন্বে অশ্রদ্ধার কথা বলতে নেই গোঁসাই।

বলিলাম, না না, অশ্রদ্ধা নয়, অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের কাহিনী  
শুনতে চাইচি কমললতা।

এবার সে হাসিল না বটে, কিন্তু চাপাহাসি গোপন করিতেও পারিল না,  
কহিল, যে বাবাজী ভালোবাসে তাকে সব কথা খুলে বলতে নেই, আমাদের  
বোষ্টমের শান্ত্রে নিষেধ আছে।

বলিলাম, তবে থাক। সব কথায় কাজ নেই, কিন্তু একটা বল, গোঁসাইজী  
দ্বারিকা দাসকে যোগাড় করলে কোথায়?

কমললতা সঙ্কোচে জিভ কাটিয়া কপালে হাত ঠেকাইল, বলিল, ঠাট্টা  
করতে নেই, উনি যে আমার গুরুদেব গোঁসাই।

গুরুদেব! তুমি ওঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছ?

না, দীক্ষা নিইনি বটে, কিন্তু উনি তাঁর মতই পূজনীয়।

কিন্তু এই যে এতগুলি বৈষ্ণবী—সেবাদাসী না কি যে বলে—

কমললতা পুনশ্চ জিভ কাটিয়া বলিল, ওরা আমার মতই ওঁর শিষ্যা।  
ওদেরও তিনি উদ্ধার করেছেন।

কহিলাম, নিশ্চয়ই করেছেন, কিন্তু পরকীয়া সাধনা, না কি এমনি একটা  
সাধনপদ্ধতি তোমাদের আছে—তাতে ত দোষ নেই—

বৈষ্ণবী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমরা দূর থেকে আমাদের  
কেবল ঠাট্টা-তামাশাই করলে, কাছে এসে কখনো ত কিছু দেখলে না, তাই  
সহজেই বিদ্রূপ করতে পার। আমাদের বড়গোঁসাইজী সন্ন্যাসী, ওঁকে উপহাস  
করলে অপরাধ হয় নতুনগোঁসাই, অমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

তাহার কথা ও গান্তীর্ঘে একটু অপ্রতিভ হইলাম। বৈষ্ণবী তাহা লক্ষ্য  
করিয়া স্মিত মুখে বলিল, দু'দিন থাকো না গোঁসাই আমাদের কাছে? কেবল  
বড়গোঁসাইজীর জন্যেই বলচি নে, আমাকে ত তুমি ভালোবাসো, আর কখনো  
যদি দেখা না-ও হয়, তবু ত দেখে যাবে কমললতা সত্যিই কি নিয়ে সংসারে  
থাকে। যতীনকে আমি আজো ভুলিনি—দু'দিন থাকো—আমি বলচি তোমাকে,  
তুমি যথার্থই খুশি হবে।

চুপ করিয়া রহিলাম। ইহাদের সম্বন্ধে একেবারেই যে কিছু জানি না তাহা  
নয়, জাতবোষ্ঠমের মেয়ে টগরের কথাটাও মনে পড়িল, কিন্তু রহস্য করিতে আর  
প্রবৃত্তি হইল না। যতীনের প্রায়শিত্তের ঘটনা সকল আলোচনার মাঝখানে রহিয়া  
রহিয়া আমাকেও যেন উন্মনা করিয়া দিতেছিল।

বৈষ্ণবী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হাঁ গোঁসাই, এ বয়সে সত্যিই কাউকে কখনো  
কি ভালোবাসো নি?

তোমার কি মনে হয় কমললতা?

আমার মনে হয়—না। তোমার মনটা হ'ল আসলে বৈরাগীর মন,  
উদাসীনের মন—প্রজাপতির মত। বাঁধন তুমি কখনো কোন কালে নেবে না।

হাসিয়া বলিলাম, প্রজাপতির উপমা ত ভাল হ'ল না কমললতা, ওটা যে  
অনেকটা গালাগালির মত শুনতে। আমার ভালোবাসার মানুষ কোথাও যদি সত্য  
কেউ থাকে, তার কানে গেলে যে অনর্থ বাধবে।

বৈষ্ণবীও হাসিল, কাহিল, ভয় নেই গোঁসাই, সত্যিই যদি কেউ থাকে  
আমার কথায় সে বিশ্঵াসও করবে না, তোমার মধুমাখানো ফাঁকিও সে সারাজীবনে  
ধরতে পারবে না।

বলিলাম, তবে তার দুঃখ কিসের? হোক না ফাঁকি, কিন্তু তার কাছে ত  
সেই সত্য হয়ে রইল।

বৈষ্ণবী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে হয় না গোঁসাই, মিথ্যে কখনো সত্য  
জায়গা নিয়ে থাকতে পারে না। তারা বুঝতে না পারুক, কারণটা তাদের কাছে  
সুস্পষ্ট না হোক, তবু অন্তরটা তাদের নিরন্তর অশ্রমুখী হয়েই থাকে। মিথ্যের  
কাও দেখেচি ত। এমনি করে এ পথে কত লোকই এলো, এ পথ যাদের সত্য  
নয়, জলের ধারাপথে শুকনো বালির মত সমস্ত সাধনাই তাদের চিরদিন আলগা  
হয়ে রইল, কখনো জমাট বাঁধতে পারলে না।

একটু থামিয়া সে যেন হঠাত নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, তারা রসের খবর ত পায় না, তাই প্রাণহীন নিজীব পুতুলের নিরর্থক সেবায় প্রাণ তাদের দুদিনে হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবে এ কোন্ মোহের ঘোরে নিজেকে দিনরাত ঠকিয়ে মরি! এদের দেখেই আমাদের তোমরা উপহাস করতে শেখো—কিন্তু এ কি আমি বাজে বকে মরচি গোঁসাই, এ-সব অসংলগ্ন প্রলাপের তুমি ত একটা কথাও বুঝবে না। কিন্তু এমন যদি কেউ তোমার থাকে, তুমি তাকে ভুলবে, কিন্তু সে তোমাকে না পারবে ভুলতে, না শুকোবে কখনো তার চোখের জলের ধারা।

স্বীকার করিলাম যে, তাহার বক্ষব্যের প্রথম অংশটা বুঝি নাই, কিন্তু শেষের দিকটার প্রতিবাদে কহিলাম, তুমি কি আমাকে এই কথাই বলতে চাও কমললতা যে, আমাকে ভালোবাসার নামই হ'লো দুঃখ পাওয়া ?

দুঃখ ত বলিনি গোঁসাই, বলছি চোখের জলের কথা।

কিন্তু ও দুই-ই এক কমললতা, শুধু কথার ঘোরফের।

বৈষণবী কহিল, না গোঁসাই, ও দুটো এক নয়। না কথার ঘোরফের, না ভাবের। মেয়েরা ওর এটাও ভয় করে না, ওটাও এড়াতে চায় না। কিন্তু তুমি বুঝবে কি করে?

কিছুই যদি না বুঝি আমাকে বলাই বা কেন?

না বলেও যে থাকতে পারিনে গো। প্রেমের বাস্তবতা নিয়ে তোমরা পুরুষের দল যখন বড়াই করতে থাকো তখন ভাবি আমাদের জাত যে আলাদা। তোমাদের ও আমাদের ভালোবাসার প্রকৃতিই যে বিভিন্ন। তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা; তোমরা চাও উঞ্জাস, আমরা চাই শান্তি। জানো গোঁসাই, ভালোবাসার নেশাকে আমরা অন্তরে ভয় করি, ওর মন্ততায় আমাদের বুকের কাঁপন থামে না!

কি-একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করিল না; ভাবের আবেগে বলিতে লাগিল, আমাদের সত্যও নয়, আমাদের আপনও নয়। ওর

ছুটোছুটির চঞ্চলতা যেদিন থামে সেইদিনেই কেবল আমরা নিশ্চাস ফেলে বাঁচি।  
ওগো নতুনগোঁসাই, নির্ভর হতে পারার চেয়ে ভালোবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের  
আর নেই, কিন্তু এ জিনিসটাই যে তোমার কাছে কেউ কখনো পাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, পাবে না, নিশ্চয় জানো?

বৈষ্ণবী বলিল, নিশ্চয় জানি। তাই তোমার বড়াই আমার সয় না।

আশ্চর্য হইলাম। বলিলাম, বড়াই ত তোমার কাছে কখনো করিনি  
কমললতা?

সে কহিল, জেনে করোনি, কিন্তু তোমার এ উদাসীন বৈরাগী মন—ওর  
চেয়ে বড় অহংকারী জগতে আর কিছু আছে না কি!

কিন্তু এই দুটো দিনের মধ্যে আমাকে এত তুমি জানলে কি করে?

জানলুম তোমাকে ভালবেসেছি বলে।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, তোমার দুঃখ আর চোখের জলের প্রভেদটা  
এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি কমললতা। অবিশ্রাম ভাবের পূজো আর রসের  
আরাধনার বোধ করি এমনি পরিণামই ঘটে।

প্রশ্ন করিলাম, ভালোবেসেছো এ কি সত্যি কমললতা?

হাঁ সত্যি।

কিন্তু তোমার জপ-তপ, তোমার কীর্তন, তোমার রাত্রিদিনের ঠাকুরসেবা  
এ-সবের কি হবে বল ত?

বৈষ্ণবী কহিল, এরা আমার আরও সত্যি, আরও সার্থক হয়ে উঠবে। চল  
না গোঁসাই, সব ফেলে দু'জনে পথে পথে বেরিয়ে পଡ়ি?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সে হয় না কমললতা, কাল আমি চলে যাচ্ছি।  
কিন্তু যাবার আগে গহরের কথাটা একটু জেনে যেতে ইচ্ছে করে।

বৈষ্ণবী নিশ্চাস ফেলিয়া শুধু বলিল, গহরের কথা? না, সে শুনে তোমার  
কাজ নেই। কিন্তু সত্যি কি কাল যাবে?

হাঁ, সত্যিই কাল যাব।

বৈষ্ণবী মুহূর্তকাল স্তন্ধ থাকিয়া বলিল, কিন্ত এ আশ্রমে আবার তুমি  
আসবে, তখন কিন্ত কমললতাকে আর খুঁজে পাবে না গোঁসাই।

## আট

এখানে আর একদণ্ডও থাকা উচিত নয় এবিষয়ে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তখনি কে যেন আড়ালে দাঁড়াইয়া চোখ টিপিয়া ইশারায় নিষেধ করে, বলে, যাবে কেন? ছ-সাতদিন থাকবে বলেই ত এসেছিলে—থাক না। কষ্ট ত কিছু নেই।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিলাম, কে ইহারা একই দেহের মধ্যে বাস করিয়া একই সময়ে ঠিক উল্টা মতলব দেয়? কাহার কথা বেশি সত্য? কে বেশি আপনার? বিবেক, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি—এমনি কত নাম, কত দার্শনিক ব্যাখ্যাই না ইহার আছে, কিন্তু নিঃসংশয় সত্যকে আজও কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল? যাহাকে ভাল বলিয়া মনে করি, ইচ্ছা আসিয়া সেখানে পা বাঢ়াইতে বাধা দেয় কেন? নিজের মধ্যে এই বিরোধ, এই দ্঵ন্দ্বের শেষ হয় না কেন? মন বলিতেছে আমার চলিয়া যাওয়াই শ্ৰেয়, চলিয়া যাওয়াই কল্যাণের, তবে পরক্ষণেই সেই মনের দু'চোখ ভরিয়া জল দেখা দেয় কিসের জন্য? বুদ্ধি, বিবেক, প্রবৃত্তি, মন—এইসব কথার সৃষ্টি করিয়া কোথায় সত্যকার সাঙ্গনা?

তথাপি যাইতেই হইবে, পিছাইলে চলিবে না। এবং কালই। এই যাওয়াটা যে কি করিয়া সম্পন্ন করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। ছেলেবেলার একটা পথ জানি, সে অন্তর্হিত হওয়া। বিদায়বাণী নয়, ফিরিয়া আসিবার স্তোকবাক্য নয়, কারণ প্রদর্শন নয়, প্রয়োজনের, কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ নয়,—শুধু, আমি যে ছিলাম এবং আমি যে নাই, এই সত্য ঘটনাটা আবিষ্কারের ভার যাহাদের রহিল তাহাদের 'পরে নিঃশব্দে অর্পণ করা।

স্থির করিলাম, ঘুমানো হইবে না, ঠাকুরের মঙ্গল-আরতি শুরু হইবার পূর্বেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রস্থান করিব। একটা মুশকিল, পুঁতুর পণের টাকাটা ছোট ব্যাগসমেত কমললতার কাছে আছে, কিন্তু সে থাক। হয় কলিকাতা,

নয় বর্মা হইতে চিঠি লিখিব, তাহাতে আরও একটা কাজ এই হইবে যে, আমাকে প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত কমলগতাকে বাধ্য হইয়া এখানেই থাকিতে হইবে, পথে-বিপথে বাহির হইবার সুযোগ পাইবে না। এদিকে যে কয়টা টাকা জামার পকেটে পড়িয়া আছে, কলিকাতায় পৌঁছিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত এমনি করিয়াই কাটিল এবং ঘুমাইব না বলিয়া বার বার সঙ্গে করিলাম বলিয়াই বোধ করি কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কিন্তু হঠাত মনে হইল বুঝি স্বপ্নে গান শুনিতেছি। একবার ভাবিলাম রাত্রির ব্যাপার হয়ত এখনো সমাপ্ত হয় নাই; আবার মনে হইল প্রত্যয়ের মঙ্গল-আরতি বুঝি শুরু হইয়াছে, কিন্তু কাঁসরঘণ্টার সুপরিচিত দুঃসহ নিনাদ নাই। অসম্পূর্ণ অপরিতৃপ্ত নিন্দা ভাঙিয়াও ভাঙ্গে না, চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারি না, কিন্তু কানে গেল ভোরের সুরে মধুকঠের আদরের অনুচ্ছ আহ্বান—‘রাই জাগো, রাই জাগো, শূক-শারী বলে, কত নিন্দা যাও লো কালো-মানিকেরে কোলে’। গোঁসাইজী! আর কত ঘুমোবে গো—ওঠ!

বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মশারি তোলা, পুবের জানালা খোলা—সম্মুখের আভ্রশাখায় পুষ্পিত লবঙ্গ-মঞ্জুরীর কয়েকটা সুনীর্ঘ স্তবক নীচে পর্যন্ত ঝুলিয়া আছে, তাহারি ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল আকাশের কতকটা জায়গায় ফিকে রাঙ্গার আভাস দিয়াছে,—অন্ধকার রাতে সুদূর গ্রামান্তে আগুন লাগার মত—মনের কোথায় যেন একটুখানি ব্যথিত হইয়া উঠে। গোটাকয়েক বাদুড় বোধ করি উড়িয়া বাসায় ফিরিতেছিল, তাহাদের পক্ষ তাড়নার অস্ফুট শব্দ পরে পরে কানে আসিয়া পৌঁছিল; বুঝা গেল আর যাই হোক রাত্রিটা শেষ হইতেছে। এটা দোয়েল, বুলবুল ও শ্যামাপাখির দেশ। হয়ত বা উহাদের রাজধানী,—কলিকাতা শহর। আর ত্রিবিরাট বকুলগাছটা তাহাদের লেনদেন কাজকারবারের বড়বাজার—দিনের বেলায় ভিড় দেখিলে অবাক হইতে হয়। নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা রঙ-বেরঙের পোশাক-পরিচ্ছদের অতি বিচিত্র সমাবেশ। আর রাত্রে আখড়ার চতুর্দিকের

বনজঙ্গলে ডালে ডালে তাহাদের অণুগতি আড়ডা! ঘুম-ভাঙার সাড়াশব্দ কিছু কিছু  
পাওয়া গেল—ভাবে বোধ হইল চোখেমুখে জল দিয়া তৈরি হইয়া লইতেছে,  
এইবার সমস্ত দিবসব্যাপী নাচগানের মোচ্ছব শুরু হইবে! সবাই এরা লক্ষ্মৌয়ের  
ওষ্টাদ,—ক্লান্তও হয় না, কসরত থামায় না। ভিতরে বৈষ্ণবদলের কীর্তনের পালা  
যদিবা কদাচিং বন্ধ হয়, বাহিরে সে বালাই নাই। এখানে ছোটবড়, ভালোমন্দর  
বাছবিচার চলে না, ইচ্ছা এবং সময় থাক না-থাক গান তোমাকে শুনিতেই হইবে।  
এদেশের বোধ করি এইরূপই ব্যবস্থা। মনে পড়িল কাল সমস্ত দুপুর পিছনের  
বাঁশবনে গোটা-দুই হর-গৌরী পাখির চড়াগলার পিয়া-পিয়া-পিয়া ডাকের অবিশ্রান্ত  
প্রতিযোগিতায় আমার দিবানিদ্রার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ আমারি  
ন্যায় বিক্ষুল্ক কোন একটা ডাহুক নদীর কল্মীদলের উপরে বসিয়া ততোধিক  
কঠিনকঠে ইহাদের বার বার তিরক্ষার করিয়াও স্তুত করিতে পারে নাই। ভাগ্য  
ভাল যে এদেশে ময়ুর মিলে না, নহিলে উৎসবের গানের আসরে তাহারা আসিয়া  
যোগ দিলে আর মানুষ টিকিতে পারিত না। সে যাই হোক, দিনের উৎপাত  
এখনো আরম্ভ হয় নাই, হয়ত আর একটু নির্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিতাম, কিন্তু স্মরণ  
হইল গতরাত্রির সকলের কথা। কিন্তু গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িবারও জো নাই—  
প্রহরীর সতর্কতায় মতলব ফাঁসিয়া গেল। রাগ করিয়া বলিলাম, আমি রাইও নই,  
আমার বিছানায় শ্যামও নেই—দুপুর রাতে ঘুম ভাঙানোর কি দরকার ছিল বল  
ত?

বৈষ্ণবী কহিল, রাত কোথায় গোঁসাই, তোমার যে আজ ভোরের গাড়িতে  
কলকাতা যাবার কথা। মুখহাত ধুয়ে এসো, আমি চা তৈরি করে আনি গে। কিন্তু  
মান ক'রো না যেন। অভ্যাস নেই, অসুখ করতে পারে।

বলিলাম, তা পারে। সকালের গাড়িতে যখন হোক আমি যাবো, কিন্তু  
তোমার এত উৎসাহ কেন বলো ত?

সে কহিল, আর কেউ ওঠার আগে আমি যে তোমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত  
পৌঁছে দিয়ে আসতে চাই গোঁসাই!

স্পষ্ট করিয়া তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু ছড়ানো চুলের পানে চাহিয়া  
ঘরের এই অত্যন্ত আলোকেও বুঝা গেল সেগুলি ভিজা—ন্নান সারিয়া বৈষণবী  
প্রস্তুত হইয়া লইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আশ্রমেই আবার ফিরে আসবে  
ত?

বৈষণবী বলিল, হাঁ।

সেই ছোট টাকার থলিটি সে বিছানায় রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার  
ব্যাগ। এটা পথে সাবধানে রেখো, টাকাগুলো একবার দেখে নাও।

হঠাৎ মুখে কথা যোগাইল না, তার পরে বলিলাম, কমললতা, তোমার  
মিছে এ পথে আসা। একদিন নাম ছিল তোমার উষা, আজো সেই উষাই আছ—  
একটুও বদলাতে পারনি।

কেন বল ত?

তুমি বল ত কেন বললে আমাকে টাকা গুণে নিতে? গুণে নিতে পারি  
বলে কি সত্যই মনে করো? যারা ভাবে একরকম, বলে অন্য রকম তাদের বলে  
ভঙ্গ। যাবার আগে বড়গোঁসাইজীকে আমি নালিশ জানিয়ে যাব আখড়ার খাতা  
থেকে তোমার নামটা যেন তিনি কেটে দেন। তুমি বোষ্টমদলের কলঙ্ক।

সে চুপ করিয়া রহিল।

আমিও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলাম, আজ সকালে আমার যাবার  
ইচ্ছে নেই।

নেই? তা হলে আর একটু ঘুমোও। উঠলে আমাকে খবর দিও—কেমন?  
কিন্তু এখন তুমি করবে কি?

আমার কাজ আছে। ফুল তুলতে যাব।

এই অন্ধকারে? ভয় করবে না?

না, ভয় কিসের? ভোরের পুজোর ফুল আমিই তুলে আনি। নইলে ওদের  
বড় কষ্ট হয়।

ওদের মানে অন্যান্য বৈষ্ণবীদের। এই দুটা দিন এখানে থাকিয়া লক্ষ্য  
করিতেছিলাম যে, সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা  
একাকী বহন করে। তাহার কর্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায়, সকলের ‘পরেই। কিন্তু মেঘে,  
সৌজন্যে ও সর্বোপরি সবিনয় কর্মকুশলতার এই কর্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায়  
প্রবহমান যে, কোথাও ঈর্ষা-বিদ্বেষের এতটুকু আবর্জনাও জমিতে পায় না। এই  
আশ্রমলক্ষ্মীটি আজ উৎকর্থ-ব্যাকুলতায় যাই যাই করিতেছে। এ যে কত বড়  
দুর্ঘটনা, কত বড় নিরূপায় দুগতিতে এতগুলি নিশ্চিত নরনারী স্থলিত হইয়া  
পড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া আমারও ক্লেশবোধ হইল। এই মঠে  
মাত্র দু'টি দিন আছি, কিন্তু কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি—ইহার  
আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা না করিয়াই যেন পারি না এমনি মনোভাব। ভাবিলাম,  
লোকে মিছাই বলে সকলে মিলিয়া আশ্রম—এখানে সবাই সমান। কিন্তু একের  
অভাবে যে কেন্দ্রবৃষ্টি উপগ্রহের মত সমস্ত আয়তনই দিঘিদিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত  
হইয়া পড়িতে পারে তাহা চোখের উপরেই যেন দেখিতে লাগিলাম। বলিলাম,  
আর শোব না কমললতা, চল তোমার সঙ্গে গিয়ে ফুল তুলে আনি গে।

বৈষ্ণবী কহিল, তুমি স্নান করোনি, কাপড় ছাড়োনি, তোমার ছোঁয়া ফুলে  
পুজো হবে কেন?

বলিলাম, ফুল তুলতে না দাও, ডাল নুইয়ে ধরতে দেবে ত? তাতেও  
তোমার সাহায্য হবে।

বৈষ্ণবী বলিল, ডাল নোয়াবার দরকার হয় না, ছোট ছোট গাছ, আমি  
নিজেই পারি।

বলিলাম, অন্ততঃ সঙ্গে থেকে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করতেও পারব ত?  
তাতেও তোমার শ্রম লঘু হবে।

এবার বৈষ্ণবী হাসিল, কহিল, হঠাৎ বড় দরদ যে গোঁসাই,—আচ্ছা চলো।  
আমি সাজিটা আনি গে, তুমি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও।

আশ্রমের বাহিরে অল্প একটু দূরে ফুলের বাগান। ঘনছায়াচ্ছন্ন আমবনের  
ভিতর দিয়া পথ। শুধু অন্ধকারের জন্য নয়, রাশিকৃত শুকনা পাতায় পথের রেখা  
বিলুপ্ত। বৈষ্ণবী আগে, আমি পিছনে, তবু ভয় করিতে লাগিল পাছে সাপের ঘাড়ে  
পা দিই! বলিলাম, কমললতা, পথ ভুলবে না ত?

বৈষ্ণবী বলিল, না। অন্ততঃ তোমার জন্যেও আজ পথ চিনে আমাকে  
চলতে হবে!

কমললতা, একটা অনুরোধ রাখবে?

কি অনুরোধ?

এখান থেকে তুমি আর কোথাও চলে যেয়ো না।

গেলে তোমার লোকসান কি?

জবাব দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী বলিল, মুরারিঠাকুরের একটি গান আছে,—“সখি হে ফিরিয়া  
আপন ঘরে যাও, জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর  
বুঝাও”। গোঁসাই, বিকালে তুমি কলকাতায় চলে যাবে, আজ একটা বেলার বেশি  
বোধ করি এখানে আর থাকতে পারবে না,—না?

বলিলাম, কি জানি আগে সকালবেলাটা ত কাটুক।

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, একটু পরে গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল,—

“কহে চণ্ণীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই—

সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।”

থামিলে বলিলাম, তারপরে?

তারপরে আর জানিনে ।

বলিলাম, তবে আর একটা কিছু গাও—

বৈষ্ণবী তেমনি মৃদুকণ্ঠে গাহিল,—

“চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা, পীরিতি লাগিয়া  
পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা ।”

এবারেও থামিলে বলিলাম, তারপরে?

বৈষ্ণবী কহিল, তারপরে আর নেই, এখানেই শেষ ।

শেষই বটে! দু'জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। ভারী ইচ্ছা করিতে লাগিল  
দ্রুতপদে পাশে গিয়া কিছু একটা বলিয়া এই অঙ্ককার পথটা তাহার হাত ধরিয়া  
চলি। জানি সে রাগ করিবে না, বাধা দিবে না, কিন্তু কিছুতেই পাও চলিল না,  
মুখেও একটা কথা আসিল না, যেমন চলিতেছিলাম তেমনি ধীরে ধীরে নীরবে  
বনের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পথের ধারে বেড়া দিয়া ঘেরা আশ্রমের ফুলের বাগান, ঠাকুরের  
নিত্যপূজার যোগান দেয়। খোলা জায়গায় অঙ্ককার আর নাই, কিন্তু ফর্সাও তেমন  
হয় নাই। তথাপি দেখা গেল অজস্র ফুট্ট মল্লিকায় সমস্ত বাগানটা যেন সাদা  
হইয়া আছে। সামনের পাতাখরা ন্যাড়া চাঁপাগাছটায় ফুল নাই, কিন্তু কাছাকাছি  
কোথাও বোধ করি অসময়ে প্রস্ফুটিত গোটাকয়েক রজনীগন্ধার মধুর গন্ধে সে  
ক্রটি পূর্ণ হইয়াছে। আর সবচেয়ে মানাইয়াছে মাঝখানটায়। নিশান্তের এই ঝাপসা  
আলোতেও চেনা যায় শাখায়-পাতায় জড়াজড়ি করিয়া গোটা পাঁচ-ছয় স্তুলপদ্মের  
গাছ—ফুলের সংখ্যা নাই—বিকশিত সহস্র আরক্ত আঁখি মেলিয়া বাগানের সকল  
দিকে তাহারা চাহিয়া আছে।

কখনো এত প্রত্যমে শয়া ছাড়িয়া উঠি না, এমন সময়টা চিরদিন  
নিদ্রাচ্ছন্ন জড়তায় অচেতনে কাটিয়া যায়—আজ কি যে ভালো লাগিল তাহা বলিতে  
পারি না। পূর্বে রক্ষিম দিগন্তে জ্যোতির্ময়ের আভাস পাইতেছি, নিঃশব্দ মহিমায়

সকল আকাশ শান্ত হইয়া আছে, আর এ লতায়-পাতায় শোভায়-সৌরভে ফুলে-ফুলে পরিব্যাপ্ত সমুখের উপরন—সমস্ত মিলিয়া এ যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অশ্রুদ্বন্দ্ব ভাষা।

করুণায়, মমতায় ও অ্যাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কমললতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পেয়েছ, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও।

বৈষ্ণবী সাজিটা চাঁপাডালে ঝুলাইয়া আগলের বাঁধন খুলিতেছিল, আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল—হঠাৎ তোমার হ'লো কি গোঁসাই?

নিজের কথাটা নিজের কানেও কেমন খাপছাড়া ঠেকিয়াছিল, তাহার সবিস্ময়-প্রশ্নে মনে মনে ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। মুখে উত্তর যোগাইল না, লজ্জিতের আবরণ একটা অর্থহীন হাসির চেষ্টাও ঠিক সফল হইল না, শেষে চুপ করিয়া রাখিলাম।

বৈষ্ণবী ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমিও গেলাম। ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই কহিল, আমি সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করে দিয়েচি কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

সন্দেহ হইল কথার অর্থটা বেশ পরিষ্কার নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট করিতে বলারও ভরসা হইল না। সে মৃদুগুঞ্জনে গাহিতে লাগিল—“কালা মানিকের মালা গাঁথি নিব গলে, কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে। কানু অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া, দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া। যদুনাথ দাস কহে—”

থামাইতে হইল। বলিলাম, যদুনাথ দাস থাক, ওদিকে কাঁসরের বাদ্য শুনতে পাচ্ছো কি? ফিরবে না?

সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে পুনরায় আরম্ভ করিল, “ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই, মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই—“ আচ্ছা নতুনগোঁসাই,

জানো মেয়েদের মুখের গান অনেক ভালো লোকে শুনতে চায় না, তাদের ভারি  
খারাপ লাগে?

বলিলাম, জানি। কিন্তু আমি অতটা ভালো বর্বর নই।

তবে বাধা দিয়ে আমাকে থামালে কেন?

ওদিকে হয়ত আরতি শুরু হয়েছে—তুমি না থাকলে যে তার অঙ্গহানি  
হবে।

এটি মিথ্যে ছলনা গোঁসাই।

ছলনা হবে কেন?

কেন তা তুমই জানো। কিন্তু এ কথা তোমাকে বললে কে? আমার  
অভাবে ঠাকুরের সেবায় সত্যিই অঙ্গহানি হতে পারে এ কি তুমি বিশ্বাস করো?

করি। আমাকে কেউ বলেনি কমললতা—আমি নিজের চোখে দেখেচি।

সে আর কিছু বলিল না, কি একরকম অন্যমনক্ষের মত ক্ষণকাল আমার  
মুখের পানে চাহিয়া রাহিল, তারপরে ফুল তুলিতে লাগিল। ডালা ভরিয়া উঠিলে  
কহিল, হয়েছে—আর না।

স্তলপদ্ম তুললে না?

না, ও আমরা তুলিনে, ঐখান থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। চল  
এবার যাই।

আলো ফুটিয়াছে, কিন্তু গ্রামের একান্তে এই মঠ—এদিকে বড় কেহ আসে  
না। তখনো পথ ছিল জনহীন, এখনো তেমনি। চলিতে চলিতে একসময়ে আবার  
সেই প্রশংসন করিলাম, তুমি কি এখান থেকে সত্যিই চলে যাবে?

বার বার এ কথা জেনে তোমার কি হবে গোঁসাই?

এবারেও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা  
করিলাম, সত্যই কেন বার বার এ কথা জানতে চাই,—জানিয়া আমার লাভ কি!

মঠে ফিরিয়া দেখা গেল ইতিমধ্যে সবাই জাগিয়া উঠিয়া প্রাত্যহিক কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। তখন কাঁসরের শব্দে ব্যস্ত হইয়া বৈষণবীকে বৃথা তাড়া দিয়াছিলাম। অবগত হইলাম তাহা মঙ্গল-আরতির নয়, সে শুধু ঠাকুরদের ঘুম-ভাঙানোর বাদ্য। এ তাঁদেরই সয়।

দু'জনকে অনেকেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহারও চাহনিতে কৌতুহল নাই। শুধু পদ্মার বয়স অত্যন্ত কম বলিয়া সেই কেবল একটুখানি হাসিয়া মুখ নিচু করিল। ঠাকুরদের সে মালা গাঁথে। ডালাটা তাহারি কাছে রাখিয়া দিয়া কমলতা সন্নেহ কৌতুকে তর্জন করিয়া বলিল, হাসলি যে পোড়ামুখি?

সে কিন্তু আর মুখ তুলিল না। কমলতা ঠাকুরঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, আমিও আমার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

স্নানাহার যথারীতি এবং যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। বিকালের গাড়িতে আমার যাবার কথা। বৈষণবীর সন্ধান করিতে গিয়া দেখি সে ঠাকুরঘরে, ঠাকুর সাজাইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র কহিল, নতুনগোঁসাই, যদি এলে আমাকে একটু সাহায্য করো না ভাই। পদ্মা মাথা-ধরে শুয়ে আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'বোনেই হঠাতে জ্বরে পড়েচে—কি যে হবে জানিনে এই বাসন্তী-রঙের কাপড় দু'খানি কুঁচিয়ে দাও না গোঁসাই!

বৈষণবী কহিল, তিনি ত এখানে নেই, পরশু নবদ্বীপে গেছেন তাঁর গুরুদেবকে দেখতে।

কবে ফিরবেন?

সে ত জানিনে গোঁসাই!

এতদিন মঠে থাকিয়াও বৈরাগী দ্বারিকাদাসের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় নাই—কতকটা আমার নিজের দোষে, কতকটা তাঁহার নির্লিপ্ত স্বভাবের জন্য। বৈষণবীর মুখে শুনিয়া ও নিজের চোখে দেখিয়া জানিয়াছি এ লোকটির মধ্যে কপটতা নাই, অনাচার নাই, আর নাই মাস্টারি করিবার ঝোঁক। বৈষণব ধর্মগ্রন্থ লইয়া অধিকাংশ

সময় তাঁহার নিজের ঘরের মধ্যে কাটে। ইঁহার ধর্মতে আমার আস্থাও নাই, বিশ্বাসও নাই, কিন্তু এই মানুষটির কথাগুলি এমন নম্র, চাহিবার ভঙ্গি এমন স্বচ্ছ ও গভীর, বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় অহর্নিশ এমন ভরপুর হইয়া আছেন যে, তাঁহার মত ও পথ লইয়া বিরংব আলোচনা করিতে শুধু সঙ্কেচ নয়, দুঃখবোধ হয়। আপনি বুঝা যায় এখানে তর্ক করিতে যাওয়া একেবারে নিষ্পত্তি। একদিন সামান্য একটুখানি যুক্তির অবতারণা করায় তিনি হাসিমুখে এমন নীরবে চাহিয়া রহিলেন যে, কুণ্ঠায় আমার মুখেও আর কথা রহিল না। তারপর হইতে তাঁহাকে সাধ্যমত এড়াইয়া চলিয়াছি, তবে একটা কৌতুহল ছিল। এতগুলি নারী-পরিবৃত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন রসের অনুশীলনে নিমগ্ন রহিয়াও চিত্তের শান্তি ও দেহের নির্মলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলার রহস্য, ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কিন্তু সে সুযোগ এ যাত্রায় বোধ করি আর মিলিল না। মনে মনে বলিলাম, আবার যদি কখনো আসা হয় ত তখন দেখা যাইবে।

বৈষ্ণবের মঠেও বিগ্রহমূর্তি সচরাচর ব্রাক্ষণ ব্যতীত অন্যে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু এ আশ্রমে সে বিধি ছিল না। ঠাকুরের বৈষ্ণব পূজারী একজন বাহিরে থাকে, সে আসিয়া যথারীতি আজও পূজা করিয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরের সেবার ভার আজ অনেকখানি আসিয়া পড়িল আমার ‘পরে। বৈষ্ণবী দেখাইয়া দেয়, আমি করি সব, কিন্তু রহিয়া রহিয়া সমস্ত অন্তর তিক্ত হইয়া উঠে। এ কি পাগলামি আমাকে পাইয়া বসিতেছে! তথাপি আজও যাওয়া বন্ধ রহিল। আপনাকে বোধ হয়, এই বলিয়া বুঝাইলাম যে, এতদিন এখানে আছি, এ বিপদে ইহাদের ফেলিয়া যাইব কিরূপে? সংসারে কৃতজ্ঞতা বলিয়াও ত একটা কথা আছে!

আরও দুইদিন কাটিল। কিন্তু আর না। কমললতা সুস্থ হইয়াছে, পদ্মা ও লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোনেই সারিয়া উঠিয়াছে। দ্বারিকাদাস গত সন্ধ্যায় ফিরিয়াছেন, তাঁহার কাছে বিদায় লইতে গেলাম।

গোঁসাইজী কহিলেন, আজ যাবে গোঁসাই? আবার কবে আসবে?

সে ত জানিনে গোঁসাই।

কমললতা কিন্তু কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাবে।

আমাদের কথাটা এর কানেও গেছে জানিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত  
হইলাম, কহিলাম, সে কাঁদতে যাবে কিসের জন্যে?

গোঁসাইজী একটু হাসিয়া কহিলেন, তুমি জানো না বুঝি?

না।

ওর স্বভাবই এমনি। কেউ চলে গেলে ও যেন শোকে সারা হয়ে যায়।

কথাটা আরও খারাপ লাগিল, বলিলাম, যার স্বভাব শোক করা সে  
করবেই, আমি তাকে থামাব কি দিয়ে? কিন্তু বলিয়াই তাঁহার চোখের পানে চাহিয়া  
ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম আমার পিছনে দাঁড়াইয়া কমললতা।

ঘারিকাদাস কৃষ্ণতস্বরে বলিলেন, ওর ওপর রাগ ক'রো না গোঁসাই,  
শুনেচি ওরা তোমার যত্ন করতে পারেনি, অসুখে পড়ে তোমাকে অনেক  
খাটিয়েছে, অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার কাছে কাল ও নিজেই বড় দুঃখ করছিল।  
আর বোষ্টম-বৈরাগীদের আদর-যত্ন করবার কিই বা আছে! কিন্তু আবার যদি  
কখনো তোমার এদিকে আসা হয় ভিথরিদের দেখা দিয়ে যেয়ো। দেবে ত  
গোঁসাই?

ঘাড় নাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম, কমললতা সেখানেই তেমনি  
দাঁড়াইয়া রাহিল। কিন্তু অকস্মাত এ কি হইয়া গেল! বিদায়-গ্রহণের প্রাক্কালে কত  
কি বলার, কত কি শোনার কল্পনা ছিল, সমস্ত নষ্ট করিয়া দিলাম। চিন্তের  
দুর্বলতার ফ্লানি অন্তরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল তাহা অনুভব করিতেছিলাম,  
কিন্তু উত্যক্ত অসহিষ্ণু মন এমন অশোভন ঝাড়তায় যে নিজের মর্যাদা খর্ব করিয়া  
বসিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

ନବୀନ ଆସିଯା ଉପାସ୍ତିତ ହଇଲ । ସେ ଗହରେ ଖୋଜେ ଆସିଯାଛେ । କାଳ ହିତେ ଏଥନେ ସେ ଘୃତେ ଫିରେ ନାହିଁ । ଆଶର୍ଯ୍ୟ ହଇଯା ଗେଲାମ,—ସେ କି ନବୀନ, ସେ ତ ଏଥାନେଓ ଆର ଆସେ ନା!

ନବୀନ ବିଶେଷ ବିଚଲିତ ହଇଲ ନା, ବଲିଲ, ତବେ ବୋଧ ହ୍ୟ କୋନ୍ ବନେବାଦାଡ଼େ ଘୁରଚେ—ନାଓୟା-ଖାଓୟା ବନ୍ଧ କରେଛେ—ଏହିବାର କଥନ ସାପେ କାମଡ଼ାନୋର ଖବରଟା ପେଲେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ଦି ହୁଓୟା ଯାଯ ।

ତାର ସନ୍ଧାନ କରା ତ ଦରକାର ନବୀନ?

ଦରକାର ତ ଜାନି, କିନ୍ତୁ ଖୁଁଜିବ କୋଥାଯ? ବନେଜଙ୍ଗଲେ ଘୁରେ ଘୁରେ ନିଜେର ପ୍ରାଣଟା ତ ଆର ଦିତେ ପାରିନେ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ତିନି କୋଥାଯ? ଏକବାର ଜିଜ୍ଞେସା କରେ ଯେତେ ଚାଇ ଯେ?

ତିନିଟା କେ?

ଏ ଯେ କମଲିଲତା ।

କିନ୍ତୁ ସେ ଜାନବେ କି କରେ ନବୀନ?

ସେ ଜାନେ ନା? ସବ ଜାନେ ।

ଆର ବିତର୍କ ନା କରିଯା ଉତ୍ତେଜିତ ନବୀନକେ ମଠେର ବାହିରେ ଲଇଯା ଆସିଲାମ, ବଲିଲାମ, ସତିଇ କମଲିଲତା କିଛୁଇ ଜାନେ ନା ନବୀନ । ନିଜେ ଅସୁଖେ ପଡ଼େ ତିନ-ଚାର ଦିନ ସେ ଆଖଡ଼ାର ବାଇରେଓ ଯାଇନି ।

ନବୀନ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲ ନା । ରାଗ କରିଯା ବଲିଲ, ଜାନେ ନା? ଓ ସବ ଜାନେ । ବୋଷ୍ଟମୀ କି ମନ୍ତ୍ର ଜାନେ—ଓ ପାରେ ନା କି? କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିତେ ଏକବାର ନବ୍ନେର ପାଞ୍ଚାୟ, ଓର ଚୋଖମୁଖ ଘୁରିଯେ କେଉଁନ କରା ବାର କରେ ଦିତୁମ । ବାପେର ଅତଗୁଲୋ ଟାକା ଛୋଟ୍ଟା ଯେନ ଭେଲକିତେ ଉଡ଼ିଯେ ଦିଲେ!

ତାହାକେ ଶାନ୍ତ କରାର ଜନ୍ୟ କହିଲାମ, କମଲିଲତା ଟାକା ନିଯେ କି କରବେ ନବୀନ? ବୋଷ୍ଟମ ମାନୁଷ, ମଠେ ଥାକେ, ଗାନ ଗେଯେ ଦୁଟୋ ଭିକ୍ଷେ କରେ ଠାକୁର-ଦେବତାର

সেবা করে, দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া বৈ ত নয়—ওকে টাকার কাঙাল বলে ত আমার বোধ হয় না নবীন!

নবীন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, ওর নিজের জন্যে নয় তা আমরাও জানি। দেখলে যেন ভদ্রঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। তেমনি চেহারা, তেমনি কথাবার্তা। বড়বাবাজীটাও লোভী নয়, কিন্তু একপাল পুষ্যি রয়েছে যে। ঠাকুরসেবার নাম করে তাদের যে লুচি-মণ্ডা ঘি-দুধ নিত্য চাই। নয়ন চক্ষেত্রে মুখে কানাঘুমোয় শুনচি আখড়ার নামে বিশ বিঘে জমি নাকি খরিদ হয়ে গেছে। কিছুই থাকবে না বাবু, যা আছে সব বৈরাগীদের পেটে গিয়েই একদিন ঢুকবে।

বলিলাম, হয়ত গুজব সত্য নয়। কিন্তু সে-পক্ষে তোমাদের নয়ন চক্ষেত্রিও ত কম নয় নবীন।

নবীন সহজেই স্বীকার করিয়া কহিল, সে ঠিক। বিট্লে বামুন মস্ত ধড়িবাজ। কিন্তু বিশ্বেস না করি কি করে বলুন। সেদিন খামকা আমার ছেলেদের নামে দশ বিঘে জমি দানপত্র করে দিলে। অনেক মানা করলুম, শুনলে না। বাপ বহুৎ রেখে গেছে মানি, কিন্তু বিলোলে ক'দিন বাবু? একদিন বললে কি জানেন? বললে, আমরা ফকিরের বংশ, ফকিরি আমার ত কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না? শুনুন কথা!

নবীন চলিয়া গেল। একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, আমি কিসের জন্য যে এতদিন মঠে পড়িয়া আছি এ কথা সে জিজ্ঞাসাও করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেই যে কি বলিতাম জানি না, কিন্তু মনে মনে লজ্জা পাইতাম। তাহার কাছেই আরও একটা খবর পাইলাম, কাল কালিদাসবাবুর ছেলের ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সাতাশে তারিখটা আমার খেয়াল ছিল না।

নবীনের কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করিতে অকস্মাত বিদ্যুদ্বেগে একটা সন্দেহ জাগিল—বৈষণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়! সেই ভুরুওয়ালা কদাকার লোকটার কঠিবদল-করা স্বামিত্বের হাঙ্গামার ভয়ে কদাচ নয়—এ গহর।

এখানে আমার থাকার সম্বন্ধে তাই বোধ করি বৈষণবী সেদিন কৌতুকে বলিয়াছিল, আমি ধরে রাখলে সে রাগ করবে না গোঁসাই। রাগ করবার লোক সে নয়, কিন্তু কেন সে আর আসে না? হয়ত বা নিজের মনে মনে কি কথা সে ভাবিয়া লইয়াছে। সংসারে গহরের আসক্তি নাই, আপন বলিতেও কেহ নাই। টাকাকড়ি বিষয়-আশয় সে যেন বিলাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচে। ভালো যদি সে বাসিয়াও থাকে মুখ ফুটিয়া কোনদিন হয়ত সে বলিবেও না কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে। বৈষণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চিরনিরুদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিন্তাহ হইতে এই শান্ত আত্মভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমললতা পলাইতে চায়।

নবীন চলিয়া গেছে, বকুলতলার সেই ভাঙা বেদীটার উপরে একলা বসিয়া ভাবিতেছি। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, পাঁচটার গাড়ি ধরিতে গেলে দেরি করা আর চলে না। কিন্তু প্রতিদিন না যাওয়াটাই এমনি অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল যে, ব্যস্ত হইয়া উঠিব কি, আজও মন পিছু হটিতে লাগিল।

যেখানেই থাকি পুঁটুর বৌভাতে অন্নগ্রহণ করিয়া যাইব কথা দিয়াছিলাম। নিরন্দিষ্ট গহনের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্তব্য। এতদিন অনাবশ্যক অনুরোধ অনেক মানিয়াছি, কিন্তু আজ সত্যকার কারণ যখন বিদ্যমান তখন মানা করিবার কেহ নাই। দেখি, পদ্মা আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, তোমাকে দিদি একবার ডাকচে গোঁসাই।

আবার ফিরিয়া আসিলাম। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বৈষণবী কহিল, কলকাতার বাসায় পৌঁছতে তোমার রাত হবে নতুনগোঁসাই। ঠাকুরের প্রসাদ দুটি সাজিয়ে রেখেচি, ঘরে এসো।

প্রত্যহের মতই সয়ন্ত্র আয়োজন। বসিয়া গেলাম। এখানে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করার প্রথা নাই, আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইতে হয়। উচিষ্ট ফেলিয়া রাখা চলে না।

যাবার সময়ে বৈষ্ণবী কহিল, নতুনগোঁসাই, আবার আসবে ত?

তুমি থাকবে ত?

তুমি বলো কতদিন আমাকে থাকতে হবে?

তুমিও বলো কতদিনে আমাকে আন্তে হবে?

না, সে তোমাকে আমি বলব না।

না বলো অন্য একটা কথার জবাব দেবে, বলো?

এবার বৈষ্ণবী একটুখানি হাসিয়া কহিল, না, সেও তোমাকে আমি বলবো না। তোমার যা ইচ্ছে হয় ভাবো গে গোঁসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।

অনেকবার মুখে আসিয়া পড়িতে চাহিল—আজ আর সময় নেই  
কমললতা, কাল যাবো—কিন্তু কিছুতেই এ কথা বলা গেল না।

চললাম।

পদ্মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। কমললতার দেখাদেখি সেও হাত তুলিয়া  
নমস্কার করিল।

বৈষ্ণবী তাহাকে রাগ করিয়া বলিল, হাত তুলে নমস্কার কি রে  
পোড়ারমুখী, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম কর।

কথাটায় যেন চমক লাগিল। তাহার মুখের পানে চাহিতে গিয়া দেখিলাম  
সে তখন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়াছে। আর কোন কথা না বলিয়া তাহাদের  
আশ্রম ছাড়িয়া তখন বাহির হইয়া আসিলাম।

## ନୟ

ଆଜ ଅବେଲାଯ କଲିକାତାର ବାସାର ଉଦ୍ଦେଶେ ଯାତ୍ରା କରିଯା ବାହିର ହଇଯାଛି । ତାର ପରେ ଏର ଚେଯେଓ ଦୁଃଖମୟ ବର୍ମାୟ ନିର୍ବାସନ । ଫିରିଯା ଆସିବାର ହୟତ ଆର ସମୟଓ ହଇବେ ନା, ପ୍ରୟୋଜନଓ ଘଟିବେ ନା । ହୟତ ଏହି ଯାଓଯାଇ ଶେଷେର ଯାଓଯା । ଗଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଲାମ ଆଜ ଦଶଦିନ । ଦଶଟା ଦିନ ଜୀବନେର କତୁକୁଇ ବା । ତଥାପି ମନେର ମଧ୍ୟେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଦଶଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେ-ଆମି ଏଥାନେ ଆସିଯାଇଲାମ ଏବଂ ଯେ-ଆମି ବିଦାଯ ଲହିୟା ଆଜ ଚଲିଯାଛି, ତାହାରା ଏକ ନୟ ।

ଅନେକକେଇ ସଖେଦେ ବଲିତେ ଶୁଣିଯାଛି, ଅମୁକ ଯେ ଏମନ ହିତେ ପାରେ ତାହା କେ ଭାବିଯାଛେ! ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୁକେର ଜୀବନଟା ଯେନ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣେର ମତ ତାହାର ଅନୁମାନେର ପାଁଜିତେ ଲେଖା ନିର୍ଭଲ ହିସାବ । ଗରମିଳଟା ଶୁଦ୍ଧ ଅଭାବିତ ନୟ, ଅନ୍ୟାୟ । ଯେନ ତାହାର ବୁଦ୍ଧିର ଆଁକ-କସାର ବାହିରେ ଦୁନିଯାର ଆର କିଛୁ ନାହିଁ । ଜାନେଓ ନା ସଂସାରେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ମାନୁଷଙ୍କ ଆଛେ ତାଇ ନୟ, ଏକଟା ମାନୁଷଙ୍କ ଯେ କତ ବିଭିନ୍ନ ମାନୁଷେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୟ ତାହାର ନିର୍ଦେଶ ଖୁଜିତେ ଯାଓଯା ବୃଥା । ଏଥାନେ ଏକଟା ନିମେଷେଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣତାଯ ତୀର୍ବତାଯ ସମସ୍ତ ଜୀବନକେଓ ଅତିକ୍ରମ କରିତେ ପାରେ ।

ସୋଜା ରାନ୍ତା ଛାଡ଼ିଯା ବନବାଦାଡ଼େର ମଧ୍ୟ ଦିଯା ଏପଥ-ଓପଥ ଘୁରିଯା ଘୁରିଯା ସ୍ଟେଶନ ଚଲିଯାଇଲାମ । ଅନେକଟା ଛେଲେବେଲାଯ ପାଠଶାଳେ ଯାବାର ମତ । ଟ୍ରେନେର ସମୟ ଜାନି ନା, ତାଗିଦିଓ ନାହିଁ—ଶୁଦ୍ଧ ଜାନି ଓଖାନେ ପୋଁଛିଲେ ସଖନ ହଟକ ଗାଡ଼ି ଏକଟା ଜୁଟିବେଇ । ଚଲିତେ ଚଲିତେ ହଠାତ୍ ଏକସମୟେ ମନେ ହଇଲ ସବ ପଥଗୁଲାଇ ଯେନ ଚେନା । ଯେନ କତଦିନ ଏପଥେ କତବାର ଆନାଗୋନା କରିଯାଛି । ଶୁଦ୍ଧ ଆଗେ ଛିଲ ସେଣ୍ଟଲା ବଡ଼, ଏଥନ କି କରିଯା ଯେନ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଛୋଟ ହଇଯା ଗେଛେ; କିନ୍ତୁ ଐ ନା ଖାଁଯେଦେର ଗଲାଯ-ଦଢ଼େର ବାଗାନ । ତାଇ ତ ବଟେ; ଏ ଯେ ଆମାଦେରଇ ଗ୍ରାମେର ଦକ୍ଷିଣପାଡ଼ାର ଶେଷପ୍ରାନ୍ତ ଦିଯା ଚଲିଯାଛି । କେ ନାକି କବେ ଶୁଲେର ବ୍ୟଥାୟ ଏତେ ତେଣୁଳ ଗାଛେର ଉପରେର ଡାଳେ

গলায় দড়ি দিয়া আঘাত্যা করিয়াছিল। করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রায় সকল গ্রামের মত এখানেও একটা জনশ্রুতি আছে। গাছটা পথের ধারে, ছেলেবেলায় চোখে পড়িলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত এবং চোখ বুজিয়া সবাই একদৌড়ে স্থানটা পার হইয়া যাইতাম।

গাছটা তেমনই আছে। তখন মনে হইত ঐ অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মত, মাথা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে। আজ দেখিলাম সে বেচারার গর্ব করিবার কিছু নাই, আরও পাঁচটা তেঁতুলগাছ যেমন হয় সেও তেমনি। জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহু বর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মত চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছ? ভয় করে না ত?

কাছে গিয়া পরমন্মেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়।

সায়াহ্নের আলো নিবিয়া আসিতেছিল, বিদায় লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে দৈবাং দেখা হয়ে গেল। চললাম বন্ধু।

সারি সারি অনেকগুলা বাগানের পরে একটুখানি খোলা জায়গা, অন্যমনে হয়ত এটুকু পার হইয়া আসিতাম, কিন্তু সহসা বঙ্গদিনের বিস্মৃতপ্রায় পরিচিত ভারি একটি মিষ্ট গন্ধে চমক লাগিল—এদিক-ওদিক চাহিতেই চোখে পড়িয়া গেল—বাঃ! এ যে আমাদের সেই যশোদা বৈষণবীর আউশফুলের গন্ধ! ছেলেবেলায় ইহার জন্য যশোদার কত উমেদারিই না করিয়াছি। এ জাতীয় গাছ এদিকে মিলে না, কি জানি সে কোথা হইতে আনিয়া তাহার আঙ্গিনার একধারে পুঁতিয়াছিল। ট্যারা-বাঁকা গাঁটে-ভরা বুড়ো মানুষের মত তাহার চেহারা—সেদিনের মত আজও তাহার সেই একটিমাত্র সজীব শাখা এবং উর্ধ্বে গুটিকয়েক সবুজ পাতার মধ্যে

তেমনি গুটিকয়েক সাদা সাদা ফুল। ইহার নীচে ছিল যশোদার স্বামীর সমাধি। বোষ্টমঠাকুরকে আমরা দেখি নাই, আমাদের জন্মের পূর্বেই তিনি গোলোকে রওনা হইয়াছিলেন। তাহারই ছোট মনোহারী দোকানটি তখন বিধবা চালাইত। দোকান ত নয়, একটি ডালায় ভরিয়া যশোদা মালা-ঘূন্সি, আর্শি-চিরুনি, আলতা, তেলের মশলা, কাঁচের পুতুল, টিনের বাঁশি প্রভৃতি লইয়া দুপুরবেলায় বাড়ি বাড়ি বিক্রি করিত। আর ছিল তাহার মাছ ধরিবার সাজসরঞ্জাম। বড় ব্যাপার নয়, দু-এক পয়সা মূল্যের ডোরকাঁটা। এই কিনিতে যখন-তখন তাহাকে ঘরে গিয়া আমরা উৎপাত করিতাম। এই আউশগাছের একটা শুকনো ডালের উপর কাদা দিয়া জায়গা করিয়া যশোদা সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিত। ফুলের জন্য আমরা উপদ্রব করিলে সে সমাধিটি দেখাইয়া বলিত, না বাবাঠাকুর, ও আমার দেবতার ফুল, তুললে তিনি রাগ করেন।

বৈষণবী নাই, সে কবে মরিয়াছে জানি না—হয়ত খুব বেশিদিন নয়। চোখে পড়িল গাছের একধারে আর একটি ছোট মাটির ঢিপি, বোধ হয় যশোদারই হইবে। খুব সন্তুষ, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজ স্বামীর পাশেই সে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। স্তুপের খোঁড়া-মাটি অধিকতর উর্বর হইয়া বিছুটি ও বনচাঁড়ালের গাছে গাছে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—যত্ন করিবার কেহ নাই।

পথ ছাড়িয়া সেই শৈশবের পরিচিত বুড়ো গাছটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, সন্ধ্যা-দেওয়া সেই দীপটি আছে নীচে পড়িয়া এবং তাহারি উপরে সেই শুকনো ডালটি আছে আজও তেমনি তেলে তেলে কালো হইয়া।

যশোদার ছোট ঘরটি এখনো সম্পূর্ণ ভূমিসাং হয় নাই—সহস্র ছিদ্রময় শতজীর্ণ খড়ের চালখানি দ্বার ঢাকিয়া হৃমড়ি খাইয়া পড়িয়া আজও প্রাণপণে আগলাইয়া আছে।

কুড়ি-পঁচিশ বর্ষ পূর্বের কত কথাই মনে পড়িল। কঞ্চিরে বেড়া দিয়া ঘেরা নিকানো-মুছানো যশোদার উঠান, আর সেই ছোট ঘরখানি। সে আজ এই

হইয়াছে। কিন্তু এর চেয়েও দের বড় করুণ বস্তু তখনও দেখার বাকি ছিল। অকস্মাত চোখে পড়িল সেই ঘরের মধ্য হইতে ভাঙা চালের নীচে দিয়া গুড়ি মারিয়া একটা কঙ্কালসার কুকুর বাহির হইয়া আসিল। আমার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া সে বোধ করি অনধিকার-প্রবেশের প্রতিবাদ করিতে চায়। কিন্তু কঢ় এত ক্ষীণ যে, সে তাহার মুখেই বাধিয়া রাখিল।

বলিলাম, কি রে, কোন অপরাধ করিনি ত?

সে আমার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া জানি না, এবার ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

বলিলাম, আজও তুই এখানেই আছিস?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু মলিন চোখ-দুটো মেলিয়া অত্যন্ত নিরূপায়ের মত আমার মুখের পানে চাহিয়া রাখিল।

এ যে ঘশোদার কুকুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুলকাটা রাঙা পাড়ের সেলাইকরা বগ্লস এখনো তাহার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটিরের মধ্যে কি খাইয়া যে আজও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ায় তুকিয়া কাড়িয়া কুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই, স্বজাতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার শিক্ষাও এ পায় নাই—অনশনে অর্ধাশনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালোবাসিত। হ্যত ভাবে, কোথাও না কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এ-ই কি এমনি? এ প্রত্যাশা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?

যাইবার পূর্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটায় একবার দৃষ্টি দিয়া লইলাম। অন্ধকারে দেখা কিছুই গেল না, শুধু চোখে পড়িল দেয়ালে সাঁটা পটগুলি। রাজা-রানী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা জাতীয় দেবদেবতার প্রতিমূর্তি নৃতন কাপড়ের গাঁট হইতে সংগ্রহ করিয়া ঘশোদা ছবির শখ মিটাইত। মনে পড়িল ছেলেবেলায়

মুঞ্ছ চক্ষে এগুলি বহুবার দেখিয়াছি। বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া, দেয়ালের কাদা মাখিয়া এগুলি আজও কোনমতে টিকিয়া আছে।

আর রহিয়াছে পাশের কুলুঙ্গিতে তেমনি দুর্দশায় পড়িয়া সেই রঙ-করা হাঁড়িটি। এর মধ্যে থাকিত তাহার আলতার বাণ্ডিল, দেখামএই সেকথা আমার মনে পড়িল। আরও কি কি যেন এদিকে-ওদিকে পড়িয়া আছে অন্ধকারে ঠাহর হইল না। তাহারা সবাই মিলিয়া আমাকে প্রাণপণে কিসের যেন ইঙ্গিত করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভাষা আমার অজানা। মনে হইল, বাড়ির এক কোণে এ যেন মৃতশিশুর পরিত্যক্ত খেলাঘর। গৃহস্থালীর নানা ভাঙাচোরা জিনিস দিয়া স্যন্তে রচিত তাহার এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে সে ফেলিয়া গেছে। আজ তাহাদের আদর নাই, প্রয়োজন নাই, আঁচল দিয়া বার বার ঝাড়ামোছা করিবার তাগিদ গেছে ফুরাইয়া—পড়িয়া আছে শুধু কেবল জঞ্জালগুলা কেহ মুক্ত করে নাই বলিয়া।

সেই কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থাকিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম সে-বেচারা এইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরিচয়ও এই প্রথম, শেষও এইখানে, তবু আগু বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্ বন্ধুহীন লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভঙ্গা ঘরে। এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচকের এই অভাগা সঙ্গীর জন্য বুকের ভিতরটা হঠাত ভু-ভু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের জল আর সামলাইতে পারি না এমনি দশা।

চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম, কেন এমন ‘হয়? আর কোন একটা দিনে এ-সব দেখিয়া হয়ত বিশেষ কিছু মনে হইত না, কিন্তু আজ আপন অন্তরাকাশই নাকি মেঘের ভারে ভারাতুর, তাই ওদের দুঃখের হাওয়ায় তাহারা অজস্রধারায় ফাটিয়া পড়িতে চায়।

স্টেশনে পৌঁছিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তখনি গাড়ি মিলিল। কলিকাতার  
বাসায় পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইবে না। টিকিট কিনিয়া উঠিয়া বসিলাম, বাঁশি  
বাজাইয়া সে যাত্রা শুরু করিল। স্টেশনের প্রতি তাহার মোহ নাই, সজলচক্ষে  
বার বার ফিরিয়া চাহিবার তাহার প্রয়োজন হয় না।

আবার সেই কথাটাই মনে পড়িল—দশটা দিন মানুষের জীবনের কতটুকু,  
অথচ কতই না বড়!

কাল প্রভাতে কমলগতা একলা যাইবে ফুল তুলিতে। তার পরে চলিবে  
তাহার সারাদিনের ঠাকুরসেবা। কি জানি, দিন-দশেকের সাথী নতুনগোঁসাইকে  
ভুলিতে তাহার ক'টা দিন লাগিবে!

সেদিন সে বলিয়াছিল, সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে নিজেকে  
নিবেদন করে দিয়েছি, দাসীকে কখনো তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

তাই হোক। তাই যেন হয়।

ছেলেবেলা হইতে নিজের জীবনের কোন লক্ষ্যও নাই, জোর করিয়া  
কোন-কিছু কামনা করিতেও জানি না—সুখ-দুঃখের ধারণাও আমার স্বতন্ত্র।  
তথাপি এতটা কাল কাটিল শুধু পরের দেখাদেখি পরের বিশ্বাসে ও পরের হৃকুম  
তামিল করিতে। তাই কোন কাজই আমাকে দিয়া সুনির্বাহিত হয় না। দ্বিধায়  
দুর্বল সকল সঙ্গম সকল উদ্যমই আমার অনতিদূরে ঠোকর খাইয়া পথের মধ্যে  
ভঙ্গিয়া পড়ে। সবাই বলে অলস, সবাই বলে অকেজো। তাই বোধ করি ওই  
অকেজো বৈরাগীদের আখড়াতেই আমার অন্তরবাসী অপরিচিত বন্ধু অস্ফুট  
ছায়ারূপে আমাকে দেখা দিয়া গেলেন। বার বার রাগ করিয়া মুখ ফিরাইলাম,  
বার বার স্মিতহাস্যে হাত নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিলেন।

আর ঐ বৈক্ষণ্বী কমলগতা! ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈক্ষণ্ব কবিচিত্তের  
অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষার ত্রুটি অনেক,  
কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাঁহাদেরই দেওয়া কীর্তনের সুর—

মর্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে নানা  
রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই—কলাশান্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয়  
দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

আমাকে বলিয়াছিল, চলো না গোঁসাই এখান থেকে যাই, গান গেয়ে পথে-  
পথে দু'জনের দিন কেটে যাবে।

বলিতে তাহার বাধে নাই, কিন্তু আমার বাধিল। আমার নাম দিল সে  
নতুনগোঁসাই। বলিল, ও নামটা আমাকে যে মুখে আনতে নেই গোঁসাই। তাহার  
বিশ্বাস আমি তাহার গত জীবনের বন্ধু। আমাকে তাহার ভয় নাই, আমার কাছে  
সাধনায় তাহার বিষ্ণ ঘটিবে না। বৈরাগী দ্বারিকাদাসের শিষ্যা সে, কি জানি কোন্  
সাধনায় সিদ্ধিলাভের মন্ত্র তিনি দিয়াছিলেন!

অকস্মাত রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়িল—মনে পড়িল তাহার সেই চিঠি। স্নেহ  
ও স্বার্থে মিশামিশি সেই কঠিন লিপি। তবুও জানি এ জীবনের পূর্ণচেদে সে  
আমার শেষ হইয়াছে। হয়ত এ ভালোই হইয়াছে, কিন্তু সে শূন্যতা ভরিয়া দিতে  
কি কোথায় কেহ আছে? জানলার বাহিরে অঙ্ককারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া  
রহিলাম। একে একে কত কথা কত ঘটনাই স্মরণ হইল। শিকারের আয়োজনে  
কুমার সাহেবের সেই তাঁবু, সেই দলবল, বহুবর্ষ পরে প্রবাসে সেই প্রথম  
সাক্ষাতের দিন, দীপ্ত কালো চোখে তাহার সে কি বিস্ময়বিমুঞ্চ দৃষ্টি! যে মরিয়াছে  
বলিয়া জানিতাম তাহাকে চিনিতে পারি নাই—সেদিন শূশানপথে তাহার সে কি  
ব্যগ্র ব্যাকুল মিনতি! শেষে ক্রুদ্ধ হতাশাসে সে কি তীব্র অভিমান! পথরোধ করিয়া  
কহিল, যাবে বললেই তোমাকে যেতে দেব নাকি? কই যাও ত দেখি। এই বিদেশে  
বিপদ ঘটলে দেখবে কে? ওরা, না আমি?

এবার তাহাকে চিনিলাম। এই জোরই তাহার চিরদিনের সত্য পরিচয়।  
জীবনে এ আর তাহার ঘুচিল না—এ হইতে কখনো কেহ তাহার কাছে অব্যাহতি  
পাইল না।

আরায় পথের প্রান্তে মরিতে বসিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম শিয়রে বসিয়া সে। তখন সকল চিন্তা সঁপিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইলাম। সে ভার তাহার, আমার নয়।

দেশের বাড়িতে আসিয়া জুরে পড়িলাম। এখানে সে আসিতে পারে না—এখানে সে মৃত—এর বাড়া লজ্জা তাহার নাই, তথাপি যাহাকে কাছে পাইলাম—সে ওই রাজলক্ষ্মী।

চিঠিতে লিখিয়াছে—তখন তোমাকে দেখিবে কে? পুঁটু? আর আমি ফিরিব শুধু চাকরের মুখে খবর লইয়া? তারপরেও বাঁচিতে বলো নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব দিই নাই। জানি না বলিয়া নয়—সাহস হয় নাই।

মনে মনে বলিলাম, শুধু কি রূপে? সংযমে, শাসনে, সুকঠোর আঞ্চনিয়ন্ত্রণে এই প্রথর বুদ্ধিশালিনীর কাছে ঐ মিঞ্চ সুকোমল আশ্রমবাসিনী কমললতা কতটুকু? কিন্তু ওই এতটুকুর মধ্যেই এবার যেন আপন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে ওর কাছে আছে আমার মুক্তি, আছে মর্যাদা, আছে আমার নিশ্চাস ফেলিবার অবকাশ। ও কখনো আমার সকল চিন্তা, সকল ভালোমন্দ আপন হাতে লইয়া রাজলক্ষ্মীর মত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না।

ভাবিতেছিলাম কি করিব বিদেশে গিয়া? কি হইবে আমার চাকরিতে? নৃতন ত নয়—সেদিনই বা কি এমন পাইয়াছিলাম যাহাকে ফিরিয়া পাইতে আজ লোভ করিতে হইবে? কেবল কমললতাই ত বলে নাই, দ্বারিকাগোঁসাইও একান্ত সমাদরে আহ্বান করিয়াছিল আশ্রমে থাকিতে। সে কি সমস্তই বঞ্চনা, মানুষকে ঠকানো ছাড়া কি এ আমন্ত্রণে কোন সত্যই নাই? এতকাল জীবনটা কাটিল যেভাবে, এই কি ইহার শেষ কথা? কিছুই জানিতে বাকি নাই, সব জানাই কি আমার সমাপ্ত হইয়াছে? চিরদিন ইহাকে শুধু অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষাই করিয়াছি,

বলিয়াছি সব ভুয়া, সব ভুল, কিন্তু কেবলমাত্র অবিশ্বাস ও উপহাসকেই মূলধন  
করিয়া সংসারে বৃহৎ বস্তু কে করে লাভ করিয়াছে?

গাড়ি আসিয়া হাওড়া স্টেশনে থামিল। স্থির করিলাম রাত্রিটা বাসায়  
থাকিয়া জিনিসপত্র যা-কিছু আছে, দেনা-পাওনা যা-কিছু বাকী, সমস্তই চুকাইয়া  
দিয়া কালই আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইব। রহিল আমার ঢাকরি, রহিল আমার  
বর্মা যাওয়া।

বাসায় পৌঁছিলাম—রাত্রি তখন দশটা। আহারের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু  
উপায় ছিল না।

হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া লইতেছিলাম, পিছনে  
সুপরিচিত কঠের ডাক আসিল, বাবু এলেন?

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিলাম—রতন, কখন এলি রে?

এসেছি সন্ধ্যাবেলায়। বারান্দায় তোফা হাওয়া—আলিস্যিতে একটুখানি  
ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বেশ করেছিলে। খাওয়া হয়নি ত?

আজ্ঞে না।

তবেই দেখচি মুক্ষিলে ফেললি রতন।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার?

স্বীকার করিতে হইল, আমারও হয় নাই।

রতন খুশি হইয়া কহিল, তবে ত ভালোই হয়েছে। আপনার প্রসাদ পেয়ে  
রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারব।

মনে মনে বলিলাম, ব্যাটা নাপতে বিনয়ের অবতার! কিছুতেই অপ্রতিভ  
হয় না। মুখে বলিলাম, তা হলে কাছাকাছি কোন দোকানে খুঁজে দ্যাখ যদি  
প্রসাদের যোগাড় করে আনতে পারিস, কিন্তু শুভাগমন হ'লো কিসের জন্যে?  
আবার চিঠি আছে নাকি?

ରତନ କହିଲ, ଆଜେ ନା । ଚିଠି ଲେଖାଲୋଖିତେ ଅନେକ ଭଜକଟୋ । ଯା ବଲବାର  
ତିନି ମୁଖେଇ ବଲବେନ ।

ତାର ମାନେ ଆବାର ଆମାକେ ଯେତେ ହବେ ନାକି?

ଆଜେ, ନା । ମା ନିଜେଇ ଏସେଚେନ ।

ଶୁଣିଯା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟନ୍ତ ହଇୟା ପଡ଼ିଲାମ । ଏହି ରାତ୍ରେ କୋଥାଯ ରାଖି, କି  
ବନ୍ଦୋବନ୍ତ କରି ଭାବିଯା ପାଇଲାମ ନା । କିନ୍ତୁ କିଛୁ ତ ଏକଟା କରା ଚାଇ! ଜିଜ୍ଞାସା  
କରିଲାମ, ଏସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଘୋଡାର ଗାଡ଼ିତେଇ ବସେ ଆଚେନ ନାକି?

ରତନ ହାସିଯା କହିଲ, ମା ସେଇ ମାନୁଷଙ୍କ ବଟେ! ନା ବାବୁ, ଆମରା ଚାରଦିନ  
ହ'ଲୋ ଏସେଛି—ଏହି ଚାରଟେ ଦିନଟି ଆପନାକେ ଦିନରାତ ପାହାରା ଦିଚ୍ଛି । ଚଲୁନ ।

କୋଥାଯ? କତଦୂରେ?

ଦୂରେ ଏକଟୁ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମାର ଗାଡ଼ି ଭାଡ଼ା କରା ଆଚେ, କଷ୍ଟ ହବେ ନା ।

ଅତ୍ୟବ, ଆର ଏକଦଫା ଜାମା-କାପଡ଼ ପରିଯା ଦରଜାଯ ତାଳା ବନ୍ଧ କରିଯା  
ଯାତ୍ରା କରିତେ ହଇଲ । ଶ୍ୟାମବାଜାରେ କୋନ୍ ଏକଟା ଗଲିର ମଧ୍ୟେ ଏକଥାନି ଦୋତଳା  
ବାଡ଼ି, ସୁମୁଖେ ପ୍ରାଚୀରଘେରା ଏକଟୁଥାନି ଫୁଲେର ବାଗାନ । ରାଜଲଙ୍ଘୀର ବୁଡ଼ା ଦରୋଯାନ  
ଦ୍ୱାର ଖୁଲିଯାଇ ଆମାକେ ଦେଖିତେ ପାଇଲ; ତାହାର ଆନନ୍ଦେର ସୀମା ନାହିଁ—ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଯା  
ମୁଣ୍ଡ ନମକ୍ଷାର କରିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ଆଛା ବାବୁଜୀ?

ବଲିଲାମ, ହାଁ ତୁଳସୀଦାସ, ଭାଲୋ ଆଛି । ତୁମି ଭାଲୋ ଆଛ?

ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ ସେ ତେମନି ଆର ଏକଟା ନମକ୍ଷାର କରିଲ । ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡେର ଜେଳାର  
ଲୋକ, ଜାତିତେ କୁର୍ମୀ, ବ୍ରାକ୍ଷଣ ବଲିଯା ଆମାକେ ସେ ବରାବର ବାଙ୍ଗଳା ରୀତିତେ ପା ଛୁଟୁଇଁ  
ପ୍ରଗାମ କରେ ।

ଆର ଏକଜନ ହିନ୍ଦୁଷ୍ଟାନୀ ଚାକର ଆମାଦେର ଶବ୍ଦ-ସାଡ଼ାଯ ବୋଧ କରି ସେଇମାତ୍ର  
ସୁମ ଭାଙ୍ଗିଯା ଉଠିଯାଛେ, ରତନେର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାଡ଼ାଯ ସେ ବେଚାରା ଉଦ୍ଭାନ୍ତ ହଇୟା ପଡ଼ିଲ ।  
ଅକାରଣେ ଅପରକେ ଧରିଯା ରତନ ଏ ବାଡ଼ିତେ ଆପନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହାଲ ରାଖେ ।

বলিল, এসে পর্যন্ত কেবল ঘুম মারচো আর রঁটি সাঁটচো বাবা, তামাকটুকু পর্যন্ত সেজে রাখতে পারনি? যাও জল্দি—

এ লোকটি নৃতন, ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া একখানি বড় ঘর—গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত—আগাগোড়া কাপেটি পাতা, তাহার উপরে ফুল-কাটা জাজিম ও গোটা-দুই তাকিয়া। কাছেই আমার বহুব্যবহৃত অত্যন্ত প্রিয় গুড়গুড়িটি এবং ইহারই অদূরে সফলে রাখা আমার জরির কাজ-করা মখমলের চটি। এটি রাজলক্ষ্মীর নিজের হাতে বোনা, পরিহাসছলে আমার একটা জন্মদিনে সে উপহার দিয়াছিল। পাশের ঘরটিও খোলা, এ-ঘরেও কেহ নাই। খোলা দরজার ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম একধারে নৃতন-কেনা খাটের উপরে বিছানা পাতা। আর একধারে তেমনি নৃতন আলনায় সাজানো শুধু আমারই কাপড়-জামা। গঙ্গামাটিতে যাইবার পূর্বে এগুলি তৈরি হইয়াছিল। মনেও ছিল না, কখনো ব্যবহারেও লাগে নাই।

রতন ডাকিল, মা!

যাই, বলিয়া সাড়া দিয়া রাজলক্ষ্মী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, রতন, তামাক নিয়ে আয় বাবা। তোকেও এ ক'দিন অনেক কষ্ট দিলুম।

কষ্ট কিছুই নয় মা। সুস্থদেহে ওঁকে যে বাঢ়ি ফিরিয়ে আনতে পেরেচি এই আমার চের। এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মীকে নৃতন চোখে দেখিলাম। দেহে রূপ ধরে না। সেদিনের পিয়ারীকে মনে পড়িল, শুধু কয়েকটা বছরের দুঃখ-শোকের বড়জলে স্নান করিয়া যেন সে নবকলেবর ধরিয়া আসিয়াছে। এই দিন-চারেকের নৃতন বাঢ়িটার বিলিব্যবস্থায় বিস্মিত হই নাই, কারণ তাহার একটা বেলার গাছতলার বাসাও সুশৃঙ্খলায় সুন্দর হইয়া উঠে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আপনাকে আপনি যেন এই

ক'দিনেই ভাসিয়া গড়িয়াছে। আগে সে অনেক গহনা পরিত, মাঝখানে সমস্ত খুলিয়া ফেলিল—যেন সন্ধ্যসিনী। আজ আবার পরিয়াছে—গোটাকয়েক মাত্র—কিন্তু দেখিয়া মনে হইল সেগুলা অতিশয় মূল্যবান। অথচ পরনের কাপড়খানা দামী নয়—সাধারণ মিলের শাড়ি—আটপৌরে, ঘরে পরিবার। মাথার আঁচলের পাড়ের নীচে দিয়া ছোট চুল গালের আশপাশে ঝুলিতেছে, ছোট বলিয়াই বোধ হয় তাহারা শাসন মানে নাই। দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি অত দেখচ?

দেখছি তোমাকে।

নতুন নাকি?

তাই ত মনে হচ্ছে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

না।

মনে হচ্ছে রতন তামাক নিয়ে আসবার আগে আমার হাত-দুটো তোমার গলায় জড়িয়ে দিই। দিলে কি করবে বলো ত? বলিয়াই হাসিয়া উঠিল, কহিল, ছুঁড়ে ফেলে দেবে না ত?

আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, দিয়েই দেখ না। কিন্তু, এত হাসি—সিদ্ধি খেয়েচ না কি?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বুদ্ধিমান রতন একটু জোর করিয়াই পা ফেলিয়া উঠিতেছিল। রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, রতন আগে যাক, তারপরে তোমাকে দেখাচ্ছি সিদ্ধি খেয়েচি কি আর কিছু খেয়েচি। কিন্তু বলিতে বলিতেই তাহার গলা হঠাৎ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, এই অজানা জায়গায় চার-পাঁচদিন আমাকে একলা ফেলে রেখে তুমি পুঁতুর বিয়ে দিতে গিয়েছিলে? জানো, রাতদিন আমার কি করে কেটেচে?

হঠাৎ তুমি আসবে আমি জানব কি করে?

হাঁ গো হাঁ, হঠাৎ বৈ কি! তুমি সব জানতে। শুধু আমাকে জর্দ করার  
জন্যেই চলে গিয়েছিলে।

রতন আসিয়া তামাক দিল, বলিল, কথা আছে মা, বাবুর প্রসাদ পাব।  
ঠাকুরকে খাবার আনতে বলে দেব? রাত বারোটা হয়ে গেল।

বারোটা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ঠাকুর পারবে না বাবা, আমি  
নিজে যাচ্ছি। তুই আমার শোবার ঘরে একটা জায়গা করে দে।

খাইতে বসিয়া আমার গঙ্গামাটির শেষের দিনগুলার কথা মনে পড়িল।  
তখন এই ঠাকুর ও এই রতনই আমার খাবার তত্ত্বাবধান করিত। তখন  
রাজলক্ষ্মীর খোঁজ লইবার সময় হইত না। আজ কিন্তু ইহাদের দিয়া চলিবে না—  
রাঙাঘরে তাহার নিজের যাওয়া চাই। কিন্তু এইটাই তাহার স্বভাব, ওটা ছিল  
বিকৃতি। বুঝিলাম, কারণ যাহাই হোক, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

খাওয়া সাঙ্গ হইলে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটুর বিয়ে কেমন হ'লো?

বলিলাম, চোখে দেখিনি, কানে শুনেছি ভালোই হয়েছে।

চোখে দেখিনি? এতদিন তবে ছিলে কোথায়?

বিবাহের সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম, শুনিয়া সে ক্ষণকাল গালে হাত  
দিয়া থাকিয়া কহিল, অবাক করলে! আসবার আগে পুঁটুকে কিছু একটা ঘৌতুক  
দিয়েও এলে না?

সে আমার হয়ে তুমি দিও।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমার হয়ে কেন, নিজের হয়েই মেয়েটাকে কিছু  
পাঠিয়ে দেব, কিন্তু ছিলে কোথায় বললে না?

বলিলাম, মুরারিপুরে বাবাজীদের আখড়ার কথা মনে আছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আছে বৈ কি! বোষ্টমীরা ওখান থেকেই ত পাড়ায় পাড়ায়  
ভিক্ষে করতে আসত। ছেলেবেলার কথা আমার খুব মনে আছে।

সেইখানেই ছিলাম।

ଶୁନିଆ ଯେନ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଗାୟେ କାଁଟା ଦିଲ—ସେଇ ବୋଷ୍ଟମଦେର ଆଖଡ଼ାଯ? ମା ଗୋ ମା—ବଲ କି ଗୋ? ତାଦେର ସେ ଶୁଣେଚି ସବ ଭୟକ୍ଷର ଇଞ୍ଚୁତେ କାଣ! କିନ୍ତୁ ବଲିଆଇ ସହସା ଉଚ୍ଚ କଟେ ହାସିଆ ଫେଲିଲ । ଶେଷେ ମୁଖେ ଆଁଚଳ ଚାପିଯା କହିଲ, ତା ତୋମାର ଅସାଧ୍ୟ କାଜ ନେଇ । ଆରାଯ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖେଚି! ମାଥାଯ ଜଟ ପାକାନୋ, ଗା-ମୟ ରଞ୍ଜାକ୍ଷିର ମାଳା, ହାତେ ପେତଲେର ବାଲା—ସେ ଅପରାପ—କଥା ଶେଷ କରିତେ ପାରିଲା, ହାସିଆ ଲୁଟାଇଯା ପଡ଼ିଲ । ରାଗ କରିଆ ତୁଲିଆ ବସାଇଯା ଦିଲାମ । ଅବଶେଷେ ବିଷମ ଖାଇଯା ମୁଖେ କାପଡ଼ ଗୁଁଜିଯା ଅନେକ କଟେ ହାସି ଥାମିଲେ ବଲିଲ, ବୋଷ୍ଟମୀରା କି ବଲଲେ ତୋମାଯ? ନାକ-ଖାଁଦା ଉଲକିପରା ଅନେକଗୁଲୋ ସେଖାନେ ଥାକେ ସେ ଗୋ ।

ଆର ଏକଟା ତେମନି ପ୍ରବଳ ହାସିର ଝୋଁକ ଆସିତେଛେ, ସତର୍କ କରିଆ ଦିଯା ବଲିଲାମ, ଏବାର ହାସଲେ ଭୟାନକ ଶାନ୍ତି ଦେବ । କାଳ ଚାକରଦେର ସାମନେ ମୁଖ ବାର କରତେ ପାରବେ ନା ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଭ୍ୟେ ସରିଆ ବସିଲ, ମୁଖେ ବଲିଲ, ସେ ତୋମାର ମତ ବୀରପୁରୁଷେର କାଜ ନଯ । ନିଜେଇ ଲଜ୍ଜାଯ ବେରତେ ପାରବେ ନା । ସଂସାରେ ତୋମାର ମତ ଭୀତୁ ମାନୁଷ ଆର ଆଛେ ନାକି?

ବଲିଲାମ, କିଛୁଇ ଜାନୋ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ତୁମି ଅବଜ୍ଞା କରଲେ ଭୀତୁ ବଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଖାନେ ଏକଜନ ବୈଷ୍ଣୋବୀ ବଲତ ଆମାକେ ଅହଙ୍କାରୀ—ଦାଷ୍ଟିକ ।

କେନ ତାର କି କରେଛିଲେ?

କିଛୁଇ ନା । ସେ ଆମାର ନାମ ଦିଯେଛିଲ ନତୁନଗୋଁସାଇ । ବଲତୋ, ଗୋଁସାଇ, ତୋମାର ମତ ଉଦ୍ଦୀପନ ବୈରାଗୀ-ମନେର ଚେଯେ ଦାଷ୍ଟିକ ମନ ପୃଥିବୀତେ ଆର ଦୁଟି ନେଇ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ହାସି ଥାମିଲ, କହିଲ, କି ବଲଲେ ସେ?

ବଲଲେ, ଏରକମ ଉଦ୍ଦୀପନ, ବୈରାଗୀ-ମନେର ମାନୁଷେର ଚେଯେ ଦାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆଯ ଆର ଖୁଁଜେ ମେଲେ ନା । ଅର୍ଥାତ କି ନା ଆମି ଦୁର୍ଵର୍ଷ ବୀର । ଭୀତୁ ମୋଟେଇ ନଇ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ମୁଖ ଗଞ୍ଜିର ହଟିଲ । ପରିହାସେ କାନ୍ଦ ଦିଲ ନା, କହିଲ, ତୋମାର ଉଦ୍ଦୀପନ ଖବର ସେ ମାଗି ପେଲେ କି କରେ?

বলিলাম, বৈষ্ণবীর প্রতি ওরূপ অশিষ্ট ভাষা অতিশয় আপত্তিকর।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা জানি। কিন্তু তিনি তোমার নাম ত দিলেন  
নতুনগোঁসাই—তাঁর নামটি কি?

কমললতা। কেউ কেউ রাগ করে কমললতাও বলে। বলে, ও জানু  
জানে। বলে, ওর কীর্তনগানে মানুষ পাগল হয়। সে যা চায় তাই দেয়।

তুমি শুনেচো?

শুনেচি। চমৎকার।

ওর বয়েস কত?

বোধ হয় তোমার মতই হবে। একটু বেশি হতেও পারে।

দেখতে কেমন?

ভালো। অন্ততঃ মন্দ বলা চলে না। নাক-খাঁদা, উলকিপরা যাদের তুমি  
দেখেচ তাদের দলের নয়। এ ভদ্রঘরের মেয়ে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ওর কথা শুনেই বুঝেছি। যে ক'দিন ছিলে  
তোমাকে যত্ন করত ত?

বলিলাম, হাঁ। আমার কোন নালিশ নেই।

রাজলক্ষ্মী হঠাতে একটা নিশাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তা করুক। যে  
সাধ্যি-সাধনায় তোমাকে পেতে হয় তাতে ভগবান মেলে। সে বোষ্টম-বৈরাগীর  
কাজ নয়। আমি ভয় করতে যাব কোথাকার কে এক কমললতাকে? ছি! এই  
বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়াও একটা বড় নিশাস পড়িল। বোধ হয় একটু বিমনা  
হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই শব্দে হঁশ হইল। মোটা তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া চিত  
হইয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। উপরে কোথায় একটা ছোট মাকড়সা ঘুরিয়া  
ঘুরিয়া জাল বুনিতেছিল, উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় ছায়াটা তার মস্তবড় বীভৎস

জন্মের মত কড়িকাঠের গায়ে দেখাইতে লাগিল। আলোকের ব্যবধানে ছায়াটাও  
কত গুণেই না কায়াটাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়া আমারই বালিশের এককোণে কনুয়ের ভর  
দিয়া ঝুঁকিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিলাম তাহার কপালের চুলগুলা ভিজা। বোধ  
হয় এইমাত্র চোখেমুখে জল দিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, লক্ষ্মী, হঠাৎ এরকম কলকাতায় চলে এলে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, হঠাৎ মোটেই নয়। সেদিন থেকে দিনরাত চরিশ ঘণ্টাই  
এমন মন কেমন করতে লাগল যে কিছুতেই টিকতে পারলুম না, ভয় হ'লো বুঝি  
হার্টফেল করবো—এ জন্মে আর চোখে দেখতে পাব না, এই বলিয়া সে গুড়গুড়ির  
নলটা আমার মুখ হইতে সরাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল, বলিল, একটু থামো। ধুঁয়োর  
জ্বালায় মুখ পর্যন্ত দেখতে পাইনে এমনি অন্ধকার করে তুলেচো।

গুড়গুড়ির নল গেল, কিন্তু পরিবর্তে তাহার হাতটা রহিল আমার মুঠোর  
মধ্যে।

জিঞ্জাসা করিলাম, বন্ধু আজকাল কি বলে?

রাজলক্ষ্মী একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, বৌমারা ঘরে এলে সব ছেলেই যা  
বলে তাই।

তার বেশি কিছু নয়?

কিছু নয় তা বলিনে, কিন্তু ও আমাকে কি দুঃখ দেবে? দুঃখ দিতে পারো  
শুধু তুমি। তোমরা ছাড়া সত্যিকার দুঃখ মেয়েদের আর কেউ দিতে পারে না।

কিন্তু আমি কি দুঃখ কখনো তোমাকে দিয়েচি লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী অনাবশ্যক আমার কপালটা হাত দিয়া একবার মুছিয়া দিয়া  
বলিল, কখনো না। বরঞ্চ আমিই তোমাকে আজ পর্যন্ত কত দুঃখই না দিলুম।  
নিজের সুখের জন্য তোমাকে লোকের চোখে হেয় করলুম, খেয়ালের ওপর

তোমার অসম্মান হতে দিলুম —তার শাস্তি এখন তাই দু'কুল ভাসিয়ে দিয়ে  
চলচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ ত?

হাসিয়া বলিলাম, কই না!

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাহলে মন্ত্র পড়ে কেউ দু'চোখে তোমার ঠুলি পরিয়ে  
দিয়েচে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এত পাপ করেও সংসারে এত ভাগ্য  
আমার মত কারো কখনো দেখেচো? কিন্তু আমার তাতেও আশা মিটলো না,  
কোথা থেকে এসে জুটল ধর্মের বাতিক, আমার হাতের লক্ষ্মীকে আমি পা দিয়ে  
ঠেলে দিলুম। গঙ্গামাটি থেকে চলে এসেও চৈতন্য হ'লো না, কাশী থেকে তোমাকে  
অনাদরে বিদায় দিলুম।

তাহার দুই চোখ জলে টলটল করিতে লাগিল, আমি হাত দিয়া মুছাইয়া  
দিলে বলিল, বিষের গাছ নিজের হাতে পুঁতে এইবার তাতে ফল ধরল। খেতে  
পারিনে, শুতে পারিনে, চোখের ঘুম গেল শুকিয়ে, এলোমেলো কত কি ভয় হয়  
তার মাথামুণ্ড নেই—গুরুদেব তখনো বাড়িতে ছিলেন, তিনি কি একটা কবজ  
হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, মা, সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশ হাজার  
ইষ্টনাম জপ করতে হবে। কিন্তু, পারলুম কই? মনের মধ্যে হ-হ করে, পুজোয়  
বসলেই দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে—এমনি সময়ে এলো তোমার চিঠি।  
এতদিনে রোগ ধরা পড়ল।

কে ধরলে?—গুরুদেব? এবার বোধ হয় আর একটা কবজ লিখে দিলেন?  
হাঁ গো দিলেন। বলে দিলেন সেটা তোমার গলায় বেঁধে দিতে।

তাই দিও, তাতে যদি তোমার রোগ সারে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেই চিঠিখানা নিয়ে আমার দু'দিন কাটল। কোথা দিয়ে  
যে কাটল জানিনে। রতনকে ডেকে তার হাতে চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিলুম।  
গঙ্গায় স্নান করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে দাঁড়িয়ে বললুম, মা, চিঠিখানা সময় থাকতে  
যেন তাঁর হাতে পড়ে। আমাকে আত্মহত্যা করে না মরতে হয়।

আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমাকে এমন করে বেঁধেছিলে কেন  
বলো ত?

সহসা এ জিজ্ঞাসার উপর দিতে পারিলাম না। তারপর বলিলাম, এ  
তোমাদের মেয়েদেরই সম্ভব। এ আমরা ভাবতেও পারিনে, বুঝতেও পারিনে।

স্বীকার করো?

করি।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় একমুহূর্ত আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সত্যিই  
বিশ্বাস করো?

এ আমাদেরই সম্ভব, পুরুষে সত্যিই এ পারে না!

কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই স্তন্ধ হইয়া রহিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, মন্দির  
থেকে বেরিয়ে দেখি আমাদের পাটনার লচ্ছমন সাউ। আমাকে সে বারাণসী কাপড়  
বিক্রি করত। বুড়ো আমাকে বড়ো ভালোবাসত, আমাকে বেটী বলে ডাকত।  
আশ্চর্য হয়ে বললে, বেটী, আপ ইঁহা? তার কলকাতায় দোকান ছিল জানতুম,  
বললুম, সাউজী, আমি কলকাতায় যাব, আমাকে একটি বাড়ি ঠিক করে দিতে  
পার?

সে বললে, পারি। বাঙালীপাড়ায় তার নিজেরই একখানা বাড়ি ছিল,  
সম্ভায় কিনেছিল; বললে, চাও ত বাড়িটা আমি সেই টাকাতেই তোমাকে দিতে  
পারি।

সাউজী ধর্মভীরু লোক, তার উপর আমার বিশ্বাস ছিল, রাজি হয়ে তাকে  
বাড়িতে ঢেকে এনে টাকা দিলুম, সে রসিদ লিখে দিলে। তারই লোকজন এ-  
সব জিনিসপত্র কিনা দিয়েচে। ছ-সাতদিন পরেই রতনদের সঙ্গে নিয়ে এখানে  
চলে এলুম, মনে ঘনে বললুম, মা অম্পূর্ণা, দয়া তুমি আমাকে করেচো, নইলে  
এ সুযোগ কখনো ঘটত না। দেখা তাঁর আমি পাবই। এই ত দেখা পেলুম।

বলিলাম, কিন্তু আমাকে যে শীত্রাই বর্মা যেতে হবে লক্ষ্মী।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ବେଶ ତ ଚଳ ନା । ସେଥାନେ ଅଭ୍ୟା ଆହେନ, ଦେଶମଯ  
ବୁନ୍ଦେବେର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆଛେ—ଏସବ ଦେଖତେ ପାବ ।

କହିଲାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ବଡ଼ ନୋଂରା ଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୁଚିବାୟୁଗନ୍ତଦେର ବିଚାର-  
ଆଚାର ଥାକେ ନା—ସେ ଦେଶେ ତୁମି ଯାବେ କି କରେ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମାର କାନେର ଉପର ମୁଖ ରାଖିଯା ଚୁପି ଚୁପି କି ଏକଟା କଥା  
ବଲିଲ, ଭାଲୋ ବୁଝିତେ ପାରିଲାମ ନା । ବଲିଲାମ, ଆର ଏକଟୁ ଚେଁଚିଯେ ବଲୋ ଶୁଣି ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ନା ।

ତାରପର ଅସାଡ଼େର ମତ ତେମନିଭାବେଇ ପଡ଼ିଯା ରହିଲ । ଶୁଧୁ ତାହାର ଉଷ୍ଣ ସନ  
ନିଶ୍ଚାସ ଆମାର ଗଲାର ଉପରେ, ଗାଲେର ଉପରେ ଆସିଯା ପଡ଼ିତେ ଲାଗିଲ ।

## দশ

ওগো, ওঠো! কাপড় ছেড়ে মুখহাত ধোও—রতন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে।

আমার সাড়া না পাইয়া রাজলক্ষ্মী পুনরায় ডাকিল, বেলা হ'লো—কত ঘুমোবে?

পাশ ফিরিয়া জড়িত কঞ্চি বলিলাম, ঘুমোতে দিলে কই? এই ত সবে শুয়োচি।

কানে গেল টেবিলের উপর চায়ের বাটিটা রতন ঠক করিয়া রাখিয়া দিয়া বোধ হয় লজ্জায় পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ছি-ছি, কি বেহায়া তুমি! মানুষকে মিথ্যে কি অপ্রতিভ করতেই পারো। নিজে সারারাত কুস্তকর্ণের মত ঘুমোলে, বরঝ আমিহ জেগে বসে পাখার বাতাস করলুম পাছে গরমে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আবার আমাকেই এই কথা! ওঠো বলাচি, নইলে গায়ে জল ঢেলে দোব।

উঠিয়া বসিলাম। বেলা না হইলেও তখন সকাল হইয়াছে, জানালাগুলি খোলা। সকালের সেই স্নিগ্ধ আলোকে রাজলক্ষ্মীর কি অপরূপ মূর্তিই চোখে পড়িল। তাহার স্নান, পূজা-আহিক সমাপ্ত হইয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়ে-পাণ্ডুর দেওয়া শ্বেত ও রক্তচন্দনের তিলক তাহার ললাটে, পরনে নৃতন রাঙ্গা বারাণসী শাড়ি, পুরের জানালা দিয়া একটুকরা সোনালী রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহার মুখের একধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপাহাসি তাহার ঠোঁটের কোণে, অথচ কৃত্রিম ক্রোধে আকুঞ্জিত ঝ-দুটির নীচে চপ্পল চোখের দৃষ্টি যেন উচ্ছল আবেগে ঝলমল করিতেছে—চাহিয়া আজও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কাল থেকে কি অত দেখচো বলো ত?

কহিলাম, তুমই বলো ত কি অত দেখচি?

রাজলক্ষ্মী আবার একটু হাসিয়া বলিল, বোধ হয় দেখচো এর চেয়ে পুঁতু  
দেখতে ভালো কিনা, কমললতা দেখতে ভালো কিনা—না?

বলিলাম, না। রূপের দিক দিয়ে কেউ তারা তোমার কাছেও লাগে না  
সে এমনিই বলা যায়। অত করে দেখতে হয় না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সে যাক গে। কিন্তু গুণে?

গুণে? সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের সম্ভাবনা আছে তা মানতেই হবে।

গুণের মধ্যে ত শুনলুম কেতুন করতে পারে।

হাঁ চমৎকার।

চমৎকার—তা তুমি বুঝলে কি করে?

বাঃ—তা আর বুঝিনে? বিশুদ্ধ তাল, লয়, সুর—

রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তাল কাকে বলে?

বলিলাম, তাল তাকে বলে ছেলেবেলায় যা তোমার পিঠে পড়ত। মনে  
নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, নেই আবার! সে আমার খুব মনে আছে। কাল খামকা  
তোমায় ভীতু বলে অপবাদ দিয়েছি বৈ ত নয়, কিন্তু কমললতা শুধু তোমার  
উদাসী মনের খবরটাই পেলে, তোমার বীরত্বের কাহিনীটা শোনেনি বুঝি?

না, আত্মপ্রশংসা আপনি করতে নেই, সে তুমি শুনিয়ো। কিন্তু তার গলা  
সুন্দর, গান সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই।

আমারও নেই। বলিয়াই সহসা তাহার দুই চক্ষু প্রচলন কৌতুকে জলিয়া  
উঠিল, কহিল, হাঁ গা, তোমার সেই গানটি মনে আছে? সেই যে পাঠশালার ছুটি  
হলে তুমি গাইতে, আমরা মুঞ্চ হয়ে শুনতুম—সেই—কোথা গেলি প্রাণের প্রাণ  
বাপ দুর্যোধন রে-এ-এ-এ-এ—

হাসি চাপিতে সে মুখে আঁচল চাপা দিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାବେର ଗାନ । ତୋମାର ମୁଖେ ଶୁଣିଲେ ଗୋର-  
ବାଚୁରେର ଚୋଖେଓ ଜଳ ଏସେ ପଡ଼ତ—ମାନୁଷ ତ କୋନ ଛାର ।

ରତନେର ପାଯେର ଶବ୍ଦ ପାଓୟା ଗେଲ । ଅନତିବିଲଞ୍ଜେ ସେ ଦ୍ୱାରେର କାହେ  
ଦାଁଡ଼ାଇୟା ବଲିଲ, ଆବାର ଚାଯେର ଜଳ ଚଢ଼ିଯେ ଦିଯୋଛି ମା, ତୈରି ହତେ ଦେଇ ହବେ  
ନା । ଏହି ବଲିଯା ସେ ଘରେ ତୁକିଯା ଚାଯେର ବାଟିଟା ହାତେ ତୁଲିଯା ଲାଇଲ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମାକେ ବଲିଲ, ଆର ଦେଇ କ'ରୋ ନା, ଓଠୋ । ଏବାର ଚା ଫେଲା  
ଗେଲେ ରତନ ଖେପେ ଯାବେ! ଓର ଅପବ୍ୟୟ ସହ୍ୟ ହୟ ନା । କି ବଲିସ ରତନ?

ରତନ ଜବାବ ଦିତେ ଜାନେ । କହିଲ, ଆପନାର ନା ସହିତେ ପାରେ ମା, କିନ୍ତୁ  
ବାବୁର ଜନ୍ୟେ ଆମାର ସବ ସଯ । ଏହି ବଲିଯା ସେ ବାଟିଟା ଲାଇୟା ଚଲିଯା ଗେଲ । ତାହାର  
ରାଗ ହଇଲେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀକେ ସେ ‘ଆପନି’ ବଲିତ, ନା ହଇଲେ ‘ତୁମି’ ବଲିଯା ଡାକିତ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ରତନ ତୋମାକେ ସତ୍ୟଇ ବଡ଼ ଭାଲୋବାସେ ।

ବଲିଲାମ, ଆମାରଓ ତାଇ ମନେ ହୟ ।

ହାଁ । କାଶୀ ଥେକେ ତୁମି ଚଲେ ଏଲେ ଓ ବାଗଡ଼ା କରେ ଆମାର କାଜ ଛେଡ଼େ  
ଦିଲେ । ରାଗ କରେ ବଲଲୁମ, ଆମି ଯେ ତୋର ଏତ କରଲୁମ ରତନ, ତାର କି ଏହି  
ପ୍ରତିଫଳ? ଓ ବଲଲେ, ରତନ ନେମକହାରାମ ନୟ ମା । ଆମିଓ ଚଲଲୁମ ବର୍ମାୟ, ତୋମାର  
ଖଣ ଆମି ବାବୁର ସେବା କରେ ଶୋଧ ଦେବ । ତଥନ ହାତେ ଧରେ, ଘାଟ ମେନେ ତବେ ଓକେ  
ଶାନ୍ତ କରି ।

ଏକଟୁ ଥାମିଯା ବଲିଲ, ତାରପରେ ତୋମାର ବିଯେର ନେମନ୍ତନପତ୍ର ଏଲୋ ।

ବାଧା ଦିଯା ବଲିଲାମ, ମିଛେ କଥା ବ'ଲୋ ନା । ତୋମାର ମତାମତ ଜାନାର  
ଜନ୍ୟେ—

ଏବାର ସେଓ ଆମାକେ ବାଧା ଦିଲ, କହିଲ, ହାଁଗୋ ହାଁ, ଜାନି । ରାଗ କରେ ଯଦି  
ଲିଖତୁମ କରୋ ଗେ—କରତେ ତ?

ନା ।

ନା, ବୈ କି । ତୋମରା ସବ ପାର ।

না, সবাই সব কাজ পারে না।

রাজলক্ষ্মী বলিতে লাগিল, কি জানি রতন মনে মনে কি বুঝলে, কেবলি  
দেখি আমার মুখের পানে চেয়ে তার দু'চোখ ছলছল করে আসে। তারপরে, তার  
হাতে যখন চিঠির জবাব দিলুম ডাকে ফেলতে, সে বললে না, এ চিঠি ডাকে  
ফেলতে পারব না—আমি নিজে নিয়ে যাব হাতে করে। বললুম, মিথ্যে কতকগুলো  
টাকা খরচ করে লাভ কি বাবা?

রতন চোখটা হঠাৎ মুছে ফেলে বললে, কি হয়েচে আমি জানিনে মা,  
কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় যেন পদ্মাতীরের তলা ক্ষয়ে গেছে—গাছপালা,  
বাড়িঘর নিয়ে কখন যে তলিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই! তোমার দয়ায় আমারও  
আর অভাব নেই মা—এ টাকা তুমি দিলেও আমি নিতে পারব না, কিন্তু বিশ্বনাথ  
মুখ তুলে যদি চান, আমার দেশের কুঁড়েতে তোমার দাসীটাকে কিছু প্রসাদ  
পাঠিয়ে দিয়ো, সে বর্তে যাবে।

বলিলাম, ব্যাটা নাপতে কি সেয়ানা!

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল। বলিল, কিন্তু আর দেরি  
করো না যাও।

দুপুরবেলা আমাকে সে খাওয়াইতে বসিলে বলিলাম, কাল পরনে ছিল  
আটপৌরে কাপড়, আজ সকাল থেকে বারাণসী শাড়ির সমারোহ কেন বলো ত?

তুমি বলো ত কেন?

আমি জানিনে।

নিশ্চয় জানো। এ কাপড়খানা চিনতে পারো?

তা পারি। বর্মা থেকে আমি কিনে পাঠিয়েছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেদিন আমি ভেবে রেখেছিলুম জীবনের সবচেয়ে বড়  
দিনটিতে এটি পরব—তা ছাড়া কখনো পরব না।

তাই পরেছ আজ?

হাঁ, তাই পরেচি আজ।

হাসিয়া বলিলাম, কিন্তু সে ত হয়েছে, এখন ছাড়ো গে!

সে চুপ করিয়া রহিল। বলিলাম, খবর পেলাম তুমি এখুনি নাকি  
কালীঘাটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া কহিল, এখনি? সে কি করে হবে? তোমাকে  
খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে ত ছুটি পাব।

বলিলাম, না, তখনো পাবে না। রতন বলছিল তোমার খাওয়া-দাওয়া  
প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, শুধু কাল দুটিখানি খেয়েছিলে, আবার আজ থেকে শুরু  
হয়েছে উপবাস। আমি কি স্থির করেচি জানো? এখন থেকে তোমাকে কড়া  
শাসনে রাখব, যা খুশি তাই আর করতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তা হলে ত বাঁচি গো মশাই! খাই-দাই থাকি,  
কোন ঝঞ্চাট পোহাতে হয় না।

কহিলাম, সেইজন্যেই আজ তুমি কালীঘাট যেতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, শুধু আজকের  
দিনটি আমাকে ভিক্ষে দাও, তারপরে আগেকার দিনে নবাব-বাদশা'দের যেমন  
কেনা-বাঁদী থাকত তার বেশি তোমার কাছে চাইব না।

এত বিনয় কেন বলো ত?

বিনয় ত নয়, সত্তি। আপনার ওজন বুরো চলিনি, তোমাকে মানিনি তাই  
অপরাধের পরে অপরাধ করে কেবলই সাহস বেড়ে গেছে। আজ আমার সেই  
লক্ষ্মীর অধিকার তোমার কাছে আর নেই—নিজের দোষে হারিয়ে বসে আছি।

চাহিয়া দেখিলাম তাহার চোখে জল আসিয়াছে, বলিল, শুধু আজকের  
দিনটির জন্য হৃকুম দাও, আমি মায়ের আরতি দেখে আসি গে।

বলিলাম, না হয় কাল যেয়ো। নিজেই বললে সারারাত জেগে বসে আমার  
সেবা করেছো—আজ তুমি বড় শ্রান্ত।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ନା, ଆମାର କୋନ ଶ୍ରାନ୍ତି ନେଇ । ଶୁଦ୍ଧ ଆଜ ବଲେ ନୟ, କତ ଅସୁଖେଇ ଦେଖଚି ରାତେର ପର ରାତ ଜେଗେଓ ତୋମାର ସେବାୟ ଆମାର କଷ୍ଟ ହୟ ନା । କିମେ ଆମାର ସମ୍ମତ ଅବସାଦ ଯେନ ମୁଛେ ଦିଯେ ଯାଯ । କତଦିନ ହ'ଲୋ ଠାକୁର-ଦେବତା ଭୁଲେ ଛିଲୁମ, କିଛୁତେ ମନ ଦିତେ ପାରିନି—ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି, ଆଜ ଆମାକେ ମାନା କ'ରୋ ନା— ଯାବାର ହୁକୁମ ଦାଓ ।

ତବେ ଚଲୋ, ଦୁ'ଜନେ ଏକସଙ୍ଗେ ଯାଇ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦୁଇ ଚକ୍ର ଉଳ୍ଳାସେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହଇଯା ଉଠିଲ, କହିଲ ତାଇ ଚଲୋ । କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଠାକୁର-ଦେବତାକେ ତାଚିଛନ୍ତ୍ୟ କରବେ ନା ତ?

ବଲିଲାମ, ଶପଥ କରତେ ପାରବ ନା, ବରଞ୍ଚ ତୋମାର ପଥ ଚେଯେ ଆମି ମନ୍ଦିରେର ଦୋରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକବ । ଆମାର ହୟେ ଦେବତାର କାହେ ତୁମି ବର ଚେଯେ ନିଯ଼ୋ ।

କି ବର ଚାଇବ ବଲୋ ।

ଅନ୍ନେର ଗ୍ରାସ ମୁଖେ କରିଯା ଭାବିତେ ଲାଗିଲାମ, କିନ୍ତୁ କୋନ କାମନାଇ ଖୁଜିଯା ପାଇଲାମ ନା । ସେକଥା ସ୍ଵିକାର କରିଯା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲାମ, ତୁମି ବଲୋ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କି ଆମାର ଜନ୍ୟେ ତୁମି ଚାଇବେ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ଚାଇବ ଆୟୁ, ଚାଇବ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର ଚାଇବ ଆମାର ଓପର ଏଥନ ଥେକେ ଯେନ ତୁମି କଠିନ ହତେ ପାର, ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଯେ ଆର ଯେନ ନା ଆମାର ସର୍ବନାଶ କରୋ । କରତେଇ ତ ବସେଛିଲେ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ହ'ଲୋ ତୋମାର ଅଭିମାନେର କଥା ।

ଅଭିମାନ ତ ଆଛେଇ । ତୋମାର ସେ ଚିଠି କଥନୋ କି ଭୁଲତେ ପାରବ!

ଅଧୋମୁଖେ ନୀରବ ହଇଯା ରହିଲାମ ।

ସେ ହାତ ଦିଯା ଆମାର ମୁଖଖାନା ତୁଳିଯା ଧରିଯା ବଲିଲ, ତା ବଲେ ଏଓ ଆମାର ସଯ ନା । କିନ୍ତୁ କଠୋର ହତେ ତ ତୁମି ପାରବେ ନା, ସେ ତୋମାର ସ୍ଵଭାବ ନୟ, କିନ୍ତୁ ଏକାଜ ଆମାକେ ଏଥନ ଥେକେ ନିଜେଇ କରତ ହବେ, ଅବହେଲା କରଲେ ଚଲବେ ନା ।

ଜିଙ୍ଗାସା କରିଲାମ, କାଜଟା କି? ଆରଓ ଖାଡ଼ା ଉପୋସ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସିଯା ବଲିଲ, ଉପୋସେ ଆମାର ଶାନ୍ତି ହୟ ନା, ବରଂ ଅହଙ୍କାର  
ବାଡ଼େ । ଓ ଆମାର ପଥ ନଯ ।

ତବେ ପଥଟା କି ଠାଓରାଳେ?

ଠାଓରାତେ ପାରିନି, ଖୁଁଜେ ବେଡ଼ାଚି ।

ଆଛା, ସତିଯିଟି ଆମି କଥନୋ କଠିନ ହତେ ପାରି ଏ ତୋମାର ବିଶ୍ୱାସ ହୟ?

ହୟ ଗୋ ହୟ—ଖୁବ ହୟ ।

କଥନୋ ହୟ ନା—ଏ ତୋମାର ମିଛେ କଥା ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସିଯା ମାଥା ନାଡ଼ିଯା ବଲିଲ, ମିଛେ କଥାଇ ତ । କିନ୍ତୁ ସେଇ ହୟେଛେ  
ଆମାର ବିପଦ ଗୋଁସାଇ । କିନ୍ତୁ ବେଶ ନାମଟି ବାର କରେଛେ ତୋମାର କମଲତା । କେବଳ  
ଓଗୋ ହ୍ୟାଙ୍ଗୋ କରେ ପ୍ରାଣ ଯାଯ, ଏଥନ ଥେକେ ଆମିଓ ଡାକବ ନତୁନଗୋଁସାଇଜି ବଲେ ।

ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦେ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ତବୁ ହୟତ ଆଚମକା କଥନୋ କମଲତା ବଲେ ଭୁଲ ହବେ—  
ତାତେଓ ସ୍ଵନ୍ତ ପାବେ । ବଲୋ, ଠିକ ନା?

ହାସିଲାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ଵଭାବ କଥନୋ ମଲେଓ ଯାଯ ନା । ବାଦଶାହୀ ଆମଲେର କେନା-  
ବାଁଦୀଦେର ମତ କଥାଇ ହଚ୍ଛେ ବଟେ । ଏତକ୍ଷଣେ ତାରା ତୋମାକେ ଜଲ୍ଲାଦେର ହାତେ ସଂପେ  
ଦିତ ।

ଶୁନିଯା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଓ ହାସିଯା ଫେଲିଲ, ବଲିଲ, ଜଲ୍ଲାଦେର ହାତେ ନିଜେଇ ତ  
ସଂପେ ଦିଯେଛି ।

ବଲିଲାମ, ଚିରକାଳ ତୁମି ଏତ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ, କୋନ ଜଲ୍ଲାଦେର ସାଧ୍ୟ ନେଇ ତୋମାକେ  
ଶାସନ କରେ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ କି ଏକଟା ବଲିତେ ଗିଯାଇ ତଡ଼ିବେଗେ ଉଠିଯା  
ଦାଁଡ଼ାଇଲ—ଏ କି! ଖାଓଯା ହୟେ ଏଲୋ ଯେ! ଦୁଧ କହି? ମାଥା ଖାଓ, ଉଠେ ପ'ଡୋ ନା  
ଯେନ । ବଲିତେ ବଲିତେ ଦ୍ରଢ଼ତପଦେ ବାହିର ହଇଯା ଗେଲ ।

ନିଶ୍ଚାସ ଫେଲିଯା ବଲିଲାମ, ଏ, ଆର ସେଇ କମଲତା !

মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া পাতের কাছে দুধের বাটি রাখিয়া পাখা-হাতে বাতাস করিতে বসিল, বলিল, এতকাল মনে হ'ত, এ নয়—কোথায় যেন আমার পাপ আছে। তাই, গঙ্গামাটিতে মন বসল না, ফিরে এলুম কাশীধামে। গুরুবেকে ডাকিয়া এনে চুল কেটে গয়না খুলে একবারে তপস্যা জুড়ে দিলুম। ভাবলুম আর ভাবনা নেই, স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরি হ'লো বলে। এক আপদ তুমি—সে ত বিদায় হ'লো। কিন্তু সেদিন থেকে চোখের জল যে কিছুতে থামে না। ইষ্টমন্ত্র গেলুম ভুলে, ঠাকুর-দেবতা করলে অস্তর্ধান, বুক উঠল শুকিয়ে, ভয় হ'লো এই যদি ধর্মের সাধনা তবে এ-সব হচ্ছে কি ! শেষে পাগল হবো নাকি !

আমি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম, বলিলাম, তপস্যার গড়াতে দেবতারা সব ভয় দেখান ! টিকে থাকলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সিদ্ধিতে আমার কাজ নেই, সে আমি পেয়েচি।

কোথায় পেলে?

এখানে। এই বাড়িতে।

অবিশ্বাস্য। প্রমাণ দাও।

প্রমাণ দিতে যাব তোমার কাছে ! আমার বয়ে গেছে।

কিন্তু ক্রীতদাসীরা এরূপ উক্তি কদাচ করে না।

দ্যাখো, রাগিও না বলচি। একশ'বার ক্রীতদাসী-ক্রীতদাসী করো ত ভাগো হবে না।

আচ্ছা, খালাস দিলাম। এখন থেকে তুমি স্বাধীন।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, স্বাধীন যে কত, এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কাল কথা কইতে কইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমার গলার ওপর থেকে তোমার হাতখানি সরিয়ে রেখে আমি উঠে বসলুম। হাত দিয়ে দেখি ঘামে তোমার কপাল ভিজে—আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে একখানা পাখা নিয়ে বসলুম, মিটমিটে আলোটা দিলুম উজ্জ্বল করে, তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে চোখ

আর ফিরতে পারলুম না। এ যে এত সুন্দর এর আগে কেন চোখে পড়েনি? এতদিন কানা হয়ে ছিলুম কি? ভাবলুম, এ যদি পাপ তবে পুণ্যে আমার কাজ নেই, এ যদি অধর্ম তবে থাক গে আমার ধর্মচর্চা—জীবনে এই যদি হয় মিথ্যে তবে জ্ঞান না হতেই বরণ করেছিলুম একে কার কথায়? ও কি, খাচ্চো না যে? সব দুধই পড়ে রাইল যে।

আর পারিনে।

তবে কিছু ফল নিয়ে আসি?

না, তাও না।

কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ যে।

যদি হয়েও থাকি সে অনেক দিনের অবহেলায়। একদিনে সংশোধন করতে চাইলেই মারা যাব।

বেদনায় মুখ তাহার পাংশু হইয়া উঠিল, কহিল, আর হবে না। যে শান্তি পেলুম সে আর ভুলব না। এই আমার মস্ত লাভ। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ভোর হলে উঠে এলুম। ভাগ্যে কুস্তকর্ণের নিদ্রা অল্পে ভাঙ্গে না, নইলে লোভের বশে তোমাকে জাগিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! তারপর দরোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা নাইতে গেলুম—মা যেন সব তাপ মুছে নিলেন। বাড়ি এসে আহিকে বসলুম, দেখতে পেলুম তুমি কেবল একাই ফিরে আসোনি, সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পূজার মন্ত্র। এসেছেন আমার ইষ্টদেবতা, গুরুদেব—এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কিন্তু সে আমার রুকের রক্ত-নেঙড়ানো অশ্র নয়, আমার আনন্দের উপচে-ওঠা ঝরনার ধারা—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে, বয়ে গেল। আনি গে দুটো ফল? বাঁটি নিয়ে কাছে বসে নিজের হাতে বানিয়ে অনেকদিন তোমায় খেতে দিইনি—যাই? কেমন?

যাও।

রাজলক্ষ্মী তেমনি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।  
আমার আবার নিশ্চাস পড়িল। এ, আর সেই কমলগতা!  
কি জানি কে উহার জন্মকালে সহস্র নামের মধ্যে বাছিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী  
নাম দিয়াছিল!

দু'জনে কালীঘাট হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন রাত্রি নয়টা।  
রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া সহজ-মানুষের মত কাছে আসিয়া বসিল।  
বলিলাম, রাজপোশাক গেছে—বাঁচলাম।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও আমার রাজপোশাকই বটে। কিন্তু রাজার  
দেওয়া যে! যখন মরব, ঐ কাপড়খানা আমাকে পরিয়ে দিতে ব'লো।

তাই হবে। কিন্তু সারাদিন ধরে আজ কি ভূমি শুধু স্বপ্ন দেখেই কাটাবে,  
এইবার কিছু খাও।

খাই।

রতনকে বলে দিই ঠাকুর এইখানে তোমার খাবার দিয়ে যাক।

এইখানে? বেশ যা হোক! তোমার সামনে বসে আমি খাবো কেন? কখনো  
দেখেচো খেতে?

দেখিনি, কিন্তু দেখলে দোষ কি?

তা কি হয়। মেয়েদের রাক্ষুসে খাওয়া তোমাদের আমরা দেখতেই বা  
দেবো কেন?

ও ফন্দি আজ খাটবে না লক্ষ্মী। তোমাকে অকারণ উপোস করতে আমি  
কিছুতেই দেবো না। না খেলে তোমার সঙ্গে আমি কথা ক'বো না।

নাই বা কইলে।

আমিও খাবো না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এইবার জিতেছো। এ আমার সইবে  
না।

ঠাকুর খাবার দিয়া গেল, ফল-মূল-মিষ্টান্ন। সে নামমাত্র আহার করিয়া বলিল, রতন তোমাকে নালিশ জানিয়েছে আমি খাইনে, কিন্তু কি ক'রে খাব বলো ত? কলকাতায় এসেছিলুম হারা-মকদ্দমার আপিল করতে। তোমার বাসা থেকে প্রত্যহ রতন ফিরে আসত, আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারতুম না পাছে সে বলে, দেখা হয়েছে, কিন্তু বাবু এলেন না। যে দুর্ঘ্যবহার করেছি আমার বলবার ত কিছুই নেই।

বলবার দরকার ত নেই। তখন বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধরে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেতে।

কে তেলাপোকা—তুমি ?

তাই ত জানি। এমন নিরীহ জীব সংসারে কে আছে?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, অথচ তোমাকেই মনে মনে আমি যত ভয় করি এমন কাউকে নয়।

এটি পরিহাস। কিন্তু হেতু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী আবার ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তার হেতু তোমাকে আমি চিনি। আমি জানি মেয়েদের দিকে তোমার সত্যিকার আসঙ্গি এতটুকু নেই, যা আছে তা লোকদেখানো শিষ্টাচার। সংসারে কোন কিছুতেই তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি ‘না’ বললে তোমাকে ফেরাব কি দিয়ে?

বলিলাম, একটু ভুল হ'লো লক্ষ্মী। পৃথিবীর একটি জিনিসে আজও লোভ আছে—সে তুমি। কেবল ঐখানে ‘না’ বলতে বাধে। ওর বদলে দুনিয়ার সব-কিছু যে ছাড়তে পারে শ্রীকান্তের এই জানাটাই আজও তুমি জানতে পারিনি।

হাতটা ধুয়ে আসি গো, বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন দিনের ও দিনান্তের সর্ববিধ কাজকর্ম সারিয়া রাজলক্ষ্মী আসিয়া আমার কাছে বসিল। কহিল, কমলগতার গল্ল শুনবো, বলো।

যতটা জানি সমস্তই বলিলাম, শুধু নিজের সম্পর্কে কিছু কিছু বাদ দিলাম,  
কারণ, ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা।

আগাগোড়া মন দিয়া শুনিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, যতীনের মরণটাই  
ওকে সবচেয়ে বেজেছে। ওর দোষেই সে মারা গেল।

ওর দোষ কিসে? দোষ বৈ কি। কলঙ্ক এড়াতে ওকেই ত কমললতা  
ডেকেছিল সকলের আগে আঘাত্যায় সাহায্য করতে। সেদিন যতীন স্বীকার  
করতে পারেনি, কিন্তু আর একদিন নিজের কলঙ্ক এড়াতে তার ঐ পথটাই  
সকলের চোখে পড়ে গেল। এমনিই হয়, তাই পাপের সহায় হতে কখনো বন্ধুকে  
ডাকতে নেই—তাতে একের প্রায়শিত্ব পড়ে অপরের ঘাড়ে। ও নিজে বাঁচল, কিন্তু  
ম'লো তার মেহের ধন।

যুক্তিটা ভালো বোঝা গেল না লক্ষ্মী।

তুমি বুঝবে কি করে? বুঝেছে কমললতা, বুঝেছে তোমার রাজলক্ষ্মী।

ওঃ—এই?

এই বৈ কি! আমার বাঁচা কতটুকু বলো ত যখন চেয়ে দেখি তোমার  
পানে?

কিন্তু কালই যে বললে তোমার মনের সব কালি মুছে গেছে—আর কোন  
গ্লানি নেই—সে কি তবে মিছে?

মিছেই ত। কালি মুছবে ম'লে—তার আগে নয়। মরতেও চেয়েচি, কিন্তু  
পারিনে কেবল তোমারই জন্য!

তা জানি। কিন্তু এ নিয়ে বার বার যদি যথা দাও, আমি এমনি নিরাদেশ  
হবো, কোথাও আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের কাছে  
ঁেঁবিয়া বসিল, বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না। তুমি সব পারো,  
তোমার নিষ্ঠুরতা কোথাও বাধা মানে না।

এমন কথা আর বলবে না বলো?

না।

ভাববে না বলো?

তুমি বলো আমাকে ফেলে কখনো যাবে না?

আমি ত কখনো যাইনি লক্ষ্মী, যখনি দূরে গেছি—তুমি শুধু চাওনি বলেই।

সে তোমার লক্ষ্মী নয়—সে আর কেউ।

সেই আর কেউকেই আজও ভয় করিয়ে।

না, তাকে আর ভয় ক'রো না, সে রাক্ষুসী মরেছে। এই বলিয়া সে আমার  
সেই হাতটাই খুব জোর করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবেই থাকিয়া হঠাৎ সে অন্য কথা পাড়িল, বলিল,  
তুমি কি সত্যিই বর্মায় যাবে?

সত্যিই যাবো।

কি করবে গিয়ে—চাকরি? কিন্তু আমরা ত দু'জন—কতটুকুতেই বা  
আমাদের দরকার?

কিন্তু সেটুকুও ত চাই!

সে ভগবান দিয়ে দেবেন। কিন্তু চাকরি করতে তুমি পারবে না, ও তোমার  
ধাতে পোষাবে না।

না পোষালে চলে আসব।

আসবেই জানি। শুধু আড়ি ক'রে অতদূরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট  
দিতে চাও।

কষ্ট না করলেই পার।

রাজলক্ষ্মী ত্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া বলিল, যাও চালাকি ক'রো না।

বলিলাম, চালাকি করিনি, গেলে তোমার সত্যি কষ্ট হবে। রাঁধাবাড়া, বাসন  
মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা পাতা—

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ତବେ ଝି-ଚାକରରା କରବେ କି?

କୋଥାଯ ଝି-ଚାକର? ତାର ଟାକା କୈ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ନାହି ଥାକ । କିନ୍ତୁ ଯତଇ ଭୟ ଦେଖାଓ ଆମି ଯାବଇ ।

ଚଲୋ । ଶୁଧୁ ତୁମି ଆର ଆମି । କାଜେର ତାଡ଼ାୟ ନା ପାବେ ବଗଡ଼ା କରବାର  
ଅବସର, ନା ପାବେ ପୁଜୋ-ଆହିକ-ଉପୋସ କରାର ଫୁରସଂ ।

ତା ହୋକ ଗେ । କାଜକେ ଆମି କି ଭୟ କରି ନାକି ।

କରୋ ନା ସତି, କିନ୍ତୁ ପେରେଓ ଉଠବେ ନା । ଦୁଇନ ବାଦେଇ ଫେରବାର ତାଡ଼ା  
ଲାଗାବେ ।

ତାତେଇ ବା ଭୟ କିମେର? ସଙ୍ଗେ କରେ ନିଯେ ଯାବ, ସଙ୍ଗେ କରେ ଫିରିଯେ ଆନବ ।  
ରେଖେ ଆସତେ ହବେ ନା ତ! ଏହି ବଲିଯା ସେ ଏକମୁହୂର୍ତ୍ତ କି ଭାବିଯା ବଲିଯା ଉଠିଲ,  
ମେହି ଭାଲୋ । ଦାସ-ଦାସୀ ଲୋକଜନ କେଉ ନେଇ, ଏକଟି ଛୋଟ ବାଡ଼ିତେ ଶୁଧୁ ତୁମି ଆର  
ଆମି—ଯା ଖେତେ ଦେବ ତାଇ ଖାବେ, ଯା ପରତେ ଦେବ ତାଇ ପରବେ,—ନା, ତୁମି ଦେଖୋ,  
ଆମି ହୟତ ଆର ଆସତେଇ ଚାହିବ ନା ।

ସହସା ଆମାର କୋଲେର ଉପର ମାଥା ରାଖିଯା ଶୁଇଯା ପଡ଼ିଲ ଏବଂ ବହୁକ୍ଷଣ  
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋଖ ବୁଜିଯା ସ୍ତର ହଇଯା ରହିଲ ।

କି ଭାବଚ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚୋଖ ଚାହିଯା ହାସିଲ, ଆମରା କବେ ଯାବ?

ବଲିଲାମ, ଏହି ବାଡ଼ିଟାର ଏକଟା ବ୍ୟବହାର କରେ ନାଓ, ତାରପରେ ସେଦିନ ଇଚ୍ଛେ  
ଚଲ ଯାତ୍ରା କରି ।

ମେ ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଯା ସାଯ ଦିଯା ଆବାର ଚୋଖ ବୁଜିଲ ।

ଆବାର କି ଭାବଚ?

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହିଯା ବଲିଲ, ଭାବଚି ଏକବାର ମୁରାରିପୁରେ ଯାବେ ନା?

ବଲିଲାମ, ବିଦେଶେ ଯାବାର ପୂର୍ବେ ଏକବାର ଦେଖା ଦିଯେ ଆସବ ତାଁଦେର କଥା  
ଦିଯେଛିଲାମ ।

তবে চল কালই দু'জনে যাই।

তুমি যাবে?

কেন ভয় কিসের? তোমাকে ভালোবাসে কমললতা, আর তাকে  
ভালোবাসে আমাদের গহরদাদা। এ হয়েছে ভালো।

এ-সব কে তোমাকে বললে?

তুমই বলেছ।

না, আমি বলিনি।

হাঁ, তুমই বলেছ, শুধু জানো না কখন বলেছ।

শুনিয়া সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, সে যাই হোক, সেখানে  
যাওয়া তোমার উচিত নয়।

কেন নয়?

সে বেচারাকে ঠাট্টা করে তুমি অস্থির করে তুলবে।

রাজলক্ষ্মী জ্ঞ কুঢ়িত করিল, কুপিত-কঢ়ে কহিল, এতকালে আমার এই  
পরিচয় পেয়েছ তুমি? তোমাকে সে ভালোবাসে এই নিয়ে তাকে লজ্জা দিতে  
যাবো আমি? তোমাকে ভালোবাসাটা কি অপরাধ? আমিও ত মেয়েমানুষ। হয়ত  
বা তাকে আমিও ভালোবেসে আসব।

কিছুই তোমার অসম্ভব নয় লক্ষ্মী—চল যাই।

হাঁ চল, কাল সকালের গাড়িতেই বেরিয়ে পড়ব দু'জনে—তোমার কোন  
ভাবনা নেই—এ জীবনে তোমাকে অসুখী করব না আমি কখনো।

বলিয়াই সে কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, শ্বাস-  
প্রশ্বাস থামিয়া আসিতেছে—সহসা সে যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল।

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম, ও কি?

রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, কৈ না—কিছু ত  
নয়!

তাহার এই হাসিটাও আজ যেন আমার কেমনধারা লাগিল।

## এগার

পরদিন আমার অনিচ্ছায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু পরের দিন আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না, মুরারিপুর আখড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেই হইল। রাজলক্ষ্মীর বাহন রতন, সে নহিলে কোথাও পা বাড়ানো চলে না, কিন্তু রান্নাঘরের দাসী লালুর মাও সঙ্গে চলিল। কতক জিনিসপত্র লইয়া রতন ভোরের গাড়িতে রওনা হইয়া গিয়াছে, সেখানকার স্টেশনে নামিয়া সে খান-দুই ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া রাখিবে। আবার আমাদের সঙ্গেও মোটঘাট যাহা বাঁধা হইয়াছে তাহাও কম নয়।

প্রশ্ন করিলাম, সেখানে বসবাস করতে চললে না কি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, দু'একদিন থাকব না? দেশের বনজঙ্গল, নদীনালা, মাঠঘাট তুমিই একলা দেখে আসবে, আর আমি কি সে-দেশের মেয়ে নই? আমার দেখতে সাধ যায় না?

তা যায় মানি, কিন্তু এত জিনিসপত্র, এত রকমের খাবার-দাবার আয়োজন—

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঠাকুরের স্থানে কি শুধুহাতে যেতে বলো? আর তোমাকে ত বইতে হবে না, তোমার ভাবনা কিসের?

ভাবনা যে কত ছিল সে আর বলিব কাহাকে? আর এই ভয়টাই বেশি ছিল যে, বৈষ্ণব-বৈরাগীর ছোঁয়া ঠাকুরের প্রসাদ সে স্বচ্ছন্দে মাথায় তুলিবে, কিন্তু মুখে তুলিবে না। কি জানি সেখানে গিয়া কোন একটা ছলে উপবাস শুরু করিবে, না রাঁধিতে বসিবে বলা কঠিন। কেবল একটা ভরসা ছিল মনটি রাজলক্ষ্মীর সত্যকার ভদ্র মন। অকারণে গায়ে পড়িয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে পারে না। যদিবা

এ-সব কিছু করে, হাসিমুখে রহস্যে-কৌতুকে এমন করিয়াই করিবে যে আমি ও  
রতন ছাড়া আর কেহ বুঝিতেও পারিবে না।

রাজলক্ষ্মীর দৈহিক ব্যবস্থায় বাহ্যিকভাবে কোনকালেই নাই, তাহাতে সংযম  
ও উপবাসে সেই দেহটাকে যেন লঘুতার একটি দীপ্তি দান করিয়াছে। বিশেষ  
করিয়া তাহার আজিকার সাজসজ্জাটি হইয়াছে বিচিত্র। প্রত্যুম্বে স্নান করিয়া  
আসিয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়েপাওয়ার স্বচ্ছ-রচিত অলক-তিলক তাহার ললাটে,  
পরনে তেমনি নানা ফুলে-ফুলে লতায়-পাতায় বিচিত্র খয়ের রঙের বৃন্দাবনী শাড়ি,  
গায়ে সেই কয়টি অলঙ্কার, মুখের ‘পরে স্নিঘ-প্রসন্নতা—আপন মনে কাজে  
ব্যাপৃত। কাল গোটা-দুই লস্বা আয়না-লাগানো আলমারি কিনিয়া আনিয়াছে, আজ  
যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়ি করিয়া কি-সব তাহাতে সে গুছাইয়া তুলিতেছিল।  
কাজের সঙ্গে হাতের বালার হাঙ্গরের চোখ-দুটা মাঝে মাঝে জুলিয়া উঠিতেছে,  
হীরা ও পান্নাবসানো গলার হারের বিভিন্ন বর্ণচূটা পাড়ের ফাঁক দিয়া ঝলকিয়া  
উঠিতেছে, তাহার কানের কাছেও কি যেন একটা নীলাভ দৃঢ়ি, টেবিলে চা খাইতে  
বসিয়া আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া ছিলাম। তাহার একটা দোষ ছিল—  
বাড়িতে সে জামা অথবা সেমিজ পরিত না। তাই কণ্ঠ ও বাহুর অনেকখানি হয়ত  
অসতর্ক মুহূর্তে অনাবৃত হইয়া পড়িত, অথচ বলিলে হাসিয়া কহিত, অত পারিনে  
বাপু। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দিনরাত বিবিয়ানা আর সয় না। অর্থাৎ জামা-কাপড়ের  
বেশি বাঁধা-বাঁধি শুচিবায় গুণ্ঠনের অত্যন্ত অস্পষ্টিকর।

আলমারির পাঞ্চা বন্ধ করিয়া হঠাৎ আয়নায় তাহার চোখ পড়িল আমার  
‘পরে। তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, রাগিয়া  
বলিল, আবার চেয়ে আছ? এভাবে বারে বারে কি আমাকে এত দেখ বলো ত?  
বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

আমি হাসিলাম, বলিলাম, ভাবছিলাম বিধাতাকে ফরমাশ দিয়ে না জানি  
কে তোমাকে গড়িয়েছিল।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ତୁମି । ନହିଁଲେ ଏମନ ସୃଷ୍ଟିଛାଡ଼ା ପଚନ୍ଦ ଆର କାର? ଆମାର ପାଁଚ-ଛ'ବର ଆଗେ ଏସେଚୋ, ଆସବାର ସମୟ ତାଁକେ ବାଯନା ଦିଯେ ଏସେହିଲ—ମନେ ନେଇ ବୁଝି?

ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମି ଜାନଲେ କି କରେ?

ଚାଲାନ ଦେବାର ସମୟ କାନେ କାନେ ତିନି ବଲେ ଦିଯେଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ହ'ଲୋ ଚାଖାଓୟା? ଦେଇ କରଲେ ଯେ ଆଜଓ ଯାଓୟା ହବେ ନା ।

ନାହିଁ ବା ହ'ଲୋ ।

କେନ ବଲୋ ତ?

ମେଥାନେ ଭିଡ଼ର ମଧ୍ୟେ ହୟତ ତୋମାକେ ଖୁଁଜେ ପାବ ନା ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, ଆମାକେ ପାବେ । ଆମିହି ତୋମାକେ ଖୁଁଜେ ପେଲେ ବାଁଚି ।

ବଲିଲାମ, ମେଓ ତ ଭାଲୋ ନଯ ।

ମେ ହାସିଯା କହିଲ, ନା, ମେ ହବେ ନା । ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ଚଲ । ଶୁଣେଚି ନତୁନଗୋଁସାଇୟେର ମେଥାନେ ଏକଟା ଆଲାଦା ଘର ଆଛେ, ଆମି ଗିଯେଇ ତାର ଖିଲଟା ଭେଙେ ରେଖେ ଦେବ । ଭୟ ନେଇ, ଖୁଁଜିତେ ହବେ ନା—ଦାସୀକେ ଏମନଇ ପାବେ ।

ତବେ ଚଲୋ ।

ଆମରା ମଠେ ଗିଯା ଯଥନ ଉପଚିତ ହଇଲାମ ତଥନ ଠାକୁରେର ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ପୂଜା ମେହିମାତ୍ର ସମାଞ୍ଚ ହଇଯାଛେ । ବିନା ଆହ୍ଵାନେ, ବିନା ସଂବାଦେ ଏତଗୁଲି ପ୍ରାଣୀ ଅକ୍ଷ୍ମାଂ ଗିଯା ହାଜିର, ତଥାପି କି ଯେ ତାହାରା ଖୁଣି ହଇଲ ବଲିତେ ପାରି ନା । ବଡ଼ଗୋଁସାଇ ଆଶ୍ରମେ ନାହିଁ, ଗୁରୁଦେବକେ ଦେଖିତେ ଆବାର ନବଦ୍ଵୀପେ ଗିଯାଛେନ, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟେ ଜନ-ଦୁଇ ବୈରାଗୀ ଆସିଯା ଆମାରଇ ଘରେ ଆଶ୍ରମା ଗାଡ଼ିଯାଛେ ।

କମଳତା, ପଦ୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ଵତୀ ଏବଂ ଆରା ଅନେକେ ଆସିଯା ମହାସମାଦରେ ଅଭ୍ୟର୍ଣ୍ଣା କରିଲ; କମଳତା ଗାଢ଼ସ୍ଵରେ କହିଲ, ନତୁନଗୋଁସାଇ, ତୁମି ଯେ ଏତ ଶୀଘ୍ର ଏସେ ଆବାର ଆମାଦେର ଦେଖା ଦେବେ ଏ ଆଶା କରିନି ।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল, যেন কতকালের চেনা। বলিল, কমললতাদিদি, এ ক'দিন শুধু তোমার কথাই ওঁর মুখে, আরও আগে আসতে চেয়েছিলেন, কেবল আমার জন্যেই ঘটে

ওঠেনি। ওটা আমারই দোষে।

কমললতার মুখ ক্ষণকালের জন্যে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, পদ্মা ফিক করিয়া হাসিয়া চোখ

ফিরাইয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া সে যে সন্তানতরের মেয়ে তাহা সবাই

বুঝিয়াছে, শুধু আমার সঙ্গে যে তাহার কি সম্বন্ধ ইহাই তাহারা নিঃসন্দেহে

ধরিতে পারে

নাই। পরিচয়ের জন্য সবাই উদ্গীব হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর চোখে  
কিছুই এড়ায় না,

বলিল, কমললতাদিদি, আমাকে চিনতে পারচো না?

কমললতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বৃন্দাবনে দেখনি কখনো?

কমললতাও নির্বোধ নয়, পরিহাসটা সে বুঝিল, হাসিয়া বলিল, মনে ত  
পড়চে না ভাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না পড়াই ভালো দিদি। আমি এদেশেরই মেয়ে, কখনো  
বৃন্দাবনের

ধারেও যাইনি,—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্যান্য  
সকলে চলিয়া গেলে

আমাকে দেখাইয়া কহিল, আমরা দু'জনে এক গাঁয়ে এক গুরুমশায়ের  
পাঠশালায় পড়তুম—

দুটিতে যেন ভাইবোন এমনি ছিল ভাব। পাড়ার সুবাদে দাদা বলে  
ডাকতুম—বোনের মত

আমাকে কি ভালোই বাসতেন। গায়ে কখনো হাতটি পর্যন্ত দেননি।

আমার পানে চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, বলচি সব সত্যি নয়?

পদ্মা খুশি হইয়া বলিল, তাই তোমাদের ঠিক এক রকম দেখতে।

দু'জনেই লম্বা

ছিপছিপে—শুধু তুমি ফর্সা, আর নতুনগোঁসাই কালো, তোমাদের দেখলেই  
বোঝা যায়।

রাজলক্ষ্মী গন্তীর হইয়া বলিল, যাবেই ত ভাই। আমাদের ঠিক একরকম  
না হয়ে কি

কোন উপায় আছে পদ্মা।

ও মা! তুমি আমারও নাম জানো যে দেখচি। নতুনগোঁসাই বলেছে বুবি?

বলেছে বলেই ত তোমাদের দেখতে এলুম, বললুম, সেখানে একলা যাবে  
কেন,

আমাকেও সঙ্গে নাও। তোমার কাছে ত আমার ভয় নেই—একসঙ্গে  
দেখলে কেউ কলঙ্কও

রটাবে না। আর রটালেই বা কি, নীলকণ্ঠের গলাতেই বিষ লেগে থাকবে,  
উদরস্থ হবে না।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, মেয়েদের এ যে কি রকম  
ঠাট্টা সে তারাই

জানে। রাগিয়া বলিলাম, কেন ছেলেমানুষের সঙ্গে মিথ্যে তামাশা কোরচ  
বলো ত?

রাজলক্ষ্মী ভালোমানুষের মত বলিল, সত্যি তামাশাটা কি তুমিই না হয়  
বলে দাও! যা

জানি সরল মনে বলচি, তোমার রাগ কেন?  
তাহার গান্ধীর্ঘ দেখিয়া রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিলাম,—সরল মনে বলচি!  
কমলতা,

এত বড় শয়তান ফাজিল তুমি সংসারে দুটি খুঁজে পাবে না। এর কি  
একটা মতলব আছে,

কখনো এর কথায় সহজে বিশ্বাস ক'রো না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন নিন্দে কর গোঁসাই। তা হ'লে আমার সম্বন্ধে  
নিশ্চয় তোমার

মনেই কোন মতলব আছে?

আছেই ত।

কিন্তু আমার নেই। আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ঘ।

হাঁ, যুধিষ্ঠির!

কমলতাও হাসিল, কিন্তু সে উহার বলার ভঙ্গিতে। বোধ হয়, ঠিক কিছু  
বুঝিতে পারিল

না, শুধু গোলমালে পড়িল। কারণ সেদিনও আমি ত কোন রমণীর  
সম্বন্ধেই নিজের কোন

আভাস দিই নাই। আর দিবই বা কি করিয়া। দিবার সেদিন ছিলই বা  
কি!

কমলতা জিজ্ঞাসা করিল, ভাই তোমার নামটা কি?

আমার নাম রাজলক্ষ্মী। উনি গোড়ার কথাটা ছেড়ে দিয়ে বলেন শুধু লক্ষ্মী।  
আমি বলি,

ওগো, হাঁগো। আজকাল বলচেন নতুনগোঁসাই বলে ডাকতে। বলেন, তবু  
স্বস্তি পাবো।

পদ্মা হঠাত হাততালি দিয়া উঠিল—আমি বুঝোচি।

কমলজন্ম তাহাকে ধমক দিল—পোড়ারমুখীর ভারী বুদ্ধি! কি বুরোচিস্  
বল ত?

নিশ্চয় বুরোচি। বলব?

বলতে হবে না, যা। বলিয়াই সে সন্ধে রাজলক্ষ্মীর একটা হাত ধরিয়া  
কহিল, কিন্তু

কথায় কথায় বেলা বাড়ছে ভাই, রোদুরে মুখখানি শুকিয়ে উঠেচে। খেয়ে  
কিছু আসোনি

জানি—চল, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করবে, তারপরে সবাই মিলে তাঁর  
প্রসাদ পাব।

তুমিও এসো গোঁসাই। এই বলিয়া সে তাহাকে মন্দিরের দিকে টানিয়া  
লইয়া গেল।

এইবার মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। কারণ, এখন আসিবে প্রসাদ গ্রহণের  
আহ্বান। খাওয়া-

ছোঁওয়ার বিষয়টা রাজলক্ষ্মীর জীবনে এমন করিয়াই গাঁথা যে, এ সম্বন্ধে  
সত্যসত্যর প্রশ্নই

অবৈধ। এ শুধু বিশ্বাস নয়—এ তাহার স্বভাব। এছাড়া সে বাঁচে না।  
জীবনের এই একান্ত

প্রয়োজনের সহজ ও সক্রিয় সজীবতা কতদিন কত সঙ্কট হইতে তাহাকে  
রক্ষা করিয়াছে

সে কথা কাহারো জানিবার উপায় নাই। নিজে সে বলিবে না—জানিয়াও  
লাভ নাই। আমি

শুধু জানি, যে রাজলক্ষ্মীকে একদিন না চাহিয়াই দৈবাং পাইয়াছি, আজ  
সে আমার সকল

পাওয়ার বড়। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

তাহার যতকিছু কঠোরতা সে কেবল নিজেকে লইয়া, অথচ অপরের  
প্রতি জুলুম ছিল

না। বরঞ্চ হাসিয়া বলিত, কাজ কি বাপু অত কষ্ট করার! একালে অত  
বাছতে গেলে

মানুষের প্রাণ বাঁচে না। আমি যে কিছুই মানি না সে জানে। শুধু তাহার  
চোখের উপর

ভয়ঙ্কর একটা-কিছু না ঘটিলেই সে খুশি। আমার পরোক্ষ অনাচারের  
কাহিনীতে কখনো বা

সে দুই কান চাপা দিয়া আত্মরক্ষা করে, কখনো বা গালে হাত দিয়া  
অবাক হইয়া বলে,

আমার অদৃষ্টে কেন তুমি এমন হ'লে! তোমাকে নিয়ে আমার যে সব  
গেল!

কিন্তু আজিকার ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়। এই নির্জন মঠে যে-কয়টি  
প্রাণী শান্তিতে

বাস করে তাহারা দীক্ষিত বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী। ইহাদের জাতিভেদ নাই,  
পূর্বাশ্রমের কথা

ইহারা কেহ মনেও করে না। তাই অতিথি কেহ আসিলে ঠাকুরের প্রসাদ  
নিঃসঙ্কোচে-শন্দায়

বিতরণ করা এবং প্রত্যাখ্যান করিয়াও আজো কেহ ইহাদের অপমানিত  
করে নাই। কিন্তু

এই অপ্রীতিকর কার্যই আজ যদি অনাহৃত আসিয়া আমাদের দ্বারাই  
সংঘটিত হয় ত

পরিতাপের অবধি রহিবে না। বিশেষ করিয়া আমার নিজের। জানি,  
কমললতা মুখে কিছুই

বলিবে না, তাহাকে বলিতেও দিবে না—হয়ত বা শুন্দমাত্র একটিবার  
আমার প্রতি চাহিয়াই

মাথা নিচু করিয়া অন্যত্র সরিয়া যাইবে। এই নির্বাক অভিযোগের জবাব  
যে কি, এইখানে

দাঁড়াইয়া মনে মনে আমি ইহাই ভাবিতেছিলাম।

এমনি সময়ে পদ্মা আসিয়া বলিল, এসো নতুনগোঁসাই, দিদিরা তোমাকে  
ডাকচে। হাতমুখ ধুয়েছো?

না।

তবে এস আমি জল দিই। প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে।

প্রসাদটা কি হ'লো আজ?

আজ হ'লো ঠাকুরের অন্নভোগ।

মনে মনে বলিলাম, তবে ত সংবাদ আরও ভালো। জিজ্ঞাসা করিলাম,  
প্রসাদ কোথায় দিলে?

পদ্মা বলিল, ঠাকুরঘরের বারান্দায়। বাবাজীমশায়ের সঙ্গে তুমি বসবে,  
আমরা মেয়েরা খাব পরে। আজ আমাদের পরিবেশন করবে রাজলক্ষ্মীদিদি  
নিজে।

সে খাবে না?

না। সে ত আমাদের মত বোষ্টম নয়—বামুনের মেয়ে। আমাদের ছোঁয়া  
খেলে তার পাপ হয়।

তোমার কমললতাদিদি রাগ করলে না?

রাগ করবে কেন, বরঞ্চ হাসতে লাগল। রাজলক্ষ্মীদিদিকে বললে,  
পরজন্মে আমরা দু'বোনে গিয়ে জন্মাব এক মায়ের পেটে। আমি জন্মাব আগে,  
আর তুমি আসবে পরে। তখন মায়ের হাতে দু'বোনে একপাতায় বসে খাব।  
তখন কিন্তু জাত যাবে বললে মা তোমার কান মলে দেবে।

শুনিয়া খুশি হইয়া ভাবিলাম, এইবার ঠিক হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী কখনো  
কথায় তাহার সমকক্ষ পায় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জবাব দিলে সে?

পদ্মা কহিল, রাজলক্ষ্মীদিদি শুনে হাসতে লাগল, বললে, মা কেন দিদি,  
তখন বড় বোন হয়ে তুমই দেবে আমার কান মলে, ছোটর আস্পর্ধা কিছুতেই  
সহিবে না।

প্রত্যন্তের শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, শুধু প্রার্থনা করিলাম ইহার নিহিত  
অর্থ কমললতা যেন না বুঝিতে পারিয়া থাকে।

গিয়া দেখিলাম প্রার্থনা আমার মঞ্জুর হইয়াছে, কমললতা সে কথায় কান  
দেয় নাই। বরঞ্চ এই অমিলটুকু মানিয়া লইয়াই ইতিমধ্যে দু'জনের ভারি একটি  
মিল হইয়া গেছে।

বিকালের গাড়িতে বড়গেঁসাই দ্বারিকাদাস ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে  
আসিল আরও জনকয়েক বাবাজী। সর্বাঙ্গের ছাপচোপের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য  
দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে ইহারাও অবহেলার নয়। আমাকে দেখিয়া বড়গেঁসাই  
খুশি হইলেন, কিন্তু পার্ষদগণ গ্রাহ্য করিল না। না করিবারই কথা, কারণ, শুনা  
গেল—ইহাদের একজন নামজাদা কীর্তনীয়া এবং আর একজন মৃদঙ্গের ওষ্ঠাদ।

প্রসাদ পাওয়া সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই মরা নদী ও  
সেই বনবাদাড়। বেণু ও বেতসকুঞ্জ চারিদিকে —গায়ের চামড়া বাঁচান দায়।  
আসন্ন সূর্যান্তকালে তটপ্রান্তে বসিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিব সক্ষম  
করিলাম, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি কচুজাতীয় ‘আঁধারমানিক’ ফুল  
ফুটিয়াছে। তাহার বীভৎস মাংসপচা গন্ধে তিষ্ঠতে দিল না। মনে মনে ভাবিলাম,  
কবিরা ফুল এত ভালবাসেন, কেহ এটাকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের উপহার দিয়া  
আসে না কেন?

সন্ধ্যার প্রাক্তালে প্রত্যাবর্তন করিলাম, গিয়া দেখি, সেখানে সমারোহ ব্যাপার। ঠাকুর ও ঠাকুরঘর সাজান হইতেছে, আরতির পরে কীর্তনের বৈঠক বসিবে।

পদ্মা কহিল, নতুনগোঁসাই, কীর্তন শুনতে তুমি ভালোবাস, আজ মনোহর দাস বাবাজীর গান শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কি চমৎকার!

বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মত মধুর বস্তু আমার আর নাই, বলিলাম, সত্যিই বড় ভালোবাসি পদ্মা। ছেলেবেলায় দু-চার ক্ষেত্রের মধ্যে কোথাও কীর্তন হবে শুনলে আমি ছুটে যেতাম, কিছুতে ঘরে থাকতে পারতাম না। বুঝি-না-বুঝি তবু শেষ পর্যন্ত বসে থাকতাম। কমললতা, তুমি গাইবে না আজ?

কমললতা বলিল, না গোঁসাই, আজ না। আমার ত তেমন শিক্ষা নেই, ওঁদের সামনে গাইতে লজ্জা করে। তা ছাড়া সেই অসুখটা থেকে গলা তেমনই ধরে আছে, এখনো সারেনি।

বলিলাম, লক্ষ্মী কিন্তু তোমার গান শুনতেই এসেচে। ও ভাবে আমি বুঝি বাড়িয়ে বলেছি।

কমললতা সলজে কহিল, বাড়িয়ে নিশ্চয়ই বলেছো গোঁসাই। তারপরে শ্মিতহাস্যে রাজলক্ষ্মীকে বলিল, তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই, সামান্য যা জানি তোমাকে আর একদিন শোনাব।

রাজলক্ষ্মী প্রসন্নমুখে কহিল, আচ্ছা দিদি, তোমার যেদিন ইচ্ছে হবে আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি নিজে এসে তোমার গান শুনে যাব। আমাকে বলিল, তুমি কীর্তন শুনতে এত ভালোবাস, কই আমাকে ত সে কথা কখনো বলোনি?

উত্তর দিলাম, কেন বোলব তোমাকে? গঙ্গামাটিতে অসুখে যখন শয্যাগত,  
দুপুরবেলাটা কাটত শুকনো শূন্য মাঠের পানে চেয়ে, দুর্ভর সন্ধ্যা কিছুতে একলা  
কাটতে চাইত না—

রাজলক্ষ্মী চট করিয়া আমার মুখে হাত চাপা দিয়া ফেলিল, কহিল, আর  
যদি বলো পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। তারপর নিজেই অপ্রতিভ হইয়া হাত সরাইয়া  
বলিল, কমললতাদিদি, বলে এসো ত ভাই তোমার বড়গোঁসাইজীকে, আজ  
বাবাজীমশায়ের কীর্তনের পরে আমি ঠাকুরদের গান শোনাব।

কমললতা সন্দিধ্বকষ্টে বলিল, কিন্তু বাবাজীরা বড় খুঁতখুঁতে ভাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক গে, ভগবানের নাম ত হবে। বিগ্রহমূর্তিগুলিকে  
হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, ওঁরা হয়ত খুশি হবেন, বাবাজীদের জন্যেও  
তত ভাবিনে দিদি, কিন্তু আমার এই দুর্বাসা ঠাকুরটি প্রসন্ন হলে বাঁচি।

বলিলাম, হ'লে কিন্তু বকশিশ পাবে।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বলিল, রক্ষে করো গোঁসাই, সকলের সম্মুখে যেন  
বকশিশ দিতে এসো না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

শুনিয়া বৈষ্ণবীরা হাসিতে লাগিল, পদ্মা খুশি হইলেই হাততালি দেয়,  
বলিল, আ—মি—বু—ঝো—চি।

কমললতা তাহার প্রতি সন্নেহে চাহিয়া সহাস্যে কহিল, দূর হ পোড়ামুখী—  
চুপ কর। রাজলক্ষ্মীকে কহিল, নিয়ে যাও ত ভাই ওকে, কি জানি হঠাতে কি একটা  
বলে বসবে।

ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পরে কীর্তনের আসর বসিল। আজ আলো জ্বলিল  
অনেকগুলা। মুরারিপুর আখড়া বৈষ্ণবসমাজে নিতান্ত অখ্যাত নয়, নানা স্থান  
হইতে কীর্তনীয়া বৈরাগীর দল আসিয়া জুটিলে একরূপ আয়োজন প্রায়ই হয়। মঠে  
সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রই মজুত আছে, দেখিলাম সেগুলা হাজির করা হইয়াছে।  
একদিকে বসিয়া বৈষ্ণবীগণ—সকলেই পরিচিত, অন্যদিকে উপবিষ্ট

অজ্ঞাতকুলশীল অনেকগুলি বৈরাগী মূর্তি—নানা বয়স ও নানা চেহারার। মাঝখানে সমাসীন বিখ্যাত মনোহর দাস ও তাঁহার মদ্দপ্রবাদক। আমার ঘরের অধুনা দখলীকার একজন ছোকরা বাবাজী দিতেছে হারমোনিয়ামে সুর। এটা প্রচার হইয়াছে যে, কে একজন সন্তানগৃহের মহিলা আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে—তিনিই গাহিবেন গান। তিনি যুবতী, তিনি রূপসী, তিনি বিভিন্নালিনী। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে দাসদাসী, আসিয়াছে বহুবিধ খাদ্যসম্ভার, আর আসিয়াছে কে এক নতুনগোঁসাই—সে নাকি এই দেশেরই এক ভবঘুরে।

মনোহর দাসের কীর্তনের ভূমিকা ও গৌরচন্দ্রিকার মাঝামাঝি একসময়ে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কমলতার কাছে বসিল। হঠাৎ বাবাজীমশায়ের গলাটা একটু কাঁপিয়াই সামলাইয়া গেল এবং মৃদঙ্গের বোলটা যে কাটিল না সে নিতান্তই একটা দৈবাতের লীলা। শুধু দ্বারিকাদাস দেয়ালে ঠেস দিয়া যেমন চোখ বুজিয়া ছিলেন তেমনি রহিলেন, কি জানি, হয়ত জানিতেই পারিলেন না কে আসিল আর কে আসিল না।

রাজলক্ষ্মী পরিয়া আসিয়াছে একখানা নীলাম্বরী শাড়ি, তাহারি সরু জরির পাড়ের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়াছে গায়ের নীল রঙের জামা। আর সব তেমনি আছে। কেবল সকালের উড়েপাণ্ডির পরিকল্পিত কপালের ছাপছোপ এবেলা অনেকখানি মুছিয়াছে—অবশিষ্ট যা আছে সে যেন আশ্বিনের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ, নীল আকাশে কখন মিলাইল বলিয়া। অতি শিষ্টশান্ত মানুষ, আমার প্রতি কটাক্ষেও চাহিল না—যেন চেনেই না। তবু যে কেন একটুখানি হাসি চাপিয়া লইল, সে সেই জানে। কিংবা আমারও ভুল হইতে পারে—অসম্ভব নয়।

আজ বাবাজীমশায়ের গান জমিল না। কিন্তু সে তাঁর দোষে নয়, লোকগুলোর অধীরতায়।

দ্বারিকাদাস চোখ চাহিয়া রাজলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দিদি, আমার ঠাকুরদের এবার তুমি কিছু নিবেদন করে শোনাও, শুনে আমরাও ধন্য হই।

রাজলক্ষ্মী সেইদিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া বসিল। দ্বারিকাদাস খোলটার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওটায় কোন বাধা জন্মাবে না ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না।

শুনিয়া শুধু তিনি নয়, মনোহর দাসও মনে মনে কিছু বিস্ময় বোধ করিলেন। কারণ, সাধারণ মেয়েদের কাছে এতটা বোধ করি তাঁহারা আশা করেন না।

গান শুরু হইল। সঙ্কোচের জড়িমা, অজ্ঞতার দ্বিধা কোথাও নাই—নিঃসংশয়ের কণ্ঠ অবাধ জলপ্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। এ বিদ্যায় সে সুশিক্ষিতা জানি, এ ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু বাঙ্গলার নিজস্ব সঙ্গীতের এই ধারাটাও সে যে এত যত্ন করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে তাহা ভাবি নাই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব-কবিগণের এত বিভিন্ন পদাবলী যে তাহার কণ্ঠস্থ তাহা কে জানিত! শুধু সুরে তালে লয়ে নয়, বাক্যের বিশুদ্ধতায়, উচ্চারণের স্পষ্টতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর মধুরতায় এই সন্ধ্যায় সে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল তাহা অভাবিত। পাথরের ঠাকুর তাহার সম্মুখে, পিছনে বসিয়া ঠাকুর দুর্বাসা—কাহাকে বেশি প্রসন্ন করিতে যে তাহার এই আরাধনা বলা কঠিন। গঙ্গামাটির অপরাধের এতটুকু শ্঵লনও যদি ইহাতে হয়, কি জানি একথা তাহার মনের মধ্যে আজ ছিল কি না।

সে গাহিতেছিল—

“একে পদ-পক্ষজ, পক্ষে বিভূষিত, কণ্টকে জরজর ভেল,  
তুয়া দরশন-আশে কচু নাহি জানলু চিরদুখ অব দূরে গেল।  
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়নু গৃহ-সুখ আশ,  
পত্রক দুখ ত্রুণহ্ল করি না গণনু, কহতঁহি গোবিন্দদাস।।”

বড়গোঁসাইজীর চোখে ধারা বহিতেছিল; তিনি আবেশ ও আনন্দের প্রেরণায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিগ্রহের কর্ষ হইতে মল্লিকার মালা তুলিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, প্রার্থনা করি তোমার সমস্ত অকল্যাণ যেন দূর হয়, ভাই।

রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, তারপরে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা সকলের সম্মুখে মাথায় লইল, চুপি চুপি বলিল, এ মালা তোলা রইল, বকশিশের ভয় না দেখালে এখানেই তোমার গলায় পরিয়ে দিতুম। বলিয়াই চলিয়া গেল।

গানের আসর শেষ হইল। মনে হইল, জীবনটা যেন আজ সার্থক হইল।

ক্রমশঃ প্রসাদ বিতরণের আয়োজন আরম্ভ হইল। তাহাকে অঙ্ককারে একটু আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, ও মালা রেখে দাও, এখানে নয়, বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার হাত থেকে পরবো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এখানে ঠাকুরবাড়িতে প'রে ফেললে আর খুলতে পারবে না এই বুঝি ভয়?

না, ভয় আর নেই, সে ঘুচেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার থাকলে তোমাকে আজ তা দান করতাম।

উঃ—কি দাতা! সে ত তোমারি থাকত গো।

বলিলাম, তোমাকে আজ অসংখ্য ধন্যবাদ।

কেন বলো ত?

বলিলাম, আজ মনে হচ্ছে তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে, গুণে, রসে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, মেহে, সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অযাচিত পেয়েছি, সংসারে তার তুলনা নেই। নিজের অযোগ্যতায় লজ্জা পাই লক্ষ্মী, তোমার কাছে সত্যই আমি বড় কৃতজ্ঞ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এবার কিন্তু সত্যই আমি রাগ করব।

তা ক'রো। ভাবি এ ঐশ্বর্য আমি রাখব কোথায়?

কেন, চুরি যাবার ভয় নাকি?

না, সে মানুষ ত চোখে দেখতে পাইনে লক্ষ্মী। চুরি করে তোমাকে ধরে  
রাখবার মত বড় জায়গাই বা সে বেচারা পাবে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিল না, হাতটা আমার টানিয়া ক্ষণকাল বুকের কাছে  
ধরিয়া রাখিল। তারপরে বলিল, এমন করে মুখোমুখি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে  
দেখলে লোকে হাসবে যে! কিন্তু ভাবচি, রাত্রে তোমাকে শুতে দিই কোথায়—  
জায়গা ত নেই।

না থাক, যেখানে হোক শুয়ে রাত্রিটা কাটবেই।

তা কাটবে, কিন্তু শরীর ত ভালো নয়, অসুখ করতে পারে যে!

তোমার ভাবনা নেই, ওরা ব্যবস্থা একটা করবেই।

রাজলক্ষ্মী চিন্তার সুরে বলিল, দেখচি ত সব, ব্যবস্থা কি করবে জানিনে;  
কিন্তু ভাবনা নেই আমার, আছে ওদের? এসো। যা হোক দুটি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

বাস্তবিক লোকের ভিড়ে শোবার স্থান ছিল না। সে রাত্রে কোনমতে একটা  
খোলা বারান্দায় মশারি টঙ্গাইয়া আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। রাজলক্ষ্মী খুঁতখুঁত  
করিতে লাগিল, হয়ত বা রাত্রে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া গেল, কিন্তু আমার  
ঘুমের বিষ্ণু ঘটিল না।

পরদিন শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলাম রাশীকৃত ফুল তুলিয়া উভয়ে  
ফিরিয়া আসিল। আমার পরিবর্তে কমললতা আজ রাজলক্ষ্মীকেই সঙ্গী  
করিয়াছিল। সেখানে নির্জনে তাহাদের কি কথা হইয়াছে জানি না, কিন্তু আজ  
তাহাদের মুখ দেখিয়া আমি ভারি তৃষ্ণি লাভ করিলাম। যেন কতদিনের বন্ধু  
দু'জনে—তাহারা কতকালের আজীয়। কাল উভয়ে একত্রে এক শয্যায় শয়ন  
করিয়াছিল, জাতের বিচার সেখানে প্রতিবন্ধক ঘটায় নাই। একজন অপরের হাতে  
খায় না এই লইয়া কমললতা আমার কাছে হাসিয়া বলিল, তুমি ভেবো না গেঁসাই,

সে বন্দোবস্ত আমাদের হয়ে গেছে। আসচে বারে আমি বড় বোন হয়ে জন্মে ওর  
দু'টি কান ভাল করে মলে দেব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার বদলে আমিও একটা শর্ত করিয়ে নিয়েছি গোঁসাই।  
যদি মরি, ওঁকে বোষ্টমিগিরি ইন্তফা দিয়ে তোমার সেবায় নিযুক্ত হতে হবে।  
তোমাকে ছেড়ে আমি মুক্তি পাব না সে খুব জানি, তখন ভুত হয়ে দিদির ঘাড়ে  
চাপব—সেই সিন্ধবাদের দৈত্যের মত—কাঁধে বসে সব কাজ ওঁকে দিয়ে করিয়ে  
নিয়ে তবে ছাড়ব।

কমললতা সহাস্যে কহিল, তোমার মরে কাজ নেই ভাই, তোমাকে কাঁধে  
নিয়ে আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারব না।

সকালে চা খাইয়া বাহির হইলাম গহরের খোঁজে। কমললতা আসিয়া  
বলিল, বেশি দেরি ক'রো না গোঁসাই, আর তাকেও সঙ্গে এনো। এদিকে একজন  
বামুন ধরে এনেচি আজ ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে। যেমন নোংরা তেমনি কুঁড়ে।  
রাজলক্ষ্মী সঙ্গে গেছে তার সাহায্য করতে।

বলিলাম, ভালো করোনি। রাজলক্ষ্মীর আজ খাওয়া হবে বটে, কিন্তু  
তোমার ঠাকুর থাকবে উপবাসী।

কমললতা সভয়ে জিভ কাটিয়া বলিল, অমন কথা ব'লো না গোঁসাই, সে  
কানে শুনলে এখানে আর জলগ্রহণ করবে না।

হাসিয়া বলিলাম, চরিশ ঘণ্টাও কাটেনি কমললতা, কিন্তু তাকে তুমি  
চিনেছো।

সেও হাসিয়া বলিল, হাঁ গোঁসাই চিনেছি, শত-লক্ষেও এমন মানুষ তুমি  
একটিও খুঁজে পাবে না ভাই। তুমি ভাগ্যবান।

গহরের দেখা মিলিল না, সে বাঢ়ি নাই। তাহার এক বিধবা মামাতো  
ভগিনী থাকে সুনাম গ্রামে; নবীন জানাইল সেদেশে কি এক নৃতন ব্যাধি  
আসিয়াছে, লোক মরিতেছে বিস্তর। দরিদ্র আত্মীয়া ছেলেপুলে লইয়া বিপদে

পড়িয়াছে, তাই সে গিয়াছে চিকিৎসা করাইতে। আজ দশ-বারোদিন সংবাদ নাই—নবীন ভয়ে সারা হইয়াছে—কিন্তু কোন পথ তাহার চোখে পড়িতেছে না। হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার বাবু বোধ হয় আর বেঁচে নেই। মুখ্য চাষা মানুষ আমি, কখনো গাঁয়ের বার হইনি, কোথায় সে দেশ, কোথা দিয়ে যেতে হয় জানিনে, নইলে ঘরসংসার সব ভেসে গেলেও নবীন নাকি থাকে এখনো বাড়ি বসে! চক্রোত্তিমশাইকে দিনরাত সাধচি, ঠাকুর দয়া করো, তোমাকে জমি বেচে আমি একশ' টাকা দেব, আমাকে একবার নিয়ে চলো, কিন্তু বিটলে বামুন নড়লে না। কিন্তু এও বলে রাখচি বাবু, আমার মনিব যদি যায় মারা, চক্রোত্তিকে ঘরে আগুন দিয়ে আমি পোড়াব, তারপর সেই আগুনে নিজে মরব আত্মহত্যা করে। অত বড় নেমকহারামকে আমি জ্যান্ত রাখব না।

তাহাকে সাঙ্গনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, জেলার নাম জানো নবীন?

নবীন কহিল, কেবল শুনেচি গাঁথানা আছে নাকি নদে জেলার কোন্ একটেরে, ইস্টিশান থেকে অনেকদূর যেতে হয় গরুর গাড়িতে। বলিল, চক্রোত্তি জানে, কিন্তু বামুন তাও বলতে চায় না।

নবীন পুরাতন চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিল, কিন্তু সে-সকল হইতে কোন হনিস মিলিল না। কেবল মিলিল এই খবরটা যে, মাস-দুই পূর্বেও বিধবা মেয়ের বিয়ে বাবদ চক্রবর্তী শ'দুই টাকা গহরের কাছে আদায় করিয়াছে।

বোকা গহরের অনেক টাকা, সুতরাং অক্ষম দরিদ্রেরা ঠকাইবেই, এ লইয়া ক্ষোভ করা বৃথা, কিন্তু এত বড় শয়তানিও সচরাচর চোখে পড়ে না।

নবীন বলিল, বাবু ম'লেই ওর ভালো,—একেবারে নির্বাঞ্ছাট হয়ে বাঁচে। একপয়সাও আর ধার শোধ করতে হয় না।

অসম্ভব নয়। গেলাম দু'জনে চক্রবর্তীর গৃহে। এমন বিনয়ী, সদালাপী, পরদুঃখকাতর ভদ্রব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। কিন্তু বৃদ্ধ হইয়া স্মৃতিশক্তি তাঁহার এত ক্ষীণ হইয়াছে যে কিছুই তাঁহার মনে পড়িল না, এমনকি জেলার নাম পর্যন্ত না।

বহু চেষ্টায় একটা টাইম টেবল সংগ্রহ করিয়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সমস্ত রেল-স্টেশন একে একে পড়িয়া গেলাম, কিন্তু স্টেশনের আদ্যক্ষর পর্যন্ত তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না। দুঃখ করিয়া বলিলেন, লোকে কত কি জিনিসপত্র টাকাকড়ি ধার বলে চেয়ে নিয়ে যায় বাবা, মনে করতে পারিনে, আদায়ও হয় না। মনে মনে বলি মাথার ওপর ধর্ম আছেন, তিনিই এর বিচার করবেন।

নবীন আর সহিতে পারিল না, গর্জন করিয়া উঠিল, হাঁ, তিনিই তোমার বিচার করবেন, না করেন করব আমি।

চক্ৰবৰ্তী মেহার্দি-মধুৱৰকষ্ঠে বলিলেন, নবীন, মিছে রাগ কৱিস্ কেন দাদা, তিনিকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, পারলে কি আর এটুকু কৱিনে? গহৰ কি আমার পৰ? সে যে আমার ছেলের মত রে!

নবীন কহিল, সে-সব আমি জানিনে, তোমাকে শেষবাবের মত বলচি, বাবুৱ কাছে আমাকে নিয়ে যাবে ত চল, নইলে যেদিন তাঁৰ মন্দ খবৰ পাব সেদিন রইলে তুমি আর আমি।

চক্ৰবৰ্তী প্ৰত্যুত্তৰে ললাটে কৱাঘাত কৱিয়া শুধু বলিলেন, কপাল নবীন, কপাল! নইলে তুই আমাকে এমন কথা বলিস!

অতএব, পুনৰায় দু'জনে ফিরিয়া আসিলাম। বাটীৰ বাহিৰে দাঁড়াইয়া আমি ক্ষণকাল আশা কৱিলাম অনুতপ্ত চক্ৰবৰ্তী যদি এখনো ফিরিয়া ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া আসিল না, দ্বাৰেৰ ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম চক্ৰবৰ্তী পোড়া কলিকাটা ঢালিয়া ফেলিয়া নিবিষ্টিচিত্তে তামাক সাজিতে বসিয়াছে।

গহৰেৰ সংবাদ পাইবাৰ উপায় চিন্তা কৱিতে কৱিতে আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্ৰায় তিনটা। ঠাকুৱঘৰেৰ বারান্দায় মেয়েদেৱ ভিড় জমিয়াছে; বাবাজীৱা কেহ নাই, সম্ভৱতঃ সুপ্ৰচুৱ প্ৰসাদসেৱাৰ পৱিণ্ডিমে নিজীৰ হইয়া কোথাও বিশ্রাম কৱিতেছেন। রাত্ৰিকালে আৱ একদফা লড়িতে হইবে তাহার বলসঞ্চয়েৰ প্ৰয়োজন।

উঁকি মারিয়া দেখিলাম ভিড়ের মাঝখানে বসিয়া এক গণক; পাঁজি, পুঁথি, খড়ি, শেলেট, পেন্সিল প্রভৃতি গণনার যাবতীয় উপকরণ তাঁহার কাছে। আমার প্রতি সর্বাংগে চোখ পড়িল পদ্মার, সে চেঁচাইয়া উঠিল, নতুনগোঁসাই এয়েছে।

কমললতা বলিল, তখনি জানি গহরগোঁসাই তোমাকে অমনি ছেড়ে দেবে না, কি খেলে সে—

রাজলক্ষ্মী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—থাক দিদি, ও আর জিজ্ঞাসা করো না।

কমললতা তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, রোদুরে মুখ শুকিয়ে গেছে, রাজ্যের ধুলোবালি উঠেচে মাথায়—শ্বানটান হয়েচে ত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তেল ছোঁন না, হলেও ত বোঝা যাবে না দিদি।

অবশ্য সর্বপ্রকার চেষ্টাই নবীন করিয়াছে, কিন্তু আমি স্বীকার করি নাই, অন্নাত অভুক্তই ফিরিয়া আসিয়াছি।

রাজলক্ষ্মী মহানন্দে কহিল, গণকঠাকুর আমার হাত দেখে বলেছে, আমি রাজরানী হবো।

কি দিলে?

পদ্মা বলিয়া দিল—পাঁচ টাকা। রাজলক্ষ্মীদিদির আঁচলে বাঁধা ছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমাকে দিলে আমি তার চেয়েও ভালো বলতে পারতাম।

গণক উড়িয়া ব্রাক্ষণ, বেশ বাঙালা বলিতে পারে—বাঙালী বলিলেই হয়—সেও হাসিয়া কহিল, না মশাই, টাকার জন্যে নয়, টাকা আমি অনেক রোজগার করি। সত্যিই এমন ভালো হাত আমি আর দেখিনি। দেখবেন, আমার হাতদেখা কখনো মিথ্যে হবে না।

বলিলাম, ঠাকুর, হাত না দেখে কিছু বলতে পারো কি?

সে কহিল, পারি। একটা ফুলের নাম করুন।

বলিলাম, শিমুলফুল।

গণক হাসিয়া কহিল, শিমুলফুলই সই! আমি এর থেকেই বলে দেব  
আপনি কি চান। এই বলিয়া সে খড়ি দিয়া মিনিট-দুই আঁক কষিয়া হিসাব করিয়া  
বলিল, আপনি চান একটা খবর জানতে।

কি খবর?

সে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল, না—মামলা-মকদ্দমা নয়; আপনি  
কোন লোকের খবর পেতে চান।

খবরটা বলতে পার ঠাকুর?

পারি। খবর ভালো, দু-একদিনেই জানতে পারবেন।

শুনিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম এবং আমার মুখ দেখিয়া সকলেই  
তাহা অনুমান করিল।

রাজলক্ষ্মী খুশি হইয়া বলিল, দেখলে ত! আমি বলচি ইনি খুব ভালো  
গোণেন, কিন্তু তোমরা কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না—হেসে উড়িয়ে দাও।

কমললতা বলিল, অবিশ্বাস কিসের? নতুনগোঁসাই, দেখাও ত ভাই  
তোমার হাতটা একবার ঠাকুরকে।

আমি করতল প্রসারিত করিয়া ধরিতে গণক নিজের হাতে লইয়া মিনিট  
দুই-তিন স্যন্তে পর্যবেক্ষণ করিল, হিসাব করিল, তারপরে বলিল, মশায়,  
আপনার ত দেখি মস্ত ফাঁড়—

ফাঁড়া? কবে?

খুব শীঘ্ৰ। মৰণ-বাঁচনের কথা।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মীর মুখে আর রক্ত নাই—ভয়ে সাদা হইয়া  
গিয়াছে।

গণক আমার হাতটা ছাড়িয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, দেখি মা তোমার হাতটা  
আর একবার—

না। আমার আর হাত দেখতে হবে না—হয়েছে।

তাহার তীব্র ভাবাত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। চতুর গণক তৎক্ষণাত বুঝিল হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই, বলিল, আমি ত দর্পণ মাত্র মা, ছায়া যা পড়বে তাই আমার মুখে ফুটবে—কিন্তু রুষ্ট গ্রহকেও শান্ত করা যায়, তার ক্রিয়া আছে—সামান্য দশ-কুড়ি টাকা খরচের ব্যাপার মাত্র।

তুমি আমাদের কলকাতার বাড়িতে যেতে পার?

কেন পারব না মা, নিয়ে গেলেই পারি।

আচ্ছা।

দেখিলাম তাহার গ্রহের কোপের প্রতি পুরা বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহাকে প্রসন্ন করার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ।

কমললতা বলিল, চল গোঁসাই তোমার চা তৈরি করে দিই গে—খাবার সময় হয়েচে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি তৈরি করে আনচি দিদি, তুমি ওঁর বসবার জায়গাটা একটু ঠিক করে দাও গে। রতনকে বলো তামাক দিতে। কাল থেকে তার ছায়া দেখবার জো নেই।

অন্যান্য সকলে গণৎকার লইয়া কলরব করিতে লাগিল, আমরা চলিয়া আসিলাম।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় আমার দড়ির খাট, রতন ঝাড়িয়া-বুড়িয়া দিল, তামাক দিল, মুখহাত ধোবার জল আনিয়া দিল—কাল সকাল হইতে বেচারার খাটুনির বিরাম নাই, অথচ কঢ়ী বলিলেন তাহার ছায়া পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। ফাঁড়া আমার আসন, কিন্তু রতনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই বলিত, আজ্জে না, ফাঁড়া আপনার নয়—আমার।

কমললতা নীচে বারান্দায় বসিয়া গহরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, রাজলক্ষ্মী চা লইয়া আসিল, মুখ অত্যন্ত ভারী, সুমুখের টুলে বাটিটা রাখিয়া দিয়া

কহিল, দ্যাখো, তোমাকে একশো বার বলেচি বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ো না—  
বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? তোমাকে গলায় কাপড় দিয়ে হাতজোড় করচি, কথাটা  
আমার শোনো।

এতক্ষণ চা তৈরি করিতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী বোধ হয় ইহাই ভাবিয়া স্থির  
করিয়াছিল—‘খুব শীঘ্ৰ’ অর্থে আৱ কি হইতে পাৱে?

কমললতা আশৰ্য হইয়া কহিল, বনেজঙ্গলে গোঁসাই আবাৱ কখন গেল?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কখন গেলেন সে কি আমি দেখে রেখেচি দিদি? আমার  
কি সংসারে আৱ কাজ নেই।

আমি বলিলাম, ও দেখেনি, ওৱ অনুমান। গণকব্যাটা আছা বিপদ ঘটিয়ে  
গেল। শুনিয়া রতন আৱ একদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতপদেই প্ৰস্থান কৱিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, গণকেৱ দোষটা কি? সে যা দেখবে তাই ত বলবে?  
পৃথিবীতে ফাঁড়া বলে কি কথা নেই? বিপদ কাৱও কখনো ঘটে না নাকি?

এ-সকল প্ৰশ্নেৱ উত্তৰ দিতে যাওয়া বৃথা। কমললতাও রাজলক্ষ্মীকে  
চিনিয়াছে, সেও চুপ কৱিয়া রহিল।

চায়েৱ বাটিটা আমি হাতে কৱামাত্ৰ রাজলক্ষ্মী কহিল, অমনি দুটো ফল  
আৱ মিষ্টি নিয়ে আসি গে?

বলিলাম, না।

না কেন? না ছাড়া হাঁ বলতে কি ভগবান তোমাকে দেননি? কিন্তু আমার  
মুখেৱ দিকে চাহিয়া সহসা অধিকতৰ উদ্বিঘ্নকঞ্চে প্ৰশ্ন কৱিল, তোমাৱ চোখ-দুটো  
অত রাঙা দেখাচ্ছে কেন? পচা নদীৱ জলে নেয়ে আসোনি ত?

না স্নান আজ কৱিনি।

কি খেলে সেখানে?

খাইনি কিছুই, ইচ্ছেও হয়নি।

কি ভাবিয়া কাছে আসিয়া সে আমার কপালের উপর হাত রাখিল,  
তারপরে জামার ভিতরে আমার বুকের কাছে সেই হাতটা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া  
বলিল, যা ভেবেচি ঠিক তাই। কমলদিদি, দেখ ত এঁর গা-টা গরম বোধ হচ্ছে  
না?

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল না, কহিল, হ'লোই বা একটু গরম  
রাজু—ভয় কি?

সে নামকরণে অত্যন্ত পটু। এই নৃতন নামটা আমারও কানে গেল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার মানে জ্বর যে দিদি!

কমললতা কহিল, তাই যদি হয়ে থাকে তোমরা জলে এসে ত পড়েনি?  
এসেছ আমদের কাছে, আমরাই তার ব্যবস্থা করব ভাই, তোমার কিছু চিন্তা  
নেই।

নিজের এই অসঙ্গত ব্যাকুলতায় অপরের অবিচলিত শান্তকর্ত্তা  
রাজলক্ষ্মীকে প্রকৃতিস্থ করিল। সে লজ্জা পাইয়া কহিল, তাই বলো দিদি। একে  
এখানে ডাঙ্কার-বদ্য নেই, তাতে বার বার দেখেচি ওঁর কিছু একটা হ'লে সহজে  
সারে না—ভারী ভোগায়। আবার কোথা থেকে এসে ঐ গোণকার পোড়ারমুখো  
ভয় দেখিয়ে দিলে—

দেখালেই বা।

না ভাই দিদি, আমি দেখেচি কিনা ওদের ভালো কথা ফলে না, কিন্তু  
মন্দটি ঠিক খেটে যায়।

কমললতা স্মিতহাস্যে কহিল, ভয় নেই রাজু, এক্ষেত্রে খাটবে না। সকাল  
থেকে গোঁসাই রোদুরে অনেক ঘোরাঘুরি করেচে, তাতে সময়ে স্নানাহার হয়নি,  
তাই হয়ত গা একটু তপ্ত হয়েচে—কাল সকালে থাকবে না।

লালুর মা আসিয়া কহিল, মা, রান্নাঘরে বামুনঠাকুর তোমাকে ডাকচে।

যাই, বলিয়া সে কমললতার প্রতি একটা স্কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া  
গেল।

আমার রোগের সম্মে কমললতার কথাই ফলিল। জ্বরটা ঠিক সকালেই  
গেল না বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে  
আমাদের ভিতরের কথাটা কমললতা টের পাইল এবং আরও একজন বোধ হয়  
পাইলেন তিনি বড়গোঁসাইজী নিজে।

যাবার দিন আমাদের আড়ালে ডাকিয়া কমললতা জিজ্ঞাসা করিল,  
গোঁসাই, তোমাদের বিয়ের বছরটি মনে আছে ভাই?

নিকটে দেখি একটা থালায় ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও ফুলের মালা।

প্রশ্নের জবাব দিল রাজলক্ষ্মী, বলিল, উনি ছাই জানেন—জানি আমি।

কমললতা হাসিমুখে কহিল, এ কি-রকম কথা যে একজনের মনে রইল,  
আর একজনের রইল না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, খুব ছোট বয়সে কিনা—তাই। ওঁর তখনো ভালো জ্ঞান  
হয়নি।

কিন্তু উনিই যে বয়সে বড় রে রাজু।

ইঃ ভারি বড়ো! মোটে পাঁচ-ছয় বছরের। আমার বয়স তখন আট-ন'  
বছর, একদিন গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বললুম, আজ থেকে তুমি  
হ'লে আমার বর! বর! বর! এই বলিয়া আমাকে ইঙিতে দেখাইয়া কহিল, কিন্তু  
ও-রাক্ষস তক্ষুনি আমার মালা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে ফেললে।

কমললতা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ফুলের মালা খেয়ে ফেললে কি  
করে?

আমি বলিলাম, ফুলের মালা নয়, পাকা বঁইচিফলের মালা। সে যাকে  
দেবে সেই খেয়ে ফেলবে।

কমলনতা হাসিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু সেই থেকে শুরু  
হ'লো—আমার দুগ্ধি। ওঁকে ফেললুম হারিয়ে, তার পরের কথা আর জানতে  
চেয়ো না দিদি—কিন্তু লোকে যা ভাবে তাও না—তারা কত কি-ই না ভাবে! তার  
পরে অনেকদিন কেঁদে কেঁদে হাতড়ে বেড়ালাম খুঁজে খুঁজে—তখন ঠাকুরের দয়া  
হ'লো—যেমন নিজে দিয়েও হঠাত একদিন কেড়ে নিয়াছিলেন, তেমনি অকস্মাত  
আর একদিন হাতে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। এই বলিয়া সে উদ্দেশে তাঁহাকে  
প্রণাম করিল।

কমলনতা বলিল, সেই ঠাকুরের মালা-চন্দন বড়গোঁসাই দিয়েচেন  
পাঠিয়ে, আজ ফিরে যাবার দিনে তোমরা দু'জনকে দু'জনে পরিয়ে দাও।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, ওঁর ইচ্ছে উনি জানেন, কিন্তু আমাকে  
ও আদেশ ক'রো না। আমার ছেলেবেলার সে রাঙ্গা মালা আজও চোখ বুজলে  
ওঁর সেই কিশোর গলায় দুলচে দেখতে পাই। ঠাকুরের দেওয়া আমার সেই  
মালাই চিরদিন থাক দিদি।

বলিলাম, কিন্তু সে মালা ত খেয়ে ফেলেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁগো রাক্ষস—এইবার আমাকে সুন্দ খাও। এই বলিয়া  
সে হাসিয়া চন্দনের বাটিতে সব কয়টি আঙুল ডুবাইয়া আমার কপালে ছাপ  
মারিয়া দিল।

সকলে দ্বারিকাদাসের ঘরে গেলাম দেখা করিতে। তিনি কি একটা  
গৃহপাঠে নিযুক্ত ছিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, এসো ভাই, ব'সো।

রাজলক্ষ্মী মেজেতে বসিয়া বলিল, বসবার যে আর সময় নেই গোঁসাই।  
অনেক উপদ্রব করেছি, যাবার আগেই তাই নমস্কার জানিয়ে তোমার ক্ষমা-ভিক্ষে  
করতে এলুম।

গোঁসাই বলিলেন, আমরা বৈরাগী মানুষ, ভিক্ষে নিতেই পারি, দিতে পারব  
না ভাই। কিন্তু আবার কবে উপদ্রব করতে আসবে বল ত দিদি? আশ্রমটি যে  
আজ অন্ধকার হয়ে যাবে।

কমললতা বলিল, সত্যি কথা গোঁসাই—সত্যিই মনে হবে বুঝি আজ  
কোথাও আলো জ্বলেনি, সব অন্ধকার হয়ে আছে।

বড়গোঁসাই বলিলেন, গানে, আনন্দে, হাসিতে, কৌতুকে এ কয়দিন মনে  
হচ্ছিল যেন চারিদিকে আমাদের বিদ্যুতের আলো জ্বলচে—এমন আর কখনো  
দেখিনি। আমাকে বলিলেন, কমললতা নাম দিয়েচে নতুনগোঁসাই, আর নাম  
দিলাম আজ আনন্দময়ী—

এইবার তাঁহার উচ্ছ্বাসে আমাকে বাধা দিতে হইল, বলিলাম, বড়গোঁসাই,  
বিদ্যুতের আলোটাই তোমাদের চোখে লাগল, কিন্তু কড়কড় ধ্বনি যাদের দিবারাত্রি  
কর্ণরঞ্জে পশে তাদের একটু জিজ্ঞাসা ক'রো। আনন্দময়ীর সম্বন্ধে, অন্ততঃ  
রতনের মতামতটা—

রতন পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ওদের কথা তুমি শুনো না গোঁসাই, ওরা দিনরাত আমায়  
হিংসে করে। আমার পানে চাহিয়া কহিল, এবার যখন আসব এই রোগা-পটকা  
অরসিক লোকটিকে ঘরে তালাবন্ধ করে আসব—ওর জ্বালায় কোথাও গিয়ে যদি  
আমার স্বষ্টি আছে!

বড়গোঁসাই বলিলেন, পারবে না আনন্দময়ী—পারবে না। ফেলে আসতে  
পারবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, নিশ্চয় পারব। সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছে হয় গোঁসাই,  
যেন আমি শীগ্নির মরি।

বড়গোঁসাই বলিলেন, এ ইচ্ছে ত বৃন্দাবনে একদিন তাঁর মুখেও প্রকাশ  
পেয়েছে ভাই, কিন্তু পারেন নি। হাঁ, আনন্দময়ী কথাটি তোমার কি মনে নেই?  
সাথি! কারে দিয়ে যাব, তারা কানুসেবার কিবা জানে—

বলিতে বলিতে তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, সত্য  
প্রেমের কতটুকুই বা জানি আমরা? কেবল ছলনায় নিজেদের ভোলাই বৈ ত নয়!  
কিন্তু তুমি জানতে পেরেছ ভাই। তাই বলি, তুমি যেদিন এ প্রেম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ  
করবে আনন্দময়ী—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন শিহরিয়া উঠিল, ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া  
বলিল, এমন আশীর্বাদ ক'রো না গোঁসাই, এ যেন না কপালে ঘটে। বরঞ্চ  
আশীর্বাদ করো এমনি হেসেখেলেই একদিন যেন ওঁকে রেখে মরতে পারি।

কমললতা কথাটা সামলাইয়া লইতে বলিল, বড়গোঁসাই তোমার  
ভালবাসার কথাটাই বলেছেন রাজু, আর কিছু নয়।

আমিও বুবিয়াছিলাম অনুক্ষণ অন্য ভাবের ভাবুক দ্বারিকাদাস—তাঁহার  
চিন্তার ধারাটা সহসা আর এক পথে চলিয়া গিয়াছিল মাত্র।

রাজলক্ষ্মী শুক্ষমুখে বলিল, একে ত এই শরীর, তাতে একটা না একটা  
অসুখ লেগেই আছে—একগুঁয়ে লোক, কারও কথা শুনতে চান না—আমি দিনরাত  
কি ভয়ে ভয়েই যে থাকি দিদি, সে আর জানাব কাকে?

এইবার মনে মনে আমি উদ্বিঘ্ন হইয়া উঠিলাম, যাবার সময়ে কথায় কথায়  
কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার ঠিকানা নাই। আমি জানি,  
আমাকে অবহেলায় বিদায় দেওয়ার যে মর্মান্তিক আত্মানি লইয়া এবার রাজলক্ষ্মী  
কাশী হইতে আসিয়াছে, সর্বপ্রকার হাস্যপরিহাসের অন্তরালেও কি একটা অজানা  
কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার মন হইতে কিছুতেই ঘূঁটিতেছে না। সেইটা শান্ত  
করার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিলাম, তুমি যতই কেননা লোকের কাছে আমার

রোগাদেহের নিন্দে করো লক্ষ্মী, এ দেহের বিনাশ নেই। আগে তুমি না মরলে আমি মরচি নে এ নিশ্চয়—

কথাটা সে শেষ করিতেও দিল না, খপ্ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এঁদের সামনে তবে তিনসত্ত্ব করো। বলো এ কথা কখনো মিথ্যে হবে না। বলিতে বলিতেই উদ্গত অশ্রুতে দুই চক্ষু তাহার উপচাইয়া উঠিল।

সবাই অবাক হইয়া রহিল। তখন লজ্জায় হাতটা আমার সে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিয়া জোর করিয়া হসিয়া বলিল, ঐ পোড়ারমুখো গোণকারটা মিছিমিছি আমাকে এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে—

এ কথাটাও সে সম্পূর্ণ করিতে পারিল না এবং মুখের হাসি ও লজ্জার বাধা সত্ত্বেও ফৌঁটা-দুই চোখের জল তাহার গালের উপরে গড়াইয়া পড়িল।

আবার একবার সকলের কাছে একে একে বিদায় লওয়া হইল। বড়গোঁসাই কথা দিলেন এবার কলিকাতায় গেলে আমাদের ওখানে তিনি পদার্পণ করিবেন এবং পদ্মা কখনো শহর দেখে নাই, সেও সঙ্গে যাইবে।

স্টেশনে পৌঁছাইয়া সর্বাগ্রে চোখে পড়িল সেই ‘পোড়ারমুখো গোণকার’ লোকটাকে। প্লাটফর্মে কম্বল পাতিয়া বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, আশেপাশে লোকও জুটিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ও সঙ্গে যাবে নাকি?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ হাসি আর একদিকে চাহিয়া গোপন করিল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল, সেও সঙ্গে যাইবে।

বলিলাম, না, ও যাবে না।

কিন্তু ভালো না হোক, মন্দ কিছু ত হবে না! আসুক না সঙ্গে।

বলিলাম, না, ভালোমন্দ যাই হোক ও আসবে না। ওকে যা দেবার দিয়ে  
এখান থেকেই বিদায় করো, ওর গ্রহণাত্ম করার ক্ষমতা এবং সাধুতা যদি থাকে  
যেন তোমার চোখের আড়ালেই করে।

তবে তাই বলে দিই, এই বলিয়া সে রতনকে দিয়া তাহাকে ডাকাইতে  
পাঠাইল। তাহাকে কি দিল জানি না, কিন্তু সে অনেকবার মাথা নাড়িয়া ও অনেক  
আশীর্বাদ করিয়া সহাস্যমুখে বিদায় গ্রহণ করিল।

অন্তিমিলস্বে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতা অভিমুখে আমরাও  
যাত্রা করিলাম।

## বার

রাজলক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তরে আমার অর্থাগমের বৃত্তান্তটা প্রকাশ করিতে হইল। আমাদের বর্মা-অফিসের একজন বড়দরের সাহেব ঘোড়দৌড়ের খেলায় সর্বস্ব হারাইয়া আমার জমানো টাকা ধার লইয়াছিলেন। নিজেই শর্ত করিয়াছিলেন, শুধু সুদ নয়, সুদিন যদি আসে মুনাফার অর্ধেক দিবেন। এবার কলিকাতায় আসিয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইলে তিনি কর্জের চতুর্ণণ ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই আমার সম্মত।

সেটা কত?

আমার পক্ষে অনেক, কিন্তু তোমার কাছে অতিশয় তুচ্ছ।

কত শুনি?

সাত-আট হাজার।

এ আমাকে দিতে হবে।

সভয়ে কহিলাম, সে কি কথা! লক্ষ্মী দানই করেন, তিনি হাতও পাতেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী সহায়ে কহিল, লক্ষ্মীর অপব্যয় সয় না। তিনি সন্ধ্যাসী ফকিরকে বিশ্বাস করেন না—তারা অযোগ্য বলে। আনো টাকা।

কি করবে?

করব আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান। এখন থেকে এই হবে আমার বাঁচবার মূলধন।

কিন্তু এটুকু মূলধনে চলবে কেন? তোমার একপাল দাসী-চাকরের পনর দিনের মাইনে দিতেই যে কুলোবে না। এর ওপর আছে গুরু-পুরুত, আছে

তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা, আছে বহু বিধবার ভরণপোষণ—তাদের উপায় হবে কি?

তাদের জন্য ভাবনা নেই, তাদের মুখ বন্ধ হবে না। আমার নিজের ভরণপোষণের কথাই ভাবচি বুঝলে?

বলিলাম, বুঝেচি। এখন থেকে কোন একটা ছলনায় আপনাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও—এই ত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না তা নয়। সে-সব টাকা রইল অন্য কাজের জন্যে, কিন্তু তোমার কাছে হাত পেতে যা নেব এখন থেকে সেই হবে আমার ভবিষ্যতের পুঁজি। কুলোয় খাব, না হয় উপোস করব।

তা হলে তোমার অদৃষ্টে তাই আছে।

কি আছে—উপোস? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তুমি ভাবচ সামান্য, কিন্তু সামান্যকেই কি করে বাড়িয়ে বড় করে তুলতে হয় সে বিদ্যে আমি জানি। একদিন বুঝবে আমার ধনের সম্বন্ধে তোমরা যা সন্দেহ কর তা সত্যি নয়।

এ কথা এতদিন বলোনি কেন?

বলিনি বিশ্বাস করবে না বলে। আমার টাকা তুমি ঘূণায় ছোঁও না, কিন্তু তোমার বিত্তঘায় আমার বুক ফেটে যায়।

ব্যথিত হইয়া কহিলাম, হঠাৎ এ-সব কথা আজ কেন বলচ লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আজ হঠাৎ ঠেকবে, কিন্তু এ যে আমার রাত্রিদিনের ভাবনা। তুমি কি ভাবো অধর্মপথের উপার্জন দিয়ে আমি ঠাকুর-দেবতার সেবা করি? সে অর্থের এককণা তোমার চিকিৎসায় খরচ করলে তোমাকে কি বাঁচাতে পারতুম? ভগবান আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতেন। আমি যে তোমারই এ কথা সত্যি বলে তুমি বিশ্বাস কর কই?

বিশ্বাস করি ত!

না, করো না।

তাহার প্রতিবাদের তাৎপর্য বুঝিলাম না। সে বলিতে লাগিল, কমললতার সঙ্গে পরিচয় তোমার দু'দিনের, তবু তার সমস্ত কাহিনী তুমি মন দিয়ে শুনলে, তোমার কাছে তার সকল বাধা ঘূচলো—সে মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করলে না কোন কথা, কখনো বললে না, লক্ষ্মী, তোমার সব ঘটনা আমাকে খুলে বল। কেন জিজ্ঞাসা করনি? করনি ভয়ে। তুমি বিশ্বাস কর না আমাকে, তুমি বিশ্বাস করতে পারো না আপনাকে।

বলিলাম, তাকেও জিজ্ঞাসা করিনি, জানতেও চাইনি। নিজে সে জোর করে শুনিয়েছে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত শুনেচ। সে পর, তার বৃত্তান্ত শুনতে চাওনি প্রয়োজন নেই বলে। আমাকেও কি তাই বলবে নাকি?

না, তা বলব না। কিন্তু তুমি কি কমললতার চেলা? সে যা করচে তোমাকেও তাই করতে হবে?

ও-কথায় আমি ভুলব না। আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে।

এ ত বড় মুক্ষিল! আমি চাইনে শুনতে, তবু শুনতেই হবে?

হাঁ, হবে। তোমার ভাবনা, শুনলে হয়ত আমাকে আর ভালোবাসতে পারবে না, হয়ত বা আমাকে বিদায় দিতে হবে।

তোমার বিবেচনায় সেটা তুচ্ছ ব্যাপার নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না, সে হবে না—তোমাকে শুনতেই হবে। তুমি পুরুষমানুষ, তোমার মনে এটুকু জোর নেই যে, উচিত মনে হলে আমাকে দূর করে দিতে পার?

এই অক্ষমতা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া করুল করিয়া বলিলাম, তুমি যে-সকল জোরালো পুরুষদের উল্লেখ করে আমাকে অপদস্থ কোরচ লক্ষ্মী, তাঁরা বীরপুরুষ—নমস্য ব্যক্তি, তাঁদের পদধূলির যোগ্যতা আমার নেই। তোমাকে বিদায়

দিয়ে একটা দিনও আমি থাকতে পারব না, হয়ত তখনি ফিরিয়ে আনতে দৌড়াব  
এবং তুমি ‘না’ বলে বসলে আমার দুগ্ধতির অবধি থাকবে না। অতএব, এ সকল  
ভয়াবহ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ কর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি জানো, ছেলেবেলায় মা আমাকে এক মৈথিলী  
রাজপুত্রের হাতে বিক্রি করে দিয়েছিলেন?

হাঁ, আর এক রাজপুত্রের মুখে খবরটা শুনেছিলাম অনেককাল পরে। সে  
ছিল আমার বন্ধু।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁ, তোমার বন্ধুরই বন্ধু ছিল সে। একদিন মাকে রাগ  
করে বিদায় করে দিলুম, তিনি দেশে ফিরে এসে রটালেন আমার মৃত্যু। এ খবর  
ত শুনেছিলে?

হাঁ, শুনেছিলাম।

শুনে তুমি কি ভাবলে?

ভাবলাম, আহা! লক্ষ্মী মরে গেল!

এই? আর কিছু না?

আরও ভাবলাম, কাশীতে মরে তবু যা হোক একটা সদ্গতি হ'লো।  
আহা!

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল,—যাও—মিথ্যে আহা! আহা! করে তোমাকে  
দুঃখ জানাতে হবে না। তুমি একটা ‘আহা’ও বলোনি আমি দিব্যি করে বলতে  
পারি। কই, আমাকে ছুঁয়ে বল ত?

বলিলাম, এতদিন আগেকার কথা কি ঠিক মনে থাকে? বলেছিলাম বলেই  
যেন মনে পড়চে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, থাক কষ্ট করে অতদিনের পুরানো কথা আর মনে করে  
কাজ নেই, আমি সব জানি। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া থাকিয়া বলিল,  
আর আমি? কেঁদে কেঁদে বিশ্বনাথকে প্রত্যহ জানাতুম, ভগবান, আমার অদৃষ্টে এ

তুমি কি করলে! তোমাকে সাক্ষী রেখে যাঁর গলায় মালা দিয়েছিলুম, এ জীবনে  
তাঁর দেখা কি কখনো পাব না? এমনি অশুচি হয়েই চিরকাল কাটবে? সেদিনের  
কথা মনে পড়লে আজও আমার আত্মহত্যা করে মরতে ইচ্ছে করে।

তাহারা মুখের প্রতি চাহিয়া ক্লেশ বোধ হইল, কিন্তু আমার নিষেধ শুনিবে  
না বুবিয়া মৌন হইয়া রাখিলাম।

এই কথাগুলি সে অন্তরে অন্তরে কতদিন কতভাবে তোলাপাড়া করিয়াছে,  
আপন অপরাধে ভারাক্রান্ত মন নীরবে কত মর্মান্তিক বেদনাই সহ্য করিয়াছে,  
তবু প্রকাশ পাইতে ভরসা পায় নাই পাছে কি করিতে কি হইয়া যায়। এতদিনে  
এই শক্তি অর্জন করিয়া আসিয়াছে সে কমলগতার কাছে। বৈষ্ণবী আপন প্রচলন  
কলুষ অনাবৃত করিয়া মুক্তি পাইয়াছে, রাজলক্ষ্মী নিজেও আজ ভয় ও মিথ্যা  
মর্যাদার শিকল ছিঁড়িয়া তাহারি মত সহজ হইয়া দাঁড়াইতে চায়, অদৃষ্টে তাহার  
যাহাই কেননা ঘটুক। এ বিদ্যা দিয়াছে তাহাকে কমলগতা। সংসারে একটিমাত্র  
মানুষের কাছেও যে এই দর্পিতা নারী হেঁট হইয়া আপন দুঃখের সমাধান ভিক্ষা  
করিয়াছে এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া মনের মধ্যে ভারি একটি তৃপ্তি  
বোধ করিলাম।

উভয়েই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া রাজলক্ষ্মী সহসা বলিয়া উঠিল,  
রাজপুত্র হঠাৎ মারা গেলেন, কিন্তু মা আবার চক্রান্ত করলেন আমাকে বিক্রি  
করার—

এবার কার কাছে?

অপর একটি রাজপুত্র—তোমার সেই বন্ধুরত্নটি—যাঁর সঙ্গে শিকার করতে  
গিয়ে—কি হ'লো মনে নেই?

বলিলাম, নেই বোধ হয়। অনেকদিনের কথা কিনা। কিন্তু তার পরে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ষড়যন্ত্র খাটলো না। বললুম, মা তুমি বাড়ি যাও। মা  
বললেন, হাজার টাকা নিয়েচি যে। বললুম, সে টাকা নিয়ে তুমি দেশে যাও,

দালালির টাকা যেমন করে পারি আমি শোধ দেব। বললুম, আজ রাত্রির গাড়িতেই  
যদি বিদায় না হও মা, কাল সকালেই দেব আমি আপনাকে আপনি বিক্রি করে  
মা-গঙ্গার জলে। জানো ত মা আমাকে, আমি মিথ্যে ভয় তোমাকে দেখাচ্ছি না।  
মা বিদেয় হলেন। তাঁর মুখেই আমার মরণ-সংবাদ পেয়ে তুমি দুঃখ করে  
বলেছিলে—আহা! মরে গেল! এই বলিয়া সে নিজেই একটুখানি হাসিল, বলিল,  
সত্য হলে তোমার মুখের সেই ‘আহা’টুকুই আমার তের। কিন্তু এবার যেদিন  
সত্যসত্যিই মরব সেদিন কিন্তু দু’ফোঁটা চোখের জল ফেলো।

ব’লো, পৃথিবীতে অনেক বর-বধূ অনেক মালাবদল করেছে, তাদের প্রেমে  
জগৎ পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন’বছর  
বয়সের সেই কিশোর বরটিকে একমনে যত ভালবেসেছে এ সংসারে তত ভালো  
কেউ কোনদিন কাউকে বাসেনি। আমার কানে কানে তখন বলবে বলো এই  
কথাগুলি? আমি মরেও শুনতে পাব।

একি, তুমি কাঁদচো যে!

সে চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, নিরূপায় ছেলেমানুষের  
ওপর তার আত্মীয়স্বজন যত অত্যাচার করেছে, অন্তর্যামী ভগবান কি তা দেখতে  
পাননি ভাবো? এর বিচার তিনি করবেন, না, চোখ বুজেই থাকবেন?

বলিলাম, থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি। কিন্তু তাঁর ব্যাপার তোমরাই  
ভালো জানো, আমার মত পাষণ্ডের পরামর্শ তিনি কোনকালেই নেন না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কেবল ঠাট্টা! কিন্তু পরক্ষণেই গন্তীর হইয়া কহিল,  
আচ্ছা, লোকে যে বলে স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম এক না হলে চলে না, কিন্তু ধর্মেকর্মে  
তোমার-আমার ত সাপে-নেউলে সম্পর্ক। আমাদের তবে চলে কি করে?

চলে সাপে-নেউলের মতই। একালে প্রাণে বধ করায় হঙ্গামা আছে, তাই  
একজন আর একজন বধ করে না, নির্মম হয়ে বিদায় করে দেয়, যখন আশঙ্কা  
হয় তার ধর্মসাধনায় বিঘ্ন ঘটচে।

তার পরে কি হয়?

হাসিয়া বলিলাম, তার পরে সে নিজেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে।  
নাকখত দিয়ে বলে আমার অনেক শিক্ষা হয়েচে, এ জীবনে এত ভুল আর করব  
না, রইল আমার জপতপ, গুরু-পুরুত—আমাকে ক্ষমা কর।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল, কহিল, ক্ষমা পায় ত?

পায়। কিন্তু তোমার গল্পের কি হ'লো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বলচি। ক্ষণকাল নিষ্পলকচক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া  
থাকিয়া বলিল, মা দেশে চলে গেলেন। আমাকে একজন বুড়ো ওস্তাদ গান-বাজনা  
শেখাতেন, লোকটি বাঙালী, এককালে সম্ম্যাসী ছিলেন, কিন্তু ইস্তফা দিয়ে আবার  
সংসারী হয়েছিলেন। তাঁর ঘরে ছিল মুসলমান স্ত্রী, তিনি শেখাতে আসতেন  
আমাকে নাচ! তাঁকে বলতুম আমি, দাদামশাই—আমাকে সত্যিই বড়  
ভালোবাসতেন। কেঁদে বললুম, দাদামশাই, আমাকে তুমি রক্ষে কর, এ-সব আর  
আমি পারব না। তিনি গরীব লোক, হঠাৎ সাহস করলেন না। আমি বললুম,  
আমার যে টাকা আছে তাতে অনেকদিন চলে যাবে। তারপর কপালে যা আছে  
হবে, এখন কিন্তু পালাই চলো। তারপরে তাঁদের সঙ্গে কত জায়গায় ঘূরলুম—  
এলাহাবাদ, লক্ষ্মী, দিল্লী, আগরা, জয়পুর, মথুরা—শেষে আশ্রয় নিলুম এসে  
পাটনায়। অর্ধেক টাকা জমা দিলুম এক মহাজনের গদীতে, আর অর্ধেক টাকা  
দিয়ে ভাগে খুললুম একটা মনোহারী আর একটা কাপড়ের দোকান। বাড়ি কিনে  
খোঁজ করে বন্ধুকে আনিয়ে নিয়ে দিলুম তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে, আর জীবিকার  
জন্যে যা করতুম সে ত তুমি নিজের চেথেই দেখেচ।

তাহার কাহিনী শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তারপরে বলিলাম,  
তুমি বলেই অবিশ্বাস হয় না—আর কেউ হলে মনে হ'তো মিথ্যা বানানো একটা  
গল্প শুনচি মাত্র।

রাজলক্ষ্মী বলিল, মিথ্যে বলতে বুঝি আমি পারিনে?

বলিলাম, পার হয়ত, কিন্তু আমার কাছে আজও বলোনি বলেই আমার  
বিশ্বাস।

এ বিশ্বাস কেন?

কেন! তোমার ভয়, মিথ্যে ছলনায় পাছে কোন দেবতা রংষ্ট হন। তোমাকে  
শাস্তি দিতে পাছে আমার অকল্যাণ করেন।

আমার মনের কথাই বা তুমি জানলে কি করে?

আমার মনের কথাই বা তুমি জানতে পারো কি করে?

আমি পারি এ আমার দিবানিশির ভাবনা বলে, কিন্তু তোমার ত তা নয়।

হলে খুশি হও?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হইনে। আমি তোমার দাসী, দাসীকে  
তার চেয়ে বেশি ভাববে না, এই আমি চাই।

উভরে বলিলাম, সেই সে-যুগের মানুষ তুমি—সেই হাজার বছরের  
পুরানো সংস্কার।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাই যেন আমি হ'তে পারি। এমনই যেন চিরদিন  
থাকি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ যুগের  
মেয়েদের আমি দেখিনি তুমি ভাবচো? অনেক দেখেচি। বরঞ্চ তুমই দেখিনি,  
কিংবা দেখেচো কেবল বাইরে থেকে। এদের কারূর সঙ্গে আমাকে বদল করো  
ত দেখি কেমন থাকতে পার? আমাকে ঠাট্টা করছিলে নাকথত দিয়েচি বলে,  
তখন তুমি দেবে দশ হাত মেপে নাকে খত।

কিন্তু এ মীমাংসা যখন হবার নয় তখন ঝগড়া করে লাভ নেই। কেবল  
এইটুকু বলতে পারি, এঁদের সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত অবিচার করেচ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, অবিচার যদি করেও থাকি অত্যন্ত অবিচার করিনি তা  
বলতে পারি। ওগো গোঁসাই, আমিও যে অনেক ঘুরেচি, অনেক দেখেচি। তোমরা  
যেখানে অন্ধ, সেখানেও যে আমাদের দশজোড়া চোখ খোলা।

কিন্তু সে দেখেচো রঙীন চশমা দিয়ে, তাই সমস্ত ভুল দেখেচো।  
দশজোড়াই ব্যর্থ।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, কি বোলব আমার হাত-পা বাঁধা—নইলে এমন  
জন্ম করতাম যে জন্মে ভুলতে না। কিন্তু সে থাক গে, আমি সে-যুগের মত  
তোমার দাসী হ'য়েই যেন থাকি, তোমার সেবাই যেন হয় আমার সবচেয়ে বড়  
কাজ। কিন্তু তোমাকে আমার কথা ভাবতে আমি একটুও দেব না। সংসারে  
তোমার অনেক কাজ—এখন থেকে তাই করতে হবে। হতভাগীর জন্মে তোমার  
অনেক সময় এবং আরও অনেক কিছু গেছে—আর নষ্ট করতে আমি দেব না।

বলিলাম, এই জন্মেই ত আমি যত শীত্র পারি সেই সাবেক চাকরিতে  
গিয়ে ভর্তি হতে চাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাকরি করতে তোমাকে ত দিতে পারব না।

কিন্তু মনোহারী দোকান চালাতেও ত আমি পেরে উঠব না।

কেন পেরে উঠবে না?

প্রথম কারণ, জিনিসের দাম আমার মনে থাকে না, দ্বিতীয় কারণ দাম  
নেওয়া এবং দ্রুত হিসেব করে বাকি ফিরিয়ে দেওয়া সে আরও অসম্ভব। দোকান  
ত উঠবেই, খদ্দেরের সঙ্গে লাঠালাঠি না বাধলে বাঁচি।

তবে একটা কাপড়ের দোকান কর?

তার চেয়ে একটা জ্যান্ত বাঘ-ভালুকের দোকান করে দাও, সে বরঞ্চ  
চালানো সহজ হবে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, একমনে এত আরাধনা করে কি শেষে  
ভগবান এমনি একটা অকর্মা মানুষ আমাকে দিলেন, যাকে নিয়ে সংসারে এতটুকু  
কাজ চলে না।

বলিলাম, আরাধনার ক্রটি ছিল। সংশোধনের সময় আছে, এখনো কর্মঠ  
লোক তোমার মিলতে পারে। বেশ সুপুষ্ট নীরোগ বেঁটেখাটো জোয়ান, যাকে কেউ

হারাতে কেউ ঠকাতে পারবে না, যাকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, হাতে  
টাকাকড়ি দিয়ে নির্ভয়, যাকে খবরদারি করতে হবে না, ভিড়ের মধ্যে যাকে  
হারিয়ে ফেলবার উৎকর্থা নেই, যাকে সাজিয়ে তৃষ্ণি, খাইয়ে আনন্দ—হাঁ ছাড়া যে  
না বলতে জানে না—

রাজলক্ষ্মী নির্বাকমুখে আমার প্রতি চাহিয়াছিল, অকস্মাত সর্বাঙ্গে তাহার  
কাঁটা দিয়া উঠিল।

বলিলাম, ও কি ও?

না, কিছু না।

তবে শিউরে উঠলে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মুখে মুখে যে ছবি তুমি আঁকলে তার অর্ধেক সত্ত্ব  
হলেও বোধ হয় আমি ভয়ে মরে যাই।

কিন্তু আমার মত এমন অকর্মা লোক নিয়েই বা তুমি করবে কি?

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া বলিল, করবো আর কি! ভগবানকে অভিসম্পাত  
করবো, আর চিরকাল জ্বলেপুড়ে মরবো। এ-জন্মে আর ত কিছু চোখে দেখিনে।

এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে মুরারিপুর আখড়ায় পাঠিয়ে দাও না কেন?

তাদেরই বা তুমি কি উপকার করবে?

তাদের ফুল তুলে দেব। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যতদিন বাঁচি থাকব,  
তারপরে তারা দেবে আমাকে সেই বকুলতলায় সমাধি। ছেলেমানুষ পদ্মা কোন্  
সন্ধ্যায় দিয়ে যাবে প্রদীপ জ্বেলে, কখনো বা তার ভুল হবে—সে সন্ধ্যায় আলো  
জ্বলবে না। ভোরের ফুল তুলে তারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমললতা,  
কোনোদিন বা দেবে সে একমুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে, কোনোদিন বা দেবে কুন্দ।  
আর পরিচিত যদি কেউ কখনো আসে পথ ভুলে, তাকে দেখিয়ে বলবে, ঐখানে  
থাকে আমাদের নতুনগোঁসাই। ঐ যে একটু উঁচু—ঐ যেখানটায় শুকনো মল্লিকা-  
কুন্দ-করবীর সঙ্গে মিশে ঝরা-বকুলে সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিঙ্গাসা করিল, আর সেই  
পরিচিত লোকটি কি করবে তখন?

বলিলাম, সে আমি জানিনে। হয়ত অনেক টাকা খরচ করে মন্দির বানিয়ে  
দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, হ'লো না। সে বকুলতলা ছেড়ে আর যাবে না।  
গাছের ডালে ডালে করবে পাখিরা কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই—কত  
বারিয়ে ফেলবে শুকনো পাতা, শুকনো ডাল, সে-সব মুক্ত করার কাজ থাকবে  
তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে  
শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব-কবিদের গান, তারপর সময় হলে ডেকে বলবে,  
কমললতাদিদি, আমাদের এক করে দিয়ো সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন  
আলাদা বলে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিয়ো মন্দির গড়িয়ে, ক’রো  
রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখো না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন—কেউ  
না জানে কেই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।

বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার ছবিটি যে হ'লো আরও মধুর, আরও সুন্দর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ত কেবল কথা গেঁথে ছবি নয় গোঁসাই, এ যে সত্যি।  
তফাং যে ঐখানে! আমি পারব, কিন্তু তুমি পারবে না। তোমার আঁকা কথার ছবি  
শুধু কথা হয়েই থাকবে।

কি করে জানলে?

জানি। তোমার নিজের চেয়েও বেশি জানি। এই ত আমার পুজো, এই ত  
আমার ধ্যান। আঙ্কিক শেষ করে কার পায়ে দিই জলাঞ্জলি? কার পায়ে দিই  
ফুল? সে ত তোমারই।

নীচে হইতে মহারাজের ডাক আসিল, মা, রতন নেই, চায়ের জল তৈরি  
হয়ে গেছে।

যাই বাবা, বলিয়া সে চোখ মুছিয়া তখনি উঠিয়া গেল।

খানিক পরে চায়ের বাটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে রাখিয়া  
দিয়া বলিল, তুমি বই পড়তে এত ভালোবাসো, এখন থেকে তাই কেন করো  
না?

তাতে টাকা ত আসবে না?

কি হবে টাকায়? টাকা ত আমাদের অনেক আছে।

একটু থামিয়া বলিল, উপরের ঐ দক্ষিণের ঘরটা হবে তোমার পড়ার  
ঘর। আনন্দ ঠাকুরপো আনবে বই কিনে, আর আমি সাজিয়ে তুলব আমার মনের  
মত করে। ওর একপাশে থাকবে আমার শোবার ঘর, অন্যপাশে হবে আমার  
ঠাকুরঘর। এ জন্মে রইল আমার ত্রিভুবন—এর বাইরে যেন না কখনো দৃষ্টি যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার রান্নাঘর? আনন্দ সন্ধ্যাসী-মানুষ, ওখানে চোখ  
না দিলে যে তাকে একটা দিনও রাখা যাবে না, কিন্তু তার সন্ধান পেলে কি  
করে? কবে আসবে সে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ধান দিয়েছেন কুশারীমশাই—আনন্দ আসবে বলেচে  
খুব শীঘ্ৰ, তারপরে সকলে মিলে যাব গঙ্গামাটিতে—থাকব সেখানে কিছুদিন।

বলিলাম, তা যেন গেলে, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে এবার তোমার লজ্জা  
করবে না?

রাজলক্ষ্মী কুণ্ঠিতহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু তারা ত কেউ জানে না  
কাশীতে আমি নাক-চুল কেটে সঙ্গ সেজেছিলুম? চুল আমার অনেকটা বেড়েচে,  
আর নাক গেছে বেমালুম জুড়ে—দাগটুকু পর্যন্ত নেই। আর তুমি যে আছ সঙ্গে,  
আমার সব অন্যায় সব লজ্জা মুছে দিতে।

একটু থামিয়া বলিল, খবর পেয়েছি সে হতভাগী মালতীটা এসেছে ফিরে,  
সঙ্গে এনেছে তার স্বামীকে। আমি তারে দেব একটা হার গড়িয়ে।

বলিলাম, তা দিয়ো, কিন্তু আবার গিয়ে যদি সুনন্দার পাণ্ডায় পড়—

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବଲିଯା ଉଠିଲ, ନା ଗୋ ନା, ସେ ଭୟ ଆର ନେଇ, ତାର ମୋହ ଆମାର କେଟେଚେ । ବାପରେ ବାପ; ଏମନି ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି ଦିଲେ ଯେ ଦିନେରାତେ ନା ପାରି ଚୋଖେର ଜଳ ଥାମାତେ, ନା ପାରି ଖେତେ ଶୁତେ । ପାଗଳ ହଯେ ଯେ ଯାଇନି ଏହି ତେର । ଏହି ବଲିଯା ସେ ହାସିଯା କହିଲ, ତୋମାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆର ଯା-ଇ ହୋକ, ଅଷ୍ଟିର ମନେର ଲୋକ ନଯ । ସେ ସତି ବ'ଲେ ଏକବାର ସିଂହା ବୁଝାବେ ତାକେ ଆର କେଉ ଟଳାତେ ପାରବେ ନା । ଏକଟୁଖାନି ନୀରବ ଥାକିଯା ପୁନଶ୍ଚ ବଲିଲ, ଆମାର ସମସ୍ତ ମନଟି ଯେଣ ଏଥିନ ଆନନ୍ଦେ ଡୁବେ ଆଛେ, ସବ ସମୟେଇ ମନେ ହୟ ଏ ଜୀବନେର ସମସ୍ତ ପେଯେଛି, ଆର ଆମାର କିଛୁ ଚାଇନେ । ଏ ଯଦି ନା ଭଗବାନେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୟ ତ ଆର କି ହବେ ବଲ ତ? ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରେ ଠାକୁରେର ଚରଣେ ନିଜେର ଜନ୍ୟେ ଆର କିଛୁ କାମନା କରିଲେ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏମନି ଆନନ୍ଦ ଯେଣ ସଂସାରେ ସବାଇ ପାଯ । ତାଇ ତ ଆନନ୍ଦ-ଠାକୁରପୋକେ ଡେକେ ପାଠିଯେଛି ତାର କାଜେ ଏଥିନ ଥେକେ କିଛୁ କିଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରବୋ ବଲେ ।

ବଲିଲାମ, କ'ରୋ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେର ମନେ କି ଭାବିତେ ଲାଗିଲ, ସହସା ବଲିଯା ଉଠିଲ, ଦ୍ୟାଖୋ, ଏହି ସୁନନ୍ଦା ମେଯେଟିର ମତ ଏମନ ସ୍ବ, ଏମନ ନିର୍ଲୋଭ, ଏମନ ସତ୍ୟବାଦୀ ମେଯେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଓର ବିଦ୍ୟେର ଝାଁଜ ଯତଦିନ ନା ମରବେ ତତଦିନ ଓ-ବିଦ୍ୟେ କାଜେ ଲାଗବେ ନା ।

କିନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦାର ବିଦ୍ୟେର ଦର୍ପ ତ ନେଇ ।

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲିଲ, ନା, ଇତରେର ମତ ନେଇ—ଆର ସେ-କଥାଓ ଆମି ବଲିନି । ଓ କତ ଶ୍ଲୋକ, କତ ଶାନ୍ତି-କଥା, କତ ଗଙ୍ଗ-ଉପାଖ୍ୟାନ ଜାନେ, ଓର ମୁଖେ ଶୁଣେ ଶୁଣେଇ ତ ଆମାର ଧାରଣା ହେବେଛିଲ ଆମି ତୋମାର କେଉ ନଇ, ଆମାଦେର ସମ୍ବନ୍ଧ ମିଥ୍ୟେ—ଆର ତାଇ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ଚେଯେଛିଲୁମ—କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମାକେ ଘାଡ଼େ ଧରେ ବୁଝିଯେ ଦିଲେନ ଏର ଚେଯେ ମିଥ୍ୟେ ଆର ନେଇ । ତବେଇ ଦ୍ୟାଖୋ ଓର ବିଦ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ କୋଥାଯା ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ଆଛେ । ତାଇ ଦେଖି ଓ କାଉକେଓ ସୁଧୀ କରତେ ପାରେ ନା, ସବାଇକେ ଶୁଧୁ ଦୁଃଖ ଦେଯ; କିନ୍ତୁ ଓର ବଡ଼ ଜା ଓର ଚେଯେ ଅନେକ ବଡ଼ । ସାଦାମାଟା ମାନୁଷ, ଲେଖାପଡ଼ା ଜାନେ

না, কিন্তু মনের ভেতরটা দয়া-মায়ায় ভরা। কত দুঃখী দরিদ্র পরিবার ও লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিপালন করে—কেউ জানতে পায় না। ঐ যে তাঁতীদের সঙ্গে একটা সুব্যবস্থা হ'ল সে কি সুনন্দাকে দিয়ে কখনো হ'তো? তেজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াতেই হয়েছে ভাবো? কখ্খনো না। সে করেছে ওর বড় জা কেঁদেকেটে স্বামীর পায়ে ধরে। সুনন্দা সমস্ত সংসারের কাছে ওর গুরুজন ভাঙুরকে চোর বলে ছোট করে দিলে—এইটেই কি শান্ত্রশিক্ষার বড় কথা? ওর পুঁথির বিদ্যে যতদিন না মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, লোভ-মোহের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে পারবে ততদিন ওর বইয়ে-পড়া কর্তব্যজ্ঞানের ফল মানুষকে অযথা বিঁধবে, অত্যাচার করবে, সংসারে কাউকে কল্যাণ দেবে না তোমাকে বলে দিলুম।

কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, এ-সব তুমি শিখলে কার কাছে?

রাজগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, এ-সব তুমি শিখলে না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারো ওপর, তাই তোমার কাছে শেখা ত কেবল শেখা নয়, সত্যি করে পাওয়া। হঠাত একদিন আশৰ্য হয়ে ভাবতে হয় এ-সব এলো কোথা থেকে। সে যাকগে, এবার গিয়ে কিন্তু বড় কুশারীগিন্নির সঙ্গে ভাব করবো, সেবার তাঁকে অবহেলা করে যে ভুল করেছি, এবার তার সংশোধন হবে। যাবে গঙ্গামাটিতে?

কিন্তু বর্মা? আমার চাকরি?

আবার চাকরি? এই যে বললুম, চাকরি তোমাকে আমি করতে দেব না।

লক্ষ্মী, তোমার স্বভাবটি বেশ। তুমি বল না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারো ওপর—খাঁটি বৈকল্পী-তিতিক্ষার নমুনা শুধু তোমার কাছেই মেলে।

তাই বলে যার যা খেয়াল তাতেই সায় দিতে হবে? সংসারে আর কারও সুখ-দুঃখ নেই নাকি? তুমি নিজেই সব!

ঠিক বটে! কিন্তু অভয়া! সে প্লেগের ভয়ও করেনি, সে দুর্দিনে আশ্রয় দিয়ে না বাঁচালে আজ হয়ত আমাকে তুমি পেতে না। আজ তাদের কি হ'লো এ কথা একবার ভাববে না?

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্তে করুণা ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া বলিল, তবে তুমি থাকো, আনন্দ-ঠাকুরপোকে নিয়ে আমি যাই, বর্মায় গিয়ে তাঁদের ধরে আনি গে। কোন একটা উপায় এখানে হবেই।

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু সে বড় অভিমানী, আমি না গেলে হয়ত আসবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আসবে। সে বুঝবে যে তুমিই এসেচ তাদের নিতে। দেখো আমার কথা ভুল হবে না।

কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে ত?

রাজলক্ষ্মী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তারপরে অনিশ্চিত কঢ়ে ধীরে ধীরে বলিল, সেই-ই আমার ভয়। হয়ত পারব না; কিন্তু তার আগে চল না গিয়ে দিনকতক থাকি গে গঙ্গামাটিতে।

সেখানে কি তোমার বিশেষ কোন কাজ আছে?

আছে একটু। কুশারীমশাই খবর পেয়েচেন পাশের পোড়ামাটি গাঁ-টা তারা বিক্রি করবে। ওটা ভাবচি কিনব। সে বাড়িটাও ভালো করে তৈরি করাব, যেন সেখানে থাকতে তোমার কষ্ট না হয়। সেবারে দেখেচি ঘরের অভাবে তোমার কষ্ট হ'তো।

বলিলাম, ঘরের অভাবে কষ্ট হ'তো না, কষ্ট হ'তো অন্য কারণে।

রাজলক্ষ্মী ইচ্ছা করিয়াই এ কথায় কান দিল না, বলিল, আমি দেখেচি সেখানে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে—বেশিদিন শহরে রাখতে যে তোমাকে ভরসা হয় না, তাই ত তাড়াতাড়ি সরিয়া নিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু এই ভঙ্গুর দেহটাকে নিয়ে যদি অনুক্ষণ তুমি এত বিরত থাকো,  
মনে শান্তি পাবে না লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এ উপদেশ খুব কাজের, কিন্তু আমাকে না দিয়ে নিজে  
যদি একটু সাবধানে থাকো হয়ত সত্যই শান্তি একটু পেতে পারি।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ এ বিষয়ে তর্ক করা শুধু নিষ্ফল নয়,  
অপ্রীতিকর। তাহার নিজের স্বাস্থ্য অটুট, কিন্তু সে সৌভাগ্য যাহার নাই,  
বিনাদোষেও যে তাহার অসুখ করিতে পারে এ কথা সে কিছুতেই বুবিবে না।

বলিলাম, শহরে আমি কোনকালেই থাকতে চাইনে। সেদিন গঙ্গামাটি  
আমার ভালোই লেগেছিল, নিজের ইচ্ছেয় চলেও আসিনি—এ কথা আজ তুমি  
ভুলে গেছ লক্ষ্মী!

না গো না, ভুলিনি। সারাজীবনে ভুলব না—এই বলিয়া সে একটু হাসিল।  
বলিল, সেবারে তোমার মনে হ'তো যেন কোন্ অচেনা জায়গায় এসে পড়েচো,  
কিন্তু এবারে গিয়ে দেখো তার আকৃতি-প্রকৃতি এমনি বদলে যাবে যে, তাকে  
আপনার বলে বুঝতে একটুও গোল হবে না। আর কেবল ঘরবাড়ি থাকবার  
জায়গাই নয়, এবার গিয়ে আমি বদলাব নিজেকে, আর সবচেয়ে বদলে ভেঙ্গে  
গড়ে তুলব নতুন করে তোমাকে—আমার নতুনগোঁসাইজীকে! কমললতাদিদি আর  
যেন না দাবি করতে পারে তার পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী বলে।

বলিলাম, এই-সব বুঝি ভেবে স্থির করেছো?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, হাঁ। তোমাকে কি বিনামূল্যে অমনি অমনিই  
নেব—তার ঝণ পরিশোধ করবো না? আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্তি  
করে এসেছিলুম, যাবার আগে সে আসার চিহ্ন রেখে যাব না? এমনিই নিষ্ফলা  
চলে যাব? কিছুতেই তা আমি হতে দেব না।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধায় ও স্নেহে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,  
মনে মনে ভাবিলাম, হন্দয়ের বিনিময় নর-নারীর অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা—সংসারে

নিত্য নিয়ত ঘটিয়াছে, বিরাম নাই, বিশেষত্ব নাই; আবার এই দান ও প্রতিগ্রহই ব্যক্তিবিশেষের জীবন অবলম্বন করিয়া কি বিচ্ছিন্ন বিস্ময় ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহিমা তাহার যুগে যুগে মানুষের মন অভিষিঞ্চ করিয়াও ফুরাইতে চাহে না। এই সেই অক্ষয় সম্পদ, মানুষকে ইহা বৃহৎ করে, শক্তিমান করে, অভাবিত কল্যাণে নৃতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া তোলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বঙ্কুর কি করবে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে ত আমাকে আর চায় না। ভাবে এ আপদ দূর হলেই ভালো।

কিন্তু সে যে তোমার নিকট-আত্মীয়—তাকে যে ছেলেবেলায় মানুষ করে তুলেচো!

সেই মানুষ-করার সম্বন্ধই থাকবে, আর কিছু মানব না। নিকট-আত্মীয় আমার সে নয়।

কেন নয়? অস্বীকার করবে কি করে?

অস্বীকার করবার ইচ্ছে আমারও ছিল না, এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আমার সব কথা তুমি জানো না। আমার বিয়ের গল্প শুনেছিলে?

শুনেছিলাম লোকের মুখে; কিন্তু তখন ত আমি দেশে ছিলাম না।

না ছিলে না। এমন দুঃখের ইতিহাস আর নেই, এমন নিষ্ঠুরতাও বোধ হয় কোথাও হয়নি। বাবা মাকে কখনো নিয়ে যাননি, আমিও কখনো তাঁকে দেখিনি। আমরা দু'বোনে মামার বাড়িতেই মানুষ। ছেলেবেলা জুরে জুরে আমার কি চেহারা ছিল মনে আছে ত?

আছে।

তবে শোন। বিনাদোষে শান্তির পরিমাণ শুনলে তোমার মত নিষ্ঠুর লোকেরও দয়া হবে। জুরে ভুগি, কিন্তু মরণ হয় না। মামা নিজেও নানা অসুখে শয্যাগত, হঠাত খবর জুটলো দত্তদের বামুনঠাকুর আমাদের ঘর, মামার মতই

স্বভাব-কুলীন। বয়স ষাটের কাছে। আমাদের দু'বোনকেই একসঙ্গে তার হাতে দেওয়া হবে। সবাই বললে এ সুযোগ হারালে আইবুড়ো নাম আর ওদের খণ্ডাবে না। সে চাইলে এক'শ', মামা পাইকিরি দর হাঁকলে পঞ্চাশ টাকা। এক আসনে একসঙ্গে—মেহন্ত কম। সে নাবলো পঁচাত্তরে; বললে, মশাই, দু'-দুটো ভাগনীকে কুলীনে পার করবেন, একজোড়া রামছাগলের দাম দেবেন না? ভোর-রাত্রে লঘ, দিদি নাকি জেগে ছিল, কিন্তু আমাকে পুঁটলি বেঁধে এনে উচ্ছুণ্য করে দিলে। সকাল হতে বাকি পঁচিশ টাকার জন্যে ঝগড়া শুরু হ'লো। মামা বললেন, ধারে কুশগুকি হোক, সে বললে, সে অত হাবা নয়, এসব কারবারে ধারধোর চলবে না। সে গা-ঢাকা দিলে, বোধ হয় ভাবলে মামা খুঁজেপেতে এনে তাকে টাকা দিয়া কাজটা সম্পূর্ণ করবেন। একদিন যায়, দু'দিন যায়, মা কাঁদাকাটা করেন, পাড়ার লোকেরা হাসে, মামা গিয়ে দণ্ডদের কাছে নালিশ করেন, কিন্তু বর আর এলো না। তাদের গাঁয়ে খোঁজ নেওয়া হ'লো, সেখানে সে যায়নি। আমাদের দেখিয়ে কেউ বলে আধকপালী, কেউ বলে পোড়াকপালী—দিদি লজ্জায় ঘরের বার হয় না—সেই ঘর থেকে ছ'মাস পরে বার করা হ'লো একেবারে শুশানে। আরও ছ'মাস পরে কলকাতার কোন একটা হোটেল থেকে খবর এল বরও সেখানে রাঁধতে রাঁধতে জ্বরে মরেচে। বিয়ে আর পুরো হ'লো না।

বলিলাম, পঁচিশ টাকা দিয়ে বর কিনলে ঐরকমই হয়।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত সে আমার ভাগে পঁচিশ টাকা পেয়েছিল, কিন্তু তুমি পেয়েছিলে কি? শুধু একছড়া বাঁচির মালা—তাও কিনতে হয়নি—বন থেকে সংগ্রহ হয়েছিল।

কহিলাম, দাম না থাকলে তাকে অমূল্য বলে। আর একটা মানুষ দেখাও ত আমার মত অমূল্য ধন পেয়েছে?

তুমি বলো ত এ কি তোমার মনের সত্যি কথা?

টের পাও না?

না গো না, পাই নে, সত্যি পাইনে—কিন্তু বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল, কহিল, পাই শুধু তখন যখন তুমি ঘুমোও—তোমার মুখের পানে চেয়ে; কিন্তু সে কথা যাক। আমাদের দু'বোনের মত শান্তিভোগ এদেশে কত শত মেয়ের কপালেই ঘটে। আর কোথাও বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও এমন দুর্গতি করতে মানুষের বুকে বাজে।

এই বলিয়া সে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হয়ত তুমি ভাবচো আমার নালিশটা বাড়াবাড়ি, এমন দৃষ্টান্ত আর ক'টা মেলে? এর উভরে যদি বলতুম একটা হ'লেও সমস্ত দেশের কলঙ্ক, তাতেও আমার জবাব হ'তো; কিন্তু সে আমি বলবো না। আমি বলবো, অনেক হয়। যাবে আমার সঙ্গে সেই-সব বিধবাদের কাছে যাঁদের আমি অল্পস্বল্প সাহায্য করিঃ তাঁরা সবাই সাক্ষ্য দেবেন, তাঁদেরও হাত-পা বেঁধে আঞ্চীয়স্বজনে এমনিই জলে ফেলে দিয়েছিল।

বলিলাম, তাই বুঝি তাদের ওপর এত মায়া?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমারও হ'তো যদি চোখ চেয়ে আমাদের দুঃখটা দেখতে। এখন থেকে একটি একটি করে আমিই তোমাকে সমস্ত দেখাব।

আমি দেখব না, চোখ বুজে থাকব।

পারবে না। আমার কাজের ভার একদিন ফেলে যাব আমি তোমার ওপর। সব ভুলবে, কিন্তু সে ভুলতে কখনো পারবে না। এই বলিয়া সে একটুখানি মৌন থাকিয়া অক্ষমাং নিজের পূর্বকথার অনুসরণে বলিয়া উঠিল, হবেই ত এমনি অত্যাচার। যে-দেশে মেয়ের বিয়ে না হলে ধর্ম যায়, জাত যায়, লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারে না—হাবা-বোবা-অন্ধ-আতুর কারও রেহাই নেই—সেখানে একটাকে ফাঁকি দিয়ে লোকে অন্যটাকেই রাখে, এ ছাড়া সে-দেশে মানুষের আর কি উপায় আছে বলো ত? সেদিন সবাই মিলে আমাদের বোন দুটিকে যদি বলি না দিত, দিদি হয়ত মরত না, আর আমি—এজন্মে এমন করে তোমাকে হয়ত পেতুম না, কিন্তু মনের মধ্যে তুমিই চিরদিন এমনি প্রভু হয়েই থাকতে। আর,

তাই বা কেন? আমাকে এড়াতে তুমি পারতে না, যেখানে হোক, যতদিনে হোক  
নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতে হতোই।

একটা জবাব দিব ভাবিতেছি, হঠাত নীচে হইতে বালক-কঢ়ে ডাক  
আসিল, মাসিমা?

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কে?

ও-বাড়ির মেজবৌয়ের ছেলে, এই বলিয়া সে ইঙ্গিতে পাশের বাড়িতে  
দেখাইয়া সাড়া দিল—ক্ষিতীশ, ওপরে এসো বাবা!

পরক্ষণেই একটি ঘোল-সতেরো বছরের সুশ্রী বলিষ্ঠ কিশোর ঘরে  
আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া প্রথমটা সঙ্কুচিত হইল, পরে নমস্কার  
করিয়া তাহার মাসিমাকেই কহিল, আপনার নামে কিন্তু বারো টাকা চাঁদা পড়েছে  
মাসিমা।

তা পড়ুক বাবা, কিন্তু সাবধানে সাঁতার কেটো, কোনো দুর্ঘটনা না হয়।

নাঃ—কোন ভয় নেই মাসিমা।

রাজলক্ষ্মী আলমারি খুলিয়া তাহার হাতে টাকা দিল, ছেলেটি দ্রুতবেগে  
সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে হঠাত দাঁড়াইয়া বলিল, মা বলে দিলেন ছোটমামা  
পরশু সকালে এসে সমস্ত এস্টিমেট করে দেবেন। বলিয়াই উৎবর্শ্বাসে প্রস্থান  
করিল।

প্রশ্ন করিলাম, এস্টিমেট কিসের?

বাড়িটা মেরামত করতে হবে না? তেতুলার ঘরটা আধখানা করে তারা  
ফেলে রেখেচে, পুরো করতে হবে না?

তা হবে, কিন্তু এত লোককে তুমি চিনলে কি করে?

বাঃ, এরা যে সব পাশের বাড়ির লোক; কিন্তু আর না, যাই—তোমার  
খাবার তৈরির সময় হয়ে গেল. এই বলিয়া সে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

## তের

এক সকালে স্বামীজী আনন্দ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে আসার নিম্নলিখিত করা হইয়াছে রতন জানিত না, বিষণ্ণমুখে আসিয়া আমাকে খবর দিল, বাবু, গঙ্গামাটির সেই সাধুটা এসে হাজির হয়েচে। বলিহারি তাকে, খুঁজে খুঁজে বা'র করেছে ত!

রতন সর্বপ্রকার সাধুসংজ্ঞনকেই সন্দেহের চোখে দেখে, রাজলক্ষ্মীর গুরুদেবটিকে ত সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, বলিল, দেখুন, এ আবার মাকে কি মতলব দেয়। টাকা বার করে নেবার কত ফন্দিই যে এই ধার্মিক ব্যাটারা জানে!

হাসিয়া বলিলাম, আনন্দ, বড়লোকের ছেলে, ডাক্তারি পাশ করেচে, তার নিজের টাকার দরকার নেই।

হঁ—বড়লোকের ছেলে! টাকা থাকলে নাকি কেউ আবার এ পথে যায়! এই বলিয়া সে তাহার সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেল। রতনের আসল আপত্তি এইখানে, মায়ের টাকা কেহ বার করিয়া লইবার সে ঘোরতর বিরুদ্ধে। অবশ্য, তাহার নিজের কথা স্বতন্ত্র।

বজ্জানন্দ আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল, কহিল, আর একবার এলুম দাদা। খবর ভালো ত? দিদি কই?

বোধ হয় পুজোয় বসেচেন, সংবাদ পাননি নিশ্চয়ই।

তবে সংবাদটা নিজে দিই গে। পুজো করা পালিয়ে যাবে না, এখন একবার রাঙ্গাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পুজোর ঘরটা কোন্ দিকে দাদা? নাপ্ তে ব্যাটা গেল কোথায়—চায়ের একটু জল চড়িয়ে দিক না।

পূজার ঘরটা দেখাইয়া দিলাম। আনন্দ রতনের উদ্দেশে একটা ভক্ষার ছাড়িয়া সেইদিকে প্রস্থান করিল।

মিনিট-দুই পরে উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইল, আনন্দ কহিল, দিদি, গোটা-পাঁচেক টাকা দিন, চা খেয়ে একবার শিয়ালদার বাজারটা ঘুরে আসি গে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কাছেই যে একটা ভালো বাজার আছে আনন্দ, অত দূরে যেতে হবে কেন? আর তুমই বা যাবে কিসের জন্যে, রতন যাক না।

কে, রত্না? ও ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই দিদি, আমি এসেচি বলেই হয়ত ও বেছে বেছে পচা মাছ কিনে আনবে—বলিয়াই হঠাৎ দেখিল রতন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া; জিভ কাটিয়া বলিল, রতন দোষ নিও না বাবা, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ও-পাড়ায় গেছ—ডেকে সাড়া পাইনি কিনা।

রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, আমিও না হাসিয়া পারিলাম না। রতন কিন্তু ভক্ষেপ করিল

না, গন্তীর মুখে বলিল, আমি বাজারে যাচ্ছি মা, কিষণ চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে।—বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, রতনের সঙ্গে আনন্দের বুঝি বনে না?

আনন্দ বলিল, ওকে দোষ দিতে পারি নে দিদি। ও আপনার হিতৈষী—বাজে লোকজন ঘেঁষতে দিতে চায় না; কিন্তু আজ ওর সঙ্গ নিতে হবে, নইলে খাওয়াটা ভালো হবে না। বহুদিন উপবাসী।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া ডাকিয়া বলিল, রতন, আর গোটাকয়েক টাকা নিয়ে যা বাবা, বড় দেখে একটা রুইমাছ আনতে হবে কিন্তু। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মুখহাত ধুয়ে এসো গে ভাই, আমি চা তৈরি করে আনচি। এই বলিয়া সেও নীচে নামিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, দাদা, হঠাৎ তলব হ'লো কেন?

সে কৈফিয়ত কি আমার দেবার, আনন্দ?

ଆନନ୍ଦ ସହାସ୍ୟ କହିଲ, ଦାଦାର ଦେଖଚି ଏଥିମେ ସେଇ ଭାବ—ରାଗ ପଡ଼େନି । ଆବାର ଗା-ଢାକା ଦେବାର ମତଳବ ନେଇ ତ? ସେବାର ଗଞ୍ଜମାଟିତେ କି ହାଙ୍ଗମାତେଇ ଫେଲେଛିଲେନ । ଏଦିକେ ଦେଶସୁନ୍ଦର ଲୋକେର ନେମନ୍ତମ, ଓଦିକେ ବାଡ଼ିର କର୍ତ୍ତା ନିରଂଦେଶ । ମାଝଥାନେ ଆମି—ନତୁନ ଲୋକ—ଏଦିକେ ଛୁଟି, ଓଦିକେ ଛୁଟି, ଦିଦି ପା ଛଡ଼ିଯେ କାଁଦିତେ ବସଲେନ, ରତନ ଲୋକ ତାଡ଼ାବାର ଉଯୁଗ କରଲେ—ସେ କି ବିଆଟ! ଆଚା ମାନୁଷ ଆପନି ।

ଆମିଓ ହାସିଯା ଫେଲିଲାମ, ବଲିଲାମ, ରାଗ ଏବାରେ ପଡ଼େ ଗେଛେ, ଭୟ ନେଇ ।

ଆନନ୍ଦ ବଲିଲ, ଭରସାଓ ନେଇ । ଆପନାଦେର ମତ ନିଃସଙ୍ଗ, ଏକାକୀ ଲୋକେଦେର ଆମି ଭୟ କରି । କେନ ଯେ ନିଜେକେ ସଂସାରେ ଜଡ଼ାତେ ଦିଲେନ ତାଇ ଆମି ଅନେକ ସମୟେ ଭାବି ।

ମନେ ମନେ ବଲିଲାମ, ଅଦୃଷ୍ଟ! ମୁଖେ ବଲିଲାମ, ଆମାକେ ଦେଖଚି ତା ହଲେ ଭୋଲୋନି, ମାଝେ ମାଝେ ମନେ କରତେ?

ଆନନ୍ଦ ବଲିଲ, ନା ଦାଦା, ଆପନାକେ ଭୋଲାଓ ଶକ୍ତ, ବୋକାଓ ଶକ୍ତ, ମାଯା କାଟାନୋ ଆରା ଶକ୍ତ । ବିଶ୍ୱାସ ନା ହୟ ବଲୁନ, ଦିଦିକେ ସାକ୍ଷୀ ମାନି । ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ପରିଚୟ ତ ମାତ୍ର ଦୁ-ତିନଦିନେର, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେ ଦିଦିର ସଙ୍ଗେ ଗଲା ମିଲିଯେ ଆମିଓ କାଁଦିତେ ବସିନି—ସେଟା ନିତାନ୍ତଇ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ-ଧର୍ମେର ବିରଙ୍ଗନ୍ଦ ବଲେ ।

ବଲିଲାମ, ସେଟା ବୋଧ ହୟ ଦିଦିର ଖାତିରେ । ତାଁର ଅନୁରୋଧେଇ ତ ଏତଦୂରେ ଏଲେ ।

ଆନନ୍ଦ କହିଲ, ନେହାତ ମିଥ୍ୟେ ନୟ ଦାଦା । ଓଁର ଅନୁରୋଧ ତ ଅନୁରୋଧ ନୟ, ସେଣ ମାଯେର ଡାକ । ପା ଆପନି ଚଲତେ ଶୁରୁ କରେ । କତ ଘରେଇ ତୋ ଆଶ୍ୟ ନିଇ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଏମନଟି ଆର ଦେଖିନେ । ଆପନିଓ ତ ଶୁନେଚି ଅନେକ ଘୁରେଛେନ, କୋଥାଓ ଦେଖେଛେନ ଏହି ମତ ଆର ଏକଟି?

ବଲିଲାମ, ଅନେକ—ଅନେକ ।

রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। ঘরে তুকিয়াই সে আমার কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল, চায়ের বাটিটা আনন্দের কাছে রাখিয়া দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি অনেক গা?

আনন্দ বোধ করি একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল; আমি বলিলাম, তোমার গুণের কথা। উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বলেই সজোরে তার প্রতিবাদ করছিলাম।

আনন্দ চায়ের বাটিটা মুখে তুলিতেছিল, হাসির তাড়ায় খানিকটা চামাটিতে পড়িয়া গেল। রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল।

আনন্দ বলিল, দাদা, আপনার উপস্থিত বুদ্ধিটা অভুত। ঠিক উলটোটা চক্ষের পলকে মাথায় এলো কি করে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আশচর্য কি আনন্দ? নিজের মনের কথা চাপতে চাপতে আর গল্প বানিয়ে বলতে বলতে এ বিদ্যের উনি একেবারে মহামহোপাধ্যায় হয়ে গেছেন।

বলিলাম, আমাকে তা হলে তুমি বিশ্বাস করো না?

একটুও না।

আনন্দ হাসিয়া কহিল, বানিয়ে বলার বিদ্যের আপনিও কম নয় দিদি। তৎক্ষণাত জবাব দিলেন—একটুও না।

রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জ্ঞেপুড়ে শিখতে হয়েছে ভাই। তুমি কিন্তু আর দেরি ক'রো না, চা খেয়ে স্নান করে নাও, কাল গাড়িতে তোমার যে খাওয়া হয়নি তা বেশ জানি। ওঁর মুখে আমার সুখ্যাতি শুনতে গেলে তোমার সমস্ত দিনে কুলোবে না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, আপনাদের ঘত এমন দুটি লোক সংসারে বিরল। ভগবান আশচর্য মিল করে আপনাদের দুনিয়ায় পাঠ্ঠয়েছিলেন।

তার নমুনা দেখলে ত?

নমুনা সেই প্রথম দিনে সাঁহিথিয়া স্টেশনে গাছতলাতেই দেখেছিলুম।  
তারপরে আর একটিও কখনো চোখে পড়ল না।

আহা! কথাগুলো যদি ওঁর সামনেই বলতে আনন্দ!

আনন্দ কাজের লোক, কাজের উদ্যম ও শক্তি তাহার বিপুল। তাহাকে  
কাছে পাইয়া রাজলক্ষ্মীর আনন্দের সীমা নাই। দিনরাতে খাওয়ার আয়োজন ত  
প্রায় ভয়ের কোঠায় গিয়া ঠেকিল। অবিশ্রাম দু'জনের কত পরামর্শই যে হয়  
তাহার সবগুলো জানি না, শুধু কানে আসিয়াছে যে, গঙ্গামাটিতে একটা ছেলেদের  
ও একটা মেয়েদের ইস্কুল খোলা হইবে। ওখানে বিস্তর গরীব এবং ছোটজাতের  
লোকের বাস, উপলক্ষ বোধ করি তাহারাই; শুনিতেছি একটা চিকিৎসার ব্যাপারও  
চলিবে। এই-সকল বিষয়ে কোনদিন আমার কিছুমাত্র পটুতা নাই। পরোপকারের  
বাসনা আছে কিন্তু শক্তি নাই, কোন কিছু একটা খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে  
ভাবিলেও আমার শ্রান্ত মন আজ নয় কাল করিয়া দিন পিছাইতে চায়। তাহাদের  
নৃতন উদ্যোগে মাঝে মাঝে আনন্দ আমাকে টানিতে গেছে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী হাসিয়া  
বাধা দিয়া বলিয়াছে, ওঁকে আর জড়িয়ো না আনন্দ, তোমার সমস্ত সক্ষম পঙ্গ  
হয়ে যাবে।

শুনিলে প্রতিবাদ করিতেই হয়, বলিলাম, এই যে সেদিন বললে আমার  
অনেক কাজ, এখন থেকে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে!

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েছে গোঁসাই, এমন  
কথা আর কখনো মুখে আনব না।

তবে কি কোনদিন কিছুই করব না?

কেন করবে না? কেবল অসুখ-বিসুখ করে আমাকে ভয়ে আধমরা করে  
তুলো না, তাতেই তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আনন্দ কহিল, দিদি সত্যিই ওঁকে আপনি অকেজো করে তুলবেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আমাকে করতে হবে না ভাই, যে বিধাতা ওঁকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন—কোথাও ত্রুটি রাখেন নি।

আনন্দ হাসিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার ওপর এক গোণকার পোড়ারমুখো এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে, উনি বাড়ির বার হলে আমার বুক টিপ্পিচ করে—যতক্ষণ না ফেরেন কিছুতে মন দিতে পারিনে।

এর মধ্যে আবার গোণকার জুটলো কোথা থেকে? কি বললে সে?

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, আমার হাত দেখে সে বললে, মস্ত ফাঁড়া—জীবন-মরণের সমস্যা।

দিদি, এসব আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি বলিলাম, হাঁ করেন, আলবৎ করেন। তোমার দিদি বলেন, ফাঁড়া বলে কি পৃথিবীতে কথা নেই? কারও কখনো কি বিপদ ঘটে না?

আনন্দ হাসিয়া কহিল, ঘটতে পারে, কিন্তু হাত গুণে বলবে কি করে দিদি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা জানিনে ভাই, শুধু আমার ভরসা আমার মত ভাগ্যবত্তী যে, তাকে কখনো ভগবান এত বড় দুঃখে ডোবাবেন না।

আনন্দ স্তনমুখে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া অন্য কথা পাড়িল।

ইতিমধ্যে বাড়ির লেখাপড়া, বিলি-ব্যবস্থার কাজ চলিতে লাগিল, রাশীকৃত ইট-কাঠ, চুন-সুরকি, দরজা-জানালা আসিয়া পড়িল—পুরাতন গৃহটিকে রাজলক্ষ্মী নৃতন করিয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

সেদিন বৈকালে আনন্দ কহিল, দাদা, চলুন একটু ঘুরে আসি গে।

ইদানীং আমার বাহির হইবার প্রস্তাবেই রাজলক্ষ্মী অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকে, কহিল, ঘুরে আসতে আসতেই যে রাত হয়ে যাবে আনন্দ, ঠাণ্ডা লাগবে না?

আনন্দ বলিল, গরমে লোকে সারা হচ্ছে দিদি, ঠাণ্ডা কোথায়?

আজ আমার নিজের শরীরটাও বেশ ভালো ছিল না, বলিলাম, ঠাণ্ডা লাগার  
ভয় নেই নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ উঠতেও তেমন ইচ্ছে হচ্ছে না আনন্দ।

আনন্দ বলিল, ওটা জড়তা। সঙ্ক্ষেপে ঘরে বসে থাকলে অনিচ্ছে আরো  
চেপে ধরবে—উঠে পড়ুন।

রাজলক্ষ্মী ইহার সমাধান করিতে কহিল, তার চেয়ে একটা কাজ করিনে  
আনন্দ? ক্ষিতীশ পরশু আমাকে একটি ভালো হারমোনিয়ম কিনে দিয়ে গেছে,  
এখনো সেটা দেখবার সময় পাইনি। আমি দুটো ঠাকুরদের নাম করি, তোমরা  
দু'জনে বসে শোনো—সন্ধ্যাটা কেটে যাবে। এই বলিয়া সে রতনকে ডাকিয়া  
বাস্তা আনিতে কহিল।

আনন্দ বিশ্ময়ের কঠে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদের নাম মানে কি গান নাকি  
দিদি?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

দিদির কি সে বিদ্যেও আছে নাকি?

সামান্য একটুখানি! তারপরে আমাকে দেখাইয়া কহিল, ছেলেবেলায় ওঁর  
কাছেই হাতেখড়ি।

আনন্দ খুশি হইয়া বলিল, দাদাটি দেখচি বর্ণচোরা আম, বাইরে থেকে  
ধরবার জো নেই।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি সরল মনে  
তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। কারণ আনন্দ বুঝিবে না কিছুই, আমার  
আপত্তিকে ওস্তাদের বিনয়-বাক্য কল্পনা করিয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতে  
থাকিবে, এবং হয়ত বা শেষে রাগ করিয়া বসিবে। পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট-  
বিলাপের দুর্যোধনের গানটা জানি, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরে এ আসরে সেটা  
মানানসই হইবে না।

হারমোনিয়ম আসিলে প্রথমে সচরাচর প্রচলিত দুই-একটা ‘ঠাকুরদের’ গান গাহিয়া রাজলক্ষ্মী বৈষণব-পদাবলী আরঙ্গ করিল, শুনিয়া মনে হইল সেদিন মুরারিপুর আখড়াতেও বোধ করি এমনটি শুনি নাই। আনন্দ বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল, আমাকে দেখাইয়া মুঞ্চিত্বে কহিল, এ কি সমস্তই ওঁর কাছে শেখা দিদি?

সমস্তই কি কেউ একজনের কাছে শেখে আনন্দ?

সে ঠিক। তারপরে সে আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, দাদা, এবার কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করতে হবে। দিদি একটু ক্লান্ত।

না হে, আমার শরীর ভালো নেই।

শরীরের জন্য আমি দায়ী, অতিথির অনুরোধ রাখবেন না?

রাখবার জো নেই হে, শরীর বড় খারাপ।

রাজলক্ষ্মী গন্তীর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সামলাইতে পারিল না, হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আনন্দ ব্যাপারটা এবারে বুঝিল, কহিল, দিদি, তবে বলুন কার কাছে এত শিখলেন?

আমি বলিলাম, যাঁরা অর্থের পরিবর্তে বিদ্যা দান করেন তাঁদের কাছে। আমার কাছে নয় হে, দাদা কখনো এ বিদ্যের ধার দিয়েও চলেন নি!

আনন্দ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমিও সামান্য কিছু জানি দিদি, কিন্তু বেশি শেখবার সময় পাইনি। সুযোগ যদি হ'লো এবার আপনার শিষ্যত্ব নিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করব। কিন্তু আজ কি এখানেই থেমে যাবেন, আর কিছু শোনাবেন না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আজ ত সময় নেই ভাই, তোমাদের খাবার তৈরি করতে হবে যে।

আনন্দ নিশাস ফেলিয়া কহিল, তা জানি। সংসারের ভার যাঁদের ওপর, সময় তাঁদের কম। কিন্তু বয়সে আমি ছোট, আপনার ছোটভাই, আমাকে শেখাতে হবে। অপরিচিত স্থানে একলা যখন সময় কাটতে চাইবে না তখন এই দয়া আপনার স্মরণ করব।

রাজলক্ষ্মী মেঝে বিগলিত হইয়া কহিল, তুমি ডাক্তার, বিদেশে তোমার এই স্বাস্থ্যহীন দাদাটির প্রতি দৃষ্টি রেখো ভাই, আমি যতটুকু জানি তোমাকে আদৃ করে শেখাব।

কিন্তু এ ছাড়া আপনার কি আর চিন্তা নেই দিদি?

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

আনন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দাদার মত ভাগ্য সহসা চোখে পড়ে না।

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, এমন অকর্মণ্য ব্যক্তিই কি সহসা চোখে পড়ে আনন্দ? ভগবান তাদের হাল ধরবার মজবুত লোক দেন, নইলে তারা অকূলে ভেসে যায়—কোন কালে ঘাটে ভিড়তে পারে না। এমনি করেই সংসারে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় ভায়া, কথাটা মিলিয়ে দেখো, প্রমাণ পাবে।

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল—তাহার অনেক কাজ।

ইহার দিন কয়েকের মধ্যেই বাড়ির কাজ শুরু হইল; রাজলক্ষ্মী জিনিসপত্র একটা ঘরে বন্ধ করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল; বাড়ির ভার রহিল বুড়া তুলসীদাসের ‘পরে।

যাবার দিনে রাজলক্ষ্মী আমার হাতে একখানা পোস্টকার্ড দিয়া বলিল, আমার চারপাতা জোড়া চিঠির এই জবাব এল—পড়ে দেখ। বলিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েলী অক্ষরে গুটিদুই-তিন ছত্রের লেখা। কমললতা লিখিয়াছে, সুখেই আছি বোন। যাঁদের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেছি আমাকে ভালো রাখার

দায় যে তাঁদের ভাই। প্রার্থনা করি তোমরা কুশলে থাকো। বড়োগোঁসাইজী তাঁহার আনন্দময়ীকে শন্দা জানিয়েছেন। ইতি—

### শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণশ্রিতা—কমললতা

সে আমার নাম উল্লেখও করে নাই। কিন্তু এই কয়টি অক্ষরের আড়ালে কত কথাই না তাহার রহিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখিলাম একফোঁটা চোখের জলের দাগ কি কোথাও পড়ে নাই! কিন্তু কোন চিহ্নই চোখে পড়িল না।

চিঠিখানা হাতে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে রৌদ্রতপ্ত নীলাভ আকাশ, প্রতিবেশী-গৃহের একজোড়া নারিকেল বৃক্ষের পাতার ফাঁক দিয়া কতকটা অংশ তাহার দেখা যায়, সেখানে অকস্মাত দুটি মুখ পাশাপাশি যেন ভাসিয়া আসিল। একটি আমার রাজলক্ষ্মী—কল্যাগের প্রতিমা; অপরটি কমললতার—অপরিস্ফুট, অজানা—যেন স্বপ্নে দেখা ছবি।

রতন আসিয়া ধ্যান ভঙ্গিয়া দিল, বলিল, স্নানের সময় হয়েছে বাবু, মা বলে দিলেন।

স্নানের সময়টুকুও উত্তীর্ণ হইবার জো নাই।

আবার একদিন সকলে গঙ্গামাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেবারে আনন্দ ছিল অনাতুত অতিথি, এবারে সে আমন্ত্রিত বান্ধব। বাড়িতে ভিড় ধরে না, গ্রামের আত্মীয়-অনাত্মীয় কত লোকই যে আমাদের দেখিতে আসিয়াছে, সকলের মুখেই প্রসন্ন হাসি ও কুশল প্রশংসন।

রাজলক্ষ্মী কুশারীগঢ়িকীকে প্রণাম করিল; সুনন্দা রান্নাঘরে কাজে নিযুক্ত ছিল, বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, দাদা, আপনার শরীরটা ত ভালো দেখাচ্ছে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ভালো আর কবে দেখায় ভাই? আমি ত পারলুম না, এবার তোমরা যদি পার এই আশাতেই তোমাদের কাছে এনে ফেললুম।

আমার বিগত দিনের অস্বাস্থ্যের কথা বড়গিলীর বোধ হয় মনে পড়িল, মেহার্দকষ্টে ভরসা দিয়া কহিলেন, ভয় নেই মা, এদেশের জল-হাওয়ায় উনি দুদিনেই সেরে উঠবেন।

অথচ, নিজে ভাবিয়া পাইলাম না, কি আমার হইয়াছে এবং কিসের জন্যই বা এত দুশ্চিন্তা!

অতঃপর নানাবিধ কাজের আয়োজন পূর্ণেদ্যমে শুরু হইল। পোড়ামাটি কৃয় করার কথাবার্তা দামদস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থানান্তরণ প্রভৃতি কিছুতেই কাহারো আলস্য রহিল না।

শুধু আমিই কেবল মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করি না। হয়ত এ আমার স্বভাব, হয়ত বা ইহা আর কিছু একটা যাহা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছে। একটা সুবিধা হইয়াছিল আমার ওদাস্যে কেহ বিস্মিত হয় না, যেন আমার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। আমি দুর্বল, আমি অসুস্থ, আমি কখন আছি কখন নাই। অথচ কোন অসুখ নাই, খাই-দাই থাকি। আনন্দ তাহার ডাঙ্গারিবিদ্যা লইয়া মাঝে মাঝে আমাকে নাড়াচাড়া দিবার চেষ্টা করিলেই রাজলক্ষ্মী সম্মেহ অনুযোগে বাধা দিয়া বলে, ওঁকে টানাটানি করে কাজ নেই ভাই, কি হতে কি হবে, তখন আমাদেরই ভুগে মরতে হবে।

আনন্দ বলে, যে ব্যবস্থা করচেন ভোগার মাত্রা এতে বাড়বে বৈ কমবে না দিদি। এ আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

রাজলক্ষ্মী সহজেই স্বীকার হইয়া বলে, সে আমি জানি আনন্দ, ভগবান আমার জন্মকালে এ দুঃখ কপালে লিখে রেখেছেন।

ইহার পরে আর তর্ক চলে না।

দিন কাটে কখনো বই পড়িয়া, কখনো নিজের বিগত কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা শূন্য মাঠে একা একা ঘূরিয়া বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে কর্মের প্রেরণা আমাতে নাই, লড়াই করিয়া ছটোপুটি করিয়া, সংসারে

দশজনের ঘাড়ে চড়িয়া বসার সাধ্যও নাই, সঙ্কল্পও নাই। সহজে যাহা পাই তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানি। বাড়িঘর টাকাকড়ি বিষয়-আশয় মানসম্ভ্রম এ-সকল আমার কাছে ছায়াময়। অপরের দেখাদেখি নিজের জড়ত্বকে যদিবা কখনো কর্তব্যবুদ্ধির তাড়নায় সচেতন করিতে যাই, অচিরকাল মধ্যেই দেখি আবার সে চোখ বুজিয়া তুলিতেছে—শত ঠেলাঠেলিতেও আর গা নাড়িতে চাহে না। শুধু দেখি একটা বিষয়ে তন্দ্রাতুর মন কলরবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে, সে ঐ মুরারিপুরের দশটা দিনের স্মৃতির আলোড়নে। ঠিক যেন কানে শুনতে পাই বৈষণবী কমললতার সন্নেহ অনুরোধ—নতুনগোঁসাই এইটি করে দাও না ভাই! ঐ যাঃ—সব নষ্ট করে দিলে? আমার ঘাট হয়েচে গো, তোমায় কাজ করতে বলে—নাও ওঠো। পদ্মা পোড়ারমুখী গেল কোথায়, একটু জল চড়িয়ে দিক না, চা খাবার যে তোমার সময় হয়েচে গেঁসাই।

সেদিন চায়ের পাত্রগুলি সে নিজে ধুইয়া রাখিত পাছে ভাঙ্গে। আজ তাহাদের প্রয়োজন গেছে ফুরাইয়া, তথাপি কখনো কাজে লাগার আশায় কি জানি সেগুলি সে যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে কিনা।

জানি সে পালাই পালাই করিতেছে। হেতু জানি না, তবু মনে সন্দেহ নাই মুরারিপুর আশ্রমে দিন তাহার প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। হয়ত, একদিন এই খবরটাই অকস্মাত আসিয়া পৌঁছিবে। নিরাশয়, নিঃসম্বল, পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশেহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সকল শুভ-চিন্তায় অবিশ্রাম কর্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ অঙুলি দিয়া অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ ছায়া; করণায় মমতায় হৃদয়-যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের সর্বব্যাপী মহিমায় আমার চিত্তলোকে সে যে-আসনে অধিষ্ঠিত, তাহার তুলনা করিতে পারি এমন কিছুই জানি না।

বিদুষী সুনন্দার দুর্নির্বার্য প্রভাব স্বল্পকালের জন্যও যে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল ইহারই দুঃসহ পরিতাপে পুনরায় আপন সত্তাকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে। একটা কথা সে আজও আমাকে কানে কানে বলে, তুমি কম নও গো, কম নও। তোমার চলে যাবার পথ বেয়ে সর্বস্ব যে আমার চেখের পলকে ছুটে পালাবে এ কে জানত বলো? উঃ—সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভাবলেও ভয় হয় সে দিনগুলো আমার কেটেছিল কি করে? দম বন্ধ হয়ে মরে যাইনি এই আশ্চর্য। আমি উত্তর দিতে পারি না। শুধু নীরবে চাহিয়া থাকি।

আমার সম্বন্ধে আর তাহার ক্রটি ধরিবার জো নাই। শতকর্মের মধ্যেও শতবার অলক্ষ্যে আসিয়া দেখিয়া যায়। কখনো হঠাতে আসিয়া কাছে বসে, হাতের বইটা সরাইয়া দিয়া বলে, চোখ বুজে একটুখানি শুয়ে পড়ো ত, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই? অত পড়লে চোখ ব্যথা করবে যে।

আনন্দ আসিয়া বাহির হইতে বলে, একটা কথা জেনে নেবার আছে—  
আসতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী বলে, পারো। তোমার কোথায় আসতে মানা আনন্দ?

আনন্দ ঘরে চুকিয়া আশ্চর্য হইয়া বলে, এই অসময়ে দিদি কি ওঁকে ঘুম পাড়াচ্ছেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া জবাব দেয়, তোমার লোকসানটা হ'লো কি? না ঘুমোলেও ত তোমার পাঠশালার বাচ্চুরের পাল চরাতে যাবেন না?

দিদি দেখচি ওঁকে মাটি করবেন।

নইলে নিজে যে মাটি। নির্ভাবনায় কাজকর্ম করতে পারিনে।

আপনারা দু'জনেই ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবেন, এই বলিয়া আনন্দ বাহির হইয়া যায়।

ইস্কুল তৈরির কাজে আনন্দের নিশ্চাস ফেলিবার ফুরসত নাই, সম্পত্তি খরিদের হঙ্গমায় রাজলক্ষ্মী গলদ্ঘর্ম, এমনি সময়ে কলিকাতার বাড়ি ঘুরিয়া বল্ল

ডাকঘরের ছাপছোপ পিঠে লইয়া বহু বিলম্বে নবীনের সাংঘাতিক চিঠি আসিয়া  
পৌঁছিল—গহর মৃত্যুশয্যায়। শুধু আমারই পথ চাহিয়া আজও সে বাঁচিয়া আছে।  
খবরটা আমাকে যেন শূল দিয়া বিঁধিল। ভগিনীর বাটি হইতে সে কবে ফিরিয়াছে  
জানি না। সে যে এতদূর পীড়িত তাহাও শুনি নাই—শুনিবার বিশেষ চেষ্টাও করি  
নাই—আজ আসিয়াছে একেবারে শেষ সংবাদ। দিন-ছয়েক পূর্বের চিঠি, এখনো  
বাঁচিয়া আছে কি না তাই বা কে জানে? তার করিয়া খবর পাবার ব্যবস্থা এ-  
দেশেও নাই, সে-দেশেও নাই। ও চিন্তা বৃথা।

চিঠি পাইয়া রাজলক্ষ্মী মাথায় হাত দিল—তোমাকে যেতে হবে ত!  
হাঁ।

চলো আমিও সঙ্গে যাই।

সে কি হয়? তাদের এ বিপদের মাঝে তুমি যাবে কোথায়?

প্রস্তাবটা যে অসঙ্গত সে নিজেই বুঝিল, মুরারিপুর আখড়ার কথা আর  
সে মুখে আনিতে পারিল না, বলিল, রতনের কাল থেকে জ্বর, সঙ্গে যাবে কে?  
আনন্দকে বলব?

না। আমার তল্লি বইবার লোক সে নয়।

তবে কিষণ সঙ্গে যাক।

তা যাক, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না।

গিয়ে রোজ চিঠি দেবে বলো?

সময় পেলে দেব।

না, সে শুনব না। একদিন চিঠি না পেলে আমি নিজে যাব, তুমি যতই  
রাগ করো।

অগত্যা রাজি হইতে হইল এবং প্রত্যহ সংবাদ দিবার প্রতিশ্রূতি দিয়া  
সেই দিনই বাহির হইয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম দুশ্চিন্তায় রাজলক্ষ্মীর মুখ

পাণ্ডুর হইয়া গেছে, সে চোখ মুছিয়া শেষবারের মত সাবধান করিয়া কহিল,  
শরীরের অবহেলা করবে না বলো।

না গো, না।

ফিরতে একটা দিনও বেশি দেরি করবে না বলো?

না, তাও করব না।

অবশ্যে গরুর গাড়ি রেল-স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করিল।

আষাঢ়ের এক অপরাহ্নবেলায় গহরদের বাটীর সদর দরজায় আসিয়া  
দাঁড়াইলাম। আমার সাড়া পাইয়া নবীন বাহিরে আসিয়া আমার পায়ের কাছে  
আছাড় খাইয়া পড়িল। যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ  
পুরুষের প্রবল কঠের এই বুকফাটা কান্নায় শোকের একটা নৃতন মূর্তি চেখে  
দেখিতে পাইলাম। সে যেমন গভীর, তেমনি বৃহৎ ও তেমনি সত্য। গহরের মা  
নাই, ভগিনী নাই, কন্যা নাই, জায়া নাই, অশ্রুজলের মালা পরাইয়া এই সঙ্গিহীন  
মানুষটিকে সেদিন বিদায় দিতে কেহ ছিল না, তবু মনে হয় তাহাকে সজ্জাহীন,  
ভৃষণহীন কাঞ্জলবেশে যাইতে হয় নাই, তাহার লোকান্তরের যাত্রাপথে শেষ  
পাথেয় নবীন একাকী দু'হাত ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর কবে মারা গেল  
নবীন?

পরশু। কাল সকালে আমরা তাঁকে মাটি দিয়ে এসেছি।

মাটি কোথায় দিলে?

নদীর তীরে, আমবাগানে। তিনিই বলেছিলেন।

নবীন বলিতে লাগিল, মামাতো-বোনের বাড়ি থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন,  
সে জ্বর আর সারল না।

চিকিৎসা হয়েছিল?

এখানে যা হবার সমস্তই হয়েছিল—কিছুতেই কিছু হ'লো না। বাবু নিজেই  
সব জানতে পেরেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আখড়ার বড়গোঁসাইজী আসতেন?

নবীন কহিল, মাঝে মাঝে। নবদ্বীপ থেকে তাঁর গুরুদেব এসেছেন, তাই  
রোজ আসতে সময় পেতেন না। আর একজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা  
করিতে লাগিল, তবু সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলাম, ওখান থেকে আর কেউ  
আসত না নবীন?

নবীন বলিল, হাঁ, কমললতা।

তিনি কবে এসেছিলেন?

নবীন বলিল, রোজ। শেষ তিনদিন তিনি খাননি, শোননি, বাবুর বিছানা  
ছেড়ে একটিবার উঠেন নি।

আর প্রশ্ন করিলাম না, চুপ করিয়া রাখিলাম।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন এখন—আখড়ায়?

হাঁ।

একটু দাঁড়ান, বলিয়া সে ভিতরে গিয়া একটা টিনের বাক্স বাহির করিয়া  
আনিয়া আমার কাছে দিয়া বলিল, এটা আপনাকে দিতে তিনি বলে গিয়েচেন।

কি আছে এতে নবীন?

খুলে দেখুন, বলিয়া সে আমার হাতে চাবি দিল। খুলিয়া দেখিলাম দড়ি  
দিয়া বাঁধা তাহার কবিতার খাতাগুলা। উপরে লিখিয়াছে, শ্রীকান্ত, রামায়ণ শেষ  
করার সময় হ'ল না। বড়গোঁসাইকে দিও, তিনি যেন মঠে রেখে দেন, নষ্ট না  
হয়। দ্বিতীয়টি লাল শালুতে বাঁধা ছোট পুঁতুলি। খুলিয়া দেখিলাম নানা মূল্যের  
একতাড়া নোট এবং আমাকে লেখা আর একখানি পত্র। সে লিখিয়াছে—ভাই  
শ্রীকান্ত, আমি বোধ হয় বাঁচব না। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানিনে। যদি  
না হয় নবীনের হাতে বাক্সটি রেখে গেলাম, নিও। টাকাগুলি তোমার হাতে দিলাম,

কমলতার যদি কাজে লাগে দিও। না নিলে যে ইচ্ছে হয় ক'রো। আঞ্চাহ তোমার  
মঙ্গল করুন।—গহর।

দানের গর্ব নাই, কাকুতি-মিনতিও নাই। শুধু মৃত্যু আসন্ন জানিয়া এই  
গুটিকয়েক কথায় বাল্যবন্ধুর শুভকামনা করিয়া তাহার শেষ নিবেদন রাখিয়া  
গেছে। ভয় নাই, ক্ষেত্র নাই, উচ্ছ্বসিত হা-হৃতাশে মৃত্যুকে সে প্রতিবাদ করে  
নাই। সে কবি, মুসলমান ফকিরবংশের রক্ত তাহার শিরায়—শান্তমনে এই শেষ  
রচনাটুকু সে তাহার বাল্যবন্ধুর উদ্দেশে লিখিয়া গেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত চোখের  
জল আমার পড়ে নাই, কিন্তু তাহারা নিষেধ মানিল না, বড় বড় ফোঁটায় চোখের  
কোণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনমান তখন সমাপ্তির দিকে, পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপিয়া  
একটা কালো মেঘের স্তর উঠিতেছে উপরে, তাহারই কোন একটা সক্রীয় ছিদ্রপথে  
অঙ্গেন্মুখ সূর্যরশ্মি রাঙ্গা হইয়া আসিয়া পড়িল প্রাচীর-সংলগ্ন সেই শুঙ্কপ্রায়  
জামগাছটার মাথায়। ইহারই শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাধবী ও  
মালতীলতার কুঞ্জ। সেদিন শুধু কুঁড়ি ধরিয়াছিল, ইহারই গুটিকয়েক আমাকে সে  
উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কেবল কাঠপিংপড়ার ভয়ে পারে নাই। আজ  
তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল, কত ঝরিয়াছে তলায়, কত বাতাসে উড়িয়া ছড়াইয়াছে  
আশেপাশে, ইহারই কতকগুলি কুড়াইয়া লইলাম বাল্যবন্ধুর স্বহস্তের শেষদান  
মনে করিয়া।

নবীন বলিল, চলুন আপনাকে পোঁছে দিয়ে আসি গে।

বলিলাম, নবীন, বাইরের ঘরটা একবার খুলে দাও না দেখি।

নবীন ঘর খুলিয়া দিল। আজও রহিয়াছে সেই বিছানাটি তক্তপোশের  
একধারে গুটানো, একটি ছোট পেন্সিল, কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাগজ—এই ঘরে  
গহর সুর করিয়া শুনাইয়াছিল তাহার স্বরচিত কবিতা—বন্দিনী সীতার দুঃখের  
কাহিনী। এই গৃহে কতবার আসিয়াছি, কতদিন খাইয়াছি, শুইয়াছি, উপদ্রব করিয়া

গেছি, সেদিন হাসিমুখে যাহারা সহিয়াছিল আজ তাহাদের কেহ জীবিত নাই। আজ সমস্ত আসা-যাওয়া শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে নবীনের মুখে শুনিলাম এমনি একটি ছোট নোটের পুঁতুলি তাহার ছেলেদের হাতেও গহর দিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বিষয়-সম্পত্তি যাহা রহিল পাইবে তাহার মামাতো-ভাইবোনেরা, এবং তাহার পিতার নির্মিত একটি মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম মস্ত ভিড়। গুরুদেবের শিষ্য-শিষ্যা অনেক সঙ্গে আসিয়াছে, বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে এবং হাবভাবে তাহাদের শীত্র বিদায় হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৈষ্ণবসেবাদি বিধিমতেই চলিতেছে অনুমান করিলাম।

দ্বারিকাদাস আমাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমার আগমনের হেতু তিনি জানেন। গহরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মুখে কেমন একটা বিব্রত উদ্ভ্রান্ত ভাব—পূর্বে কখনো দেখি নাই। আন্দাজ করিলাম হয়ত এতদিন ধরিয়া এতগুলি বৈষ্ণবপরিচর্যায় তিনি ক্লান্ত, বিপর্যস্ত, নিশ্চিন্ত হইয়া আলাপ করিবার সময় নাই।

খবর পাইয়া পদ্মা আসিল, আজ তাহার মুখেও হাসি নাই, যেন সঙ্কুচিত—পলাইতে পারিলে বাঁচে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতাদিদি এখন বড় ব্যস্ত, না পদ্মা?

না, ডেকে দেব দিদিকে?—বলিয়াই চলিয়া গেল। এ-সমস্তই আজ এমন অপ্রত্যাশিত খাপছাড়া যে মনে মনে শক্তি হইয়া উঠিলাম। একটু পরে কমললতা আসিয়া নমস্কার করিল, বলিল, এস গোঁসাই, আমার ঘরে বসবে চল।

আমার বিছানা প্রভৃতি স্টেশনে রাখিয়া শুধু ব্যাগটাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম, আর ছিল গহরের সেই বাক্সটা আমার চাকরের মাথায়। কমললতার ঘরে আসিয়া

সেগুলো তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, একটু সাবধানে রেখে দাও, বাক্সটায়  
অনেকগুলো টাকা আছে।

কমললতা বলিল, জানি। তারপরে খাটের নীচে সেগুলো রাখিয়া দিয়া  
জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা-খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

না।

কখন এলে?

বিকেলবেলা।

যাই, তৈরি করে আনি গে, বলিয়া চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া উঠিয়া গেল।

পদ্মা মুখহাত ধোয়ার জল দিয়া চলিয়া গেল, দাঁড়াইল না।

আবার মনে হইল ব্যাপার কি!

খানিক পরে কমললতা চা লইয়া আসিল, আর কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন ও-  
বেলার ঠাকুরের প্রসাদ। বহুক্ষণ অভুত—অবিলম্বে বসিয়া গেলাম।

অনতিবিলম্বে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ আসিয়া  
পৌঁছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, কই তুমি গেলে না?

না, আমার বারণ।

বারণ! তোমার! তার মানে?

কমললতা ম্লান হাসিয়া কহিল, বারণ, মানে বারণ গোঁসাই। অর্থাৎ  
ঠাকুরঘরে যাওয়া আমার নিষেধ।

আহারে রঞ্চি চলিয়া গেল—বারণ করলে কে?

বড়গোঁসাইজীর গুরুদেব। আর তাঁর সঙ্গে এসেচেন যাঁরা—তাঁরা।

কি বলেন তাঁরা?

বলেন আমি অশুচি, আমার সেবায় ঠাকুর কল্যাণিত হন।

অশুচি তুমি? বিদ্যুদ্বেগে একটা কথা মনে জাগিল—সন্দেহ কি গহরকে  
নিয়ে?

হাঁ তাই।

কিছুই জানি না, তবুও অসংশয়ে বলিয়া উঠিলাম, এ মিথ্যে—এ অসম্ভব! অসম্ভব কেন গোঁসাই?

তা জানি না কমললতা, কিন্তু এত বড় মিথ্যে আর নেই। মনে হয় মানুষের সমাজে এ তোমার মৃত্যু-পথ্যাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার।

তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বলিল, আর আমার দুঃখ নেই। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাঁর কাছে ত ভয় ছিল না, ছিল শুধু তোমাকে। আজ আমি নির্ভয় হয়ে বাঁচলুম গোঁসাই।

সংসারে এত লোকের মাঝে তোমার ভয় ছিল শুধু আমাকে? আর কাউকে নয়?

না—আর কাউকে না। শুধু তোমাকে।

ইহার পরে দু'জনেই স্তন্ধ হইয়া রহিলাম। একসময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গোঁসাইজী কি বলেন?

কমললতা কহিল, তাঁর ত কোন উপায় নেই। নইলে কোন বৈষণবই যে এ মঠে আর আসবে না। একটু পরে বলিল, এখানে থাকা চলবে না, একদিন আমাকে যেতে হবে তা জানতুম, শুধু এমনি করে যেতে হবে তা ভাবিনি গোঁসাই। কেবল কষ্ট হয় পদ্মার কথা মনে করে। ছেলেমানুষ, তার কোথাও কেউ নেই—বড়গোঁসাই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাকে নবদ্বীপে, দিদি চলে গেলে সে বড় কাঁদবে। যদি পার তাকে একটু দেখো। এখানে থাকতে যদি না চায় আমার নাম করে তাকে রাজুকে দিয়ে দিও—ওর যা ভাল সে তা করবেই করবে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই টাকাগুলো কি হবে? নেবে না?

না, আমি ভিথিরি, টাকা নিয়ে আমি কি করবো বলো ত?

তবু যদি কখনো কাজে লাগে—

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, টাকা আমারো ত একদিন অনেক ছিল গো, কি কাজে লাগল? তবু যদি কখনো দরকার হয় তুমি আছ কি করতে? তখন তোমার কাছে চেয়ে নেব—অপরের টাকা নিতে যাব কেন?

এ কথায় কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে পুনশ্চ কহিল, না, গোঁসাই, আমার টাকা চাইনে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেচি, তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই সব অভাব তিনিই পূর্ণ করে দেবেন। লক্ষ্মীটি, আমার জন্যে ভেব না।

পদ্মা ঘরে আসিয়া বলিল, নতুন গোঁসাইয়ের জন্যে প্রসাদ কি এ-ঘরেই আনব দিদি?

হাঁ, এখানেই নিয়ে এস। চাকরটিকে দিলে?

হাঁ, দিয়েছি।

তবু পদ্মা যায় না, ক্ষণকাল ইত্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি খাবে না দিদি?

খাবো রে পোড়ারমুখী, খাবো। তুই যখন আছিস তখন না খেয়ে কি দিদির নিষ্ঠার আছে?

পদ্মা চলিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া কমললতাকে দেখিতে পাইলাম না, পদ্মার মুখে শুনিলাম সে বিকালে আসে। সারাদিন কোথায় থাকে কেহ জানে না। তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া কেবলি ভয় হইতে লাগিল, পাছে সে চলিয়া গিয়া থাকে, আর দেখা না হয়।

বড়গোঁসাইজীর ঘরে গেলাম। খাতাগুলি রাখিয়া বলিলাম, গহরের রামায়ণ, তার ইচ্ছে এগুলি মঠে থাকে।

দ্বারিকাদাস হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, তাই হবে নতুনগোঁসাই। যেখানে মঠের সব গ্রন্থ থাকে তার সঙ্গেই এটি তুলে রাখব।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলাম, তার সম্বন্ধে কমললতার অপবাদ  
তুমি বিশ্বাস কর গোঁসাই?

দ্বারিকাদাস মুখ তুলিয়া কহিলেন, আমি? কখনো না।

তবু ত তাকে চলে যেতে হচ্ছে?

আমাকেও যেতে হবে গোঁসাই। নির্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাক,  
তবে মিথ্যেই এ পথে এসেছিলাম, মিথ্যেই এতদিন তাঁর নাম নিয়েছি।

তবে কেনই বা তাকে যেতে হবে? মঠের কর্তা ত তুমি—তুমি ত তাকে  
রাখতে পার?

গুরু! গুরু! গুরু! বলিয়া দ্বারিকাদাস অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। বুঝিলাম  
গুরুর আদেশ—ইহার অন্যথা নাই।

আজ আমি চলে যাচ্ছি গোঁসাই, বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিবার কালে  
তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন; দেখি চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, আমাকে হাত'  
তুলিয়া নমস্কার করিলেন, আমিও প্রতিনমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ক্রমে অপরাহ্নবেলা সায়াহে গড়াইয়া পড়িল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি  
আসিল, কিন্তু কমললতার দেখা নাই। নবীনের লোক আসিয়া উপস্থিত, আমাকে  
স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে, ব্যাগ মাথায় লইয়া কিষণ ছটফট করিতেছে—সময়  
আর নাই—কিন্তু কমললতা ফিরিল না। পদ্মার বিশ্বাস সে আর একটু পরেই  
আসিবে, কিন্তু আমার সন্দেহ ক্রমশঃ প্রত্যয়ে দাঁড়াইল—সে আসিবে না।  
শেষবিদায়ের কঠোর পরীক্ষায় পরাজ্ঞুখ হইয়া সে পূর্বান্হেই পলায়ন করিয়াছে,  
দ্বিতীয় বন্দ্রুকুও সঙ্গে লয় নাই। কাল আত্মপরিচয় দিয়াছিল ভিক্ষুক বৈরাগিণী  
বলিয়া, আজ সেই পরিচয়ই সে অক্ষুণ্ণ রাখিল।

যাবার সময় পদ্মা কাঁদিতে লাগিল। আমার ঠিকানা দিয়া বলিলাম, দিদি  
বলেছে আমাকে চিঠি লিখতে—তোমার যা ইচ্ছে তাই আমাকে লিখে জানিও  
পদ্মা।

কিন্তু আমি ত ভালো লিখতে জানিনে, গোঁসাই।  
তুমি যা লিখবে আমি তাই পড়ে নেব।  
দিদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?  
আবার দেখা হবে পদ্মা, আজ আমি যাই, বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

## ଚୌଳ

ସମ୍ମନ ପଥ ଚୋଖ ଯାହାକେ ଅନ୍ଧକାରେଓ ଖୁଜିତେଛିଲ, ତାହାର ଦେଖା ପାଇଲାମ  
ରେଲଓସେ ସ୍ଟେଶନେ । ଲୋକେର ଭିଡ଼ ହିତେ ଦୂରେ ଦାଁଡ଼ାଇୟା ଆଛେ, ଆମାକେ ଦେଖିଯା  
କାହେ ଆସିଯା ବଲିଲ, ଏକଖାନି ଟିକିଟ କିନେ ଦିତେ ହବେ ଗୋଁସାଇ—

ସତିଇ କି ତବେ ସକଳକେ ଛେଡ଼େ ଚଲଲେ?

ଏ-ଛାଡ଼ା ତ ଆର ଉପାୟ ନେଇ ।

କଷ୍ଟ ହ୍ୟ ନା କମଲଲତା?

ଏ କଥା କେନ ଜିଜ୍ଞାସା କରୋ ଗୋଁସାଇ, ଜାଣୋ ତ ସବ ।

କୋଥାଯ ଯାବେ?

ଯାବ ବୃନ୍ଦାବନେ । କିନ୍ତୁ ଅତ ଦୁରେର ଟିକିଟ ଚାଇନେ—ତୁମି କାହାକାହି କୋନ-  
ଏକଟା ଜାୟଗାର କିନେ ଦାଓ ।

ଅର୍ଥାଏ ଆମାର ଝଣ ଯତ କମ ହ୍ୟ । ତାର ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ହବେ ପରେର କାହେ ଭିକ୍ଷେ,  
ସତଦିନ ନା ପଥ ଶେଷ ହ୍ୟ । ଏହି ତ?

ଭିକ୍ଷେ କି ଏହି ପ୍ରଥମ ଶୁରୁ ହବେ ଗୋଁସାଇ? ଆର କି କଥନୋ କରିନି?

ଚୁପ କରିଯା ରହିଲାମ । ସେ ଆମାର ପାନେ ଚାହିୟାଇ ଚୋଖ ଫିରାଇୟା ଲଇଲ,  
କହିଲ, ଦାଓ ବୃନ୍ଦାବନେରଇ ଟିକିଟ କିନେ ।

ତବେ ଚଲ ଏକସଙ୍ଗେ ଯାଇ ।

ତୋମାରୋ କି ଐ ଏକ ପଥ ନାକି?

ବଲିଲାମ, ନା, ଏକ ନଯ, ତବୁ ଯତ୍ତୁକୁ ଏକ କରେ ନିତେ ପାରି ।

ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଦୁ'ଜନେ ଉଠିୟା ବସିଲାମ । ପାଶେର ବେଞ୍ଚେ ନିଜେର ହାତେ  
ତାହାର ବିଛାନା କରିଯା ଦିଲାମ ।

କମଲଲତା ବ୍ୟନ୍ତ ହଇୟା ଉଠିଲ—ଓ କି କରଚ ଗୋଁସାଇ?

করচি যা কখনো কারো জন্যে করিনি—চিরদিন মনে থাকবে বলে।  
সত্যিই কি মনে রাখতে চাও?  
সত্যিই মনে রাখতে চাই কমললতা। তুমি ছাড়া যে-কথা আর কেউ  
জানবে না।

কিন্তু আমার যে অপরাধ হবে, গোঁসাই।

না, অপরাধ হবে না—তুমি স্বচ্ছন্দে ব'সো।

কমললতা বসিল, কিন্তু বড় সঙ্কোচের সহিত। গাড়ি চলিতে লাগিল কত  
গ্রাম, কত নগর, কত প্রান্তর পার হইয়া—অদূরে বসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার  
জীবনের কত কাহিনীই বলিতে লাগিল। তাহার পথে বেড়ানৱ কথা, তাহার মথুরা,  
বৃন্দাবন, গোবর্ধন, রাধাকুণ্ডাসের কথা, কত তীর্থভ্রমণের গল্প, শেষে  
দ্বারিকাদাসের আশ্রমে, মুরারিপুর আশ্রমে আসা। আমার মনে পড়িয়া গেল ঐ  
লোকটির বিদ্যায়কালের কথাগুলি; বলিলাম, জানো কমললতা, বড়গোঁসাই তোমার  
কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না।

করেন না?

একেবারে না। আমার আসবাব সময়ে তাঁর চোখে জল পড়তে লাগল,  
বললেন, নির্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি নতুনগোঁসাই, মিথ্যে তাঁর নাম  
নেওয়া, মিথ্যে আমার এ-পথে আসা। মঠে তিনিও থাকবেন না কমললতা, এমন  
নিষ্পাপ মধুর আশ্রমটি একেবারে ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে।

না, যাবে না, একটা কোন পথ ঠাকুর নিশ্চয় দেখিয়ে দেবেন।

যদি কখনো তোমার ডাক পড়ে, ফিরে যাবে সেখানে?

না।

তাঁরা যদি অনুতপ্ত হয়ে তোমাকে ফিরে চান?

তবুও না।

একটু পরে কি ভাবিয়া কহিল, শুধু যাব যদি তুমি যেতে বল। আর কারো  
কথায় না।

কিন্তু কোথায় তোমার দেখা পাব?

এ প্রশ্নের সে উন্নত দিল না, চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে  
ডাকিলাম, কমললতা? সাড়া আসিল না, চাহিয়া দেখিলাম সে গাড়ির এককোণে  
মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়াছে। সারাদিনের শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া  
তুলিতে ইচ্ছা হইল না। তারপরে নিজেও যে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না।  
হঠাতে একসময়ে কানে গেল—নতুনগোঁসাই?

চাহিয়া দেখি সে আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে। কহিল, ওঠ, তোমার  
সাঁইথিয়ায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, পাশের কামরায় কিষণ ছিল, ডাকিয়া তুলিতে  
সে আসিয়া ব্যাগ নামাইল, বিছানা বাঁধিতে গিয়া দেখা গেল যে দু-একখনায়  
তাহার শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম সে তাহা ইতিপূর্বেই ভাঁজ করিয়া আমার  
বেঞ্চের একধারে রাখিয়াছে। কহিলাম, এটুকুও তুমি ফিরিয়ে দিলে?—নিলে না?

কতবার ওঠানামা করতে হবে, এ বোৰা বইবে কে?

দ্বিতীয় বস্ত্রটিও সঙ্গে আনোনি—সেও কি বোৰা? দেব দু-একটা বার  
করে?

বেশ যা হোক তুমি। তোমার কাপড় ভিখিরির গায়ে মানাবে কেন?

বলিলাম, কাপড় মানাবে না, কিন্তু ভিখিরিকেও খেতে হয়। পৌঁছতে  
আরও দু'দিন লাগবে, গাড়িতে খাবে কি? যে খাবারগুলো আমার সঙ্গে আছে তাও  
কি ফেলে দিয়ে যাব—তুমি ছোঁবে না?

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, ইস্, রাগ দ্যাখো। ওগো, ছোঁব গো ছোঁব,  
থাক ও-সব, তুমি চলে গেলে আমি পেটভরে গিলবো।

সময় শেষ হইতেছে, আমার নামিবার মুখে কহিল, একটু দাঁড়াও ত গোঁসাই; কেউ নেই, আজ লুকিয়ে তোমায় একটা প্রণাম করে নিই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া আজ সে আমার পায়ের ধূলা লইল।

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখনো পোহায় নাই। নীচে ও উপরে অন্ধকার স্তরে একটা ভাগভাগি শুরু হইয়াছে, আকাশের একপ্রান্তে কৃষ্ণা অয়োদশীর ক্ষীণ শীর্ষ শশী, অপর প্রান্তে উষার আগমনী। সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন ঠাকুরের ফুল তুলিতে এমনি সময়ে তাহার সাথী হইয়াছিলাম। আর আজ?

বাঁশি বাজাইয়া সবুজ আলোর লক্ষ্মন নাড়িয়া গার্ডসাহেব যাত্রার সঙ্কেত করিল। কমললতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল, কঢ়ে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝাইব কি করিয়া, বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি—আজ একটি কথা রাখবে?

হাঁ রাখব, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম।

বলিতে তাহার একমুহূর্ত বাধিল, তারপর কহিল, আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে আর তুমি মন খারাপ ক'রো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তাহার সেই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার ব'লে আর তোমাকে আমি অসম্মান করবো না।

হাত ছাড়িয়া দিলাম, গাড়ি দূর হইতে দূরে চলিল, গবাক্ষপথে তাহার আনত মুখের ‘পরে স্টেশনের সারি সারি আলো কয়েকবার আসিয়া পড়িয়া

আবার সমস্ত অঙ্ককারে মিলাইল। শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে  
শেষ নমস্কার জানাইল।